শান্তিসুধা।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশামৃত।)

সূচনা।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।)

[‘ব’ লিখিত।]

শুভক্ষণে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ায়,
কামারপুকুর গ্রামে হুগলী জিলায়
সতর ছাপ্পান্ন শকে শুভ বুধবার
আবির্ভূত রামকৃষ্ণ করুণা আধা...

চট্টোপাধ্যাযের বংশে ভক্ত খুদি...
ঠাকুরের নিষ্ঠাবান্ জনকের নাম,
মাতা চন্দ্রমণি দেবী দয়ার মূরতি,
স্নেহসরলতাময়ী, ধর্ম্মে সদা মতি।

ছেলে বেলা ঠাকুরের নাম গদাধর
পাঠশালে অল্প কিছু লেখাপড়াপর
৺রঘুবীর বিগ্রহের সেবায় মগন,
নিজ হাতে তুলি ফুল করিত অর্চ্চন।

সুকণ্ঠ ঠাকুর কভু করিতেন গান,
পুণ্যদেহ, শুদ্ধমন, প্রফুল্ল পরাণ,
ছেলে বুড়া সকলের আদরের ধন ;
এইরূপে বাল্যলীলা হইল যাপন।

লাহাদের বাড়ী যেত অতিথি সজ্জন,
তাহাদের সঙ্গ সেবা করিত কখন,
কথকেরা কভু সেথা পড়িত পুরাণ,
শুনিতেন গদাধর এক মন প্রাণ।

পিতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনে
চলিলেন কলিকাতা কার্য্য অন্বেষণে,
ঝামাপুকুরেতে আর নাথের বাগানে
কিছু দিন করিলেন পূজা নানা স্থানে।

এদিকে দক্ষিণেশ্বরে করিল স্থাপন
কালীবাড়ী রাসমণি, পূজক ব্রাহ্মণ
নিযুক্ত হইল ভ্রাতা শ্রীরামকুমার,
তাই ভাই সনে সেথা চলিল এবার।

কিছুদিন করি পূজা হইল কেমন,
থাকিতেন কালীঘরে ব'সে অনুক্ষণ,
সংসার বিরাগ আর বিমনা এমন
হেরি বিবাহের সবে করে আয়োজন।

সারদামণির সনে হ'ল পরিণয়
ফিরিলনা তা'র পানে উন্মত্ত হৃদয় ;
ভাঙ্গিয়া বালির বাঁধ অনন্তের পানে
ছুটিল মানসনদী এক মহাটানে।

আরতির শেষ নাই, পূজা অনুক্ষণ ,
বাহ্য বস্তু, নিজদেহ হ'ল বিস্মরণ ,
ক্রমে সন্ধ্যা পূজা শেষ, তখন কেবল
'মা' 'মা' ব'লে অশ্রুজল ঝরে অবিরল।

বিষয়ী দেখিলে এক পাশে চ'লে যান,
পরম আনন্দ যদি সাধুসঙ্গ পান,
তোতাপুরী শিখা'লেন বেদান্ত দর্শন,
ভৈরবী ব্রাহ্মণী আর তান্ত্রিক সাধন।

ভজিলেন হনুমান ভাবে সীতারাম,
সখীভাবে জপিলেন পরে কৃষ্ণনাম ,
এইরূপে করিলেন কঠোর সাধন,
শিখাতে সংসারী জীবে সার নারায়ণ।

বারাণসী বৃন্দাবন আদি পুণ্য স্থান
একে একে বহুতীর্থে করিয়া প্রয়াণ,
বহু সাধু মহাত্মায় দিয়া দরশন
করেন দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন।

ধীরে ধীরে নানাস্থান হ'তে ভক্তগণ
লইলেন একে একে চরণে শরণ
পুত্র জ্ঞানে ভক্তগণে উপদেশ কত
অতি সুধামাখা স্বরে দেন অবিরত।

পরম করুণাময় ব্রহ্মানন্দপূর্ণ প্রাণ
বুঝাইয়া জনে জনে ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম, জ্ঞান
আঠারশ আট শকে করে লীলা সম্বরণ,
ঘরে ঘরে নর নারী করে নাম সংকীর্ত্তন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

পুণ্য ভারতের বুকে
জাহ্নবীর পূতধারা
ভগিনী যমুনা সনে
ধাইতেছে একমনে।

হিমাচল কোল হ'তে
মিশিতে সাগর সনে
অতি আদরের মেয়ে,
উচ্ছ্বাসে ছুটিছে ধেয়ে।

পুণ্যময়ী পূত করি
হরিদ্বার বারাণসী
ধাইছে দক্ষিণেশ্বরে
মোহন সঙ্গীত গাহি
নগর প্রান্তর কত
আদি স্থান শত শত
বিতরিয়া পূতধারা
হইয়া আপন হারা।

পশ্চিম আকাশে রবি
ধীরে ধীরে ডুবে যায়,
রক্তিম রঞ্জিত মেঘ
ভাসিছে গগন গায়,
সোনার মুকুট পরা
সারি সারি ঝাউ তীরে,
কি সুন্দর প্রতিবিম্ব
সুনীল জাহ্নবী নীরে।

তার পর নহবৎ উঠে পুরবীর তান,
উজল তরঙ্গ গুলি নাচে তায় ফুল্লপ্রাণ,

দক্ষিণে উদ্যানে তাব সন্ধ্যাসতী ভক্তি ভরে
ঢালিছে ফুলের ডালি বিভুর চরণ 'পরে।

বাগানের পাশে শোভে ঠাকুরের চারু ঘব,
পশ্চিমের বারান্দায় সমাসীন ঋষিবর—

প্রশান্ত সহাস্য মুখ, আনন্দ প্লবিত প্রাণ,
ব্রহ্ম প্রেম জলধিতে নিশিদিন ভাসমান।

অনন্ত অম্বর কান্তি নীল আঁখি তার কায়,
ত্রিদিবের পবিত্রতা শ্রীমুখকমল ছায়।
ভক্তি, দয়া, প্রীতি, শান্তি, ধর্ম্ম, সত্য, জ্ঞান আব
কিঙ্কর কিঙ্করী প্রায় যেন ঘিবে চারি ধাব।

সম্মুখে ভক্তেরা সব শ্রীমুখারবিন্দ পানে
চেযে আছে মুগ্ধ নেত্রে বিস্ময় প্রফুল্ল প্রাণে।

তাহার দক্ষিণ দিকে দ্বাদশ মন্দিব শোভে,
ধ'রেছে হৃদয়ে ছবি জাহ্নবী সুষমালোভে।

প্রশস্ত সোপানশ্রেণী নীল নীবে শোভা পায়,
দুইটী মন্দির শোভে তাব পূর্ব্বে আঙ্গিনায়।

কারুকার্য্য বিভূষিত সুন্দব মন্দিব মাঝে
রাধা শ্যাম একাসনে রতন ভূষণে সাজে।

অপর মন্দির মাঝে চারু মূর্ত্তি শ্যামা মার,
মহাকালোপরি স্থিতা ভকতের সারাৎসাব।

শান্তির প্রতিমা সন্ধ্যা, শান্তিময় এই স্থান,
শান্তির হিল্লোলে মৃদু উথলে ভক্তের প্রাণ।

আড়াই ক্রোশের পরে শোভে কলিকাতা ধাম,
কামিনী কাঞ্চনে মত্ত যেথা সবে অবিরাম।

জীবের দুর্দ্দশা হেরি　　কাঁদে প্রাণ নিরন্তর,
বলিলেন রামকৃষ্ণ　　করুণা জড়িত স্বর ;—

"সবেই প্রমত্ত বৎস !　　কামিনী কাঞ্চন নিয়া,
নিত্যবস্তু পানে কারো　　ছুটেনা দুর্ব্বল হিয়া।
নানা ধর্ম্ম বিসম্বাদ　　সকল সংসার ভ'রে ;
স্থূলে মত্ত, মূল কভু　　বিচার না কেহ করে।"

নীরব হইলা প্রভু।　　জিজ্ঞাসিল শিষ্যবর,
"ধর্ম্ম সমন্বয়, সে কি,　　সম্ভব এ ধরা'পর ?"

হেন কালে আরতির　　উঠিল বাজনা বাজি,
হাসিল প্রকৃতি সতী　　কৌমুদী বসনে সাজি।

নাচিল তরঙ্গ মালা　　জোছনা বসন পরি,
হাসিল কুসুম রাশি　　সকল কানন ভরি।

ফুটিল আকাশ পটে　　কত লক্ষ লক্ষ তারা,
হাসি মুখে আসে শশী　　বিভুপ্রেমে আত্মহারা।

চলিলেন রামকৃষ্ণ　　আনন্দ প্রফুল্ল প্রাণে
হেরিতে আরতি শোভা　　মায়ের মন্দির পানে।

পূর্ণ শশধর পাশে　　ক্ষুদ্র নক্ষত্রের প্রায়
নীরবে সেবকবৃন্দ　　ভক্তিভরে পিছে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।

আরতির অন্তে বসি প্রফুল্ল অন্তর
সৌর মণ্ডলের মাঝে প্রদীপ্ত ভাস্কর,
কিম্বা তারারাজি মাঝে সুধাংশু যেমন
বসিলেন রামকৃষ্ণ নি'য়ে শিষ্যগণ।

বলিলেন শিষ্যগণে কবি সম্বোধন—
"ধর্ম্ম নিন্দা মহা পাপ, রাখিও স্মরণ।

"তৃষ্ণাতুর নাহি বলে ঘোলা গঙ্গা জল;
এ ভাল ও মন্দ বলে নিন্দুক কেবল।
ধর্ম্মতৃষ্ণা জাগিয়াছে হৃদয়ে যাঁহার
সব ধর্ম্ম তাঁ'র কাছে পুণ্যের আধার।

"আমার ধর্ম্মটি ঠিক, মিথ্যা অপরের,
মতুয়ার বুদ্ধি' সুধী নাম দেন এর।
কারো ধর্ম্ম নিন্দা করা উচিত না হয়,
যত মত, তত পথ, জানিও নিশ্চয়।

"ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মত এ পৃথিবীময়,
স্থূলে বহু, মূলে এক, জানিও নিশ্চয়।
নাম নিয়া বিসম্বাদ হয় অবিরাম
দেখ, এক রাম তাঁর কত শত নাম।

"বৈষ্ণবের বিষ্ণু তিনি শিব শৈবদের,
শাক্তদের আদ্যাশক্তি যীশু খ্রীষ্টানের,
ব্রাহ্মদের ব্রহ্ম তিনি আল্লা ইস্লামের,
যোগীদের পরমাত্মা বুদ্ধ বৌদ্ধদের।

"হস্তীর নিকটে গিয়ে কাণা দুইজন
পায়ে পেটে হাত তার করি অর্পণ,
এক কাণা বলে ভাই 'হাতী গোল' হয়,
আর কাণা বলে 'না, না, লম্বা সুনিশ্চয়',
ভক্তিচক্ষুহীন বলে 'ঈশ্বর এরূপ,'
ভক্তিমান্ দেখে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

"গিরিগিটি লাল বলে একটি পথিক,
অন্য বলে 'পীতবর্ণ' অন্য 'কাল' ঠিক,
পাত্র ভেদে গিরিগিটি নানারূপ ধরে,
না বুঝিয়া নর শুধু কলহেতে মরে।

"একটি দীঘির জল সকলেতে নেয়,
কেহ বা 'ওয়াটার,' কেহ 'জল' নাম দেয়,
কেহ বা 'একোয়া' বলে, কেহ বলে 'পানি ;'
'এক রাম, বহু নাম' এই স্থির জানি।

"সবেই উঠিতে চায় প্রাসাদ উপরে,
কেহ মই বেয়ে, আর কেহ দড়ি ধ'রে,
কেহ গাছ বেয়ে উঠে, কেহ সিঁড়ি দিয়া,
নানাপথ নানাজন লইছে বাছিয়া।
ঈশ্বরই একমাত্র গন্তব্য সবার,
পথ লয়ে বৃথা কেন বাদ অনিবার ?"

নীরব এতেক বলি। কিছুক্ষণ পরে
জিজ্ঞাসিল এক শিষ্য বিনীত অন্তরে—
"হিন্দুরা সাকারবাদী, ব্রাহ্ম নিরাকার,
কেমনে হইবে প্রভো, মিলন দোঁহার ?"

বলিলেন রামকৃষ্ণ "এই মনে হয়—
রোসনচৌকির বাদ্য এ সংসারময়,
এক জন সানাইতে খালি 'পোঁ' ধরে,
'রাধা আমার মান করেছে' বাজায় সে অপরে।

"ব্রাহ্ম 'নিরাকার ব্রহ্ম' খালি ধরে থাকে,
নানা মূর্ত্তির রঙ্গ পরাঙ্গে হিন্দু তাঁকেই ডাকে।
মিছরির রুটি মিষ্ট অতি যে ভাবেই খাও,
সাকার বা নিরাকার যেটা রে হয় লও।

"ধর্ম্মে মহজনদের বিসম্বাদ নাই
হীনমতি চেলাগুলা করয়ে লড়াই,
শিবে রামে মিল হ'তে লাগে কতক্ষণ ?
ভূতে ও বানরে মিল হয় কি কখন ?

"বদ্ধ জলে হয় দল, স্রোত জলে নয়,
দল নাই বিভুপানে ছুটে যে হৃদয়।"

শিষ্য—খ্রীষ্টান পাদরী সদা কৃষ্ণ নিন্দা করে,
কিরূপে মোদের শ্রদ্ধা হ'বে খ্রীষ্ট 'পরে ?

রামকৃষ্ণ—জলেতে ডুবুরি যথা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে
ডুব দিয়া যায়, আর পুনঃ মাথা তুলে,
কাল সাগরেতে তথা এক অবতার,
ভিন্ন নামে ভিন্ন স্থানে করেন প্রচার।
যেই কৃষ্ণ সেই খ্রীষ্ট সব এক জন,
দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন এমন।

শিষ্য—তবে কেন এ সংসারে সঙ্কীর্ণ হৃদয়
ধর্ম্ম বিসম্বাদে মত্ত মানবনিচয় ?

রামকৃষ্ণ—কূয়ার বেঙ্‌টি ভাবে
কূয়া হতে বড় নাই,
সেই মত গোঁড়া ভাবে
তার চেয়ে ধর্ম্ম নাই।
নানাভাবে নানা লোক
এক ভগবানে ডাকে,
এই জ্ঞান থাকে যেন,
নিন্দা নাহি করো কা'কে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাকারোপাসনা বা প্রতিমাপূজা।

শিষ্য—মনগড়া মূর্ত্তি যদি মোক্ষের সাধন হয়
স্বপ্নলব্ধ রাজ্য পেয়ে কেন আমি রাজা নয় ?
অজ্ঞানী প্রতিমা পূজে জ্ঞানী পূজে সর্ব্বময়,
এই সব কথা প্রভো কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।
কেন তবে এত লোক প্রতিমা পূজায় রত,
যদি তাহে সত্য বস্তু নাহি হয় হস্তগত ?

রামকৃষ্ণ—সাগরসঙ্গম আর সেই হরিদ্বার,
এ সুদীর্ঘ পথে গঙ্গা ধায় অনিবার।
যেই ঘাটে স্নান কর নিস্তার পাইবে,
সব গঙ্গা পরশনে ফল যা লভিবে।
সান্ত মূর্ত্তি ধ্যানে তথা অনন্তেরে পাই,
সান্ত ধরা সোজা কিন্তু অনন্ত বালাই।
এক ঘটি জলে যদি তৃষ্ণা মিটে যায়
পুকুরেতে কত জল কে তাহা মাপায়?

আধ বোতলেতে যেই মাতাল হইবে
কত মদ দোকানেতে জেনে কি করিবে?

বিবিধ ছেলের তরে বিবিধ ব্যঞ্জন
যার পেটে যেবা সয় মা করে রন্ধন।
অধিকারী ভেদে তথা পূজার সৃজন,
কারো নিরাকার কারো সাকার ভজন।

আগুনের মূর্ত্তি নাই, আছে অঙ্গারের,
পূজকের তরে ব্রহ্ম, মূর্ত্তি সাকারের।

বিবাহের পূর্ব্বে যথা পুতুলেতে মন,
ঈশ্বর লাভের পূর্ব্বে প্রতিমা পূজন।
স্বামী পেলে পুতুলেতে নাহি প্রয়োজন,
সিদ্ধ পারে প্রতিমাটী দিতে বিসর্জ্জন।

শিষ্য—ভ্রমাত্মক নয় তবে প্রতিমা পূজন?
সাকার তবে কি মোরা করিব অর্চ্চন?

রামকৃষ্ণ—প্রতিমা পূজায় যদি ভুল হ'য়ে থাকে
তিনি ত জানেন—জীব তাঁহাকেই ডাকে!

তিনি নিরাকার, আর তিনিই সাকার,
ধ'রে থাক যেইটিতে বিশ্বাস তোমার।

শিষ্য—বিপরীত ভাব দেব, সম্ভব এমন?
সাকার ও নিরাকার দুই এক জন?

রামকৃষ্ণ—ভক্তের নিকটে তিনি সুন্দর সাকার,
জ্ঞানীর নিকটে নিত্য, শুদ্ধ, নিরাকার।

বেদান্তের জ্ঞানপথে ব্রহ্ম নিরাকার,
পুরাণের ভক্তিপথে সুন্দর সাকার।

রামরূপ ভালবাসে ভক্ত হনুমান্,
তাই ধরে রামমূর্ত্তি কৃষ্ণ ভগবান্।

জ্ঞানবান্ ভক্তিচোখে পাবে হেরিবারে
চিণ্ময়ী প্রতিমাখানি মৃণ্ময় আধারে।

শিষ্য—প্রতিমা পূজাতে প্রভো কি কি বস্তু দরকার?

রামকৃষ্ণ—কর্ত্তা, পূজারির ভক্তি, প্রতিমা সুন্দর আর।
একজন একমনে দুর্গা পূজা করে,
ধূম ধাম নাই, শুধু ভকতি অন্তরে।

নাচ বাদ্য ভোজনেরি কোথা আয়োজন,
সত্ত্বগুণী রজোগুণী পূজন এমন।
তমোগুণী পূজা করে পাঁঠা দেয় বলি,
অশ্লীল সঙ্গীত গায় মদে ঢলাঢলি।
"পূজা কেন উঠে গেল?" বলে একজন,
"দাঁত নাই, পূজাতে বা কোন্ প্রয়োজন?"

শিষ্য—কালী মূর্ত্তি কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিয়া পূজন
মানব নির্ব্বাণ মুক্তি লভে কি কখন?

রামকৃষ্ণ—যবে রূপ, বর্ণে চিত্ত একান্ত বিলয়,
সাধকের সিদ্ধিলাভ তখন নিশ্চয়।
শ্যামরূপ, শ্যামামূর্ত্তি চৌদ্দপোয়া কেন?
দূরে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ হেন।
শুদ্ধমনে মা মা বলে যত কাছে যায়,
যেই শ্যাম সেই শ্যামা দেখে বিশ্বময়।

এতটুকু সূর্য্য দেখ দূরে আছ ব'লে,
কত বড় হবে বোধ তা'র কাছে গেলে।

কাছে নিরাকার, দূরে সুনীল, আকাশ,
শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ তথা জগতে প্রকাশ।

ভক্তিভবে অবিরাম শ্যামেবে ভজিলে
অরূপ ও রূপবাশি দেখিবারে মিলে।

কেহ বলে কালী, কৃষ্ণ বলে পুনঃ কেউ ;
চিদানন্দ সাগরের চিন্ময় ও ঢেউ।

ভক্তিহিমে জমে ওই সাগর লহরী,
নিবাকাবে সাকাব কি রঙ্গ মবি মবি।
জল নিবাকাব কিন্তু ববফ সাকাব,
তেমতি এ লীলা বুঝো অতি চমৎকাব।
জ্ঞান-সূর্য্য উঠে যদি ববফ গলিয়া যায,
জলে জল একাকাব, দশ দিক্ জলে ছায়।
আগে শিশু বড লিখে, ছোট তার পবে ;
স্থূল না চিনিলে, সূক্ষ্মে আয়ত্ত কে কবে।
প্রথমে সাকাব চাই, শেষে নিরাকার
এই মত ঈশ্ববেব পূজা অধিকাব।

ব্রহ্মসাগবেব কভু পাবাপাব নাই,
লীলাময় ছবি ভ'জে পার কূল পাই।

শিষ্য—কালীমূর্ত্তি শিবোপবি কেন অধিষ্ঠিত,
কৃষ্ণ সনে বাধা মূর্ত্তি কেন বিজড়িত ?

বামকৃষ্ণ—পুরুব নিষ্ক্রিয, তাই শব হ'য়ে প'ড়ে বয়,
প্রকৃতি তাঁহাব যোগে কবে সৃষ্টি স্থিতি লয।

পুরুষ প্রকৃতি যোগে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাই রাধা আব কৃষ্ণ একত্রে দর্শন হয়।

প্রকৃতিতে পুরুষের দৃষ্টিযোগ থাকা চাই,
তাই না বঙ্কিম আঁখি কৃষ্ণের দেখিতে পাই।

কৃষ্ণ নীল, তাই রাধা সুনীল বসন পরা,
রাধা পীত, তাই কৃষ্ণ পরিহিত পীত ধড়া।
রাধা গৌর, তাই শুভ্র কৃষ্ণের মুকুতা রাজি,
কৃষ্ণ নীল, তাই রাধা সুনীল নোলকে সাজি।

প্রকৃতি পুরুষ যোগ দেখাইতে শাস্ত্রকার
বর্ণিয়াছে চারু মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার।

—০:—:০—

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

(প্রিয় মুখুয্যের বাটী।)

(১)

৩৪ দিন হ'ল স্বামিজী বিলাত হ'তে এদেশে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের আনন্দের অবধি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের ঘরে ঘরে স্বামিজীর সাদর আহ্বান হ'চ্ছে। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখুয্যের বাড়ীতে স্বামিজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়ীতে এসেছেন। শিষ্যও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে বেলা প্রায় ২৷৷০ টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামিজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামিদর্শন এই নূতন—এই প্রথম পরিচয়।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ শিষ্যকে স্বামিজীর কাছে লইয়া যাইয়া পরিচয় দিতেছেন। স্বামিজী মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটী শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছেন। শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তবরিষ্ঠ নাগ মহাশয়ের কাছে যাতায়াত করে—ইহাও স্বামিজী জানিয়াছেন।

শিষ্য আসিয়াই স্বামিজীকে করপুটে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিয়াছে। স্বামিজী সেদিন শিষ্যকে প্রথমে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। নাগ মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—"বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী"—(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। শিষ্যকে—এই কথা লিখিয়া নাগ মহাশয়কে জানাইতে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের ভিড়ে

আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, শিষ্য ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া যাইয়া 'বিবেকচূড়ামণি'র এই কথাগুলি প্রথমেই শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—

"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্! তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥"

"হে বিদ্বন্! ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই, সংসারসাগরপারের উপায় আছে। যাহা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ এই সংসারসাগর পার হইয়াছেন, সেই উৎকৃষ্ট পথ—আমি তোমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিব।"

শিষ্য শুনে ভাবছে—স্বামিজী তাহাকে আজ প্রথম দর্শনেই শিষ্যরূপে ব্যবহার করিতেছেন না কেন? বোধ হয় শিষ্যের আজিও মন্ত্রদীক্ষা হয়নি বলিয়া। শিষ্য তখন অতীব আচারী ও বেদান্তমতবাদী। গুরুকরণাদিতে এখনও তাহার মতি স্থির হয় নাই। শিষ্য এখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একান্ত গোঁড়া।

সে যাহা হোক, স্বামিজী শিষ্যকে বিবেকচূড়ামণি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। শিষ্যের সঙ্গে কিছু পয়সা ছিল, সেই দিনই সে স্বামিজীর কথামত একখানা বিবেকচূড়ামণি কিনিয়া পড়িতে থাকে। সেই গ্রন্থখানি স্বামিজীর প্রথম-দর্শনস্মরণচিহ্নরূপে আজিও শিষ্যের সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছে।

নানা প্রসঙ্গ হচ্ছে, এমন সময় সেই ঘরে এসে কে সংবাদ দিল যে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন (এখন রায় বাহাদুর) স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে তথায় উপস্থিত। স্বামিজী সংবাদবাহককে বলিলেন—"তাঁহাকে এখানে নিয়ে এসো।" নরেনবাবুও সেই ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন। নানাপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। প্রশ্নোত্তরে স্বামিজী বলিতে লাগিলেন যে, আমেরিকাবাসীর মত এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসৎকারপরায়ণ, নব নব ভাব গ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি আর জগতে দেখা যায় না। বলিলেন—"আমার শক্তিতে কিন্তু হয় নাই; আমেরিকা দেশের লোক এত সহৃদয় বলিয়াই তাঁহারা বেদান্তভাব গ্রহণ করিয়াছেন।" ইংলণ্ডের কথা উপলক্ষ করিয়া বলিলেন যে, ইংরেজের মত Conservative জাতি জগতে আর নাই। তারা কিছুতেই কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাহাদিগকে একবার কোন ভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা কিছুতেই তাহা আর ছাড়িবে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অন্য

কোন জাতিতে মিলে না। তাই তারা সভ্যতা ও শক্তিসঞ্চয়ে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বামিজী আরও বলিলেন—এমেরিকার চেয়ে, ইংলণ্ডে তাঁহার আশা বেশী; কিন্তু উপযুক্ত প্রচারক চাই। বলিলেন—"আমি কেবল কার্য্যের পত্তন করিয়া আসিয়াছি। ইহার পরবর্ত্তী প্রচারকগণ, এই পন্থা অনুসরণ করিলে, কালে অনেক-কার্য্য হইবে।"

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই প্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা আছে?"

স্বামিজী বলিলেন—"আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের আর কিছু নাই বল্লেই হয়। কিন্তু এই সার্ব্বভৌমিক বেদান্তবাদ, যা'তে সকল মতের, সকল পথের লোককেই, ধর্ম্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে, ইহার প্রচারে—পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ জানিতে পারিবে, ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম ভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল। এই মত গ্রহণ ও চর্চ্চায় আমাদের প্রতি পাশ্চাত্য জাতির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইবে—অনেকটা এখনি হইয়াছে। এই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে আমরা, তাহাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া, জীবনসংগ্রামে সমর্থ হইব। পক্ষান্তরে তাহারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করিয়া পার-মার্থিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে।"

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই আদান প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি না?" স্বামিজী বলিলেন—"ওরা মহাপরাক্রান্ত বিরো-চনের সন্তান, ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত—ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ হইয়া কার্য্য করিতেছে। আপনারা যদি মনে করেন—আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই একদিন স্বাধীন হইব—তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝিতেছেন। হিমালয়ের সাম্নে সামান্য উপলখণ্ড যেরূপ, উহাদের ও আমাদের, ঐ শক্তি-প্রয়োগ-সামর্থ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ। আমার মত কি জানেন?—আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিয়া, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকিব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকিবে। এই ধর্ম্ম ওদের হাতে ছেড়ে দিলে এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব ঘুচে যাবে। দিন রাত চীৎকার করেও ওদের এ দেও ও দেও বল্লে কিছু হবে না। এই আদান-প্রদান-রূপ কার্য্য

দ্বারা যখন উভয় পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির টান্ হবে, তখন চেঁচামেচিও আর কর্‌তে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব কর্‌বে। আমার বিশ্বাস—এইরূপে ধর্ম্মের চর্চ্চায়, এই বেদান্ত ধর্ম্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতি চর্চ্চা এর তুলনায় গৌণ (Secondary) উপায় বলিয়া বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে জীবন ক্ষয় করবো। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্য ভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন ত, অন্য ভাবে কার্য্য করে যাউন। নরেন্দ্র বাবু, স্বামিজীর কথায় অবিসংবাদী সম্মতি প্রদান করিয়া, খানিক বাদে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শিষ্য, স্বামিজীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া, স্বামিজীর সেই দীপ্ত মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক প্রধান উদ্যোগী ও প্রচারক স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে এই সময় উপস্থিত হন। পুরো না হলেও ইঁহার বেশ ভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত—মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ী বাঁধা—দেখিলেই মনে হয়, হিন্দুস্থানী। স্বামিজী তখনো পশ্চিম দিকের সেই ছোট ঘরে বসিয়া শিষ্যের সঙ্গে বেদান্তের চর্চ্চা করিতেছিলেন, একজন আসিয়া ঐ গোরক্ষা প্রচারকের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করায়, বাহিরের ঘরে অনিচ্ছায় আসিলেন। স্বামিজীকে দেখিয়া গোরক্ষিণী সভার সেই প্রচারক, অভিবাদন করিয়া, গোমাতার একখানি ছবি স্বামিজীকে উপহার দিলেন। স্বামিজী, উহা হাতে লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া, তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেন—

স্বামিজী—আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক—আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে—যেখানে রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য এবং কসায়ের হাত থেকে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হয়।

স্বামিজী—এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক—এই দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তা দিয়েই এ সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

স্বামিজী—আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে?

প্রচারক—প্রধানতঃ মাড়োয়ারী বণিক্‌সম্প্রদায় ইহার পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্য্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামিজী—এই যে মধ্য ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে—যাহাতে

ভারত গবর্ণমেণ্ট ৯ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা দিয়াছেন—তাতে আপনাদের সভা কোন সাহায্য করিয়াছে কি?

প্রচারক—আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবল গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামিজী—যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, বহু গচ্ছিত অর্থ সত্বেও আপনারা, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে অন্ন দিয়া, সাহায্য করা উচিৎ মনে করেন নাই?

প্রচারক—না; লোকের কর্ম্মফলে—পাপে—এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া স্বামিজীর সেই বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল। কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন—"যে সভাসমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে, নিজের ভাই অনশনে মরিতেছে দেখিয়াও তাহার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশিরাশি অন্ন বিতরণ করে, তাহার সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই—তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কর্ম্মফলে মানুষ মরছে—এরূপে কর্ম্মের দোহাই দিলে, জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটা একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা আপন আপন কর্ম্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মচ্চেন—আমাদের উহাতে কিছু করবার নাই।"

প্রচারক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"হাঁ, আপনি যা বল্‌ছেন, তা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—'গরু আমাদের মাতা'।"

স্বামিজী হাসতে হাসতে বল্‌লেন—"হাঁ, গরু যে আপনাদের মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি—তা না হইলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব কর্‌বেন?"

হিন্দুস্থানী প্রচারক, ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় স্বামিজীর বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না), স্বামিজীকে বলিলেন যে, এই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামিজী—আমি ত ফকির সন্ন্যাসী লোক। আমি কোথায় অর্থ পাবো যাতে আপনাদের সাহায্য কোর্‌বো? তবে আমার হাতে যদি কখনো অর্থ হয়, তবে অগ্রে মানুষের সেবায় ব্যয় করিব। এই মানুষকে আগে বাঁচাইতে হইবে—অন্নদান

—বিদ্যাদান—ধর্ম্মদান করিতে হইবে। এ সব করে যদি অর্থ বাকী থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।" এই কথা শুনে প্রচারক মহাশয় অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামিজী আমাদের বল্লেন—"কি কথাই বল্লে। বলে কি না কর্ম্মফলে মানুষ মরে; তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, তার এই একটা চূড়ান্ত প্রমাণ।" শিষ্যকে উপলক্ষ করে বল্‌ছেন—"দেখলি বাবা, তোদের হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হায়, মানুষ হ'য়ে মানুষের জন্ম যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি মানুষ রে বাবা?" ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল।

তার পর স্বামিজী তামাক খেতে খেতে শিষ্যকে বল্‌ছেন—"আবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

শিষ্য—আপনি কোথায় থাকবেন? বড় মানুষের বাড়ী থাক্‌লে আমাকে যেতে দেবে তো?

স্বামিজী—আমি সম্প্রতি কখন আলমবাজার মঠে ও কখন কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানবাড়ীতে থাক্‌বো। তুমি সেখানে যেও।

শিষ্য—মশায়, আপনার সঙ্গে নিবিবিলি কথা কইতে বড় ইচ্ছা যায়।

স্বামিজী—তাই হবে—এক দিন রাত্রিতে যেও। খুব—বেদান্তের কথা হবে। স্বামিজী প্রথমালাপেই বুঝিয়াছিলেন যে, শিষ্য বেদান্তমত ব্যতীত অন্য কিছুতেই বিশ্বাসী নয়; তাই বলেছিলেন বেদান্তের কথা হবে। ঐ কথাটী শিষ্যের বেদান্ত-চর্চ্চার পক্ষে চিরকাল একান্ত সহায়ক হইয়া রহিয়াছে।

শিষ্য—মশায়, আপনার সঙ্গে নাকি অনেক ইংরেজ ও এমেরিকান্ এসেছে? তারা তো আমার বেশভূষা কথাবার্ত্তায় কিছু বল্‌বে না?

স্বামিজী—তারাও সব মানুষ। বিশেষতঃ বেদান্তধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুসি হবে।

শিষ্য—মহাশয়, বেদান্তে যে সব অধিকারীর লক্ষণ আছে, তা আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যদের কিরূপে হলো? শাস্ত্রে বল্‌ছে—"অধীতবেদবেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আহার বিহারে পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধনসম্পন্ন না হলে বেদান্তের অধিকারী হয় না।" আপনার পাশ্চাত্য শিষ্যেরা তো একে অব্রাহ্মণ—অশন-বসনে অনাচারী; তারা বেদান্তবাদ বুঝ্‌লে কি ক'রে?

স্বামিজী—তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রেই দেখো না?

• এতক্ষণে স্বামিজী বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্য একজন নিষ্ঠাবান্—আচারী হিন্দু।

শিষ্য—তা যাবো। আপনি এখন কোথায় যাবেন?

স্বামিজী—এই নিকটেই—বোসপাড়ায়—বলরাম বাবুর বাড়ী। তুমি কাল গোপাল শীলের বাগানে যাবে তো?

শিষ্য—নিশ্চয় যাবো।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া, রাস্তায়ই পড়িতে পড়িতে দরজিপাড়ার দিকে অগ্রসর হইল।

(২)

(শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ী)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম গৃহিভক্ত, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষজা মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়ার নিকটস্থ রামকৃষ্ণপুরে নূতনবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত বাটীর নিমিত্ত জমী ক্রয় করিবার সময় স্থানটির 'রামকৃষ্ণপুর' নাম জানিয়া, তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ, উহা তাঁহার ইষ্টদেবের নামে নামিত। বাড়ী তৈয়ারি হওয়ার কয়েকদিন পরেই স্বামিজী প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঘোষজা ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামিজী দ্বারা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। ঘোঁষজা মঠে ঐ কথা উত্থাপন করায় স্বামিজী সম্মত হইয়াছেন। নবগোপাল বাবুর বাটীতে তাই আজ উৎসব। তাই মঠধারী সন্ন্যাসী ও ঠাকুরের গৃহিভক্তগণ সকলেই আজ তথায় সাদরে নিমন্ত্রিত। তাই বাড়ীখানি আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত—সাম্নের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতায় তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। তাই 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামিজী সমভিব্যাহারে মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামিজীর পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্ব্বাস, মাথায় পাগড়ী—খালি পায়। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট থেকে স্বামিজী যে পথে নবগোপাল বাবুর বাড়ী যাইবেন, সেই পথের দুধারে অগণ্য লোক দাঁড়াইয়া—স্বামিজীকে দর্শন করিবে বলিয়া। ঘাটে নামিয়াই স্বামিজী স্বয়ং খোল লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। আরও দুইতিনটী খোল ও করতাল বাজিতেছে। স্বামিজী গান ধরিয়াছেন—"দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে। কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥" অপরাপর রামকৃষ্ণভক্ত ও সন্ন্যাসিগণ পেছনে উহাই গাইতেছেন। উদ্দাম নৃত্য

ও মৃদঙ্গ ধ্বনিতে পথ ঘাট মুখরিত হইতেছে। কোন্ রাস্তায় যাওয়া হচ্চে কাহারও কিছু খেয়াল নাই। যাইতে যাইতে দলটি পরমভক্ত রামলাল ডাক্তার বাবুর বাড়ীর কাছে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়াছে। রামলাল বাবুও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামিজী না জানি কত সাজ গোজে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল—তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে, মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারে নাই। অনেকে অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছেন,—ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ! স্বামিজীর এই অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতেছেন এবং 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গম্যপন্থা মুখরিত হইতেছে।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাড়ীর দোরে উপস্থিত হইল। গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামিজী মৃদঙ্গ নামাইয়া ধূলো পায়ে বৈঠকখানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেছেন। তামাক সেজে দেওয়া হইল। তামাক খেয়ে স্বামিজী ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

নবগোপাল বাবু প্রাণ ভোবে আজ ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। 'জয়রাম', 'জয়রাম' কথা ছাড়া তাঁর মুখে আর কোন কথা নাই। শিষ্য স্বামিজীকে বলিতেছেন—"মহাশয়, ইনি গৃহস্থের আদর্শ।" স্বামিজী বল্‌ছেন—"তা একবার বল্‌তে ?"

ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোরসিলেনের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর ঠাকুর পূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামিজী দেখে শুনে খুব খুসী হইয়াছেন।

গৃহিণী ঠাকুরাণী স্বামিজীকে বলিতেছেন—"আমাদের সাধ্য কি যে, ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি ? এই সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ—আপনি আজ নিজে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।"

স্বামিজী বল্‌ছেন—"তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেল পাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস করেন নি। সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম; যেন তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। আর এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাক্‌বেন ?" সকলেই স্বামিজীর কথা শুনে হাস্‌ছে।

পূজার বহুল আয়োজন। বিভূতিভূষণ স্বামিজী, আজ মহাদেবের ন্যায় সাজে পূজকের আসনে বসিয়া, ঠাকুরকে আবাহন করিতেছেন। সে আবাহনে ঠাকুর কি অন্ত কোথাও থাকিতে পারেন? তাই ভক্তিশাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়,—

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

মনে হচ্ছে, সেই দীনদয়াময় রামকৃষ্ণ নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে আজ সত্য সত্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বামী প্রকাশানন্দ (যিনি এক্ষণে কালিফর্ণিয়ায় প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত) স্বামিজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি পড়িতেছেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইতেছে। অবশেষে আরাত্রিক উপলক্ষে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দ আরাত্রিক সম্পাদন করিলেন।

স্বামিজী, সেই পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

—সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে শিষ্য ঠাকুরের একটী স্তব পাঠ করিল। এইরূপে প্রথম পূজা সম্পন্ন হইল। তারপর নীচে সমাগত ভক্তমণ্ডলী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। স্বামিজী উপরেই রহিলেন; বাটীর মেয়েরা স্বামিজীকে কত কথা বলিতে লাগিলেন। শিষ্যও স্বামিজীর সঙ্গে তখন উপরেই রহিয়াছে।

স্বামিজী শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া বলছেন—"দেখ্‌ছিস্, এরা ঠিক্ ঠিক্ গেরস্থ—সকলেই রামকৃষ্ণগতপ্রাণ।" শিষ্য দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণী ঠাকুরাণীকে রামকৃষ্ণভক্তগণ দূর হইতে গড় করিতেছেন; তিনিও প্রতিনমস্কার করিতেছেন। সকলেই যেন রামকৃষ্ণ-মহা-প্রস্থানের পথিক! এ পথে ভেদাভেদ নাই, ভক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাসে সকলেই আত্মহারা। এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারগণের সঙ্গ ও পদধূলি পাইয়া শিষ্য আপন নরজন্ম সার্থক বোধ করিতে লাগিল।

গৃহিণীঠাকুরাণীর সম্বন্ধে স্বামিজী শিষ্যকে আরও বলিতেছেন—"এঁর হাতে ঠাকুর খেয়েছিলেন।"

শিষ্য, গৃহিণীঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া, রামকৃষ্ণভক্তি যাচ্ঞা করিতেছে। তিনি বল্‌ছেন—"আর বাবা, তোমরা যাঁর চেলা, তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে তোমাদের আর

করে কৃষ্ণে ভক্তি লাভ কত্তে হবে না—সব আপনি আপনি হয়ে যাবে।” এইবার ভক্তমণ্ডলী প্রসাদ পাইবেন—পাতা হইয়াছে। চব্য চোষ্য চাতুর্ব্বিধ দ্রব্য-সম্ভারের বিপুল আয়োজন। রামকৃষ্ণগতপ্রাণ নবগোপাল বাবু রামকৃষ্ণভক্তসেবাই জীবনের সার জানিয়াছেন—তাই প্রাণ ঢেলে আজ ভক্তসেবায় নিযুক্ত। “দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাং”—বাড়ীতে এ কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

শিষ্যও স্বামিজীর সাম্‌নে মহাপ্রসাদ পেতে বসেছে। খেতে খেতে স্বামিজী কতকগুলি ফেনা ও আঙ্গুর শিষ্যকে দিয়ে বল্‌ছেন—“খা, এগুলি বড় উত্তম।”

নবগোপাল বাবু—“এ দেও, ও দেও, একে দেও, ওকে দেও” বলে তদারক্ করে বেড়াচ্ছেন্। ষষ্ঠিবর্ষবয়স্ক নবগোপাল বাবু আজ যুবার উদ্যমে ও আনন্দে ভক্ত-সেবা কর্‌ছেন।

ভক্তগণ, ভর্‌পুর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে নীচে গিয়া, খানিক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভক্তসঙ্ঘ, একক বা ছোট ছোট দলবদ্ধ হ’য়ে, কেহ পায়ে, কেহ ঘোঁড়ার গাড়ীতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। শিষ্য, স্বামিজীর সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া, রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতে করিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

প্রথম প্রস্তাব।

গ্রীসে দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক বি, এ।]

কোনও জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সহিত মানব-শিশুর বয়োবৃদ্ধির ইতি-হাসের একটা বেশ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়। মানব-শিশু তাহার জীবনের প্রথম কয়েকদিন এই জগৎটাকে বড়ই নূতন বলিয়া মনে করে। অচেনা যায়গায় আসিয়া, সে যেন কিছুদিন নূতনত্বের ঘোরে অভিভূত থাকে। ঐ ঘোর কতকটা কাটিয়া আসিলে, জগতের সহিত চেনা পরিচয় করিবার জন্য তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদয় হয়। কারণ—নূতন-মানুষ নূতন-জগতে প্রবেশ করিয়াই হঠাৎ আপনাকে জগতের সহিত বনাইয়া লইতে পারে না। সত্য বটে—জগতের সহিত

বনাইয়া চলা তেই তাহার জীবন এবং উন্নতি নির্ভর করে, কিন্তু যাহার সহিত বনাইয়া চলিতে হইবে, তাহার প্রকৃতির বা স্বরূপের জ্ঞান অন্ততঃ কতকপরিমাণে থাকা আবশ্যক—তবেই উহা সম্ভব। এইজন্যই শিশুর জীবনে সর্ব্বাগ্রে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থনিচয়ের জ্ঞানলাভের চেষ্টার উন্মেষ।

জাতীয় জীবনেও ঠিক ঐরূপ। কোনও জাতিই আদিম অবস্থায়, উচ্চ জ্ঞান ও সভ্যতার অধিকারী থাকে না। ব্যক্তিগতজীবনে যেরূপ, জাতীয়জীবনেও ঠিক তদ্রূপ—উভয়ই জ্ঞানার্জ্জনের ফলে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। এই জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহাও আবার ব্যক্তির ন্যায় জাতীয়জীবনে জাগতিক সর্ব্ব বিষয়ের প্রকৃতিনির্ণয় দ্বারা আত্মরক্ষার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু জাগতিক জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা, সুশৃঙ্খলাযুক্ত যুক্তি ও সূক্ষ্মবিচারপূর্ণ দার্শনিক চিন্তার আকার ধারণ করিতে উভয় জীবনেই অনেক বিলম্ব হয়। ইষ্টলাভ কোনও ক্ষেত্রেই সহজ নহে। অনেক ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়া, অনেক বিফলচেষ্টার পর মানবের ইষ্টলাভ কতক পরিমাণে ঘটে।

শিশু যেরূপ জগৎটাকে বুঝিতে যাইয়া এক সময়ে সকল পদার্থকেই নিজের ন্যায় সুখ-দুঃখ-ভোগী ও ইচ্ছা এবং ক্রিয়াশীল মনে করে, জাতীয় জীবনেও ঠিক ঐরূপ একটী সময় আইসে, যখন প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে দেবতার অত্যুচ্চ আসনে উন্নীত করা হয় এবং জাতি-শিশু আপনার চারিদিকে দেবতার খেলা দেখিতে থাকে। বায়ু ধীরে বহিতেছে, নদী কলগান গাহিতেছে, পর্ব্বত স্বাদুফলদায়ী বৃক্ষরাজি মস্তকে ধারণ করিয়াছে এবং স্ববক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সুপেয় পয়োরাশি নির্গত করিতেছে, সূর্য্য মৃদু উত্তাপে শীত নিবারণ করিতেছে, নীলাম্বুধি শান্তভাবে নৌকা সকল বক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে নাচাইতেছে—মানব বলিয়া উঠে, 'দেখ, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন, প্রণত হও, দেবতার উদ্দেশে যাগ যজ্ঞের সুমহৎ আয়োজন কর।' আবার, তুমুল ঝটিকাপাতে ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, নদীর প্রবল বন্যায় গ্রাম নগর ভাসিয়া যাইতেছে, হিমানীপর্ব্বতের তুষারপ্রপাত গিরিগাত্রস্থিত মনুষ্যবাস সকল উৎপাটিত করিয়া ব্যাদিতমুখ গভীর গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রখরতেজাঃ মার্ত্তণ্ড ত্রিভুবন দাহের আয়োজন করিতেছে; অথবা বাত্যাতাড়িত সমুদ্রবক্ষ ভ্রূকুটী করিয়া হাঃ হাঃ শব্দে কোটী বাহু বিস্তার করিয়া যেন বিশ্ব সংসার গ্রাস করিতে আসিতেছে—অমনি মানব বলিয়া উঠে, 'দেবতা কুপিত হইয়াছেন, যুক্তপাণি, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া পরিত্রাহি চীৎকার কর, দেবপ্রীতির নিমিত্ত বহুপ্রাণী বলিদানের ব্যবস্থা কর, দেবরোষ প্রশমন কর।'

এই ত গেল জাতির আদিম অবস্থার ধর্ম্ম; ইহাই তাহার জগৎরহস্তমীমাংসার প্রথম চেষ্টা। কিন্তু ইহাকে দার্শনিক চিন্তা বলা যাইতে পারে না। ইহা যেন কবির চক্ষে কল্পনাসহায়ে জগৎটাকে দেখিবার চেষ্টা। কবি যেমন বাহ্যজগৎ দর্শন করিয়া, আপনার মানসভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বিবিধ বিচিত্র বর্ণের তুলিকা-স্পর্শে তাহাকে কল্পনার ইন্দ্রপুরী করিয়া তোলেন, সেইরূপ জাতি-শিশুও জগৎ-রহস্য মীমাংসা করিতে যাইয়া, প্রথমে আপনার অভ্যন্তরীণ ভাবরাশি বহির্জ্জগতে আরোপ করিয়া, তাহাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। ইহাই জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম, কবিতা, বা ভাবুকতার যুগ। এই যুগের লক্ষণ মানব-প্রকৃতি-বিশিষ্ট—অথচ মানব হইতে উচ্চ, অনুগ্রহ নিগ্রহে সমর্থ—বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস। উন্নতিশীল মানব-মন কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে চরম বলিয়া বহুদিন ধরিয়া থাকিতে পারে না। কবিতাযুগের বহুদেববাদ বহির্জ্জগতের মীমাংসাচ্ছলে মানবকে তদনুরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এক দিব্যজগৎ প্রদান করে মাত্র। ফলে—বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে সে বৈচিত্র্যই পাইয়া থাকে—স্থূল বস্তুর পরিবর্ত্তে তাহার সূক্ষ্ম বস্তুই মিলে। কিন্তু জ্ঞান চাহে—বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিতে, কাজেই পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায় সে সন্তুষ্ট হইবে কেন? এই অসন্তোষেই দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়।

উপরে দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাবের বিবরণ দিবার কতকটা চেষ্টা করা গেল। দেশভেদে উহার অল্পবিস্তর প্রভেদ হইতে পারে কিন্তু সর্ব্বদেশেই মূল ব্যাপারটা প্রায় ঐরূপ। ইউরোপেও দার্শনিক চিন্তা কতকটা ঐরূপ ভাবেই আবির্ভূত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে ঐ মহাপ্রদেশে দেশব্যাপী অজ্ঞান এবং অসভ্যতার অন্ধকারের মধ্য দিয়া, কেবল মাত্র গ্রীক্ এবং রোম্যান জাতি—জ্ঞান এবং সভ্যতার ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। সে অতি পুরাতন কথা, খ্রীষ্ট তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। গ্রীক্ জাতি তখন জ্ঞান ও সভ্যতার নব ঊষারাগে সবে মাত্র রঞ্জিত হইতেছে। হোমার (Homer) এবং হিসিয়ড্ (Hesiod) তখন অমর ছন্দোবন্ধে বহুদেবদেবীপ্রসূত সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ গ্রথিত করিয়াছেন মাত্র। ক্রমে গ্রীস দেশের নিকটস্থ বদ্বীপে এবং এসিয়ামাইনরে (Asia Minor) গ্রীক্-উপনিবেশ সকল স্থাপিত হইল। দেশ শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন, কাজেই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা কমিয়া যাইল। এখন বুদ্ধিকে জীবনরক্ষার চিন্তা হইতে কতক পরিমাণে প্রত্যাহৃত করিয়া, জ্ঞানচর্চ্চায় নিয়োজিত করিবার অবসর মানব পাইল এবং জিজ্ঞাসুগণ—জ্ঞানরাজ্যের নানা অংশ আবিষ্কার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

এই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহার নবীন বেগ, জগৎরহস্য মীমাংসার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ

রহিল না। জিজ্ঞাসুগণ হোমার (Homer) প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিগণের দেবদেবীর বিবরণ ও বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা কতকটা স্বাধীনভাবে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হইলেন। এই নবীন চেষ্টা কিন্তু গ্রীক্ উপনিবেশেই প্রথম আরম্ভ হইল। ইহার কারণও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব পুরুষগণের বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন স্থানে আসিয়া গ্রীকগণ বহুকালপ্রচলিত পিতৃপিতামহাগত পুরাতন রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং নব বাসস্থানের উপযোগী নবীন রীতিনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে পুরাতন সংস্কার সকল চলিয়া গিয়া, অনেক নূতন সংস্কার তাহাদিগের মনে স্থান পাইতেছিল। পুরাতন সংস্কারের শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ সকল গ্রীকগণের চিন্তাস্রোত অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করিল এবং সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপূর্ব্ব নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা অন্য নানা জাতির সংস্রবে আসিয়া অনেক নূতন ভাব সকলও প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঐ সকল ভাবও তাহাদের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তারে ত্রুটি করিল না। অতএব দেখা যাইতেছে, গ্রীক্ ঔপনিবেশিকগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অনেক কারণ একত্র মিলিত হইল। এইরূপে গ্রীসের উপনিবেশ আইওনীয়া (Ionia) নামক প্রদেশেই প্রথম গ্রীক্ দার্শনিকগণের আবির্ভাব হয়। ইঁহারাই ইউরোপে দার্শনিক চিন্তার প্রথম সূত্রপাত করেন।

এইবার আমরা ঐ মহাপ্রদেশের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসের স্থূল বিষয় সকল ক্রমশঃ বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু এত বড় একটি গুরুতর আয়োজনের পূর্ব্বে পাঠককে এই চেষ্টার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলা ভাল দেখায় না। কারণ, যাহার সহিত এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিতে হইবে, যাত্রারম্ভের পূর্ব্বেই পাঠকের তাহার সহিত ঐ বিষয়ের লাভালাভ সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত। এখন কেহ হয়ত বলিবেন যে, দর্শনে ও তত্ত্বজ্ঞানে ভারতবর্ষ জগতের গুরুস্থানীয়, ইহা অনেক বিদেশীয়েরাও যখন আজকাল স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন আমরা আপন ছাড়িয়া কেন পরের দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণ করিব? তাহার উত্তর এই যে, জ্ঞান আহরণ বিষয়ে আপন পর বিচার উচিত নহে। কারণ, তাহাতে জ্ঞানের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয় এবং প্রকৃত স্বদেশপ্রিয়তার পরিচয়ও দেওয়া হয় না। যাঁহারা জ্ঞানের অর্চ্চনা জীবনের সারভূত করিয়াছেন, তাঁহারা কি বিদেশীয়ের আবিষ্কৃত বলিয়া কোন জ্ঞানকে তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিতে

পারেন ? অথবা স্বদেশপ্রিয়তার কি এই পরিণাম যে, বিদেশের ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিয়া, স্বদেশকে ভূষিত করা—অন্যায় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে? হইতে পারে, আমরা তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে জগতের শীর্ষস্থানীয়; তাই বলিয়া আমাদের পিতৃপিতামহগণ যে সর্ব্ব বিষয়ে সমগ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। দেশভেদে লোকের মানসিক গঠনও ভিন্ন হইয়া থাকে এবং মানসিক গঠনের ভিন্নতা অনুসারে, সত্যনির্ণয়ের ও সত্য উপলব্ধির তারতম্য হয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সত্যের যে অংশ দেখিয়াছিলেন, ইউরোপীয়েরা হয়ত তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অথবা, যদি উভয় দেশের একই সত্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উভয়ের সত্যনির্ণয়প্রণালীর ভেদ থাকা অসম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় কোনও দর্শন বিদেশীয় বলিয়া তাহার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ জ্ঞাননিষ্ঠার লক্ষণ নহে। যদি বিদেশীয়ের দর্শনে নূতন কিছুই না মিলে, যদি তাহাতে আমাদেরই আবিষ্কৃত সত্যের পুনরুক্তিমাত্র দেখি, তাহাতেও লাভ ছাড়া লোক্সান নাই। যদি দেখিতে পাই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিদেশীয়েরাও আংশিকভাবে ঠিক সেই সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের সিদ্ধান্তের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস মন্দীভূত না হইয়া বরং সমধিক বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূতই হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গ্রীক্ দর্শনের প্রথম যুগ।

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, দর্শনশাস্ত্র মানবজীবনরূপ-রহস্য-সমাধানের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাজেই দার্শনিক চিন্তা বিকাশের পূর্ব্বে জীবনটা যে রহস্যময়, এ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, কারণ, যাহা রহস্যপূর্ণ নয়, তাহাতে বুঝিবার কি আছে? অবশ্য জগতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহাতে কোন না কোনও রূপ রহস্য একেবারেই নাই। মানবজীবনের ন্যায় জটিল বিষয় দূরে থাক, সামান্য বালুকণাও এত তুচ্ছ পদার্থ নয় যে, মনুষ্যবুদ্ধি তদ্বিষয়ক সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছে, আর তাহাতে বুঝিবার কিছুই নাই। যাহা হউক, আমরা তো আর সকল পদার্থকে রহস্যময় বলিয়া মনে করি না। ফল পাকিলেই বৃন্তচ্যুত হইয়া চিরকাল মাটিতে পড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু নিউটনের ন্যায় ভাগ্যবান্ ব্যতীত

আর কে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার মধ্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে? অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য পদার্থে এইরূপে গুপ্ত রহস্যের নিদর্শন পাওয়া—সাধারণ চিন্তাশীলতার লক্ষণ নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কোন বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেই যে কেবল চিন্তার আবশ্যক, তাহা নহে; তাহাতে রহস্যের অস্তিত্ব নিরূপণ করাও কম চিন্তার পরিচায়ক নয়। জাতীয় জীবনের আদিম অবস্থায় কোনও জাতিই এত চিন্তাশীল থাকে না যে, মানবজীবনটা তাহার নিকট জটিল রহস্যময় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ক্রমে যখন জীবনব্যাপার পুরাতন হইয়া আসে, এবং সুখ দুঃখের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনটাকে নিতান্ত খেলার জিনিষ না ভাবিয়া তাহার বিষয় গম্ভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিতে শিখে, তখন হইতে সে মানবজীবনটাকে একটা দুর্বোধ রহস্য বলিয়া মনে করে। কাজেই জীবনদ্বন্দ্বের কঠোরতা-নিবন্ধন নানা দুঃখ কষ্টের তাড়নায় গ্রীকগণ যখন নিজদেশ ত্যাগ করিয়া, উপনিবেশ সকল স্থাপন দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং যখন জীবনব্যাপার তাহাদের পক্ষে কতকটা সহজসাধ্য হইয়াছিল, তখনই তাহাদের ভিতর ঐ বিষয়টা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল এবং তখন হইতেই জীবনের রহস্যময় ভাবটা প্রকৃতরূপে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এইজন্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অন্য নানা কারণে দার্শনিক চিন্তা গ্রীকদেশে উদ্ভূত না হইয়া, তদ্দেশীয় উপনিবেশ আইওনীয়া (Ionia) নামক প্রদেশেই প্রথম আবদ্ধ হয়। এই স্থানেই ইউরোপের সর্ব্ব প্রথম দার্শনিকত্রয়ের আবির্ভাব হইয়া, ঐ মহাপ্রদেশে দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। তাঁহাদের মতে—জগতের আদি কারণস্বরূপ কোনও ভৌতিক সত্বা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই, জগদুৎপত্তির রহস্য ভেদ করা হইল। এইজন্য তাঁহাদিগকে ভৌতিক কারণবাদী (Phisiologers) বলা হয়। তাই বলিয়া তাঁহারা কেবল জড়বাদী নহেন। কারণ জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য এখনও তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। যদি জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য জানিয়া তাঁহারা জ্ঞানতঃ জড়কে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জড়বাদী বলা সঙ্গত হইত।

আইওনিয়ার দার্শনিকগণের মধ্যে প্রথম দার্শনিক থেল্‌স্ (Thales), মিলেটাস্ (Miletus) নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন (প্রায় ৬৪০ খ্রীঃ পূঃ)। ইনি যে কেবল দর্শনিক ছিলেন, তাহা নহে; গণিত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে যে, ৫৮৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের ২৮শে মে যে সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল, তিনি তাহা পূর্ব্বেই গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য

তিনি ঐ গ্রহণের দিবস বা মুহূর্ত্ত গণনা দ্বারা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, কেবল সাল মাত্র বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ইহাই প্রথম সফল ভবিষ্যদ্বাণী। ইনিই নাকি গ্রীকগণকে প্রথম জ্যামিতি শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আদি গ্রীক দার্শনিকগণ ভৌতিক কারণবাদী (Physiologers) ছিলেন—অর্থাৎ কোনওরূপ ভৌতিক সত্তা জগতের আদি কারণ, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। এই ভৌতিক সত্তার বিষয়ে সকলে একমত ছিলেন না। যাহা হউক, কোনও ভৌতিক সত্তাকে জগতের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, এইরূপ একটি ভৌতিক সত্তা বিচার করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যাহা সহজ-পরিবর্ত্তন-সাধ্য অর্থাৎ যাহা অনায়াসেই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে সমর্থ, অতএব যাহা নিজে কোনও দৃঢ় আকৃতিবিশিষ্ট নহে। সুতরাং থেল্‌স্ জলকে জগতের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। থেল্‌সের মত, তাঁহার নিজের লিখিত কোনও গ্রন্থে নিবদ্ধ ছিল কিনা, জানা যায় না। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহার মত যেরূপ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা এইরূপ :—

জল জগতের আদি কারণ। তাহাই নানারূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য সৃজন করিয়াছে। পৃথিবী চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত, যেন বারি-সমুদ্রে ভাসিতেছে। তাঁহার মতে সকল পদার্থেরই প্রাণ আছে—সকল পদার্থেই দেবতা অধিষ্ঠান করেন। গতিশীলতা এই প্রাণের অস্তিত্বের লক্ষণ। থেল্‌সের দর্শন সংক্ষেপতঃ—এইরূপ। কেনই যে জল তাঁহার নিকট জগতকারণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ বলেন যে—সকল বীজ এবং খাদ্য রসাত্মক বলিয়া, থেল্‌স্ ঐরূপ অনুমান করিয়া থাকি-বেন। অপর পণ্ডিতেরা বলেন যে—তিনি পূর্ব্ব-কবিগণ-প্রচারিত সৃষ্টি-বিবরণ দার্শনিক ভাষায় বলিয়াছিলেন মাত্র। দেখা যায়, গ্রীসদেশের প্রাচীন কবিগণের কাহিনীতে ওসিয়ানাস্ (Oceanus) অর্থাৎ জলদেবতাই অন্যান্য দেবতাগণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। থেল্‌স্ কবিকল্পনা-প্রসূত ঐ পুরাতন কাহিনী হইতে দেবত্বের আবরণ ঘুচাইয়া, পূর্ব্বকবিগণকথিত বিবরণের পুনরুক্তিমাত্র করিয়াছিলেন—ইহাই শেষোক্ত পণ্ডিতগণের ধারণা।

যাহা হউক, আদি সত্তা কোনও বিশেষগুণযুক্ত হইলে, তৎপ্রসূত পদার্থ সকলের পার্থক্য গুণগত না হইয়া পরিমাণগত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পদার্থ সকল একই গুণবিশিষ্ট হইলেও উক্ত গুণ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতেই

পদার্থগণ পরস্পর পৃথক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জলের ন্যায় বিশিষ্টগুণযুক্ত বা পদার্থকে সর্ব্বপদার্থের আদি সত্তা বলিয়া স্থির করিলে, একটী নিদারুণ আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্বিরোধী গুণসকল কিরূপে জল হইতে জন্মিতে পারে, ইহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। জলের প্রধান গুণ শৈত্য, সেই শৈত্য যে পরিমাণেই গ্রহণ করা যাউক না কেন, তাহা হইতে কখনও তেজঃ পদার্থ উদ্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং থেল্‌স্ যে ভাবে আদি সত্তার স্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। এ জন্য তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক উক্ত মতের পরিবর্ত্তন সাধন যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

এই শেষোক্ত দর্শনকর্ত্তা, থেল্‌সের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরবর্ত্তী। ইঁহারও জন্মস্থান মিলেটাস (Miletus)। ইহার নাম এন্যাক্‌সিম্যাণ্ডার (Anaximander)। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি থেল্‌সের বন্ধু ছিলেন; অপরের মতে—থেল্‌স ইঁহার শিক্ষক। উভয়ের বয়সের তারতম্য দেখিলে, শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া অনুমান হয়। গণিত শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। কথিত আছে যে, ইনিই প্রথম ভৌ-গোলিক মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যঘটীকা (Sun-dial) প্রভৃতি কয়েকটী যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ইনিই সর্ব্ব প্রথম গ্রীক্ ভাষায় গদ্যে দর্শন শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

জগৎ-উৎপত্তির কারণ স্থির করিতে যাইয়া, এন্যাক্‌সিম্যাণ্ডার সম্ভবতঃ দেখিয়াছিলেন যে, আদিকারণ সীমাবিহীন না হইলে, তাহা জগতের এই অসীম বৈচিত্র্যের জনক হইতে পারে না। তাই তাঁহার মতে—জগতের আদি কারণ অপরিমেয় ও সীমাবিহীন। আবার থেল্‌সের দর্শনের পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রুটীসংশোধনমানসে তিনি ঐ আদি সত্তাকে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ কোনও বিশেষ-গুণ-বিরহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে জগত এক নির্ব্বিশেষ অপরিমেয় সীমাবিহীন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব এবং জগতে যত কিছু বিরুদ্ধস্বভাব ও বৈচিত্র্যশালী পদার্থ আছে, সব সেই নির্ব্বিশেষ সত্তা হইতে নির্গত হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্টি বিবরণ অতি কৌতুকজনক। তিনি বলেন যে, প্রথমে বৃক্ষ যেরূপ ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ গ্রহনক্ষত্রগণ পৃথিবীর গাত্রে সংলগ্ন ছিল; ক্রমে তাহারা স্বস্থানচ্যুত হইয়া, পৃথিবী হইতে সমান দূরবর্ত্তী দেশে সকলে বিরাজ করিতেছে। মানব ও অন্যান্য জীবসকল নীচশ্রেণীস্থ প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাই পণ্ডিতগণের মতে পাশ্চাত্যজগতে ক্রমবিকাশবাদের সূচনা। যেমন সকল পদার্থ সেই এক নির্ব্বিশেষ সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

সেইরূপ কাল পূর্ণ হইলে নিয়তির বিধান অনুসারে তাহারা সেই কারণেই লীন হইয়া যায়। ইহাতে কতকটা আমাদের শাস্ত্রবর্ণিত সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের আভাস দেখা যায়।

এন্যাক্সিম্যাণ্ডার থেল্‌স্‌কৃত দর্শনের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণজন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেখা যাউক—তিনি এই চেষ্টায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং তত্ত্ব-বিচার-মার্গে থেল্‌স্‌ অপেক্ষা কত দূরই বা অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনও বিশিষ্ট-গুণ-যুক্ত পদার্থ তদ্বিরোধী গুণ-বিশিষ্ট পদার্থ প্রসব করিতে পারে না বলিয়া, থেল্‌সের মতের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা এন্যাক্সিম্যাণ্ডারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সহজে বুঝা যায় না যে, কিরূপে নির্ব্বিশেষ পদার্থ হইতে ভেদ ও বৈচিত্র্য নির্গত হইল। সুতরাং ইহা এন্যাক্সিম্যাণ্ডারের দর্শনের প্রধান ত্রুটী বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্য আইওনিয়ার তৃতীয় দার্শনিক এন্যাক্সিমিনিস্‌ (৫৪৪ খ্রীঃ পূঃ) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, আদিসত্তা নির্ব্বিশেষ হইলে চলিবে না, এবং অপর দিকে ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, জলের ন্যায় বিশিষ্টগুণযুক্ত পদার্থও আদিসত্তা হইতে পারে না। তাই তিনি বায়ুকে জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, এন্যাক্সিমিনিস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ হইতে বড় অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ইহাতে তাঁহার কোনও অগৌরব নাই। কারণ, ভৌতিক কারণবাদরূপ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া, জগৎ-রহস্যমীমাংসা অধিক দূর পৌঁছিতে পারে না। এই দার্শনিকত্রয়ের জগত্তত্ত্বনিরূপণের বিফল চেষ্টা দেখিয়া, আমাদের ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা ইষ্টলাভের অনুকূল পন্থায় প্রযুক্ত হয় নাই। জিজ্ঞাসাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন না করিলে সত্যলাভ সম্ভব নয়, প্রাচীনকালে তাঁহাদিগের বিফল চেষ্টা ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। কিন্তু একথা বলিতে হইবে যে, যদিও তাঁহারা জগৎ-রহস্য মীমাংসা করিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি পরোক্ষভাবে পরবর্ত্তী জিজ্ঞাসুগণের রহস্য-মীমাংসার পথ সুগমতর করিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা যে সফলকাম হইতে পারেন নাই, ইহাতে অন্ততঃ এটুকু লাভও হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা ভ্রান্তিপূর্ণ বুঝিয়া, সে পন্থা অনুসরণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অবলম্বিত পথে সত্য-নির্ণয় অসম্ভব—একথা না জানিলে, পরবর্ত্তী জিজ্ঞাসুগণ হয়ত ঐ ভ্রমপূর্ণ পন্থা পুনরায়

আশ্রয় করিতেন এবং সত্যলাভ বহুকাল বিলম্বিত হইত। এইরূপে নিয়তির আশ্চর্য্য বিধানে তাঁহাদের ভ্রান্তির মধ্য দিয়াও জনসমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল।

অতএব স্থূলভাবে দেখিলে, আইওনিয়ার দার্শনিকগণের দর্শন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিকচিন্তার বিকাশে উহা যে সহায়ক হইয়াছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় আমরা এইরূপ অনেক স্থলে দেখিতে পাইব যে, কোন একটি বিশেষ দার্শনিক মত, সমগ্র মানবজাতির চিন্তাপ্রবাহের ক্রমবিকাশসূত্র হইতে পৃথক করিয়া বিচার করিলে, অতি তুচ্ছ এবং মারাত্মক ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও দর্শনেতিহাসে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে, তাহারও একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।

শ্রীশ্রী৺মহাবিনাক দর্শন।

[শ্রীনীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।]

ছেলেবেলা হইতে আমার ভ্রমণেচ্ছা বড়ই প্রবল। শৈশবকালে, পিতামাতা যখন তীর্থদর্শন করিতে মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইতেন, তখন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে লইতেন। এইরূপে, তখন হইতে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, তাহার রসাস্বাদন পাইয়াই বোধ হয়, আমার ভ্রমণের বাসনা এত প্রবল হইয়াছে।

আমার তখন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম। পিতামাতার সঙ্গে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ভদ্রক সবডিভিসনে থাকি। সেখানে পিতামহাশয় সরকারি কর্ম্ম করিতেন। বড় দিনের পর্ব্ব উপলক্ষে পিতাঠাকুর মহাশয়ের আপিষ ও আমাদের স্কুল লম্বা বন্ধ হইল—কাজেই আর কি আমরা কোথাও বেড়াইতে না গিয়া, স্থির হইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে পারি? স্থির হইল—এবার আমরা রেল গাড়ি চড়িয়া কোথায় যাইব না—গোযানে করিয়া এ অঞ্চলের প্রধান তীর্থ, শ্রীশ্রী৺মহাবিনাক ও যাজপুরস্থ শ্রীশ্রী৺বরাহনাথ ও শ্রীশ্রী৺বিরজা দেবীকে দর্শন করিতে যাইব।

বন্ধের প্রথম দিনে, অতি প্রত্যূষে, আমরা দুইখানি গরুর গাড়ি করিয়া "জগন্নাথ ট্রঙ্ক রাস্তা" ধরিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলাম। আহা, এই রাস্তাটী কি সুন্দর!

পশ্চিম দিকে কেঁওঝোড় প্রভৃতি আঠারটী করদ-রাজ্যের জঙ্গলময় পাহাড় সকল দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত পাহাড়ে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, বন্যহস্তী, হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তুগণ বিচরণ করে। দিবাভাগেও এই সমস্ত জঙ্গলময় স্থানে ভ্রমণ করা বিপদ্জনক। শুনিয়াছি—প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক মানব হিংস্র জন্তুর হস্তে হতাহত হইয়া থাকে।

উড়িষ্যার বায়ু, নির্ম্মল—চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ থাকায় ও বাঙ্গালা দেশের মত জল জমিবার ও গাছের পাতা পচিবার ডোবা ডুবি বড় একটা না থাকায়, এখানে প্রায় ম্যালেরিয়া নাই। এখান হইতে জগন্নাথে যাইবার রাস্তাটী যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন—তাহা কেমন সুন্দর। রাস্তাটী লাল কাঁকরের। লালকাঁকরের খনি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে, স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। উড়িযারা লালকাঁকরকে "করকচা" বলে। ঐ সমস্ত কাঁকর নৌকা করিয়া খাল দিয়া আনিয়া, রাস্তায় দেয়। এই রাস্তা বরাবর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। ভক্তরা এই রাস্তা দিয়া গমনাগমন করে বলিয়া, স্থানীয় লোকেরা রাস্তাটীকে অতিশয় ভক্তি-সহকারে দেখে ও যখনই অন্য স্থান হইতে আসিয়া এই রাস্তার উপর উঠে, তখন আগে রাস্তা হইতে কিছু ধূলা লইয়া মস্তকে প্রদান করিযা, তাহার পরে রাস্তায় পদার্পণ করে।

রেলওয়ে লাইন হইবার পূর্ব্বে এই রাস্তা দিয়া কত শত সাধু মহাত্মা গমনাগমন করিতেন। তাঁহারা যখন একস্বরে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের স্তোত্র গান করিতে করিতে ও তাঁহার জয়োচ্চারণ করিতে করিতে এই রাস্তা দিয়া যাইতেন, তখন কতই আনন্দ হইত! এই রাস্তার স্থানে স্থানে তখন ধর্ম্মশালা ছিল; তথায় কত রাজা মহারাজা জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ হাতী, ঘোড়া, লোকজন সঙ্গে লইয়া আসিতেন ও সাধু মহাত্মা দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইযা কতই আনন্দ করিতেন। সেই সমস্ত আনন্দময় স্থান এখন নিরানন্দময় হইয়াছে। রেল হওযার পরে, গরিব গুর্ব্বো ছাড়া, লোকে আর পায়ে হাঁটিয়া বা ঘোড়া বা গাড়ি করিয়া যায় না। দুই চারিটি দরিদ্র লোক বা এক আধজন সংসার ত্যাগী সাধু সজ্জনকে মধ্যে মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে দেখা যায মাত্র। এখন সাধু সন্ন্যাসীর অনেকেও রেলে গমনাগমন করেন। কাজেই চটিগুলি প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। আগে যেগুলি বড় বড় চটি ছিল, তাহার দুই চারিখানি এখনও আছে—কিন্তু তাহাদের অবস্থা শোচনীয়।

রাস্তাটী দক্ষিণ দিকে ঠিক সোজা ভাবে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও একটু বাঁক

নাই। বোধ হয়, অন্ধ লোকেও এই রাস্তা দিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরে অতি সহজে যাইতে পারে। এক দিন একটী অন্ধ যাত্রী আমাদের ভদ্রকের বাসায় অতিথী হইয়াছিল। তাহার সহিত কোন সঙ্গী ছিল না, অথচ সে সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে একাকী জগন্নাথ দেবের সন্নিধানে যাইতেছে। চক্ষু নাই যে ঠাকুর দর্শন করিবে, তবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকটে যাইবে, এইটুকুর জন্য তাহার পুরী যাইবার এত উৎসাহ। দেখিয়া যথার্থই ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল।

আমাদের কতক রাস্তা যাইবার পরে পূর্ব্বগগনে অরুণদেব হাসিতে হাসিতে উদয় হইলেন ও তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৌষ মাসের দারুণ শীত ক্রমশঃ কম বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, সূর্য্যের তাপ আনন্দজনক বোধ হইল, কিন্তু বেলা যত বাড়ীতে লাগিল, সূর্য্যের রশ্মি তত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। দ্বিপ্রহর হইয়া গেল—তথাপি পথ চলিবার বিরাম নাই। গরুর গাড়ীতে যাওয়া কষ্টকর দেখিয়া, আমরা প্রভাত হইবার পরেই উহা হইতে অবতরণ করিয়া, পদব্রজে যাইতেছিলাম—গরুর গাড়ী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল মাত্র।

পথে বারিখপুর ও ভাণ্ডারিপুখুরী নামক দুইটী চটী পাইলাম। প্রথমটীতে ডাকঘর ও একটী ডাকবাঙ্গালা আছে। কয়েকটী দোকানও আছে, যাহাতে নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিই পাওয়া যায়। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, তাহাতে শাক সবজি তরকারি ইত্যাদি দূর দূরান্তর হইতে বেচিতে আনে।

ভাণ্ডারিপুখুরে অনেকগুলি দোকান আছে ও ভদ্রক হইতে কটকে যাইবার বিখ্যাত কাটিখালটি বাজারের নিকট দিয়াই গিয়াছে। খালের পরিদর্শক (Overseer), একটী বাঙ্গালী বাবুর বাঙ্গলা খালের কূলেই অবস্থিত। উড়িয়ারা ওভারসিয়ার বাবুকে "উগ্রেশ্বর" বাবু বলিয়া ডাকে। ভাণ্ডারিপুখুর পার হইয়া কিয়দ্দূর যাইয়া, আমরা পাকা রাস্তা ছাড়িলাম এবং একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্ব-মুখে প্রায় একক্রোশ পথ যাইয়া, "মুঞ্জরী" নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করায় আর অগ্রসর হইলাম না। ঐ স্থানের একটি ডাকবাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এবং পাকশাক করিয়া আহারান্তে কিছু কাল বিশ্রাম করি-লাম; অনন্তর সূর্য্যের কিরণের প্রখরতা কমিলে, পুনরায় যাজপুরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইয়া পথে একটি ইন্‌জিনিয়ারিং কৌশল দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

দেখিলাম, একটী ক্ষুদ্র নদীর উপর দিয়া পূর্ব্বোক্ত কাটিখালটি চালান হইয়াছে। নিম্নদেশে একটী নদী বহিতেছে ও তদ্বক্ষের অনেক উপরে সচরাচর যেখানে সাঁকো

বা পোল নির্ম্মিত হয়—সেই খানে কাটী খালের খিলান করা পয়ঃ প্রণালী রহিয়াছে এবং নিম্নে নদীবক্ষ দিয়া নৌকা সকল যেমন গমনাগমন করিতেছে, উপরে খালের ভিতর দিয়াও আবার নৌকাসকল তদ্রূপ যাইতেছে! দেখিয়া মনে হইল—ধন্য সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, যিনি তাঁহার সৃজিত জীবের মস্তকে এত বুদ্ধি দিয়াছেন!

অনন্তর শ্রীভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে করিতে আমরা যাজপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম ও অনেক খানা ডোবা পার হইয়া অবশেষে সন্ধ্যার কিছু পরে "বুড়া" নদীর কূলে পৌছিলাম। সেখানে এক খানি দোকান আছে। তথা হইতে গাড়ওয়ান গরুর খাদ্য কিছু সংগ্রহ করিয়া লইল। পরে বুড়া নদী পার হইয়া কিয়দ্দূরে বৈতরণী নদীকূলে উপনীত হইলাম। বৈতরণীতে তখন সামান্য মাত্র জল ছিল—আমরা গরুর গাড়িতে আরোহণ করিয়াই অবলীলাক্রমে উহা পার হইলাম। পার হইয়াই নদীর দক্ষিণ কূলে যাজপুর।

যাজপুর কটক জেলার অন্তর্গত একটী সব্‌ডিভিসন। এখানে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, একটী মুনসেফ ও একজন সবরেজিষ্ট্রার আছেন। ইহা একটী অতিশয় প্রাচীন পীঠস্থান। এখানে আদ্যাশক্তি বিরজাদেবী বিরাজমানা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেশরী রাজবংশের ইহাই রাজধানী ছিল। পরে ঐ বংশীয় অন্য এক রাজা আপন রাজধানী মহানদী ও কাটযুরি নদীর মধ্যবর্ত্তী কটক নামক স্থলে স্থানান্তরিত করেন।

রেল হইবার পূর্ব্বে লোকে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ যাইবার পূর্ব্বে যাজপুরে আসিত এবং বৈতরণী ও অত্রস্থ নাভিগয়া নামক স্থলে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া, পরে গন্তব্য স্থানে গমন করিত।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় যাজপুরে পৌছিয়া আমরা একটী বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে বৈতরণীতীরে বরাহনাথ ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন ও বৈতরণীতে স্নান করিবার উদ্দেশে বহির্গত হইলাম। বৈতরণীকূলে নানা দেবদেবীর মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তথায় বরাহনাথের এক মন্দির আছে ও তাহার নিকটে নদীকূলে সপ্তমাতৃকা-দেবীর মন্দির। ঐ মন্দির মধ্যে ইন্দ্রানী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কুমারী, যমমাতৃকা, কালী ও রুদ্রানী—এই সাতটি দেবীমূর্ত্তি সারি সারি বিরাজমানা। মূর্ত্তিগুলি সমস্তই পাষাণময়ী, উৎকৃষ্ট-শিল্পি-নির্ম্মিতা, কিন্তু কাহার নাক নাই, কাহার অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। কথিত আছে যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে মুসলমান আক্রমণকারি-গণ কর্ত্তৃক এ অঞ্চলের দেবতামন্দির ও বিগ্রহ সকলের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত

হইয়াছিল। স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গালার মধ্যে ও নদীর কূলে আরও অনেক অঙ্গহীন মূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখা যায়। বৈতরণী নদীকূলে পূর্ব্বোক্ত সপ্তমাতৃকা ইন্দ্রানী প্রভৃতির মন্দিরটি কাছারীর সন্নিকটেই অবস্থিত।

সপ্তমাতৃকা-মূর্ত্তিগুলি কাল প্রস্তরের—প্রকাণ্ড কলেবর। শুনা যায় যে, ঐ মূর্ত্তিগুলিও পূর্ব্বে মাটীর মধ্যে প্রোথিত ছিল। ১৮৬৬ সালে জনৈক সরকারি কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া, নদীকূলে খোলাস্থানে প্রথমে স্থাপিত হয়; পরে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়া, এই সমস্ত দেখিতে দেখিতেই অনেক বেলা হইয়া গেল। কাজেই বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে বিরজা দেবীকে দর্শন করিতে গেলাম। বিরজাদেবীর মন্দির অন্যদিকে। ইহা যাজপুর সহর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান। ঐখানে পৌছিয়াই প্রথমে গরুড়ের মন্দির ও মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটী গরুড়স্তম্ভ নামক একটী প্রস্তরের প্রকাণ্ড স্তম্ভের শিরোদেশে স্থাপিত ছিল। কথিত আছে, ঐ স্তম্ভটী এত দৃঢ় যে, অনেক হস্তী ইত্যাদি লাগাইয়াও কালাপাহাড়ের দলবল উহা পাতিত ও ভগ্ন করিতে সক্ষম না হইয়া, তদুপরিস্থ গরুড়ের মূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। গরুড়ের ঐ ভগ্নমূর্ত্তিটিকে পরে যত্ন করিয়া স্থানান্তরিত ও মন্দির মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। গরুড়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গরুড়স্তম্ভ দর্শন করিতে যাইলাম। এত বড় প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ কখনও দেখি নাই। নিকটে পাহাড় নাই; অতএব অনেক দূর হইতে উহা আনীত হইয়াছিল, নিশ্চয়। এত বড় পাথরখানিকে, সেই প্রাচীন যুগে কেমন করিয়া এত দূরে আনা হইয়াছিল ও কি প্রকারেই বা এমন ভাবে বসান হইয়াছিল—ভাবিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। স্তম্ভের কটীদেশে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর দেখা গেল। আমাদের পথপ্রদর্শককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে বলিল—কোন সময়ে এক ভণ্ড সন্ন্যাসী এই গরুড়স্তম্ভের নিকট আসন করে ও গভীর রাত্রে, যখন নিকটে কোন লোক জন না থাকিত সেই সময়ে, ছেনী দিয়া স্তম্ভে একটু একটু করিয়া ছিদ্র করিতে থাকে। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ঐ স্তম্ভের মধ্যে মণিমাণিক্যাদি রাখা আছে। কিছু দিন পরে সেই ভণ্ড স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ঐ গর্ত্তটী সিমেণ্ট দিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরে মেরামত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গরুড়স্তম্ভ দর্শন করিয়া, আমরা বিরজাদেবীকে দর্শন করিতে যাইলাম।

বিরজাক্ষেত্র ৫১ পীঠের এক পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবীর মন্দিরের পার্শ্বেই নাভিগয়া। এখানে আগমনকারী হিন্দু মাত্রেই এই নাভিগয়ায় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। একটী সুবৃহৎ গভীর কূপের ভিতর পিণ্ডদান করা হয়। শুনা গেল যে, পিণ্ডের দ্রব্যাদি ও পুষ্প বিল্বপত্র ইত্যাদিতে কূপটী সম্বৎসরে প্রায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু ঐ কূপের নিম্নভাগের সহিত নদীগর্ভের সংযোগ থাকাতে বা ঐরূপ অন্য কোন কারণে, প্রতি বর্ষাকালে ঐ সমস্ত কোথায় অন্তর্ধান হইয়া কূপটী আপনা হইতেই পরিষ্কৃত হয়। কূপের উপর হইতে বারিপাতের কোন সম্ভাবনা নাই, যে হেতু তাহার উপরে পাকা ছাদ আছে। এজন্য বর্ষাকালে কূপ আপনা হইতে পরিষ্কার হওয়া, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে।

বিরজা দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে একটী সাধুকে দর্শন করিলাম। দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত বিস্তৃত ভগ্ন প্রাচীর মেরামতের জন্য তাঁহার ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যেমন করিয়া হউক মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরটী দেওয়াইবেন। এই উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে একটী করিয়া মৃত্তিকার "ধর্ম্মের হাঁড়ি" বসাইয়া দিলেন। ক্রমশঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঐরূপ হাঁড়ি বসান হইল ও প্রত্যেক পরিবারকে প্রতিদিন রন্ধনের পূর্ব্বে, আপনাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য চাউল হইতে একমুষ্টি লইয়া, এই হাঁড়িতে রাখিয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। সৎকার্য্যের সহায় স্বয়ং ভগবান হয়েন। তাঁহারই কৃপায় কয়েকটী ধর্ম্মপ্রাণ নিঃস্বার্থ যুবক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঐ মুষ্টি-চাউল সংগ্রহ করিয়া, সাধু মহাশয়ের নিকট তদ্বিক্রয়লব্ধ টাকা জমা দিতে লাগিলেন। তুচ্ছ বস্তুর সংমিলনে বৃহৎ কার্য সম্পন্ন হয়, ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, ঐ সাধুপুরুষ কয়েক বৎসরের মধ্যেই মন্দিরের প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রাচীর দেওয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছেন। উদারচেতা লোকের সৎকার্য্যের প্রতি এমনই আকর্ষণ যে, সে সময়কার জেলার জজ ব্রাউন সাহেব স্থানীয় মুনসেফি আপিস পরিদর্শন করিতে আসিয়া, সাধুর ঐ সৎকার্য্যে একাগ্রতার কথা শুনিয়া, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ১০ দশ টাকা দান করিয়াছিলেন।

মন্দির মধ্যে মার পাষাণময়ী মূর্ত্তি ভক্তিভরে দর্শন করিয়া, আমরা বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কত যে শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কথিত আছে যে, এখানে ঐরূপ এক লক্ষ মন্দির ও শিবলিঙ্গ ছিল। ১৬৮১ সালে নবাব আবুনসির অনেক মন্দিরের প্রস্তর লইয়া

একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ-রাজের আমলেও পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট অনেক ভগ্ন মন্দিরের প্রস্তর লইয়া রাস্তার পুল ও সাঁকো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এ সমস্ত কথা হণ্টর সাহেবের পুস্তকে দেখা যায়।

পথে আসিতে আসিতে একটী শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম, তাহা অদ্ভুত। উহা কালপ্রস্তরের নির্ম্মিত কিন্তু প্রস্তরের বর্ণ দিনের মধ্যে ৪ বার পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা যখন দেখিলাম, তখন উহা তামার মত বর্ণ দেখা গেল।

সন্ধ্যা বেলা আমাদের পাণ্ডা ও অপরাপর কয়েকজন পাণ্ডা আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকখানি খাতা ও কাগজ ছিল। ঐ সকলের ভিতর হইতে আমার পিতা হইতে উর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষের এক ব্যক্তির দস্তখতি কাগজ বাহির করিলেন। সেই কাগজ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি ও তাঁহার মা এক সঙ্গে এই তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন। অপর এক খণ্ড কাগজে দেখিলাম, আমার অতিবৃদ্ধ পিতামহের সহোদর ভ্রাতা ও তাঁহার বাপও এখানে আসিয়াছিলেন। কোন্ তারিখে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাহা লিখিত ছিল না। তবে আমার অতিবৃদ্ধ পিতামহের সহোদর ভাই ১২১৪ সালে যাজপুরে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত কাগজে দেখা গেল। আমাদের বংশের উর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষের লিখিত কাগজ অন্ততঃ ২০০ বা ২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হইবে। কেমন করিয়া সেই কাগজ এত দিন ইহারা যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। শুনা গেল, এই সমস্ত খাতা পত্র এত মূল্যবান যে, পাণ্ডাদের কেহ ঋণগ্রস্ত হইলে, তাঁহার খাতা পত্র আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক ও নীলাম হয় এবং ঐ সময়ে অনেক মূল্যে ঐ সকল খাতাপত্র বিক্রয় হইয়া থাকে।

পর দিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমরা শয্যাত্যাগ করিলাম। দুই খানি গরুর গাড়ি আগে হইতেই ঠিক ছিল। তাহাতে আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রী৺জগন্নাথের নাম স্মরণ করিয়া "ধর্ম্মশালা" যাত্রা করিলাম। বেলা ৭।৮ টার সময় হরিপুর নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে একটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বাঙ্গালা আছে। তাহার পার্শ্ব দিয়া প্রায় দশ মাইল পর্য্যন্ত দুর্গম কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করিয়া "শেয়াখিয়া" গ্রামের সন্নিকটে উপনীত হইলাম। এখানে আবার জগন্নাথ ট্রঙ্ক রোড দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। এখানে একটী চটী ও কয়েকখানি দোকান আছে। শেয়াখিয়া হইতে ট্রঙ্ক রোড্ দিয়া কিছু দূরে যাইয়া পুরাতন একটী

পুলের গায়ে রাজা সুখময়ের নাম প্রস্তরে খোদিত দেখিলাম। কিম্বদন্তী আছে— রাজা সুখময়ের নিবাস কলিকাতায় ছিল। তিনি তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে সে কালে "টেঁশকেল দিয়া কটক" যাইবার রাস্তা দিয়া অর্থাৎ রাস্তাহীন প্রদেশের মাঠ ঘাট দিয়া পাল্কি করিয়া বহু লোকজন সঙ্গে দিয়া শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার মা অতিশয় দয়াবতী ছিলেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইলে, পুত্র কর্ত্তৃক কেমন ঠাকুর দর্শন হইল জিজ্ঞাসিত হওয়ায়, মা ছেলেকে বলিলেন যে, ভাল দর্শন হয় নাই ; যত দিন না গরীব যাত্রীদিগের উক্ত তীর্থে গমনের রাস্তার সুবিধা করা হইবে, ততদিন তাঁহার তীর্থগমন মঞ্জুর নহে। রাণীমাতা এই রূপ ভাব প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত পুত্রের হৃদয় আর্দ্র হয় ও তিনি তৎক্ষণাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে কয়েক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া, জগন্নাথ যাইবার রাস্তা ও পুলে সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

বেলা একটার সময় আমরা পুণ্যসলিলা ব্রাহ্মণী নদীর বক্ষস্থিত বিস্তীর্ণ বালুকা পদব্রজে ও তাহার সামান্য জলধারা নৌকা করিয়া পার হইয়া, নদীর দক্ষিণ পারস্থিত "ধর্ম্মশালার" ডাকবাঙ্গালায় পৌঁছিলাম।

ধর্ম্মশালা যাজপুর সবডিভিসনের অধীনস্থ একটী থানা। এখানে ডাকঘর, ডাক্তারখানা ও একটী ডাকবাঙ্গালা আছে। এখানে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ছিল —উহা হইতেই স্থানের ঐ নামকরণ হইয়াছে। ধর্ম্মশালাটী এখন আর আবাসযোগ্য নাই। ঘরগুলির বহুকাল জীর্ণসংস্কার না হওয়ায় পড়িয়া যাইতেছে। ধর্ম্মশালা স্থানটী কিন্তু বড়ই রমণীয়, উহার উত্তর দিকে ব্রাহ্মণী নদী ও পশ্চিম দিকে নিবিড় জঙ্গলবিশিষ্ট একটী পাহাড় থাকায়, দেখিতে অতীব মনোহর হইয়াছে। নদীর এক কিনারা দিয়া স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। নদীর বক্ষে চক্রবাক্ চক্রবাকী, হংস ইত্যাদি জলচর পক্ষিগণ দলে দলে বিচরণ করিয়া, ধর্ম্মশালার রমণীয়তা আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। কৃষকেরা নদীর কূলে নানাপ্রকার রবিশস্য ও বেগুন প্রভৃতি ফসল দেওয়ায়, নদীতট সুন্দর হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, বড়ই মনোহর দেখাইতেছিল। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিলেও আমরা এমন মনোহর স্থান দেখিয়া সায়ংকালে বাসাতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। নদীর দক্ষিণকূলস্থ বাঁধের উপর দিয়া পাহাড়ের দিকে গমন করিতে লাগিলাম, সঙ্গে আমার পিতা মাতা ও মাতুল চলিলেন। আমি ও আমার মাতুল তরুণবয়স্ক বালক, আমাদের ভয় ডর নাই। আমরা সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, দ্রুতগতিতে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু বাবা ও মা পাহাড়ে ব্যাঘ্র ভল্লুকের

ভয় আছে, পথের লোকজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়া, ত্রস্ত গতিতে আমাদের ডাকিতে ডাকিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, আমাদের পাহাড়ের শিখরদেশে আর উঠা হইল না—অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামিয়া আসিতে হইল। পরদিন অপরাহ্নে আমরা পাহাড়ের দিকে ভ্রমণ করিতে যাইতেছি, এমন সময় কয়েকটী লোক নদী তীরে যাইতেছে দেখিয়া, আমরাও কৌতূহলপরবশ হইয়া সে দিকে চলিলাম। যাইয়া দেখি, সুন্দর নিভৃত কুঞ্জে ব্রাহ্মণীনদীর কূলে একটি শিবমন্দির রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটী সরু নলের মত প্রস্তরের গহ্বর রহিয়াছে। ঠাকুরের পূজারি বলিল যে, ইহার মধ্যে মহাদেব আছেন। ইহা এক অপূর্ব্ব মহাদেব-মন্দির। পূজারি পুনরায় বলিল যে, কোন এক দুষ্ট জমিদার একটী শক্ত দড়িতে একটী ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া এই গহ্বর মধ্যে তাহা ঝুলাইয়া দিয়া, গহ্বর কত নীচে পর্য্যন্ত গিয়াছে, পরীক্ষা করিতেছিল।

যতই নামাইতে লাগিল, ততই দড়ি নীচে নামিতে লাগিল, কোথাও আটকাইল না। শেষে বিরক্ত হইয়া দড়ি তুলিয়া দেখে যে, দড়ি ও ভার বস্তুটি রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরেই উক্ত জমিদারের কঠিন পীড়া হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

আমরা ঠাকুর দর্শন করিয়া পূজারির ঐ আজগুবি গল্প সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম ও আমাদের আহার্য্যদ্রব্যের সন্ধান করিতে লাগিলাম। উড়িষ্যার মত মোটা ও সস্তা চাউল প্রায় দেখা যায় না। টাকায় ২০।২৫।৩০ সের পর্য্যন্ত মোটা চাউল অনেক স্থলেই বিক্রয় হয়। সরু চাউল কিন্তু তত ভাল পাওয়া যায় না। তরকারির মধ্যে বেগুন, কুমড়াই প্রধান। পটোল, কপি ইত্যাদি কটক কি বালেশ্বর ভিন্ন অন্যস্থানে প্রায় পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মশালাতে আমরা দুই দিন অবস্থান করিয়া, তৃতীয় দিবস রাত্রিশেষে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, ৺মহাবিনাকদর্শনে যাত্রা করিলাম। কিছু দূর যাইয়া, রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিলাম, সম্মুখে কাল মেঘের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। আরও কিছু দূর যাইয়া, নেয়ুলপুরের বাজারে আসিয়া পৌছিলাম। ইহা রেল লাইন খুলিবার পূর্ব্বে একটী প্রসিদ্ধ চটী ছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইলেও যাত্রী থাকিবার নিমিত্ত এখনও অনেক ঘর ও কয়েক খানি দোকান রহিয়াছে; কিন্তু চটীর অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে।

নেয়ুলপুর পার হইয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ যাইয়া, আমরা জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রাস্তা ছাড়িয়া দিলাম ও পশ্চিমমুখী অন্য একটী রাস্তা দিয়া কতকদূর যাইবার পরে,

পাহাড়ের তলদেশে রেল রাস্তা ও তাহার নিকটেই কাটা খাল (Canal) দেখিতে পাইলাম। উহা পার হইয়া পাহাড়ের পাদদেশে যাইলাম। পরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ যাইবার পরে একটী প্রশস্ত পাষাণময় সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে শিবচতুর্দ্দশীর সময় একটী মেলা হয় বলিয়া শুনা গেল। এইখান হইতেই পাহাড়ে উঠিলে মন্দিরে যাওয়া যায়। অনন্তর আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রী৺মহাবিনাকের মন্দিরে যাইবার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কি একটা অপরিচিত জানোয়ারের, আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসায়, পথপ্রদর্শক বলিল—"হরিণ ডাকিতেছে।" আর কিছু উপরে যাইয়া একটী কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। তাহার পরিসর ২০।২২ বর্গ হাতের অধিক হইবে না। যাত্রীরা এই কুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীশ্রী৺মহাবিনাক ঠাকুরকে পূজা করিতে যায়। কুণ্ডের কিছু উপরেই মহাদেবের পাকা মন্দির এবং উহার পার্শ্বস্থ ঝরনা হইতে কুলকুল শব্দে অমৃত ধারা নিঃসৃত হইতেছে। মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবলিঙ্গ দর্শনে বুঝিলাম—উহা মানবহস্তনির্ম্মিত নহে। পরে শুনা গেল যে, উক্ত লিঙ্গ ঐ পাহাড়েরই একটী অংশ ও তাঁহার কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন এত বড় হইয়াছে যে, মন্দির প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে।

আর কিছু দিন বাদেই বোধ হয় বর্ত্তমান মন্দিরের আয়তন বাড়াইতে হইবে। পাণ্ডারা শ্রীশ্রী৺মহাবিনাককে পুষ্প চন্দন ইত্যাদি দ্বারা সুন্দর ভাবে সাজায়। এখানে ঠাকুরকে মুড়কি ভোগ দেওয়া হয়। আমরা মুড়কি ভোগের প্রসাদ কিঞ্চিৎ হস্তে করিয়া, মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কয়েকটী লোক মানসিক করা চুল কামাইতেছে। বুঝিলাম, এ অঞ্চলেরও লোকে তারকেশ্বরের মত শিবকে চুল মানসিক করে। এইবার মুড়কি হস্তে থাকায় মর্কট বানরের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইলাম। কাজেই দ্রুতপদসঞ্চারে পাহাড়ের নীচে পূর্ব্বোক্ত পাষাণময় প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম এবং তথায় বন্দনাদি করিয়া আহারান্তে অপরাহ্নে (বি এন আর) "ধানমণ্ডল" ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। উক্ত ষ্টেসন হইতে মহাবিনাক প্রায় আড়াই ক্রোশ দূর। পৌঁছিয়া দেখি, ষ্টেসনে থাকিবার কোনরূপ চালা বা চটি ঘর পাওয়া যায় না। রাত্রিতে গাড়ি পাওয়া যাইবে না শুনিয়া কোথায় থাকিবেন ভাবিয়া আমার পিতা চিন্তিত হইতেছেন, এমন সময় সেখানকার বাঙ্গালী ষ্টেসন মাষ্টার বাবুর অনুগ্রহে একটী উত্তম বাসাগৃহের জোগাড় হইল। তথায় রাত্রিযাপন করিয়া, পর দিন প্রাতে রেলে চাপিয়া, পুনরায় ভদ্রকে ফিরিয়া আসিলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

আজ আবার সেই শুভদিন সমাগত—সেই জগদ্বিখ্যাতকীর্ত্তি মহাপুরুষের আজ জন্মদিন। এসো পাঠক, আজ একবার আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়চর্চ্চা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়া—সেই মহাপুরুষের মহান্ চরিত্রের ধ্যান করি! যাঁহার জন্ম আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। কে সে মহাপুরুষ? কি ভাবে তাঁহাকে আমরা গ্রহণ করিব? কি ভাবে তাঁহার যথার্থ সম্মান করিব?—এ চিন্তা এক একবার মনে আনা কি অতীব কর্ত্তব্য নহে? বেলুড় মঠে তাঁহার গুরু-ভাই ও শিষ্যগণ তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া পূজা ধ্যানাদি করিলেন, ভক্তসমাগম সিদ্ধ করিলেন। দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা করিলেন। আমরাও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিলাম।

কিন্তু একদিন হুজুগে মাতিয়াই কি আমরা স্বামীজিকে চিনিলাম—তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলাম? এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদয় হয়। তাই এই শুভদিনে একবার ভাবিতে চাই, স্বামীজি কে, তিনি কি করিতে আসিয়াছিলেন, আমাদিগকেই বা কি করিতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি জীবনে তাঁহার উপদেশ প্রতিফলিত করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের স্বামীজিকে ভক্তি করা কথার কথা বই ত নয়। তাই মনে প্রথমেই উদয় হয়—স্বামীজি কে?

স্বামীজি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে নানাভাবে ভগবৎ-সাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন —তাঁহার জীবনের মূল কথা এই যে, যে যে ভাবে পার, ভগবৎ-সাধনা করিয়া তাঁহাকে লাভ কর—তাঁহাকে সাক্ষাৎ কর। উহার যাহা কিছু অন্তরায়—সমুদয় যতদূর পার—পরিত্যাগ কর। প্রাচীন মহাপুরুষগণের বাক্য প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বজ্রগম্ভীররবে ঘোষণা করিয়াছেন—কাম কাঞ্চনই ভগবল্লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক—আর এক গুরুতর প্রতিবন্ধক অভিমান।

জ্ঞান-ভক্তির মহাতরঙ্গ তুলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ লোককে ভগবৎ-পথের পথিক করিবার জন্য—জগতে প্রেমরাজ্যের বিস্তারের জন্য যে মহাকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, স্বামীজি তাঁহারই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং নিজের সাধন, শাস্ত্রচর্চ্চা, ও বহুলভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতাসহায়ে সেই মহাকার্য্যেরই প্রসার করি-

লেন। চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায়—পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর সমক্ষে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিপাদন ও প্রত্যক্ষই ধর্ম্মের মূল—গুরুদেবের এই দুই মহাশিক্ষা বজ্রগম্ভীররবে ঘোষণা করিলেন। ইহাই স্বামীজির জনসাধারণের (Public) সহিত প্রথম পরিচয়। তাঁহাকে আমরা সেই হইতেই পাইলাম—সেই দিন হইতেই তিনি আমাদের হইলেন। কিন্তু এই স্বামীজিকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে আমাদিগকে কল্পনাচক্ষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে হইবে এবং বাল্যকাল হইতেই মহাপবিত্র—যেন আর এক জগৎ হইতে আসিয়াছেন, আর মাঝে মাঝে চকিতের ন্যায় সেই স্মৃতি আসিয়া 'কি যেন হারাইয়াছি, কি যেন নাই,' এই ভাবে ব্যাকুল করিয়া তোলে—সেই স্বামীজির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। যিনি শৈশবে কখন কখন খেলাচ্ছলে শিবধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ, যৌবনে—অতি কষ্টে পড়িয়াও দানে মুক্তহস্ত, অপবিত্রতা ও কপটতার উপর খড়্গহস্ত, কোথায় প্রকৃত তত্ত্ব পাইব এই চেষ্টায়—নানা সম্প্রদায়ে ভ্রমণ ও নানা শাস্ত্র আলোচনায় ব্যস্ত। তার পর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার অমানুষিক ভালবাসায়, প্রতিভাসম্পন্ন কঠোর তার্কিকের প্রেম ও সত্যের সম্মুখে পরাজয়-স্বীকার—মহাদারিদ্র্যের সময়েও অবিচলিতভাবে জগন্মাতার নিকট বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনায় অস্বীকার—কাশীপুরের বাগানে গুরুদেবের শুশ্রূষা ও ধুনি জ্বালাইয়া সত্যলাভের জন্য নানাবিধ সাধন ভজন ও সমাধি লাভ—এ সকল কথাও ভাবিতে হইবে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বলিলেন—'তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইল—এখন একটু আমার কার্য্য কর—এখন চাবি আমার কাছে রহিল—কায হইয়া গেলে চাবি খুলিয়া দিব'—যখন সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু যুগাবতার শ্রীগুরুদেবের স্থূল শরীরের অন্তর্ধান হইল ও বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইল, সেখানে—গুরু ভাইগণের সহিত দিবানিশি বৈরাগ্যচর্চ্চা, অহরহঃ সাধন ভজন, সঙ্গীত কীর্ত্তন, নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থচর্চ্চা এবং পরে ভারতের নানাস্থানে কপর্দ্দকহীনভাবে ভ্রমণ—কখন গুহায় বসিয়া সত্যলাভ না হইলে আত্মহত্যার সঙ্কল্প—ক্রমে এ সকল বিষয়ের অনুধ্যান চাই। এই সময়কার সঙ্গিগণ এখনও বর্ত্তমান—তাঁহাদের নিকট হইতে এই সময়কার ব্যাপার সব শুনিলে লোমাঞ্চিত হইতে হয়! তিন দিন অনাহারে অম্লানবদনে বসিয়া আছেন—কাহারও নিকট যাচ্ঞা নাই—শেষে এক গাড়োয়ানের কুৎসিত রুটি ও অতিরিক্তঝাল তরকারি খাইয়া অচৈতন্যবৎ হওয়া, কখন কদাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর পরীক্ষায় পতিত হওন, কখন বা বস্ত্র পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ ও শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক সান্নিধ্যানুভব ও অপার করুণার পরিচয়লাভ—হে পাঠক, যদি সাধ হয় ত এখনও

যাঁহারা সেই সকল অবস্থার সাক্ষ্য দিবার জন্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তত্ত্ব করিও। আমি আর কত বলিব?

এই বার শেষ পরিচ্ছেদ—পূর্ণ বিকাশ—জ্ঞানভক্তিশিশিরসিক্ত সহস্রদলপঙ্কজের এইবার নবারুণ রাগরঞ্জিত হইয়া মুখাবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক অদৈবী অমানুষী শোভার বিস্তার। পূর্ণ আত্মবলিদান এবং ভগবানের আদেশ লাভে কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণ! অনেক রাজারাজড়া বড় লোকের সহিত কোথা হইতে অযত্নসাধ্য পরিচয়ের সুযোগ এবং তাহাদের এই অলৌকিক পুরুষের অদৃষ্টপূর্ব্ব গুণে মোহিত হইয়া অনুগত ভক্ত শিষ্য হওয়া! কিন্তু দরিদ্রের স্বামিজীকে মান্দ্রাজবাসী কয়েকজন দরিদ্র যুবকই উত্তমরূপে চিনিল ও আমেরিকায় পাঠাইয়া দিল! *

তার পর তথায় যাইয়া নানা প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থার সংঘর্ষেও তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব বিজয়লাভ—সাধারণে অনেকটা অবগত আছেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রকৃত প্রচারের গূঢ় বিবরণ কি সব আমরা এখনও জানিতে পারিয়াছি? ধীরে ধীরে সব প্রকাশিত হইতেছে—যাঁহারা অবহিত রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন দৈববাণীস্বরূপ তাঁহার নূতন নূতন উপদেশামৃত লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

আজ তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ বেলুড় এবং অন্যান্য স্থানে মঠ, সেবাশ্রম, অনাথালয় প্রভৃতি এবং রাজযোগাদি অমূল্য গ্রন্থনিচয় বিদ্যমান। জ্ঞানভক্তি-যোগকর্ম্মের সম্মিলনে যাহাতে অপূর্ব্ব জীবন গঠিত হইতে পারে, যাহাতে বর্ত্তমান কালের নানা দ্বন্দসমাকুল অবস্থার মধ্যেও প্রাচীন আদর্শে ঋষিজীবন গঠিত হইতে পারে এবং সমগ্র জগতে এই ঋষিকুলের অভ্যুদয়ে যাহাতে পুনর্বায় সত্যযুগের সূচনা হইতে পারে, তাহারই যথাসাধ্য আয়োজনে স্বামিজীর শেষ জীবন পর্য্যবসিত! আমাদের কর্ত্তব্য—যাহার যতদূর শক্তি কায়মনোবাক্যে এই মহাকার্য্যের সহায়তা করিয়া নিজেরা ধন্য হওয়া ও অপরকে ধন্য হইতে সহায়তা করা।

বর্ত্তমান যুগের লোক আমরা, প্রাচীন শাস্ত্র প্রাচীন গৌরব লইয়া যতই বড়াই করি না কেন, সেগুলি আমাদের পক্ষে অনেক স্থলে এখন জীবনীশক্তিরহিত নিরর্থক আচারমাত্রপোষণের সহায়ক অথবা কৌতূহলচরিতার্থের উপর ও প্রত্নতত্ত্ব অন্বেষণের অবলম্বনমাত্র হইয়া পড়িয়াছে। যদি ঐ সকল প্রাচীন তত্ত্বের জ্বলন্ত জীবন্ত সত্যতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দেখিতে চাই, তবে বর্ত্তমান যুগের আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রাণ স্বামিজীর জীবন চর্চ্চা ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। আমাদিগের জন্য তিনি জীবননদীতে সেতু গঠন করিয়া গিয়াছেন—আমাদিগকে কেবল তৎসহায়ে পার হইতে হইবে মাত্র। শ্রীস্বামি-শরীরাবলম্বনে

প্রকাশিত,—সেই অদৈবী অমানুষী নিত্য জীবন্ত শক্তি আমাদিগকে—লেখক ও পাঠক, উভয়কেই মনের সত্যানুরাগ, বুদ্ধির আলোক, হৃদয়ের প্রেম ও শরীরের কামাসক্তি-অতুষ্ট বল দানে যথার্থ মনুষ্যত্ব দিন—দেবত্ব দিন !

চক্রীর চক্র।

[শ্রী—]

সরল সজ্জন সত্যবাদী বলিয়া পাড়ায় শ্যামাচরণের বড় সুনাম ছিল—কিন্তু সংসার পরীক্ষার স্থল—সত্যবাদী ব্রাহ্মণ এতদিন ধরিয়া যে সুনামের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছিলেন, এখন তাহার নিকাশের দিন উপস্থিত। ভট্টাচার্য্যের একমাত্র পুত্র কিশোর কুমার পুলিশকর্তৃক নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত। নির্দ্দয় দারোগা পুত্রকে হাতে হাতকড়ি দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ; পিতাকে সাক্ষী মান্য করিয়াছে।

যে রাত্রে দুর্ব্বৃত্ত হরিদাস মান্না খুন হয় সে রাত্রে কিশোরের বাটী আসিতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হইয়াছিল, শ্যামাচরণ কিশোরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, নিত্য নিয়মিতের সামান্য ব্যতিক্রম হইলে কারণ অনুসন্ধান করিতেন। পুত্রও অকপটে পিতার কাছে সকল কথাই বলিত, কেবল এ রাত্রে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কিশোর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরে সহসা দ্রুতপদে আপন কক্ষে চলিয়া গেল। বিস্মিত হইয়া শ্যামাচরণ লক্ষ্য করিলেন, কিশোর আলোক সন্নিধানে ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ দেখিতেছে। দীপালোকে কিশোরের বিবর্ণ মুখ ও কম্পিত কলেবর দেখিয়া শ্যামাচরণ অধিকতর বিস্মিত হইলেন ; পুত্রকে পুনরায় প্রশ্ন করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় কিশোর সহসা উঠিয়া সেই ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ড লুকাইয়া রাখিল, ও অতি ত্বরান্বিত হইয়া কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। পর-দিন প্রভাতে পুত্রকে বিশেষ করিয়া প্রশ্ন করিবেন স্থির করিয়া উদ্বিগ্নমনে শ্যামা-চরণ শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু প্রভাতে সে প্রশ্ন করিবার সুযোগ হইল না। সেই রাত্রের ভোরেই কিশোরের হাতে হাতকড়ি পড়িল। শ্যামাচরণ শুনিলেন, দুর্ব্বৃত্ত হরিদাস মান্না খুন হইয়াছে ; এবং কিশোর সেই অপরাধে ধৃত। মৃতের হস্তে কিশোরের হস্তলিখিত এক খানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহের উপর পুলিস কিশোরকে

ধরিয়াছে। পরদিন প্রভাতে সহসা শ্যামাচরণের মনে পড়িল, কিশোর গতরাত্রে দীপালোকে এক খণ্ড কাগজ দেখিতেছিল; কাগজ যেখানে রাখিয়াছিল, শ্যামাচরণ দেখিয়াছিলেন, ত্বরায় বাহির করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণের হৃদয়শোণিত সহসা নিশ্চল হইল ও নয়নে সূর্য্যালোক নিভিয়া গেল, কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের ভাবহীন স্থির দৃষ্টি রক্তচিহ্নিত কাগজ-খণ্ডে সন্নিবিষ্ট, কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, নিস্পন্দ নয়ন পৃথিবীর কিছুই দেখিতেছে না। অদূরে ব্রাহ্মণীর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাস্বরে ব্রাহ্মণের চমক ভাঙ্গিল, প্রকৃতিস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাচরণের মনে হইল, "রক্ত-চিহ্নিত জ্বলন্ত প্রমাণ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলি।" উঠিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনে কখন মিথ্যা কপটাচার করেন নাই, কে যেন তাঁহার শক্তি লোপ করিল, বসিয়া পড়িলেন! রক্ত-চিহ্নিত লিখনে আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন; অন্য দিকে চাহিলেন, কিন্তু যে দিকে দেখেন—প্রাচীরে, প্রাঙ্গনে, আকাশে সেই রক্তচিহ্নিত ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ড তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে আসিয়া উদিত হয়! ব্রাহ্মণ চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—হায় হায়! কি হোল! কিশোর নরহত্যা করলে! আমার পুত্র টাকার জন্য নরহত্যা করলে! ব্রাহ্মণের মনে হইল কে যেন নিঃশব্দে দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল, চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন—মুকুন্দরাম চাকী।

মুকুন্দরাম চাকী গ্রামের তহশীলদার। গ্রামে কেহ কোথাও আপদে বিপদে পড়িলে চাকি মহাশয়কে ডাকিতে হয় না, আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হন। কেহ আত্মজীবন উপেক্ষা করিয়া জলমগ্নের উদ্ধার সাধন করে, আবার কেহ বা কূলে দাঁড়াইয়া তাহার নিষ্ফল চেষ্টা পরিদর্শন করে, মুকুন্দরাম অধিকন্তু তাহাতে আমোদ বোধ করিয়া থাকে। সেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের জন্য মুকুন্দ আজ শ্যামাচরণের গৃহে উপস্থিত। মুকুন্দ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে শ্যামাচরণের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কিশোরের মা ধূলায় পড়িয়া আছেন, কিছু দূরে শ্যামা-চরণ এক টুক্‌রা কাগজ হাতে করিয়া চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতেছেন। কাগজখানা দেখিবার জন্য মুকুন্দের কৌতূহল জন্মিল। অতি মন্দগমনে ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইয়া মুকুন্দ দেখিল—কাগজখণ্ড রক্তচিহ্নিত। মুকুন্দের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তারপর অনবধানে শ্যামাচরণের মুখনির্গত বাক্য শুনিয়া আনন্দের বেগ মুকুন্দের দুঃসহ হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণ চক্ষুঃ চাহিতেই মুকুন্দ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল—"ওর নাম কি—ঘোর কলি পড়েচে। ইস্—ওর নাম কি—রক্ত যে!" সচকিতে শ্যামাচরণ কাগজখণ্ড তাড়াতাড়ি হাতের ভিতর লুকাই-

লেন। মুকুন্দ বলিল—ওর নাম কি—হাত কেটে গেছে নাকি! কাগজে রক্তের দাগ লেগেছে যে!

শ্যামা—না বাপু! হাত কাটেনি।

মুকুন্দ—তবে—ওর নাম কি—কাগজে রক্ত এল কোথা থেকে! বোধ করি জান্‌তে পাবেন নি। এক মাত্র পুত্র—ওর নাম কি—অধীর হ'বারই ত কথা! তবে কি না প্রথম ম্যাজেষ্টরের আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হবে, পরে—ওর নাম কি—দায়রা সোপবদ্দ—তার পর দণ্ড। প্রথম হ'তে তদ্বির করলে—ওর নাম কি—হয় ত অপরাধই সাব্যস্ত হবে না। আমরা গ্রামশুদ্ধ একপক্ষ হয়ে তদ্বির কোর্ব্বো। গ্রামশুদ্ধ এককাট্টা হয়ে সাক্ষি দেব যে, আপনার পুত্রের দ্বারা—ওর নাম কি—এমন গর্হিত কার্য্য হ'তে পারে না। শ্যামাচরণের দৃষ্টি তাঁহার হাতের ভিতর সেই লুকানো কাগজের দিকে ধাবিত হইল। চতুর মুকুন্দ অমনি বলিল—হাতটা—ওর নাম কি—বড় জ্বালা করছে বুঝি। একটু ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে রাখ্‌লে হয় না?

শ্যামাচরণ বুঝিলেন—মুকুন্দের মনে একটা সন্দেহ উঠিয়াছে। বলিলেন—বাপু! হাত জ্বলছে বটে, কিন্তু কাটার জন্য নয়। যে জন্য জ্বলছে, তা আর তোমার শুনে কায নেই। মুকুন্দ একটু সুখ ভাব করিয়া উঠিয়া গেল, কিন্তু চতুর চাকী বুঝিয়া গেল—পুত্রের অপরাধের সাংঘাতিক প্রমাণ—শ্যামাচরণের মুষ্টিমধ্যে।

*   *   *   *   *

গ্রামে আর অপর কোন কথা নাই—কেবল হরিদাস মান্নার খুন, আবাল-বৃদ্ধবণিতার মুখে ওই এক কথা, হরিদাস মান্নার খুন। পথে, ঘাটে, মাঠে, ঘরে, বাহিরে, অন্দরে ঐ এক চর্চ্চা—পাপের পরিতাপময় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, ন্যায়ের অভ্রান্ত অমোঘ দণ্ড একদিন না একদিন সাংঘাতিক আঘাতে অধর্ম্মাচারীর মর্ম্মস্থল চূর্ণ করিবে, দুষ্কর্ম্মের ফল এক দিন ফলিবেই ফলিবে ইত্যাদি। হারাধন হরিধনকে সেই কথাই বলিতেছিলেন—বুঝ্‌লে ভায়া, 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি'—'দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি নাই।

হরিধন বলিল—বটে, তা বটে, ঠিক বটে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। গুণাকর বলিল—"তা যা বল ভায়া—ছেলে ঘুমুল পাড়া জুড়ুল। এই হরিদাস মান্নার জন্যে পাড়ার মেয়ে ছেলেকে সাবধানে পথে বেরুতে হ'ত। পরের বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেওয়া, বিধবার অর্থগ্রাস, সতীর ধর্ম্মনাশ—এত বড় দুরাচার কুলাঙ্গার কি আর জন্মেচে।

হরিধন—শুনতে পাই হরিদাস মাল্লা বাড়িতে ছিল না। দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল, যে দিন নেয়ত সেই দিন ঠিক এসে উপস্থিত। বলে, নেয়তে টানে।

গুণাকর বলিল—তুমিও যেমন, ওর আবার বাড়ি কোথা? গুণ্ডামো জীবিকা, বেশ্যা নিয়ে ঘর! আচ্ছা মুখটা অমন কৃতি বিকৃতি কল্লে কেন বল দেখি?

হারা—করলে কেন! এ কি মানুষের কায ভাবা? মানুষে অমন ক'রে মারতে পারে না। ওটা উপদেবতারই কর্ম্ম। গেছ্‌লেন ভূতের সঙ্গে গুণ্ডামো করতে! মাঠ তো নয়! ভূতের আড্ডা! বাপ্‌রে, রাত্রে কি মজ্‌লিস্! কি রোস্‌নায়ের ধূম! এখানে জ্বলছে, ওখানে জ্বলছে! এই জ্বলছে, এই নিভ্‌ছে! নিভ্‌ছে—জ্বল্‌ছে! ওখানে রাত্রে মানুষ কে যাবে যে, খুন করবে!

গুণা—তবে সর্ব্বাঙ্গে ছোরার দাগ কেন?

হারা—নখ্ ভায়া নখ্। সর্ব্বাঙ্গ নখে চিরেছে! ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি!

কিশোর কুমার হাজতে—

নিষ্ঠুর রাজ আদেশ পিতা মাতার স্নেহের অঙ্ক হ'তে তাহাকে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে। গিয়াছে, হয় ত আর আসিবে না। শূন্য হৃদয়, শূন্য ভবন আর পূর্ণ হইবে না। হায়, এ সংসারে সব থাকিবে কেবল কিশোর থাকিবে না। শ্যামাচরণ ভাবিতেছিলেন—আমি থাকিব, ব্রাহ্মণী থাকিবে, এ সংসার যেমন তেমনি থাকিবে, কেবল কিশোর থাকিবে না। সে মুখ আর দেখতে পাব না—সে স্বর আর শুনতে পাব না। কিশোর থাকিবে না আর সকলই এমনি থাকিবে, নিত্য যেমন সংসার চলে তেমনি চলিবে, এ নিরালোক নিরানন্দ নীরব শোকসন্তপ্ত জীবনভার নিত্য বহন করতে হবে, এই অরুচির জীবন পোষণ করবার জন্য নিত্য খেতে হবে শু'তে হবে, আবার হয় ত লোকের কাছে হাসিমুখ দেখাতে হবে। সবই হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণীর চিরফুল্ল মুখে আর কখন হাসি দেখ্‌ব না, আমার হৃদয়ের চিরান্ধকার আর দূর হবে না।

শ্যামাচরণের হৃদয় অন্ধকার, গৃহ অন্ধকার, কেন না শ্যামাচরণের গৃহের আলোক, নয়নের আলোক, নিষ্ঠুর পুলিস হরিয়া লইয়া গিয়াছে! সংসার যেমন চলে তেমনি চলিতেছে, নিত্য দিন রাত্রির উদয় হইতেছে, কিন্তু শ্যামাচরণ তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছেন না—দিন রাত এক চিন্তায় মগ্ন। প্রবল ভূকম্পনে পৃথিবীর যেমন পরিবর্ত্তন ঘটে, দারুণ দুর্ঘটনায় শ্যামাচরণের জীবনে তেমনি বিপ্লব উপস্থিত—বর্ত্তমান আলোকবিহীন, ভবিষ্যৎ আশাশূন্য, অতীত স্বপ্নবৎ! শ্যামাচরণের মনে হইতেছে, তাঁহার একটি সুখপূর্ণ গৃহ ছিল, পরমানন্দদায়িনী

ব্রাহ্মণী ছিল, বংশের দুলাল একটি পুত্র ছিল, কিন্তু সে সব কোথায়? চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিলেন; চারি দিকে চাহিলেন—সেই চিরপরিচিত ভবন, চিরপরিচিত গৃহপ্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনপ্রান্তে পুষ্পিত করবীর, সবই সেই!—তবু শ্যামাচরণের মনে হইতেছে, এ গৃহ ত সে গৃহ নয়, ধরাশায়িনী ওই যে ব্রাহ্মণী—ওকি সেই? না না, ও ত সে নয়, ফুল্লারবিন্দের ন্যায় যে প্রফুল্ল বদন বার্দ্ধক্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সন্তোষসরোবরে নিত্য ভাসমান থাকিত—ও কি সেই মুখ? না কখনই নয়। আবার চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কোন্‌টা স্বপ্ন? অতীত স্বপ্ন, না বর্ত্তমান স্বপ্ন? দুইই স্বপ্ন। সুখস্বপ্নময় অতীত, দুঃস্বপ্নময় বর্ত্তমান—দুইই স্বপ্ন—দুইই স্বপ্ন! কেবল কঠোর জাগ্রত সত্য—ভবিষ্যতের অমঙ্গল। হায় হায় কেন এমন হ'ল! কেন এমন হ'ল! আমি জ্ঞানে কখন কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই—কেন এমন হ'ল! পুত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন—একান্ত মনে অক্ষুণ্ণ যত্নে শিল্পী যেমন সাধের প্রতিমা গঠন করে, আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্রগঠনে কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন—তার কি এই পরিণাম? আজীবন সত্যসেবা করিয়াছি—তার কি এই পরিণাম? হায় হায় কেন এমন হ'ল? সত্য মিথ্যা কি বুঝ্‌লুম না, পাপ পুণ্য কি বুঝ্‌লুম না, ধর্ম্মাধর্ম্ম কি বুঝ্‌লুম না, সত্যইত—সত্যপালন ধর্ম্ম—মিথ্যায় যদি একজনের প্রাণ রক্ষা হয়, সে মিথ্যা কি অধর্ম্ম? শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কহিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—কারো প্রাণরক্ষার জন্য নয়, স্বার্থসাধনের জন্য; তাই তার জন্য যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হয়েছিল। আমি যদি সাক্ষ্য দিই খুনের রাত্রে কিশোর গৃহের বাহির হয় নাই, রক্তচিহ্নিত ঐ কাগজের টুকরোটা যদি পুড়িয়ে ফেলা যায়,—এমন সময় দারোগা আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা আসুন, ফৌজদারী ব'সবার পূর্ব্বে আমাদের উপস্থিত হ'তে হবে।" দুর্গা দুর্গা বলিয়া শ্যামাচরণ যাত্রা করিলেন।

* * * * *

ফৌজদারি আদালতে আজ বড় ভিড়—লোকে লোকারণ্য। কিশোরকুমারকে দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক। ক্রমে মোকদ্দমার ডাক হইল সরকারী উকিল বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"ধর্ম্মাবতার! গত ৬ই জানুয়ারি ২২শে পৌষ পূর্ণিমার রাত্রে নবগ্রামের চৌকিদার গ্রামান্তর হইতে আসিবার সময় দেখে—উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী ভূতের মাঠে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে। ঐ মাঠ সম্বন্ধে জনরব এই যে, নিত্য রাত্রে ঐ স্থানে ভূতের উপদ্রব হয়। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে রাত্রে মাঠ দিয়া কেহ যাওয়া আসা করে না। মাঠের কাছাকাছি কোথাও

বসবাস নাই। কিছু দূরে একটী বহু প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়ী আছে। বোধ করি, কথা কহিতে পারিলে উহার নির্জ্জন কক্ষ সকল অনেক গুপ্ত অপরাধের সাক্ষ্য দিতে পারিত। মৃত দেহ কা'র, নির্ণয় করিবার জন্য হস্তস্থিত আলোকের সাহায্যে চৌকিদার বিশেষরূপে পরীক্ষা করে, কিন্তু লাসের মুখ এতদূর বিকৃত হইয়াছিল যে, কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। চৌকিদার থানায় যাইয়া দারোগাকে সংবাদ দেয়। দারোগা তৎক্ষণাৎ সরেজমিন তদন্তে আসে ও উক্ত চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করে যে, প্রথম যে অবস্থায় দেখিয়াছিল, লাস ঠিক সেই অবস্থায় আছে কি না। চৌকিদার পুনরায় পরীক্ষা করিয়া বলে যে, মৃতের হস্তে একখণ্ড কাগজ ছিল, এখন তাহার কতকাংশ মাত্র দেখিতেছি।

মৃতের মুষ্টি হইতে দারোগা অতি সাবধানে সরাইয়া দেখে, কাগজে এইরূপ লেখা—"হরিদাস,—আজ সন্ধ্যার পর বিষয় লিখিয়া দিতে স্বীকৃত, কার্য্য হওয়া নিশ্চয়। রেজিষ্ট্রী না হয় না হবে। বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। বাকী টাকা আজই চাই।—কিশোর।" পত্র পাঠ করিয়া সরকারী উকিল হাকিমের হাতে কাগজখণ্ড দিলেন ও বলিতে লাগিলেন—"এই কাগজখণ্ড পড়িয়া মৃতদেহ হরিদাস মান্নার বলিয়া দারোগার অনুমান হয় ও তৎক্ষণাৎ উক্ত মান্নার চাকর নিমাইদাসকে ডাকিতে পাঠায়। নিমাইদাস মৃতের বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে আঁচিল, ডান হাতের কব্জিতে জড়ুল ও কাপড় জামা জুতা ইত্যাদি দেখিয়া, লাস হরিদাস মান্নার বলিয়া সনাক্ত করে। দারোগা চৌকিদার ও নিমাইদাসের যে রোজনামা করিয়াছে, তাহাতে নিমাইদাসের উক্তিতে প্রকাশ যে, কথিত মান্না অতিশয় রাগান্বিত হইয়া এক টুক্‌রা কাগজ হাতে করিয়া সন্ধ্যার সময় বাটী আসে ও তৎক্ষণাৎ ঐ কাগজ ও একখানি ছোরা লইয়া পুনরায় বাহির হইয়া যায়। পুনরায় যখন বাহির হইয়া যায় তখন উক্ত মান্নার রক্ষিতা স্ত্রীলোক প্রশ্ন করে—তাহাতে উক্ত মান্না উত্তর দেয় যে—"কিশোর ভট্‌চাজ্ বড় বেড়েছে! রেজিষ্ট্রী না না হয় না হবে! আচ্ছা দেখি।" ইহার পর আর উক্ত মান্না বাটী ফিরিয়া যায় নাই। ধর্ম্মাবতার! পুলিস-ডায়ারি লিখিয়াই দারোগা অতিপ্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত কিশোর কুমার ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করে। লাস যে হরিদাস মান্নার তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। ধর্ম্মাবতার লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, মৃতের হস্তগত কাগজে তিন চারিটী অঙ্গুলির রক্তচিহ্ন অঙ্কিত আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ চিহ্নগুলি সম্পূর্ণ নহে, সকল আঙ্গুলেরই অর্দ্ধেক মাত্র ছাপ দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঐ অর্দ্ধচিহ্ন সকল সবরেজিষ্ট্রারের আফিসবহির অন্তর্গত মৃতমান্নার অঙ্গু-

লির পূর্ণচিহ্নের সহিত ঐক্য করিলে মান্যবর আদালত স্পষ্ট অনুমান করিতে পারিবেন যে, রক্তের চিহ্ন ও কালীর চিহ্ন একই ব্যক্তির অঙ্গুলির ; কেবল একস্থানে পূর্ণ অঙ্কিত ও অপরস্থানে অর্দ্ধ অঙ্কিত। ধর্ম্মাবতার ! মৃতের হস্তগত ঐ কাগজের অপরপিঠ লক্ষ্য করুন, শিরোনামা লেখা আছে—"হরিদাস—"। ধর্ম্মাবতার ! যদিও হত্যাকারী নিষ্ঠুর চাতুর্য্যের সহিত লাসের মুখ বিকৃত করিয়া সহজে সনাক্ত করিবার উপায় দূর করিয়াছিল, ধর্ম্মের কৌশলে তাহার অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। মৃতদেহ যে হরিদাস মান্নার, সে সম্বন্ধে কোনও সুযুক্তিসঙ্গত সন্দেহ হইতে পারে না। এখন দেখা যাক, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কোন [illegible] পাওয়া যায় কিনা। প্রমাণ পাওয়া যায়, মৃত মান্না জীবিতাবস্থায় শেষ যখন বাটীর বাহির হইয়া আসে, তখন সে দারুণ ক্রোধের অধীন। যে পত্র তাহার ক্রোধের উদ্দীপন করিয়াছিল, সেই পত্র এবং অধিকন্তু একখানি ছোরা লইয়া, সে বাহির হইয়া আসে। যদিও স্পষ্টরূপে কিছু ব্যক্ত করে নাই, কিন্তু নিমাইদাসের উক্তি হইতে অনুমান করা যায় যে, কথিত মান্নার বাহির হইবার কারণ—কিশোর ভট্টাচার্য্যের কোন কার্য্যবিশেষের প্রতিবিধান করা। সে কার্য্য কি ? ধর্ম্মাবতার ! মৃতের হস্তে যে কাগজ পাওযা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, সেই দিন সন্ধ্যার পর কিশোর ভট্টাচার্য্য কথিত মান্নাকে কোন বিষয় লিখিয়া দিবার অঙ্গীকার করিতেছে, ঐ অঙ্গীকারে অগ্রিম কিছু অর্থ লইয়াছে, এবং ঐ দিন বাকী টাকার দাবি করিতেছে—উত্তম। কিন্তু ঐ অঙ্গীকার এবং দাবির মাঝখানে একটী সাঙ্ঘাতিক কথা আছে—"রেজিষ্ট্রী না হয় না হবে।" মান্যবর আদালত অবস্থাটা বিবেচনা করিয়া দেখুন—একজন এক ব্যক্তিকে বিষয় বিক্রয় করিতেছে, বিক্রয়কোবালা রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবার অঙ্গীকারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে চুক্তিমূল্যের কতক অংশ অগ্রিম লইযাছে, এখন বলিতেছে—"রেজেষ্ট্রি না হয় না হবে, বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না, বাকী টাকা আজই চাই।" ধর্ম্মাবতার ! ইহাতে কাহার না ক্রোধের উদয় হয়, এরূপ ব্যবহারে অতি শান্ত প্রকৃতির লোকও ক্রোধে উত্তেজিত হয়। মৃত হরিদাসের ত কথাই নাই। নাবালকের বিষয় ফাঁকি দেওয়া, দুশ্চরিত্র যুবকগণ দ্বারা হাণ্ডনোট কাটান, গুণ্ডামো প্রভৃতির জন্য কথিত মান্না দুই চারিবার ফৌজদারী আদালতে দণ্ডিত হইয়াছে। যদিও মৃতের হস্তগত কাগজের কতকাংশ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু প্রাপ্ত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের লক্ষ্য—এক কিশোর ভট্টাচার্য্য। ধর্ম্মাবতার ! মৃত মান্না একজন সর্ব্বলোকজানিত গুণ্ডা ছিল, কথায় কথায় ভয় প্রদর্শন করিয়া ছোরা দেখাইত ও অভদ্রোচিত

কটূক্তি করিত। কিশোর ভট্টাচার্য্যের ব্যবহারে সে যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ কটূক্তি ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা কিশোর ভট্টাচার্য্যকেও সেইরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল। কিশোর ভট্টাচার্য্য বলিষ্ঠ সাহসী ও একজন চতুর শিকারী! তার পর সন্ধ্যার পর সে নির্জ্জন মাঠে কিরূপ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার সাক্ষী নাই। এস্থলে সত্যনির্ণয়ের একমাত্র সহায়—অনুমান। অনুমান—কোন গুপ্ত প্রয়োজনে কিশোর ভট্টাচার্য্য পিতার অজ্ঞাতে তাহার কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় করে। সন্ধ্যার পর ভৌতিকভয়সঙ্কুল নির্জ্জন মাঠের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ভাঙ্গা বাড়িতে লেখাপড়া হবার সময় ও স্থান নির্ণয় হয়। অনুমান—রেজিষ্ট্রি সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইয়া উভয়েই ক্রোধান্ধ হইয়াছিল। বলিষ্ঠ, সাহসী, চতুর যুবক, কোনরূপে গুণ্ডার করগত অস্ত্র হস্তগত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিয়াছে। ধর্ম্মাবতার এখানে ঘটনা—প্রত্যক্ষ। ঘটনার কারণ—অনুমান ও যুক্তিসাপেক্ষ।

হাকিম সরকারী উকীলের বক্তৃতার পর কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কিছু বলিবার আছে?"

কিশোর উত্তর করিল—"না।"

অতঃপর সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হইল। চৌকীদার কোথায় কিরূপ অবস্থায় প্রথম লাস দেখিয়াছিল, বলিল, আরও বলিল, মৃতদেহের নিকট সে ছোরা বা অন্য কোনরূপ অস্ত্র দেখে নাই। মৃতের হস্তগত কাগজের কতকাংশের অন্তর্ধান সম্বন্ধেও বলিল। হাকিম চৌকীদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি গ্রামান্তরে রাত্রে কি করিতে গিয়াছিলে?" চৌকিদার বলিল—"রাত্রে যাই নাই, ধর্ম্মাবতার। গিয়াছিলাম দিনে। আমার কুটুম্ববাড়ি সেদিন ভোজ ছিল, আসিতে রাত্রি হইয়াছিল।" হাকিম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্ণিমার রাত্রে, তুমি আলো হাতে করিয়া আসিতেছিলে কেন?" চৌকিদার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! ঐ মাঠে রাত্রে চলিতে কেমন গা ছম্ ছম্ করে। শুনেছি—আলো কি আগুন হাতে থাক্‌লে ভূতে ছুঁতে পাবে না।" আদালতের সর্ব্বলোক হাসিয়া উঠিল।

নিমাই দাস ও মৃত মান্নার রক্ষিতা রমণী সাক্ষ্য দিল—হরিদাস মান্না খুনের দিন সন্ধ্যার সময় ক্রোধান্ধ হইয়া, একখণ্ড কাগজ ও ছোরা লইয়া, রেজিষ্ট্রির কথা ও কিশোর ভট্টাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়া বাহির হইয়া যায়। যে সকল চিহ্ন দেখিয়া তাহারা লাস সনাক্ত করে, তাহাও বলিল। উপযুক্ত সাক্ষীর দ্বারা কিশোরের হাতের লেখা সনাক্ত করা হইল। কিশোরের পক্ষের উকিল কোন সাক্ষীর জেরা করিলেন না।

পুলিশ তদ্বিরের ক্রটি করে নাই, যে ব্যক্তি দ্বারা কিশোর পত্র পাঠাইয়াছিল, তাহাকে উপস্থিত করা হইল। নাম ধাম ইত্যাদি প্রশ্নের পর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কায কর ?

সাক্ষী—যখন যেমন মনকে লেই।

উকিল—তুমি কিশোর ভট্‌চায্যিকে চেন ?

সা—না।

উ—তুমি কিশোর ভট্‌চায্যিকে চেন না ?

সা—না।

উ—ও কে দাঁড়িযে বল দেখি, ওকে চেন ?

সা—ওকে চিন্‌ব নাই ত চিন্‌ব কাকে ?

উ—ও কে ?

সা—ছোট ভট্‌চায্‌।

উ—আচ্ছা, ছোট ভট্‌চায্‌কে তুমি চেন ?

সা—হুঁ—আমি চিন্‌ব নাই ত চিন্‌বেক্ কে ?

উ—আচ্ছা, ছোট ভট্‌চায্‌ তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিল ?

সা—আমাকে দিবেক্ কেনে ?

উ—তোমাকে দেয নি তবে কাকে দিয়েছিল ?

সা—হরিবাবুকে।

উ—হরিবাবুকে দিতে তোমাব হাতে দিয়েছিল, কেমন ?

সা—হুঁ।

উ—আচ্ছা, যখন চিঠি দিলে তখন কত বেলা ?

সা—বিকাল বেলা।

উ—তার পব চিঠি নিযে তুমি কোথায় গেলে ?

সা—একনাবে বাগান দিব্‌কে।

উ—বাগান দিকে কেন গেলে ?

সা—তবে কুন্‌থেন্‌কে যাব ?

উ—আচ্ছা, তার পর, তুমি বাগানদিকে গিযে বাবুকে চিঠি দিলে ?

সা—দিলম্ নাই ত কি থালম ?

উ—চিঠি পেয়ে বাবু কি কল্লে ?

সা—একবারে ধেই ধেই লাচ্‌তে লেগে গেল।

উ—তার পর তুমি কি কল্লে ?

সা—আমি নাচ দেখে বল্লম্—'বাবু! নাচ নাচ আবার নাচ !'

উ—বাবু কি বল্লে ?

সা—খেদাড়ে দিল, বল্ল—যা বেটা।

উ—তার পর তুমি কি কল্লে ?

সা—টা'নে ছুট্ দিলম্।

উ—ছুটে ছোট ভট্চাযের কাছে এলে ?

সা—না, ছুটে ঘর্‌কে গেলম্।

উ—আচ্ছা তুমি যাও।

সা—কুন্‌খেন্‌কে যাব ?

চৌকীদারগণ সাক্ষীকে সরাইয়া লইযা গেল। উকিল, বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন—ধর্ম্মাবতার ! সাক্ষী নির্ব্বোধ কিন্তু কিশোর ভট্টাচার্য্য চিঠি দিয়াছিল, এবং নির্ব্বোধ হইলেও সাক্ষী যে হরিদাস মান্নাকে চিঠি দিয়াছিল—তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু ঐ পত্র যে হরিদাস মান্নার বিশেষ উত্তেজনার কারণ, শেষ সাক্ষী সে সম্বন্ধে নিমাইদাসের উক্তির সমর্থন করিতেছে।

পত্রবাহকের সাক্ষ্যের পর অপর এক সাক্ষী বলিল—"আমি গ্রামান্তরে কর্ম্ম করি। নিত্য সন্ধ্যার সময় আমায় ভূতের মাঠ দিয়া বাড়ি আসিতে হয়। কিশোর ভট্টাচার্য্যকে আমি উত্তমরূপে চিনি। ঐ ব্যক্তি—কিশোর ভট্টাচার্য্য। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় আমি কিশোর ভট্টাচার্য্যকে ঐ মাঠে দেখিয়াছি। আমি নিত্য ঐ মাঠ দিয়া আনাগোনা করি। পূর্ব্বে ঐ মাঠে কিশোর ভট্টাচার্য্যকে কদাচ কখন দেখিয়াছি।"

এই সাক্ষীর পর শ্যামাচরণের ডাক হইল। মর্ম্মপীড়িত ব্রাহ্মণের প্রশান্ত মহিমাময় মুখশ্রী সর্ব্বজনের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। শ্যামাচরণ ধীরপদে সাক্ষীর স্থান অধিকার করিলেন। একবার চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—সরকারী উকীলের সন্নিকটে মুকুন্দরাম চাকী। ব্রাহ্মণের মুখ বিবর্ণ হইল। অতি কষ্টে অন্তরে যে ক্ষীণ আশালোক জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও নির্ব্বাপিত হইল।

অন্যান্য প্রশ্নের পর সরকারী উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বলিলেন—'খুনের রাত্রে আপনার পুত্রের বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল।' আচ্ছা; আপনি তখন জাগিয়াছিলেন ?"

শ্যামা—ছিলাম।

উকীল—আচ্ছা; আপনার পুত্র বাটী আসিলে তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?

শ্যামা—ছিলাম।

উকীল—আপনার পুত্র কিছু উত্তর দিয়াছিল?

শ্যামা—না।

উকীল—আচ্ছা; তার পর আপনার পুত্র কি করিল?

শ্যামা—তাহার শয়নকক্ষে গেল।

উকীল—শয়নকক্ষে যাইয়া কি করিল, আপনি কিছু জানেন কি?

ব্রাহ্মণের মুখ বিবর্ণ হইল, কিন্তু ধীরস্বরে বলিলেন—শয়নকক্ষে যাইয়া দীপা লোকে একখণ্ড কাগজ দেখিল।

উকীল—সে কাগজ আপনি দেখেছিলেন?

শ্যামা—দেখেছি।

উকীল—তাহাতে কি কিছু লেখা ছিল?

শ্যামা—ছিল।

উকীল—কি লেখা ছিল মনে আছে?

লেখা—অগ্নিবর্ণে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের ভিতর জ্বলিতেছে—মনে আর নাই! উত্তর দিলেন—আছে।

উকীল—কি লেখা ছিল?

শ্যামা—লেখা ছিল—"লাস একেবারে বিকৃত হইয়াছে। ভয় নাই। হরিদাস মান্নার লাস আর গোল কর্ব্বে না। টাকার বড় দরকার। যেমন করে পার দিতে হবে।" আদালত শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

উকীল—সে লেখা কার আপনি বলিতে পারেন?

শ্যামা—লেখা কার? আমার পুত্রের।

উকীল—সে কাগজ আপনি আদালতে দিতে পারেন?

কম্পিতকরে শ্যামাচরণ পুত্রের মৃত্যুশর হাকিমের হাতে তুলিয়া দিলেন।

শ্যামাচরণ কিরূপে ঐ কাগজ পাইলেন, উকীল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাকিমের কান সে প্রশ্নোত্তরে ছিল না। হাকিম মৃতের হস্তগত কাগজখণ্ডের সহিত শ্যামাচরণপ্রদত্ত কাগজখণ্ডের হস্তলিখন তুলনা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মস্তিষ্কে বিদ্যুতবৎ কি একটা চিন্তা প্রভাসিত হইল। বিচারপতি খণ্ড পত্রদ্বয় মিলিত করিলেন। পাঠ করিয়া উভয় খণ্ডের অপর পিঠ

দেখিলেন। হাকিমের অন্যমন দেখিয়া, সরকারী উকীল নীরব হইলেন। নিবাতনিষ্কম্প বনভূমির ন্যায় জনারণ্য— স্পন্দহীন। বিচারপতির বিস্ময়বিকাশিত মুখের উপর সর্ব্বদৃষ্টি সন্নিবিষ্ট। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, হাকিম বলিলেন—"খুনের অপরাধে কিশোর কুমার ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!" অপরাধীর প্রথম যৌবন, মনোহর মুখশ্রী, নির্ভিক অথচ বিনীত ভাব দর্শনে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে শুষ্ক বনভবন যেমন আচম্বিতে মর্ম্মরিয়া উঠে, নীরব জনতায় অস্ফুট আনন্দসূচক ধ্বনি উঠিল।

বিচারভবন আবার নিস্তব্ধ হইল। হাকিম সরকারী উকীলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মৃত হরিদাসের হস্তগত কাগজের যে অংশ খোয়া গিয়াছিল, তাহা এই—সাক্ষী শ্যামাচরণের প্রদত্ত কাগজ। মৃতের হস্তস্থিত কাগজে রক্তাঙ্কিত অঙ্গুলীর যেরূপ অর্দ্ধচিহ্ন আছে, সাক্ষী শ্যামাচরণ প্রদত্ত কাগজেও অনুরূপ কতকগুলি চিহ্ন আছে এবং উভয় চিহ্ন সংযুক্ত হইয়া রেজেষ্টারের বহির কালী-অঙ্কিত অঙ্গুলি-চিহ্নের সহিত সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইতেছে।" হাকিম উকীলের হস্তে উভয়খণ্ড অর্পণ করিলেন।

১ম খণ্ড	২য় খণ্ড
হরিদাস	
আজ সন্ধ্যার পর বি	লাস একেবারে বি
ষয় লিখিয়া দিতে স্বী	কৃত হইয়াছে। ভয় নাই,
কৃত কার্য্য হওয়া নিশ্চয়।	হরিদাস মান্নার
রেজেষ্ট্রী না হয় না হবে। বি	লাস আর গোল কর্ব্বে না।
শেষ কোন ক্ষতি হবে না।	টাকার বড় দরকার।
বাকী টাকা আজই চাই।	যেমন করে পার দিতে হবে।
—কিশোর	

বিচারপতি বলিলেন—উভয়খণ্ড একত্র করিয়া পাঠ করুন।

সরকারী উকীল পড়িলেন—"আজ সন্ধ্যার পর বিলাস একেবারে বিষয় লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ভয় নাই, কৃতকার্য্য হওয়া নিশ্চয়। হরিদাস মান্নার রেজেষ্ট্রী না হয় না হবে। বিলাস আর গোল কর্ব্বে না। শেষ কোন ক্ষতি হবে না। টাকার বড় দরকার। বাকী টাকা আজই চাই। যেমন করে পার দিতে হবে।—কিশোর"

হাকিম বলিলেন—উভয়খণ্ড সংযোগ করিয়া অপর পিঠ পাঠ করুন।

উকীল পাঠ করিলেন—শিরোনামা—হরিদাস দত্ত।

হাকিম—এ পত্র হরিদাস মান্নাকে লেখা হয় নাই। হরিদাস দত্তকে লেখা হইয়াছিল এবং এই পত্রেই প্রকাশ, হরিদাস মান্নার সহিত বিষয় লিখিয়া দেওয়া সম্বন্ধে কিশোর ভট্টাচার্য্যের কোন সংস্রব নাই; সুতরাং ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় বিষয় লেখা পড়া সম্বন্ধে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না ও কথাও নাই। মৃতের হস্তস্থ পত্রের অপরাংশ কিশোর ভট্টাচার্য্যের অধিকারে থাকা, তাহার নির্দ্দোষিতার অপর প্রমাণ। মৃতের হস্ত হইতে ঐ কাগজ লওয়া যদি হত্যাকারীর স্বার্থ হইত, তাহা হইলে হত্যার অব্যবহিত পরেই সে ঐ কাগজ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু চৌকিদারের উক্তিতে প্রমাণ যে, হত্যার পর মৃতের হস্ত হইতে ঐ কাগজ অপহৃত হইয়াছে। পত্রে এমন দুষ্য কি আছে, যাহা লোপ করিবার জন্য কিশোর ধরা পড়িবার ভয় তুচ্ছ করিয়া, দ্বিতীয় বার ঘটনা স্থানে আসিবে? কিশোর ভট্টাচার্য্যের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার মত প্রমাণ—আমি কিছুই দেখিতেছি না।

আদালত অর্দ্ধঘণ্টার জন্য অবসর গ্রহণ করিল।

কিশোর মুক্ত হইয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল। পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া শ্যামাচরণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন—"কিশোর! যাঁর অপার করুণায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরিশির লঙ্ঘন করে, আজ তাঁর কৃপায় রক্ষা পাইলাম। সে মহাচক্রীর চক্র কে বুঝিবে! বিধাতার দুর্ব্বোধ, দুর্ভেদ্য, জটিল রহস্য কে ভেদ করিবে! হায়! অন্ধ অজ্ঞ মানব! নিতান্ত নির্ভরশীলতাই তোমার জীবনযাত্রার একমাত্র ভরসা। তোমার মুক্তির উপায়কে আমি মৃত্যুবাণ ভাবিয়াছিলাম। গোপনের চেষ্টা না করি, প্রকাশ না হোক—ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। হায়, অন্ধমানব! গ্রেপ্তারের সময় প্রমাণের জন্য পুলিস পাতি পাতি করিয়া সমস্ত গৃহ অন্বেষণ করিয়াছিল, ভগবান্! তুমি তাদের সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মোহে আচ্ছন্ন করেছিলে, এ ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড কেহ দেখিতে পায় নাই। হায়! অন্ধ আমি, তবু তোমায় বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি!"

মুকুন্দরাম চাকী ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল—"ওর নাম কি—ভাগ্যিস্—আপনি তো চেপেই ছিলেন—ভাগ্যিস্ আমি উকীলকে দিয়ে কথাটা ওঠালুম!"

সদাশয় শ্যামাচরণ মুকুন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি শত্রুতা ক'রে পরম বন্ধুর কার্য্য করেছ। তাঁর ইচ্ছা হইলে পরম শত্রুও মিত্রের কায করে।"

সপ্রতিভ মুকুন্দ বলিল—"ওর নাম কি—ভাগ্যিস্!"

কিশোর বলিল—"ভাগ্যিস্, আমি কাগজের টুকরোখানা পুড়িয়ে ফেলিনি। আমি বাড়ী এসে আলোর কাছে পড়ে দেখলুম কিন্তু তখন আমার মনে হয়নি—দুখণ্ড বিভক্ত হ'য়ে এমন দুষ্য মানে হয়েছে। আমি সমস্ত পড়িও নি। আমি যে চিঠি লিখেছিলুম, তাতে তো কোন দুষ্যভাব ছিল না।"

কিশোরকুমার মুক্তি পাইল। কিন্তু সকলের মুখে এক প্রশ্ন—"হরিদাস মান্নাকে তবে হত্যা করিল কে?"

সাধারণের কৌতুহলচরিতার্থের অধিক বিলম্ব হইল না। হাকিম বিচারাসনে পুনরধিষ্ঠান করিতে না করিতে কাশী হইতে একজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া, হাকিমের আসনের সমক্ষে একখানি ছোরা ও কয়েক খণ্ড কাগজ দাখিল করিয়া, কহিল—"হরিদাস মান্নার খুনের কবুল ও ছোরা।" হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—"আসামী?"

পুলিস কর্ম্মচারী উত্তর করিল—আসামী মৃত। কাশীতে ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সেখানকার একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডাকাইয়া ছোরা ও এই কবুলপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই পুলিস ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে তাহার মৃত্যু হয়। কথা কহিতে কহিতে ঢলিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। বিষ খাইয়াছিল।

হাকিম পেশকারকে কবুল পত্র পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন। পেশকার পড়িল—

"যে আজীবন বিষ খাইয়াছে, পাপের তীব্র গরলে যে চির-অভ্যস্ত, তার সামান্য বিষে ভয় কি? শুনেছি—বিষ বিষের ঔষধ! আজ তার পরীক্ষা করিব। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে, এই যদি বিষের জ্বালা হয়, পাপের অন্তর্দ্দাহ এ হ'তে কত ভীষণ! ও কিসের কোলাহল? ঐ বুঝি বৈতরণীর দূরশ্রুত গর্জ্জন!

কাশী! পুণ্যক্ষেত্র কাশী! পাপীর তপ্ত অশ্রু মুছাইবার জন্য হেথা বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বর আপনি বিরাজিত। সর্ব্বসন্তাপহারিণী জগজ্জননী জাহ্নবী তাপিতকে কোলে নিবার জন্য মা আপনি কোল পেতে বসে আছেন। কিন্তু আমার মত পাপিষ্ঠার হেথায়ও শান্তি নাই। পাপীর শান্তি আছে, পাপের শান্তি নাই। আমি পাপ—মূর্ত্তিমতী! নরঘাতীর পালাইবার পথ—আত্মহত্যা। আজ আমি সেই মহাপথের পথিক। বলে—আত্মঘাতীর পরিত্রাণ নাই! ত্রাণ নাই? উঃ কি ভয়ঙ্কর! এই অমর আত্মা অনন্তকাল বিশ্বময় হাহাকার করে বেড়াবে, আর পতিতপাবনী জগজ্জননী তার কাতর ক্রন্দন

কাণে তুল্‌বেন না! শুনেছি—ধরণীর অন্ধকার গর্ভে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু কাঁদলে মায়ের পদ্মাসন বিচঞ্চল হয়, মাভৈ রব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে! কেবল আমারই ক্রন্দনে মা বধির হবেন? বিশ্বাস হয় না। যারা বলে, তাদের ক্ষুদ্র হৃদয় জগন্মাতার অপার করুণা ধারণা করতে অক্ষম! বিষ সহায, বিশ্বাস সম্বল, ভরসা কৃপা। এই তিন নিয়ে দুর্গা বলে পথে যাত্রা কর্‌বো। কিন্তু যাবার আগে সংসারকে একটা কথা বলে যেতে হবে। আমার মত পাপীয়সীর কথা যাঁরা বিশ্বাস কর্‌তে কুণ্ঠিত হবেন, তাঁদের একটা কথা বলি। মরণের খেয়াঘাটে এসে মিথ্যার বোঝা চাপিয়ে নৌকাডুবি ক'রে আর আমার লাভ নাই। আমার কাহিনী সত্য, বর্ণে বর্ণে সত্য। যেমন আমি সত্য আর আমার পাপরাশি জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য!

দুর্ব্বৃত্ত হরিদাস মান্নার হত্যাপরাধে যিনি ধৃত হইয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। হরিদাস মান্নাকে খুন করিযাছি আমি। যে ছোরা প্রেরণ করিতেছি, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমার জন্য নির্দ্দোষীর পীড়ন হইতেছে—ইহাই আমার মরমে পরম দুঃখ। নহিলে পাপিষ্ঠ হরিদাসকে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্য অনুমাত্রও অনুতপ্ত নহি। নরাধমের যদি সহস্র জীবন থাকিত, আর আমি একে একে সকলগুলি বধ করিতে পারিতাম, তাহাতেও আমার তৃপ্তি হইত না। সে হত্যাকাণ্ড কল্পনায় পুনরভিনয় করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিতেছি—তাহা বুঝিবে কে?

আমি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হই, অভিভাবক কেহ ছিল না; দুরাত্মা হরিদাসের পাপ-প্রলোভনে অতি সহজেই ভুলিলাম। তখন বুঝিতে পারি নাই, আমার অর্থগ্রাসের জন্য আমার সর্ব্বনাশে সে ব্রতী হইয়াছিল। ক্রমে সয়তান আমার সমস্ত সম্পত্তি আয়ত্ত করিয়া, আমায় পরিত্যাগ করিল। তখন মহাপাপের ফলে আমার একটী কন্যা জন্মিয়াছে। আমার সম্পত্তি, কিন্তু দুরাত্মার কৌশলে মাসিক বৃত্তিমাত্র ভোগী হইয়া রহিলাম। তাহাতেও আমার দুঃখ ছিল না। আমার কন্যার সাঙ্ঘাতিক পীড়া জন্মে, তাহার চিকিৎসার জন্য অর্থ চাহিলাম। দুরাত্মা উত্তর দিল যে, পাপের ফল পৃথিবী হইতে যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গল। আমার ধর্ম্মপিতা কিশোর কুমারের কৃপায় আমার কন্যা অচিকিৎসায় মরে নাই। আমায় গ্রামস্থ সকলে ঘৃণা করিত, কেবল এই নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণসন্তান আমার হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অতি ক্ষুদ্র হইতে কখন কখন মহৎ কার্য্য সাধিত হয়। কোন সময়ে আমি কিশোর কুমারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। আত্মগরিমার জন্য সে ঘটনা বিবৃত করিতে চাহি না। যে

কারণে কিশোরকুমারের সহিত আমার ধর্ম্মসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই বলিতে চাই। ধর্ম্মপিতা আমায় কাশী যাইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অর্থ কই? স্থির হইল, আমার বিষয় সম্পত্তি যাহা দুর্ব্বৃত্ত হরিদাস মান্না কৌশলে করায়ত্ত করিয়াছে, আমি তাহা জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্তকে লেখাপড়া করিয়া দিব। যে অর্থ পাইব, তাহা লইয়া কাশীবাসী হইব। ৬ই পৌষ পুর্ণিমার রাত্রে হরিদাস দত্ত স্বয়ং কাশী যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে আমিও যাত্রা করিব—স্থির রহিল।

হরিদাস দত্তকে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; দুরাত্মা মান্নাকে আমি উত্তমরূপে চিনিতাম—তাহার করায়ত্ব বিষয় যিনি কিনিবেন, তিনি মহা-বিপদাপন্ন হইবেন—আমি জানিতাম। কিন্তু কিশোর কুমার আমায় সাহস দিলেন যে, মান্না কখনই জমিদার হরিদাস দত্তের সহিত বিবাদ করিতে সাহস করিবে না। ঐ সম্পত্তির মধ্যে দুই একটী মান্নার নামে বেনামী বিষয়, তাহার রেজিষ্ট্রি করিয়া দিবার আবশ্যকতা ছিল। কিশোর কুমার বলিলেন, মান্না তাহাতেও সম্মত হইয়াছে। আমার অর্থের তখন নিতান্ত প্রয়োজন, হরিদাস দত্ত আমায় কিছু অগ্রিম দিলেন। স্থির হইল—বাকী টাকা কাশীতে লইব আর পূর্ণিমার রাত্রে হরিদাস দত্তের বাগান বাটীতে যাইয়া লেখা পড়া সই করিয়া দিয়া, ঐখান হইতেই তাঁহার সঙ্গে কাশী যাত্রা করিব। মান্না রেজিষ্ট্রী করিলে আমায় হরিদাস দত্ত সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে কাশী যাইবার পূর্ব্বে আমার কিছু টাকার দরকার হয়। সে কথা আমি কিশোর কুমারকে বলি। তিনি বলিলেন—"হরিদাস টাকাকড়ির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে, কিন্তু আমি বিশেষ অনুরোধ করিব, যেমন করিয়া হয় দিতে হইবে।" আমার দ্রব্য সামগ্রী বেশী ছিল না; যাহা ছিল তাহা গুছাইয়া, রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় কিশোর আসিয়া আমায় বলিয়া গেলেন—টাকার জন্য হরিদাস দত্তকে পত্র লেখা হইয়াছে, সম্ভবতঃ লেখাপড়া সই করার পর আমি পাইব। কিশোর চলিয়া গেলেন। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, বিখ্যাত ভূতের মাঠের সন্নিকটে যে ভাঙ্গা বাড়ী আছে, উহাই আমার শ্বশুরালয়, ঐ বাড়ীতেই আমি থাকিতাম। বিশাল বাড়ী, আমার কাছে একজন ঝি থাকিত। আমি সেই দিন তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। সন্ধ্যার কিছু পরেই আমি বাটীর বাহির হইলাম। বিখ্যাত ভূতের মাঠে আসিয়াছি, এমন সময় দুরাত্মা মান্না আসিয়া গতিরোধ করিল। ছোরা হাতে—তার তখনকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই ভয় হয়! আমারও হইল। মান্না তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল—"তোর ধর্ম্মবাবা মুরুব্বি—আমার

লুকিয়ে কায হচ্চে ! ধর্ম্মে সবে কেন ? তোর ধর্ম্মবাবা, হরি দত্তকে আজ যে চিঠি লিখিয়াছিল, দৈবাৎ তা আমার হাতে পড়েছে।"

বিধাতা, যাহাকে বল দিতে কৃপণতা করিয়াছেন, মুক্ত হস্তে তাহাকে ছল দিয়াছেন—স্ত্রীলোকের ছলই বল। আমি ছলে কৌশলে দুর্ব্বৃত্তকে শান্ত করিয়া ছোরাখানি হস্তগত করিলাম। মান্না বলিতে লাগিল—"তোর ধর্ম্মবাবা লিখেছে—হরিদাস মান্নার রেজিষ্ট্রি না হয় না হবে ! তোকেও খুন কোর্ব্বো—তাকেও।" আমি বল্লুম —"বাবা ও রকম চিঠি লেখেনি।" আমার মৎলব ছিল—চিঠিখানা দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। পাপিষ্ঠ চিঠিখানা বাহির করিয়া আমায় দেখাইল কিন্তু মুটো করে ধরে রইল। আমায় বলিল—"ঘরে চ।" আমি তখন যাত্রা করে বেরিয়েছি ; স্বীকার হইলাম না। কথায় কথায় আমার ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। আমি দুর্ব্বৃত্তের বুকে তাহারই সেই ছোরা আঘাত করিলাম ; একই আঘাতে দুরাত্মার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু তখন আমি নরকের পিশাচী হইতেও ভয়ঙ্করা—উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলাম ও যে মুখে আমায় প্রলোভিত করিয়াছিল, সেই মুখ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, শৃগাল কুক্কুরকে খাওয়াইব—সঙ্কল্প করিলাম। আমায় বাধা দিবার কেহ ছিল না। থাকিলেও মানিতাম না। ভূতের মাঠে সন্ধ্যার পর লোক চলাচল হয় না। আমি অবাধে সঙ্কল্প পূর্ণ করিলাম। পরে বাড়ী গিয়া রক্তাক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম ও ছোরা ধুইয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইলাম। তখন আমার মনে হইল—এ ছোরা আমার পরম বন্ধু—সময়ে কাযে লাগিবে—ইহাকে পরিত্যাগ করিব না। পরে হরিদাস দত্তের বাগান অভিমুখে চলিলাম। অনেক দূর যাইয়া আমার মনে হইল, আমার ধর্ম্মপিতার হস্তলিখিত পত্র দুরাত্মার কাছে আছে। পাছে নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণসন্তান কোন বিপদে পড়ে, সেই জন্য পত্রখানি সংগ্রহ করিয়া লইতে আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মাঠের নিকটে আসিয়া দেখি, চৌকীদার আলোদ্বারা লাস পরীক্ষা করিতেছে। আমার ভয় হইল ; মনে হইল, বুঝি কিশোর কুমারের পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলাম না ! কিন্তু সে দিন আমার অদৃষ্টের বড় জোর—কিছুক্ষণ দেখিয়া চৌকীদার চলিয়া গেল। আমি সেই অবসরে শবের নিকট যাইয়া দেখিলাম, দুর্ব্বৃত্তের মুষ্টিবদ্ধ হস্তে পত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। ভয়—পাছে চৌকীদার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে। তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে পত্রখানি টানিয়া লইলাম ; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই—কাগজের কতকাংশমাত্র ছিঁড়িয়া আসিয়াছে। বোধ করি, রক্তে ভিজে ছিল—সেইজন্য। আমি খানিক দূর আসিয়া তাহা লক্ষ্য

করিলাম কিন্তু তখন আর আমার ফিরিয়া যাইবার সাহস নাই। আমি দ্রুতপদে পুনরায় বাগান অভিমুখে চলিলাম। বাগানের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, আমার বিলম্ব হওয়াতে কিশোর কুমার উদ্বিগ্ন হইয়া আসিতেছেন। একটু নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, আমি হত্যার কথা তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম। বাবা, অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, আমায় বলিলেন—"যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে ; তুমি কাশী যাইয়া অবশিষ্ট জীবন পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। একবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ, আমি সাধ্যমত তোমায় রক্ষা করিব।" ইহার অব্যবহিত পরেই কাশী যাত্রা করা হয়। যাত্রাকালে মৃতের হস্ত হইতে যে পত্র আনিয়াছিলাম, গোপনে তাহা কিশোরকুমারকে দিয়া আসিলাম। কাশীতে হরিদাস দত্তের নিকট সংবাদ আসিয়াছে—আমার ধর্ম্মপিতা হরিদাস মান্নাকে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সংবাদ শ্রবণে আমার মনে কি হইল, কি হইতেছে, তাহা বুঝিবার নহে, বুঝাইবার নহে। আমার সঙ্কল্প স্থির হইল।

একা আসিয়াছি, একা যাইব। জীবনের সঙ্কীর্ণ কূলে দাঁড়াইয়া, আজ আমায় সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি মনে পড়িতেছে। ইহলোকের পরপারে আর কি তার দেখা পাইব?"

—অভাগিনী বিলাসমোহিনী।

পাঠ শেষ হইল। নিঃশব্দে কাহিনী শুনিয়া নীরবে সকলে চলিয়া গেল। বিলাসমোহিনীর ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাও ফুরাইল।

সংবাদ।

গত ২৯শে পৌষ বুধবার, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে মহুলা "রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমে" পূজা, হোম, আরতি, ভোগ ও ভজন পাঠাদি হয় এবং তৎপর রবিবার জন্মোৎসব উপলক্ষে আশ্রমস্থ অনাথগণ ও স্কুলের ছাত্রগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের দিন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৺ভাষ্যম আয়াঙ্গারের মার্কেটে বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ "দরিদ্র নারায়ণের" সেবা করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ মঠের নিকটবর্ত্তী একটী বাটীতে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৫॥০টার সময় একটী সুন্দর বক্তৃতা হয়। তাহাতে অনেক শ্রোতা সমাগত হইয়াছিলেন। তৎপরে আরাত্রিক হইয়া সেদিনকার কার্য্য সমাধা হয়।

গত ২০শে জানুয়ারী বুধবার, প্রাতে ৮টার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্ত্তৃক বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন মঠবাটীর গৃহপ্রবেশানুষ্ঠান করা হয়। তথায় সেদিন নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী কার্য্যাদি হয়—

১। মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভি, পি, মাধব রাও কর্ত্তৃক অভিনন্দন-বক্তৃতা।

২। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উত্তর।

৩। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা।

৪। ভগিনী দেবমাতার বক্তৃতা।

৫। গৃহ প্রবেশ কার্য্য।

৬। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন।

৭। পূজা ও হোম।

৮। বেদপাঠ, প্রার্থনা ও মাঙ্গলিক কার্য্য।

৯। আরাত্রিক।

১০। পুষ্প ও প্রসাদ বিতরণ।

কণখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ৯ শত গরীব দুঃখীদের প্রচুর পরিমাণে ঐ দিবস পায়সান্ন খাওয়ান হইয়াছিল।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণ কর্তৃক গত ৪ঠা মাঘ রবিবার দিবসে ঢাকার ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে পাঠ ও হরিসংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে প্রসাদ বিতরণ এবং গরীবদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবারে বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব হইবে। সকলের শুভাগমন প্রার্থনীয়।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, যে, কোন পরলোকগত আত্মার তৃপ্তার্থে শ্রী— নিম্নলিখিত ভাবে এককালীন দান করিযাছেন—

কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে	১০০৲
রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ মোচন ফণ্ডে	৫০৲

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তীর্থ সলিল—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত, একখানি কাব্যগ্রন্থ, সুন্দব কাগজ, সুন্দব ছাপা। পাঁচ ফুলে সাজি ভবিযা, স্বদেশী বিদেশী ফুল মিলাইয়া, গ্রন্থকাব বিচিত্র রঙের, দেশী ঢঙেব এক সৌরভপূর্ণ তোড়া বানাইয়াছেন। দূর দেশ হইতে সমাহৃত ফুলগুলি গবম দেশের গবমি হাওয়ায় এত নাডাচাড়িতেও যে নির্জীব হয় নাই—ইহা তাঁহাব সামান্য নিপুণতা নহে। বিশেষতঃ এ পদ্ম-গোলাপের দেশ—সে কোমল স্নিগ্ধ মধুব কান্তি ও সৌরভের পাশে বিজাতীয় ফুলের রঙ্ ঢঙ্ ও গন্ধ অনেক স্থলে কেমন কেমন তীব্র কটু ঠেকে। গ্রন্থকার যে তাহাদের এরূপ সুন্দব ভাবে মিলাইতে পারিবেন, তাহা আমরা আশা করি নাই। ইহা তাঁহার সুরুচিব পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ খানির নামটীও বেশ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। জগতের সুকবিকুল নশ্বর সংসারে অবিনশ্বর চিন্ময় রাজ্যের আভাস আনিয়া মানবকে পবিত্র পুণ্যময় করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা যে তীর্থস্থানীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নবীন গ্রন্থকার, কবির এই মহৎ জীবনোদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া, আমরা

আহ্লাদিত হইলাম। সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন, 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়'—আমরাও তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া বলি, ঐ উচ্চ লক্ষ্যে সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে, গ্রন্থকার কালে নিজে ধন্য হইয়া অপরকেও ধন্য করিবেন। তাঁহার রচনায় ভাষার সরলতা এবং ছন্দে তাল মান লয়ের বিশুদ্ধ ঝঙ্কার বেশ বহিয়াছে। গ্রন্থখানির অধিকাংশ স্থলেই তদ্বিষয়ের নিদর্শন পাইয়াছি। ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীতটী বোধ হয় অনুবাদের অনুবাদ—কিন্তু তাহার ভিতরেও বীররসের বেশ ঝঙ্কার অনুভূত হয়। পরিশেষে, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের Kali The Mother শীর্ষক ক্ষুদ্র ইংরাজী কবিতাটীর গ্রন্থকার যে সুন্দর ভাবগ্রাহী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই এখানে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার করি—

মৃত্যুরূপা মাতা।

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার,
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি'
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা,
নভস্তল পরশিতে চায়!
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর!—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে;
করালী! করাল তোর নাম,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ
কালী তুই প্রলয়রূপিণী,
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—

মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ!
বহির্গত বন্দী-শালা হ'তে,
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে;
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—
মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

"নমো বিবেকানন্দায়।"

গুরু-পূজা।

(পৌষ কৃষ্ণা-সপ্তমী—১৩১৫)

জলদ-গম্ভীর স্বরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
করে পুনঃ সে বাণী আঘাত।
শুন নর সেই কথা, এ রহস্য ধর্ম্ম-গাথা,
গুরুপদে কর প্রণিপাত॥

"কর দীন-জন-সেবা, অন্য ধর্ম্ম আছে কি বা,
মূলমন্ত্র হ'ক জীবনের।
আমরণ এই ধর্ম্ম, নাহি আর কর্ম্মাকর্ম্ম,
শ্রেষ্ঠ কার্য্য সেবা সকলের॥

দামিনী-চল জীবন, অনিত্য সম্পদ ধন,
ঢাল ভাই, নরের সেবায়।
দীন দুঃখী নর নারী, নানা বেশে আসে হরি,
সেবা করি তুষ্ট কর তাঁয়॥

না বুঝে রহস্য গূঢ়, কি কাজ করহ মূঢ়,
ভক্তি মুক্তি গাছের কি ফল?
কাম-কাঞ্চনেরে লবে, সেবা-ধর্ম্ম না করিবে,
কেমনে লভিবে তাঁহে বল॥

নরে যদি বাস ভাল, সকলি সাধিত হল,
যথা তথা দেবতা সন্ধানে।
রোগে শোকে বলহীন, ক্ষুধায় পীড়িত দীন,
কর পূজা দীন-নারায়ণে॥

ভাগীরথী-তীরে বসি, কূপ খোঁড়ে দিবানিশি,
কেন স্নিগ্ধ নও বারিপানে?
শোকার্ত্তে সান্ত্বনা কর, রোগীরে ঔষধ ধর,
ক্ষুধা তৃপ্ত কর অন্নদানে॥

মূর্খ বলি বল যাঁরে, সেও শিবরূপ ধরে,
বিদ্যা তাঁরে দাও প্রাণপণে।
শ্রীগুরুর বাক্য লও, মহোৎসাহে লেগে যাও,
মহাশক্তি আসিবে সাধনে॥

অনাথ পীড়িত দীনে, এইরূপে শিবজ্ঞানে,
পূজা সেবা করে শ্রদ্ধা ভরে।
সেই সে পরম ভক্ত, সুবৈষ্ণব শৈব শাক্ত,
জগদম্বা প্রসন্না তাহারে॥

মন্দিরে মূরতি হেরে, ভক্তি ভরে পূজা করে,
শিব বটে সুপ্রসন্ন হয়।
আর্ত্ত জীবে শিব হেরে, সেবা-ধর্ম্ম যে আচরে,
তারে কিন্তু তুষ্ট অতিশয়॥

লই জন্ম শতবার, ভুঞ্জি দুঃখ অনিবার,
কিবা ক্ষতি জানিলে এ পূজা।
শিবধ্যান শিবজ্ঞান, শিবকার্য্যে রত প্রাণ,
শিব যদি হৃদয়ের রাজা॥

মুক্তি ভক্তি কিবা বল, সেবা-বৃক্ষে দুটি ফল,
সেবা সিদ্ধে লভে তায় তায়।
জীবে শিবে এক জ্ঞান, সেবা-ধর্ম্মে দাও ধ্যান,
ধন্য হবে জনম তোমার॥"

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]   [শ্রীগুরুদাস বর্ম্মণ্।

একদিন রামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্র মাষ্টারকে বলিলেন, "দেখ বিদ্যাসাগরের কাছে আমায় এক দিন নিয়ে যাবে? বিদ্যেসাগরকে দেখতে বড় সাধ হয়েছে।" প্রায় বাল্যকাল হইতেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম ও সুখ্যাতি শুনিয়াছেন। বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার—তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই। যেখানে গুণের বিকাশ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেইখানেই আকৃষ্ট। তিনি বলিতেন, "যাকে দশে মানে গণে, তাতে শক্তির অধিক বিকাশ, সেইখানেই ঈশ্বরের অধিক কৃপা—জানবি। সেজন্য গুণীর গুণের সমাদর কর্‌তে হয়, মানীকে মান দিতে হয়।" তাই গুণী লোকের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মহেন্দ্র—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, তাই তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের কাছে লইয়া যাইতে কহিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই এক দিন বৈকালে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে করিয়া, রামকৃষ্ণদেব ভবনাথ, মহেন্দ্র ও হাজরাকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণেশ্বর হইতে বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। পথে এক স্থলে গরুর গাড়ীর ভিড় হওয়ায়, অল্পক্ষণের জন্য খান কযেক আরও ভাড়াটীয়া গাড়ী সেই স্থলে দাঁড়াইয়া গেলে রামকৃষ্ণদেব দেখিলেন, একজন লোক, একখানি গাড়ীতে বসিয়া, আপনার মোজা পরা পাখানি নাড়িয়া চাড়িয়া নিরীক্ষণ করিয়া যেন বিমোহিত হইতেছে। মোজা পরিয়া পায়ের এমন শোভা হয়, তাহা যেন সে ইতিপূর্ব্বে কখন অনুভব করে নাই। ভবনাথও তাহা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "মশাই, এ লোকটা বোধ হয় জন্মে কখনও মোজা পরেনি!" রামকৃষ্ণদেব ঊর্দ্ধদৃষ্টে মা কালীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আহা মা! এর ভোগ হয় নি মা, এ ভোগ করে নিগ, মা একে ভোগ করতে দে।"

বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়া ঠাকুর আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "মা! বিদ্যেসাগরকে দেখতে যাচ্ছি মা, আমার কিন্তু বিদ্যা নেই মা, লেখা পড়া কিছুই জানিনা মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। এমন সময়ে গাড়ী ৺রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীর নিকট আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "মশাই, এই রামমোহন রায়ের

বাড়ী।" রামকৃষ্ণদেব একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "উঃ! এখন ও সব কথা ভাল লাগ্‌ছে না।" মহেন্দ্র দেখিল, রামকৃষ্ণদেব তখনও সমাধির ঘোরে রহিয়াছেন। ক্রমে গাড়ী বিদ্যাসাগরের বাড়ী আসিলে, ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাত ধরিয়া নামাইলেন। ঠাকুরের পরিধেয়—একখানি সরু লালপেড়ে ধুতি এবং একটী সাদা জামা, কোঁচার খুঁটটী স্কন্ধে ফেলা। জামার বন্দ খোলা ছিল। বাটীর চতুর্দ্দিকে বাগান, বাগানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ঠাকুর, জামার বন্দ খোলা দেখিয়া, মাষ্টারকে কহিলেন, "হ্যাগা, এগুলো খোলা রয়েছে, তাতে কিছু দোষ হবে কি?" মাষ্টার কহিল, "না মশাই, আপনার ওতে দোষ হবে না।" সকলে তখন প্রাঙ্গন পার হইয়া দ্বিতলে উঠিয়া যে প্রকোষ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বিদ্যাসাগর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করজোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবকে 'আস্‌তে আজ্ঞা হয়' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণদেব, একদৃষ্টে, তাঁহার প্রতি তাকাইয়া, বলিতে লাগিলেন, "এত দিন খাল বিলে ছিলুম, আজ সাগরে এসে মিল্‌লুম।"

বিদ্যাসাগর হাঁসিয়া বলিলেন, "আগে মিষ্টি জলে ছিলেন, এখন লোনা জলে এলেন, তা খানিক লোনা জল নিয়ে যান।"

রামকৃষ্ণদেব হাঁসিয়া কহিলেন, "তা কেন গো, অবিদ্যার সাগর লোনা হয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর—তোমাতে কেন লোনা জল হবেক্? আমি ক্ষীর সুমুদ্রে এসিছি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিনীতভাবে—"আপনি যখন বল্‌ছেন, তা হবে"—এই বলিয়া হুকা লইয়া ধূম পান করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তামুক খাব, তামুক খাব"; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন হুঁকাটী দিতে অগ্রসর হইলে কহিলেন, "না কারুর হুঁকায় খাই নি, তুমি কোলকেটা দেও।"

বিদ্যাসাগর কহিলেন, "যদি কারুর হুঁকোয় খান না ত কোলকেটাই বা কেন; আমি নূতন হুঁকো কোলকে আনিয়ে দিচ্ছি।" তখনি একজন একটী নূতন হুঁকায় তামাক আনিয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে ধরিল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তখন সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইযা হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। বার কয়েক টানিয়া আর টানিতে পারিলেন না; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, বলিলেন, "একটু জল খাব।" বিদ্যাসাগর মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বর্দ্ধমান থেকে মেঠাই এসেছে আনাব, ইনি খাবেন কি?"

মাষ্টার কহিল, "আজ্ঞে বেশ ত আনান্।" বিদ্যাসাগর তাঁহার একটী দৌহিত্রকে

জলযোগের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বালকের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, একটী রেকাবিতে চারিটী মিঠাই ও এক গেলাস জল আনিয়া মেজের উপর রাখিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সঙ্গীদের দেখাইয়া কহিলেন, "এদের দেও।" বিদ্যাসাগর কহিলেন, "আপনি আগে গ্রহণ করুন পরে এঁদেরও দেব।" রামকৃষ্ণদেব এক কণা মুখে দিয়া জল পান করিলেন; পরে মিঠাইগুলি সকলকে দেওয়া হইল।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ, সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হযেছে—বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তন্ত্র শিবের মুখ থেকে বেরিয়েছে—কাজেই এঁটো হয়েছে; কিন্তু সচ্চিদানন্দকে কেউ মুখ দিয়ে বের কত্তে পারেনি, কাজেহ তিনি উচ্ছিষ্ট হন নি।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কহিলেন, "এ রকম সামান্য কথায় এমন গভীর ভাবের কথা কোথাও শুনিনি ত, অনেক শাস্ত্র পড়্‌লুম কিন্তু এমন ভাবের কথা কৈ পাইনি!" পরে মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি কি এঁরই কথা বলেছিলে?"

মাষ্টার কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তখন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট রামকৃষ্ণদেবের কোথায় নিবাস ছিল, কোথায় এখন থাকেন, এই সমস্ত তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "কামারপুকুর যে আমাদের গ্রাম বীরসিংহের মাত্র তিন চার ক্রোশ তফাতে।"

রামকৃষ্ণদেব তখন গান ধরিলেন,—

"কে জানে কালী কেমন?
ষড়্‌ দর্শনে না পায দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন;
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধর্‌ব শশী হয়ে বামন॥"

গাহিয়া একটু ভাবস্থ হইলেন, পরে ভাব সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "'তাঁর উদরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড', আর তাঁর 'ষড়্‌ দর্শনে না পায় দরশন'—বিশ্বাস কর্‌তে

হয়। বিশ্বাসের এমনি জোর যে, একজন সমুদ্দুর পার হবে, বিভীষণ তার কাপড়ের খুঁটে একটা জিনিষ বেঁধে দিয়ে বল্লেন, 'তুমি এটা খুলে দেখ না; ইহার জোরে তুমি পার হয়ে যাবে।' সে বেশ খানিকটা এসে একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাব্‌লে, 'বিভীষণ কি বেঁধে দিলে যে, তার গুণে জলের উপর দিয়ে এমন হেঁটে চলেছি? দেখি।' খুলে দেখে—একটী পাতায় কেবল 'রাম'—এই কথাটা লেখা! 'ও মা! এই জিনিষ'—যেমন এই ভাবা, অমনি ডুবে যাওয়া!" এই বলিযা আবার গাহিলেন, "দুর্গা দুর্গা বলে" ইত্যাদি, তাহার পরে "মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে" ইত্যাদি। গান শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় একেবারে দ্রবিভূত হইল।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "যিনি ব্রহ্ম তিনিই ব্রহ্মশক্তি, যিনিই সগুণ তিনিই নির্গুণ, আর তাঁকেই মা কালী বোলে ডাকি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন নির্গুণ, আর যখন তাঁর লীলা দেখি তখন তাঁকে সগুণ ভাবি। পূজা হোম যাগ, সবই তাঁর প্রতি ভালবাসা আন্‌বার জন্য। যখন সেই ভালবাসা আসে, তখন ওসব কর্ম্ম কমে যায়। যতক্ষণ না বাতাস বয় ততক্ষণ পাখা নাড়্‌তে হয়, আর হাওয়া বইলে কে পাখার বাতাস খায়? গেরস্তের বৌ অন্তঃসত্তা হলে গিন্নি তার কাজ ক্রমে কমিয়ে কমিয়ে দেয়। তার পর ছেলে হলে, শ্বাশুড়ী তাকে আর কোন কাজ কর্‌তে দেয় না। তখন সে সেই ছেলেটীকে নিয়েই নাড়া চাড়া করে। তুমি যে সব কাজ কর্‌ছ, সবই সৎকর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হয়। জগতের কল্যাণ তিনি ছাড়া মানুষে কর্‌তে পারে না, এইটি জেনে কামনা ত্যাগ কোরে সৎকর্ম্ম কর্‌লে তাঁর কৃপা হয়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কথাবার্ত্তায় চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে এক ব্যক্তিকে কহিতে লাগিলেন, "কি চমৎকার কথা।" সে ব্যক্তি কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অতি চমৎকার।" রামকৃষ্ণদেব, লোকটীর ভাব গতিক দেখিয়া, একটী গল্প বলিলেন, "ও দেশে (কামারপুকুরের নিকট) ব্যাঙ্গাই গ্রামে এক জমিদারের একজন লোক ছিল। জমিদারের মন যোগান তার কাজ। একদিন আম্‌ড়ার অম্বল চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না হয়েছে। জমিদার আম্‌ড়ার অম্বল খেতে খেতে বল্লে, 'আম্‌ড়ার অম্বল কেমন হে?' লোকটী বললে, 'মশাই তা আর কি বল্‌ব, মশাই অতি পরিপাটী, আমড়ার অম্বলের মত কি আর অম্বল হয়?' আমড়া, জান ত, শস্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, খালি আঁটি আর চামড়া; আবার খেলে হয়—অম্ল শূল!" কথা শুনিয়া সকলে মহা হাস্য করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব গাত্রোত্থান করিলেন তাঁহার সঙ্গে আর আর সকলেই উঠিলেন।

রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ আপুনি সব জান, কত শাস্ত্র পড়েছ ; এ সব যা বললুম—সব বাহুল্য। তবে এক কথা—বরুণের ভাণ্ডারে কত রত্ন আছে তা তার খবর নেই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁসিয়া বলিলেন, "আপনি যা বলেন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁ গো, বড় মানুষরা সব চাকরদের নাম জানে না, মনে রাখতে পারে না, বাড়ীর মধ্যে কোথায় কোন জিনিষটা আছে তাও জানে না।" একটা উচ্চ হাস্য পড়িয়া গেল। পরে রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরকে কহিলেন, "আপুনি একবার রাসমনির বাগান দেখ্‌তে যাবে, খুব চমৎকার জায়গা।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাগ্রহে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব বই কি ; আপনি এলেন আর আমি যাব না ? অবিশ্যি যাব।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আপুনি যেতে পারবেক্ নি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, "সে কি মশাই, কেন যেতে পারব না, আমায় বুঝিয়ে দিন ?"

রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে কহিলেন, "আমরা জেলে ডিঙ্গি—খাল বিলে যাই, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। আপনি জাহাজ—কেমন করে ছোট নদীতে যাবে, যদি চড়ায় আটকে যাও ?" একটা মহা হাঁসি পড়িবা গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। হয় ত মনে করিলেন বলিয়া রাখা ঠিক নহে, কারণ নানা কার্য্যে যদি নাই পারেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, পরে রামকৃষ্ণদেবের কথাই ঠিক হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইচ্ছা করিয়াও আর তাঁহার নিকট যাইতে পারেন নাই। এই ঘটনার অল্প দিন পর হইতেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই অবধি বারম্বার রোগগ্রস্থ হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন।

যাহা হউক রামকৃষ্ণদেব সে যাত্রা বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আলোক হস্তে অগ্রসর হইয়া গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, গাড়ীর নিকট একজন উষ্ণীষধারী লোক দণ্ডায়মান। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বলরাম, এত রাত্রে এখানে ?"

বলরাম কহিলেন—"আজ্ঞে, আপনাকে দর্শন করতে।" বলরাম ভাবিয়াছিলেন, ঠিক সময়ে আসিয়া সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিবেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন, রামকৃষ্ণদেব অনেক পূর্ব্বে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণকথামৃত শ্রবণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, শেষে তাঁহার দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

বলরাম, "আজ্ঞে অল্পক্ষণ।"

রামকৃষ্ণদেব, "ভেতরে গেলে না কেন?"

বলরাম সহাস্য মুখে কহিলেন, "আজ্ঞে সকলে আপনার কথা শুন্‌ছেন; ভাবলুম, আর মাঝ খানে আমি গিয়ে বিরক্ত কর্‌ব না।"

মাষ্টার পদব্রজে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; রামকৃষ্ণদেব, বলরামকে বাগবাজারে নামাইয়া দিয়া, দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

বেলুড় মঠে।

স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী আজ ৫।৭ দিন যাবৎ কবিরাজি ঔষধ খাইতেছেন। এ ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। সুধু দুধ খেয়ে থাক্‌তে হচ্ছে।

শিষ্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। স্বামিজী যে ঐরূপ ঔষধ খাইতেছেন, তাহা শিষ্য জানে না। আসিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে। মাছ দেখে স্বামী প্রেমানন্দ শিষ্যকে বল্‌লেন, "আজ ও মাছ আনতে হয়? একে আজ রবিবার; তার উপর স্বামিজী অসুস্থ—সুধু দুধ খেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।" শিষ্য, অপ্রস্তুত হইয়া নীচে মাছ ফেলে, স্বামিজীর পাদপদ্ম দর্শন মানসে উপরে গেল। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়া সস্নেহে বল্‌লেন—"এসেছিস্? তা ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাব্‌ছিলুম্।"

শিষ্য—শুন্‌লুম্—সুধু দুধ খেয়ে নাকি আজ ৫।৭ দিন আছেন?

স্বামিজী—হাঁ নিরঞ্জনের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কবিরাজী ঔষধ খেতে হল। ওদের কথা ত এড়াতে পারিনে।

শিষ্য—আপনি ত ঘণ্টায় পাঁচ বার জল খেতেন। কি করে একেবারে ছেড়ে দিলেন ?

স্বামিজী—যখন শুনলুম—এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সংকল্প কর্‌লুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।

শিষ্য—এ ওষুধে কিছু উপকার হচ্ছে কি ?

স্বামিজী—'উপকার', 'অপকার' জানি না। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি।

শিষ্য—আমাদের দেশের কবিরাজী ওষুধ, বোধ হয়, আমাদের সমধিক উপযোগী।

স্বামিজী—আমার মত কি জানিস্। একজন Scientific—(বর্ত্তমান-চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিশারদ) চিকিৎসকের হাতে পড়ে মরাও ভাল ; Layman (হাতুড়ে), যারা বর্ত্তমান Science এর কিছুই জানে না, সেকেলে পাঁজি পুথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল্ ছুঁড়্‌ছে, তারা যদি দুচারটা সারিয়েও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্য লাভ আশা করা কিছু নয়।

এই কথা হচ্ছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামিজীর কাছে এসে বল্‌লেন যে, শিষ্য একটা বড় মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য এনেছে। কিন্তু আজ রবিবার, কি করা হবে। স্বামিজী শুনেই বল্‌লেন, "চল্, কেমন মাছ, দেখ্‌বো।"

এই বলিয়া একটা গরম জামা পরিলেন ও দীর্ঘ একগাছা যষ্টি হাতে লইয়া, ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখে স্বামিজীর কত আনন্দ! বল্‌লেন—"আজই ঠাকুরকে উত্তম করে মাছ রেঁধে ভোগ দে।" স্বামী প্রেমানন্দ বল্‌লেন, "রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে ৺কালীমাতার প্রসাদী মাছ, মাংসও রবিবারে খাইতেন না সেজন্য মঠে রবিবারে ঠাকুরকে মাছ ভোগ দেওয়া হয় না। স্বামিজী বল্‌লেন—"ভক্তের আনীত দ্রব্যে শনিবার, রবিবার নাই। যা, ভোগ দিগে।" স্বামী প্রেমানন্দ, আর ওজর আপত্তি না করিয়া, স্বামিজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। সেদিন রবিবার সত্ত্বেও ঠাকুরকে মৎস্য ভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে অগ্রভাগ ঠাকুরের ভোগের জন্য রাখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "কতকটা মাছ আমায় দেতো—আমি ইংরেজী ধরণে নিজেই রাঁধিব।" স্বামী নির্ভয়ানন্দকে স্বামিজী উনুন ধরাইতে আজ্ঞা দিলেন। মঠের স্বামি মহারাজগণ সকলেই, স্বামিজীকে আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া, রাঁধিবার সংকল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামিজী বলিলেন তাঁর কোন

কষ্ট হবে না। প্রায় ১॥০ ঘণ্টার মধ্যে স্বামিজী ৪।৫ রকমের মাছ রাঁধিলেন। দুধ দিয়ে, ভার্‌মিসেলি দিয়ে, দধি দিয়ে, আরও কি কি দিয়ে যে রাঁধিলেন, তাহা স্মরণ নাই। প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা হইলে স্বামিজী, ঐ সকল মাছের তরকারী আনিয়া, শিষ্যকে বলিলেন, "তোরা বাঙ্গালা দেশী লোক—মৎস্যপ্রিয়। দেখ্ দেখি, কেমন রান্না হয়েছে।" শিষ্যকে সামনে বসাইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বামিজী অগ্রে গ্রহণ না করেই শিষ্যকে দিতেছেন দেখে শিষ্য হাত তুলে বসে আছে। স্বামিজী এইবার তাই দেখে শিষ্যকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে সকল রকমের একটু একটু মুখে ঠেকিয়ে শিষ্যকে প্রসাদ করিয়া দিলেন। শিষ্য আনন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিতে করিতে শিষ্য কি খাইতেছে, কি না খাইতেছে কিছুরই হুঁস্ নাই! স্বামিজী বল্লেন, "কেমন হয়েছে?" শিষ্য বলিল, "এমন কখনো খাইনি।" ঐ মাছের তরকারি তৎপরে সকলকেই কিছু কিছু দেওয়া হইল। ভার্‌মিসেলি—শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই। শিষ্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী বল্লেন, "ওগুলি বিলিতি কেঁচো। আমি লণ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি।" মঠের মহারাজগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

আহারান্তে স্বামিজী উপরে গেলেন। শিষ্যও স্বামিজীর সঙ্গে আছে। স্বামিজী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "মঠের লোকে তোকে আজ হিংসা কচ্ছে।" শিষ্য তখন বুঝিতে পারে নাই যে, শিষ্যের প্রতি অদ্য স্বামিজীর অপার দয়া দেখিয়া মঠের সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন,—স্বামিজী সেই কথা এই ভাবে বলিতেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি, স্বামিজীর জল খাওয়া নিষেধ। তাই তৃষ্ণা পেলে, চাঁই বরফের মধ্যে দুধের বোতল রাখিয়া, সেই ঠাণ্ডা দুধ স্বামিজীকে মধ্যে মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। স্বামী নির্ভয়ানন্দ তখন স্বামিজীর প্রধান সেবকরূপে নিযুক্ত।

এই ত কঠোর নিয়ম পালন—আহার ত নাইই—নিদ্রা দেবী ত স্বামিজীকে বহুকাল প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। এই অনাহার অনিদ্রায়ও স্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হ'ল মঠে নূতন Encyclopedia Britanica কেনা হইয়াছে। নূতন ঝক্ ঝকে বই গুলি দেখিয়া শিষ্য, স্বামিজীকে বল্লে, "এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।" শিষ্য জানেনা যে, স্বামিজী ঐ বই গুলির এক তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই পাঠ করিয়াছেন। এখন ১১ Volume খানি স্বামিজী পড়্‌ছেন।

স্বামিজী—কি বল্‌ছিস্? এই ১১ খানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা

কব্—সব বলে দিব।" শিষ্য জিজ্ঞাসা কর্লে—আপনি কি এইগুলির সব পড়েছেন? স্বামিজী—"না পড়্লে কি বল্‌ছি?"

স্বামিজীর আদেশ মত শিষ্য খুব বড় বড় বিষয় সব জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লো। আশ্চর্য্যের বিষয় যে—স্বামিজী ঐ বিষয়গুলির মর্ম্ম ত বল্‌লেনই—তার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শিষ্য ঐ ১১ Volumeএর প্রত্যেক বই খানি থেকেই দুই একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতি শক্তি দেখিয়া শিষ্য অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিল এবং বলিল—"ইহা মানুষের শক্তি নয়।"

স্বামিজী—দেখ, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক কব্‌তে পাব্‌লে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আমাদের সব ধ্বংশ হয়ে গেল।

শিষ্য—মশায়, কেবল ব্রহ্মচর্য্যেই এরূপ অমানুষিক শক্তির স্ফুরণ সম্ভবে না। আরও কিছু চাই। এ কথার উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।

ইহার পরে শিষ্যের সঙ্গে স্বামিজী বড় বড় দার্শনিক বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত-গুলি বলিতে লাগিলেন। যেন শিষ্যের অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্তগুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য নিজের শক্তি সঞ্চারিত করিয়াই ঐগুলি বুঝাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই কথাগুলি আজিও জীবন্তরূপে শিষ্য অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামিজীর ঘরে এসে, শিষ্যকে বল্‌লেন—"তুই ত বেশ। স্বামিজীর অসুস্থ শরীর—কোথায় গল্প সল্প করে তোকে স্বামিজীর মন প্রফুল্ল রাখ্‌তে বল্লুম, তা না—তুই কিনা বড় বড় কথা তুলে স্বামিজীকে বকাচ্চিস।" শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামিজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বল্লেন—"নে, রেখে দে, তোদের নিয়ম ফিয়ম্—এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় ত বয়ে গেল—তুই যা, নীচে যা।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ নীচে চলে গেলে শিষ্য, আর কোন প্রশ্নাদি না করিয়া বাঙ্গাল-দেশী কথা লইয়া, হাসি তামাসা করিতে লাগিল। স্বামিজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ রহস্যে যোগ দিলেন। এইরূপে কিছুকাল কাটিবার পর বঙ্গ দেশীয় সাহিত্যকারদের প্রসঙ্গ উঠিল। তার অল্প স্বল্প যা মনে আছে, তাহাই এখানে দিতেছি। বোধ হয়, প্রথমতঃ স্বামিজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন। তখনকার আচার ব্যবহার, সমাজ, বিবাহসংস্কারাদি প্রসঙ্গ লইয়া স্বামিজী নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের

কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ ক্যাব্যাদি বঙ্গ দেশ ছাড়া আর কোথাও জন্মায় নাই বলিয়া স্বামিজী অভিমত প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—"ছেলেদের হাতে ঐ সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত। মাইকেল মধুস্দন দত্তের কথায় স্বামিজী বলিলেন—"ঐ একটা অদ্ভুত genious তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদ বধের মত কাব্য তোদের বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাইই, ভারতবর্ষেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং দুর্লভ।" শিষ্য বলিল—"কিন্তু মাইকেল বড়ই শব্দাডম্বর করিয়াছেন।"

স্বামিজী—তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। বলি—আগে ভাল করে দেখ না, লোকটা কি বলছে। তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল, তখনি লোক তার পিছু লাগ্লো। এই মেঘনাদ বধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচো বধ কাব্য লিখা হোল! তা যত পারিস লেখ না, তাতে কি? সেই মেঘনাদ বধ কাব্য এখনো হিমাচলের ন্যায় আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে। মাইকেল যে নূতন ছন্দে, যে ওজস্বিনী ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝ্বে? এই যে জি, সি * কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই লিখ্ছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise কচ্ছে—দোষ ধরছে! জি, সি কি তাতে ভ্রুক্ষেপ করে? পরে লোক appriciate করবে।

মাইকেলের কথা হ'তে হ'তে বল্লেন—"যা, নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদ বধ নিয়ে আয়।" স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে লাইব্রেরীর চাবি ছিল। শিষ্য আলো লইয়া লাইব্রেরী থেকে 'মেঘনাদ বধ' নিয়ে স্বামিজীর কাছে এল।

স্বামিজী—পড়্ দিকি—কেমন পড়্তে জানিস্?

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম স্বর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজির মনোমত পড়া হলো না। ঐ অংশটী স্বামীজি পড়িয়া দেখাইয়া দিলেন—কিরূপে পড়্তে হয়। শিষ্যকে আবার পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল।

স্বামিজী—বল্ দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

স্বামিজী—যখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী—শোকে মুহ্যমানা—রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ—পুত্র শোক ভুলিয়া মহাবীরের

* স্বামীজি, সুবিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে 'জি, সি' বলিয়া ডাকিতেন।

ন্যায় যুদ্ধে কৃতসংকল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র সব ভুলিয়া—যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! বুঝ্‌লি? 'যা হবার হোক্ গে; আমার কর্ত্তব্য আমি ভুল্‌বনা—এতে দুনিয়া থাকে আর যাক্'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন ভঙ্গী আজিও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরূক রহিয়াছে।

এই সময় রাত্রির প্রসাদ গ্রহণ করিবার আহ্বান সূচক ঘণ্টা পড়িল। শিষ্য প্রসাদ পেতে নীচে গেল।

ভারতে শক্তিপূজা।

৪র্থ প্রস্তাব।

শক্তি—প্রতীক—দেব, মানব এবং অন্যান্য।

[স্বামী সারদানন্দ।]

সর্ব্বকালে যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি সাধককে গন্তব্যের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে বা ধর্ম্মলাভের নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব মানবাত্মা ও শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানলাভের সহায়ক হইয়া তদ্বিষয়িণী উচ্চভাবসমূহ তাহার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে, ভারত তাহাকেই প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যসোপানে আরোহণ করিয়াছে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির ভিতরেই সত্যলাভের ইহাই ক্রম। তবে, পৃথিবীর অন্য সকল জাতি নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর সত্যান্তরে উপনীত হইয়া প্রথমটিকে মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, আর তাহার সহিত সম্পর্ক মাত্র রাখে নাই—শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারত তাহা না করিয়া অন্যরূপ করিয়াছে। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ঐ নিম্ন সত্যকে যথাযথ স্থানে রাখিয়া অপরের নিমিত্ত চিরকাল তাহার পোষণ ও পূজা করিয়াছে—ভাবিয়াছে, এই 'মই, বাঁশ, দড়ি বা সিঁড়ি অবলম্বনে' আজ আমি সত্যসৌধের এই উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলাম, কাল অন্য কেহও ত এই ছাদে উঠিবার সঙ্কল্প করিয়া আগমন করিতে পারে, তাহারও তো এই মই, বাঁশ, দড়ি বা সিঁড়ি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই; অতএব তাহার বা তাহাদের সহায়তার জন্য উহা ঐখানে থাক। ভারতের এই ভাবটিই,

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতময়ী গীতে এইরূপে চিরনিবদ্ধ করিয়াছেন :—

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরণ॥

জ্ঞানী, নিজ সাধনফলে আপনি ধর্ম্মবিষয়ক, ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ক উচ্চতম সত্যে আরোহন করিয়াছেন বলিয়া, দেশকালপাত্রভেদ বিচার না করিয়া, উহা জনসাধারণে প্রচার করিবেন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে শ্রীভগবানের উপাসনার নিমিত্ত যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত তৎসকলের অনুমোদন ও যথাসম্ভব আচরণ করিয়া তাহার শ্রদ্ধা ঐ বিষয়ে দৃঢ়ীভূত করিবেন। কারণ, ধর্ম্মগত উচ্চতম সত্যের ধারণা, ব্যক্তিগত সাধনের পরিপক্কাবস্থায় আপনা আপনি উদয় হইয়া থাকে। কেবলমাত্র কাহারও কথায় তল্লাভ কাহারও কখন হইবে না।

ঐ ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন—"কাহারও ভাব নষ্ট কর্‌তে নাই, ভাব নষ্ট করা মহা দোষ। যেমন ভাব, তেমন লাভ। ভাব আশ্রয় করিয়াই মানুষ সত্যবস্তু লাভ করে, শ্রীভগবান্ ভাবময়। সোনার আতা বা হাতি দেখিলে যেমন সত্যের আতা ও হাতি মনে পড়ে, সেইরূপ মৃন্ময়ী পাষাণময়ী মূর্ত্তি দেখিলে চিন্ময়ী মূর্ত্তির উদ্দীপনা হয়," ইত্যাদি।

প্রতীক পূজার অবতারণায় আমরা প্রথমেই গুরুপাসনার উল্লেখ করিয়াছি। কেননা, গুরুপ্রতীকই সর্ব্বপ্রতীকশ্রেষ্ঠ বলিয়া জন সমাজে পরিচিত হইয়া, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাগ্রে পূজিত হইয়া থাকে। হইবারই কথা—কারণ, শ্রীগুরুই ইষ্টমন্দিরের দ্বার স্বরূপ। দ্বার রুদ্ধ থাকিলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ লাভ হয় না, শ্রীগুরুর শক্তি প্রসন্না না হইলে সেইরূপ ইষ্টদর্শনাশা বৃথা। মায়ানিরুদ্ধ দৃষ্টি ভ্রান্ত মানবের চক্ষুরুন্মীলন করিবার জন্যই কৃপাপরবশ শ্রীভগবানের ঐ শক্তিরূপে উদয়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানব যাহা কিছু সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা ঐ শক্তি প্রভাবে—বাহ্য অন্তর ভেদে নানা প্রতীক অবলম্বনে ঐ শক্তিই প্রকাশিতা হইয়া তাহাকে ধীরনিশ্চিত গতিতে দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর এবং উচ্চতম সত্যে আরূঢ় করাইতেছে—এবং ঐ শক্তিই, পূর্ণ স্বরূপে সাত্ত্বিকবিগ্রহে মানবশরীর ও মানবীয় ভাব অবলম্বনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, নিত্য নূতন নূতন ধর্ম্মাদর্শ নিজজীবনে প্রতিফলিত করিয়া, মানবকে সেই ছাঁচে জীবন গঠিত করিতে শিক্ষা দিয়া, দেশকালাতীত কেবলানন্দরূপ সমাধিতে তুরীয় সত্যানুভবের

উপায় সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া দিতেছে! সে জন্যই উপনিষদে আপ্তকাম ঋষি গাহিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ইষ্টদেবের ন্যায় গুরুতে যাহার পরম ভক্তিশ্রদ্ধা, তাহারই নিকট পরম সত্য, আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন! সেজন্যই কথিত আছে—

শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

দেবদেব উপেক্ষিত হইলে গুরুশক্তিসহায়ে মানব তাঁহার প্রসন্নতা পুনরায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু দয়াঘনমূর্ত্তি শ্রীগুরুশক্তি অবজ্ঞানিত হইলে মানবের জ্ঞান-লাভের দ্বার এককালে রুদ্ধ হইয়া গাঢ় অন্ধতম আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে!—সে তমোগুণের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ এক জীবনে সম্ভবপর হয় না। সে জন্যই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ইংরাজীভাবাপন্ন শ্রদ্ধানভিজ্ঞ বালশিষ্যমণ্ডলিকে নিজ শরীর দেখাইয়া বলিতেন—"দ্যাখ্, এটা কেবল খোলমাত্র, এই খোল্‌টাকে আশ্রয় করে শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা লোকশিক্ষা দিচ্চেন, সে জন্য এর কাছে এলে, একে স্পর্শ কর্‌লে, এর সেবা কল্লে লোকের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়, কিন্তু খুব সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত এটার সেবা কর্‌বি। হেলাশ্রদ্ধায় আমি রাগ কোর্‌বো না; কিন্তু এর ভিতর যে আছে, সে যদি অবজ্ঞিত হয়ে একবার ছুব্‌লে দেয়, তা হলে জ্বালায় অস্থির হতে হবে।" এক সময়ে কোন দুরন্ত শিষ্য নিজ ঘৃণিত জীবনা-লোচনায় ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখে অভিমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নানা অযথাভাষণ করে। অপার দয়ানিধি শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাহার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া কেবল মাত্র বলিয়াছিলেন—"ওরে, ও আমাকে যা বলে বলুক গে, (নিজ শরীর দেখাইয়া) এর ভিতরে যে আছে, তাকে তো কিছু বলে নি? আমার চিদানন্দময়ী মাকে তো কিছু বলেনি?"

হে ভারত সাবধান! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান্! বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া আজ বিদেশী অনুকরণে শ্রীগুরুর পূজায় অবহেলা করিও না। আজ আট শত বৎসরের অধিক কাল হইল, নানারূপে নানা ভাবে বিদেশী আসিয়া, কখন স্তব স্তুতি করিয়া, কখন ভয় দেখাইয়া তোমাকে ঐ শক্তিপূজায় বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে—পাশব বল প্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া ক্ষুৎক্ষামপীড়িত তোমার পরিম্লান চক্ষের সমক্ষে নানা প্রলোভন আনিয়া একে একে ধরিতেছে। কিন্তু শ্রীগুরুশক্তিরই পরিণামে জয় ভাবিয়া, তুমিও এত দিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ! সেজন্য বাহ্য-

লন্, মিসর, রোম, গ্রীস, তুর্কাদি দুর্জ্জয় কালস্রোতে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইলেও কৌপীনমাত্রাচ্ছাদিতকটি, তিতিক্ষাসম্বল, অনিত্যে নিত্যদর্শনাভিলাষী গুরুপাদনিবদ্ধদৃষ্টি, তদনন্যশরণ তোমার সন্তানকুল সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজও বর্ত্তমান। তোমারই পুণ্যক্ষেত্রে আজও সর্ব্বদেবদেবীস্বরূপ দিব্য গুরুবিগ্রহ মানুষীতনু অবলম্বনে নিজ মহিমা প্রকাশ করতঃ "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" আবির্ভূত হইতেছেন। তোমারই সন্তানকুলের সমষ্টিভূতমূর্ত্তি নরাবতার অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথমাঙ্কে যে শ্রীগুরুপাদুকোদ্দেশে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং॥

হে প্রভু! ভয়, মমতা প্রভৃতি নানা ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আমি, কি যে কর্ত্তব্য ঠিক, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার অহঙ্কার অভিমান দূর হইয়াছে—আমি এখন দয়ার পাত্র। এ সময়ে যাহা করা কর্ত্তব্য, যাহা করিলে আমার ও অন্যের মঙ্গল হয় এবং অধর্ম্মাচরণ করা না হয়, তাহাই আমায় বলিয়া দাও। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য—আমাকে আশ্রয় দাও, পথ দেখাও।

—তাহা তোমার প্রত্যেক এবং সকল সন্তানের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে সকলের জন্য সর্ব্বকালের নিমিত্ত পৌছিয়াছে! সে অভয়বাণী—"অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"—তোমার সন্তানের প্রত্যেককে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দৈব বলে বলীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছে! ধৈর্য্য ধর, পবিত্র ভাবে নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহারই অনন্যশরণ হইয়া থাক—তোমাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুর এখনও অনেক লীলা প্রকটিত হইবে। দেখিতেছ না কি—অন্তজগতে, ধর্ম্মজগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা? সর্ব্বকালে বিদেশী তোমার সন্তানের মাংসপিণ্ড ক্ষণভঙ্গুর শরীরটাকেই কয়েক দিনের জন্য মাত্র নানাপ্রকারে ক্লিষ্ট করিতে পারিয়াছে—তাহার অমরাত্মাকে কে বাঁধিবে? কে কখন তাহার অপ্রতিহত গতিরোধ করিয়াছে বা করিবে? সত্যকে ধরিয়া, ন্যায়কে ধরিয়া ধর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাক—জানিও—ভাব-জগতই স্থূল জগৎকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে—কোন শর্ব্বরী চিরস্থায়ী নয়—সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন ধ্রুব।

অহেতুক দয়াসিন্ধু শ্রীগুরুর পূজা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু ভারতে নানা প্রতীকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া, আমরা

পুনরায় মানবে শক্তিপূজার সহায়ক অন্যান্য প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুখে আনয়ন করিব না।

শ্রদ্ধাবাতাহতা, প্রেমবিকম্পভঙ্গিতা, বিজ্ঞানগুহাশায়িনী, প্রণবনাদিনী চির-পাবনকরী ভাবময়ী ধর্ম্মগঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে নির্গত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের অনেকে, মানবের অন্তস্থিত ভীতি-শৈলের শিখরদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কেহ বা বলিয়াছেন—সৃষ্টি কল্পের প্রারম্ভে আদিম মানব, বিচিত্র শক্তিশালী নানা পদার্থের সমষ্টিভূত বিশ্ববিরাট্‌ দর্শনে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশের অবলম্বনের পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়া হৃদয়ের পূজা অর্পন করিয়াছিল; ঐ বিস্ময়ভূধরের পাদমূলেই সনাতনী ধর্ম্ম-ভাগিরথীর আদিম বিকাশ।—উহাই প্রতীকোপাসনার বাস্তব মূল। ভারতের বেদ-গান ঐরূপেই প্রথমে সমুত্থিত হইয়া, জলদগম্ভীর সামধ্বনি ও পূতগন্ধী বিশ্বদেববলী ধূমে সান্ধ্যগগন পূর্ণিত করিয়াছিল। আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। চিজ্জড়-সম্মিলনী, বিপরীতগুণধারিণী, বাহ্যান্তরপ্রতিঘাতিনী উভয়মুখী মানবপ্রকৃতি এক বিষম জটিল রহস্য। সহস্র সহস্র বৎসরের নানা ঘাত প্রতিঘাত এবং ভূয়োদর্শন সহায়ে তাহাতে নিত্য জীবেশ্বরসম্বন্ধ, পরলোকাস্তিত্ব, আত্মার চিন্ময়ত্ব, অমরত্ব, সৃষ্টি-প্রবাহের অনাদিত্ব ও দেববিগ্রহাদির বর্ত্তমানত্বাদি মূলক বিশ্বাসনিচয় একত্রিভূত হইয়া, বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জটিল মানবপ্রকৃতির জটিল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎপত্তি জটিল ভাবেই সাধিত হইয়াছিল। তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিরাজি, সর্ব্ব-গ্রাসকরী জলধি, বিকটোল্লাস জীমূৎবাহন অশনি, নিশিদিবাকারী সূর্য্য, রাগরঞ্জিত উষা প্রভৃতি বাহিরের ভীষণ সুন্দর পদার্থনিচয়, যেমন জাগ্রতাবস্থায় আদিম মানবের মনে ভীতিবিস্ময়াদি ভাবসমূহের উদয় করিয়া, বাহ্য প্রতিকাবলম্বনে নানা দেবদেবীর পূজা করিতে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইরূপ মোহময়ী নিদ্রারাজ্যে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়া সে অঘটনঘটনপটীয়সী স্বপ্নের কুহকে যে সমস্ত দৃষ্টাপূর্ব্ব দেশ কাল ও পাত্রাদির অনুভব করিত, ঐ সকলকেও জাগ্রতানুভূত পদার্থসকলের ন্যায় বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করিয়া সে, ইহলোক ভিন্ন অপর এক লোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে শিখিল। বাহ্যান্তর ভেদে এইরূপে দুই প্রকার অনুভবের সহায়ে তাহার দুই প্রকার শিক্ষা যুগপৎ চলিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। কালে সর্ব্বরহস্যের উচ্চতম রহস্য মৃত্যুর সহিতও তাহার পরিচয় হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল —মৃত্যু অনিবার্য্য, মৃত্যু সকলকেই একদিন গ্রাস করিবে। অধীর হৃদয়ে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি? এ আবার কোন্‌ দেবতা? এইরূপে নচিকেতারূপী মানব মৃত্যু-

মুখেই শিথিল—ইহকালেই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যবসিত নহে—পরকাল আছে—এবং পরকালেও তাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চয়। ক্রমে প্রেতাত্মা সকলের স্বপ্নে ও কখন কখন জাগ্রতে সন্দর্শনে তাহার ঐ পরকাল বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। জগতের সকল জাতির প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহে উক্ত প্রেতাত্মা দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনও ঐরূপে প্রেতাত্মাকুলের দর্শন যে সম্ভবপর, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহুলোক, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, সকল ভূখণ্ডেই বিদ্যমান। ঐ দর্শন হইতেই যে প্রাচীন যুগে পিতৃপুরুষের পূজা প্রচলিত হয়, এ বিষয় নিঃসন্দেহ। প্রাচীন মিসরে ঐ সকল প্রেতাত্মা 'কা' নামে নির্দ্দিষ্ট হইত। ঐ 'কা' সকল, তাহাদের জীবিত সন্তানাদির নিকট আবির্ভূত হইয়া, স্ব স্ব দুঃখ কষ্টের কথা জানাইত। "আমাদের অন্ন দে, বস্ত্র দে, অন্য সব ভোগ্য পদার্থ দে"—ইত্যাদি বলিত; "না দিলে তোদের ধ্বংস করিব" —বলিয়া ভয় দেখাইত—এ সকল কথা তাহাদের ভিতর লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের পিতৃশ্রাদ্ধাদি, চীন ও জাপানের সিণ্টোপাসনা, ইউরোপ, আমেরিকার পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমানযুগের ভূতুড়ে চক্রানুষ্ঠান (Spiritualism and Science) প্রভৃতি ঐ বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য।

এইরূপে যত দিন না আদিম মানবের মনে পরকালবিশ্বাস সমুদ্ভূত হইযাছিল, ততদিন যে সে ধর্ম্মবিশ্বাসে ধনী হইযাছিল, একথা বলা যায না। আবার পরকাল বিশ্বাস এবং বিভিন্ন শক্তির আধার নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস তাহার মনে যুগপৎ উদয় হইয়াছিল—একথাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। প্রথমে ঐ সকল দেবদেবীর আবাসসীমাই হিমালয় প্রভৃতি অত্যুচ্চ ভূধরশৃঙ্গে নির্দ্ধারিত হয়। পরে মানব যখন সাহসাবলম্বনে ঐ সকল গিরিচূড়ার মস্তকে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও ঐ সকল দেবদেবীর দর্শন পাইল না, তখন স্থির হইল, তাঁহারা কখন কখন ঐ সকল ভূস্বর্গে আগমন করেন—নতুবা তাঁহাদের চিরাবাসস্থল নানানক্ষত্র-বিরাজিত ঐ সুনীল গগনের উপর দ্যোঃপিতর ভূমিতে, কৈলাসে, গোলকে, কিন্নরকিন্নরী শোভিত স্বর্গে, ইত্যাদি। আবার উচ্চাবচ পুণ্যপাপময়ী কর্ম্মের কথা আলোচনায় উক্ত পরলোক বিশ্বাস ও ক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক, অন্ধতমবিশিষ্ট লোক, নরক এবং তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতিতে মৃতব্যক্তি সকলের স্থান নির্দ্ধারিত করিল।

এইবার পৃথিবীতে বহুকাল বাস ও বহু দর্শনের ফলে মানব জাতির মধ্যে ভূতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ধীরে ধীরে উদয় হইল। তখন ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর শক্তি এক মহাশক্তির মনের লীলা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া তাহাকে

এক মহান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। স্তম্ভিত হৃদয়ে মানব ভাবিল—যিনি সকলের নিয়ন্তা, যাঁহার—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই খাদ্যরূপে পরিগণিত, স্বয়ং মৃত্যু যাঁহার ঐ খাদ্যের উপযোগী ব্যঞ্জনসদৃশ ; সেই কালকাল বিশ্বদেবকে কে জানিতে সক্ষম ?

কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না ! এইবার ঔপনিষদিক যুগের প্রারম্ভ হইল। বিচার আরম্ভ হইল,—সেই ঈশ্বর সৃষ্টির বাহিরে বা অন্তরে। প্রথমে স্থির হইল—তিনি সৃষ্টির বাহিরে, সৃষ্ট বিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট, জীব সেবক, তিনি সেব্য ; জীব তাঁহাকে কখন ধরিতে ছুঁইতে পারিবে না।

পরে স্থির হইল—তিনি সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে, বিশ্ব তাঁহার একাংশে বর্ত্তমান—"একাংশেন স্থিতোজগৎ" ; জীব অংশ, তিনি পূর্ণ ; দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাদির সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধে উভয়ে অবস্থিত। শেষে স্থির হইল—অসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিলেই তিনি বিশ্বরূপে আপাতঃ প্রতীত হন মাত্র। কোনক্রমে মনবুদ্ধিরূপ গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিলে তবে শুদ্ধ সত্যানুভব সাধ্য ; সেখানে "একমেবাদ্বিতীয়ং"—দুই তো নাই, এক—একথাও বলা যায় না ; তিনি পূর্ণ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। আর জীব ?—জীব বলিয়া কোন পদার্থ এখানে থাকিলেও সেখানে নাই !

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘরের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি তুই নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

তবে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের কি ? যতক্ষণ শরীর, মন, বুদ্ধির গণ্ডির ভিতর, ততক্ষণ ও সকল সত্য, যেমন যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত।

তবে এ সংসার-স্বপ্ন মৃত্যু হইলেই কি ভাঙ্গিয়া যায় ?—না। কোটি জন্মেও বিজ্ঞানের উদয় না হইলে ভাঙ্গে না। আবার ইচ্ছা হইলে এক জন্মেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

এইরূপে ধর্ম্মচক্র ভারতে সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তিত হইল। বাকি রহিল মাত্র—সাধন-

পথাবলম্বনে উহা জীবনে প্রতিফলিত করিয়া উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ যাহাতে ঐ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেই ভাবে সমাজ গঠন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে যত মহাপুরুষ অদ্যাবধি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে অনেক কথা—এখানে তাহার স্থানাভাব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করিলে উহাতে বিশেষ অঙ্গ-হানিই লক্ষ্য হইয়া থাকে। হইবারই কথা। কারণ, পাশ্চাত্যপ্রদেশ, কর্ম্মী ভিন্ন একজনও বিশিষ্ট ধর্ম্মবিজ্ঞানীর এতকালেও জন্মদানে সক্ষম হইল না! প্রাচ্যভূমি আসিয়া, বিশেষতঃ ভারত হইতেই ধর্ম্মালোক যে পাশ্চাত্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতীত যুগে বারবার সঞ্চারিত হয়, এ বিষয়ের সত্যতা পৃথিবীর প্রাচীনেতিহাস যতই আলোচিত হইবে, ততই প্রমাণিত হইবে—ততই মানব বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য পূজ্য বেদ হইতেই ধর্ম্মালোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মিবার সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে যখন গ্রীক জাতি বিশেষ বলদৃপ্ত হইয়া অন্যান্য সকল জাতিকে পাশববলে আপনাধীনে আনিতে ব্যস্ত, তখন হইতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার আদিগুরু গ্রীসের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বিস্তারের কথা—ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল না—একথাও স্পষ্ট বলা যায় না। ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক এবং কোন কোন স্থলে ভারতের বণিককুলও যে, ঐ কাল হইতে গ্রীস এবং তৎসন্তান রোম সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এ বিষয়েরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পালিস্তানের আণ্টিয়ক্ সহরে ভারত সম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের ধর্ম্মশাসনখোদিত প্রস্তরস্তম্ভ ঐ বিষয়ের জলন্ত নিদর্শনস্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান। ইউরোপের উল্লেখযোগ্য প্রথম দার্শনিক পিতাগোরসের নাম এবং সংখ্যা হইতে জগদুৎপত্তিরূপ মতে ভারতের পূতগন্ধের বিশেষ অনুভূতি হয়। কে না জানে—ভারতের সাধু ও আচার্য্যকুল অদ্যাবধি পিতা-গুরু শব্দাদিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অভিহিত হয়? কে না জানে—শ্রীভগবানাবতার মহামুনি কপিল, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে জগদুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া, আপন মীমাংসা সাংখ্য নামে জনসাধারণে প্রচারিত করেন? সংখ্যা হইতেই যে উক্ত সমাধান 'সাংখ্য' শব্দে অভিহিত—একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপে গ্রীস এবং রোমের ভিতর দিয়া যে, ভারতের ধর্ম্মমতসমূহই তৎকালে প্রচারিত হয়—এ বিষয়ের প্রমাণসংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রাচীন ইউরোপে ধর্ম্মালোক বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল—মিসর। ঐ

মিসরও যে ভারতের ধর্ম্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল—এ বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মিসরি, মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে ঐ দেশে প্রথম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে—এ কথা মিসরি পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্য প্রদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায়— ভারতের দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দ্রাবিড়ির সহিত প্রাচীন মিসরির রং, ঢং, চেহারা, আচার, ব্যবহার এবং পূজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান— সেই শিবশক্তি পূজা, ষাঁড়ের সম্মান, বাবরি কাটা চুল, ধুতিপরা, কাছাহীন, মিস্ কালো রঙ! কাজেই কে না বলিবে—ঐ দ্রাবিড়িই মিসরে যাইয়া বহুপূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? পরে স্থলপথে ভারতের সহিত মিশরের যে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল—এ বিষয়ের প্রমাণও প্রাচীনেতিহাস এবং এখনও বর্ত্তমান বণিককুলের গতায়াতের পথসমূহ (trade route) হইতে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশার ঐ মিসরে বহুকাল বাসের কথা বাইবেলের নবভাগে নিবদ্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন—তাঁহার ভারতেও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আগমন হইয়াছিল। যাহাই হউক, তৎপ্রচারিত মতের অধিকাংশই যে, ইরাণি ধর্ম্মপুস্তক জেন্দাবেস্তা হইতে সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—সেই ভালমন্দ দুই শক্তির দ্বন্দ্বে উত্তমের জয়, উত্তমের অনুজ্ঞায় মন্দের মানবকে প্রলোভিত করিয়া পরীক্ষা, উত্তমের কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং নরশরীরাবলম্বনে মানবকৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করণ। আবার তচ্ছিষ্য ম্যাথুলিখিত প্রচারবিবরণীতে গ্যালিলি প্রদেশস্থ শৈলপাদমূলে ঈশার ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধী যে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, অবিকল সেই সমস্ত কথাই ধম্মপাদে লিপিবদ্ধ শ্রীভগবানাবতার বুদ্ধের শৈলপ্রচারে বিবৃত রহিয়াছে। অতএব বৌদ্ধমতের কতক কতকও যে, ঈশার মতমধ্যে প্রবিষ্ট আছে—তাহাও প্রমাণিত। ঈশাশিষ্য যোহন লিখিত প্রচারবিবরণীর পূর্ব্বভাগে অতি অপরিস্ফুটভাবে লিপিবদ্ধ ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি নাদ ব্রহ্মবাদের কথাও এ স্থলে দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য ভূমি এইরূপে ভারতের ধর্ম্মালোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে উদ্ভাসিত হইতেছিল, এমন সময়ে জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উহারই ফলে ঐ ভূমিতে ধর্ম্মালোক পরিক্ষীণ হইয়া জড়বাদের অধিকার বিস্তৃত হইল। জড়বাদী, জড়শক্তির বিস্তৃত তত্ত্বলাভে তৎপ্রয়োগ-বিজ্ঞানমাত্র-কুশলী, পাশববলোন্মত্ত পাশ্চাত্যের ধর্ম্মমীমাংসা এখন যে, গীতানিবদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত বচনের অনুরূপ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম।

অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কমোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥

ঈশ্বরই নাই তা ঈশ্বর আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কামই স্ত্রী পুরুষের সংযোগ করিয়া জগৎসৃষ্টির কারণ। কামোপভোগই জগতে পরমপদার্থ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতি ব্যক্তি। অহঙ্কার অভিমানে মত্ত হইয়া ঐ ভোগ কি প্রকারে পাইবে, এই চিন্তাতেই অহরহ কালযাপন করে এবং নানা অসদুপায়াবালম্বনেও পরাঙ্মুখ হয় না।

অতএব ভারতের ঋষি এবং অবতারকুলের ঐ সম্বন্ধী মীমাংসার অনুসরণ না করিয়া পাশ্চাত্যের অনুসরণে যে, আমাদের সমূহ ক্ষতি এবং কালে ধ্বংসের বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব পূর্ব্ব হইতেই ঐ বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে। সর্ব্বকালে প্রত্যক্ষই ধর্ম্মের মূল। ঐ প্রত্যক্ষভূমি আবার সিদ্ধকাম বা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও অনুভাবয়িতা আপ্তপুরুষ-কুলের 'পাবনং পাবনানাং' জীবন চরিত ও তদ্ভাবে গঠিত সাধকের নিজের জীবন। ঐরূপ পুরুষের দর্শন, স্পর্শন ব্যতীত ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, মায়াগ্রস্ত জীবকুলের মায়াতীত নিত্যানন্দের আভাস লাভ সুদূরপরাহত। আবার, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—জড় ভাবিতে ভাবিতে লোকে জড় হইয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় মানব তচ্ছরূপই প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য ভূমির ঐরূপ আপ্তপুরুষের বহুকাল পবিত্র সন্দর্শন লাভ হয় নাই; তদুপরি জড়ের চিন্তাতেও বহুকালাতীত হইয়াছে। কাজেই ঐ দুর্দ্দশা! তবে ভারতের ধর্ম্মালোক আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় অসুর-মতাবলম্বী পাশ্চাত্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে জন্য আশা হয়, আবার পাশ্চাত্য, ভারতকে ধর্ম্মগুরুত্বে বরণ করিয়া, ধ্বংসের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জগতের যথার্থ কল্যাণে ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিবে।

দেববলে বলীয়ান্ ভারত, চিরকাল ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতেই নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। ঐ চেষ্টা বা সাধনফলেই পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সে

সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। ভারত দেখিয়াছে—সত্যই প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বাস-সহায়ে, এই বহুকালাগত সংসার-স্বপ্ন, একদিন ভাঙ্গিয়া যায়;—সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধকারময় গৃহ এক মুহূর্তে আলোকে পূর্ণিত হয়। ভারত দেখিয়াছে—সত্যই শ্রীভগবান্, পূর্ণচিদানন্দস্বরূপে সকলের হৃদ্দেশে অনন্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, সকলকে ফিরাইতেছেন, ঘুরাইতেছেন, উদ্দেশ্যবিশেষে চালিত করিতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ভারত দেখিয়াছে—সত্যই কেবল তাঁহার শরণাপন্ন হইলে পূর্ণ শান্তি লাভ—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে শ্রীভগবচ্ছক্তি মানবনয়নে প্রকাশিতা হইয়াছেন। বৈদিক যুগের তেত্রিশটি দেবপ্রতীক, এইরূপে পৌরাণিক যুগে তিন শত তেত্রিশ কোটি দেবপ্রতীকে পরিণত। তাই বলিয়া কেহ না অনুমান করেন—ঐ তেত্রিশকোটি দেবকুলের প্রত্যেকেই এক সময়ে সমভাবে মানব মনে আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম্মেতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়—ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেবপ্রতীকোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়া, ভারতে পূজালাভ করিয়া, মানবের ধর্ম্মলাভের সহায়ক হইয়াছিল। মন্ত্রশাস্ত্রাদি পাঠে কত ঐরূপ দেবতার নাম মাত্র কেবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের ধ্যান এবং পূজাপদ্ধতিসকল বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। তিব্বত, চীন, জাপানাদি প্রদেশে ঐ সকল দেবতার পূজা-প্রচার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক যে, বহু প্রাচীন যুগে ঐ সকল দেবপূজা ভারত হইতে উক্ত প্রদেশ সকলে লইয়া গিয়াছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধযুগে শতদলে আসীন উজ্জ্বল বুদ্ধমূর্ত্তিই প্রতীকরূপে উত্তর ভারতের অনেক স্থলে অবলম্বিত হয়। ক্রমে উহাই শতদলমধ্যবর্ত্তি উজ্জ্বলালোক বা পদ্মান্তর্গত উজ্জ্বলকিরণবর্ষী মণিখণ্ডে পরিণত হয়। তিব্বতে এবং অন্যান্য বৌদ্ধদেশে এখনও উহাই যে, সাধকের ধ্যানাবলম্বন, তাহা 'ওঁ মনিপদ্মি হুঁ' ইত্যাদি মন্ত্রেই স্পষ্ট ব্যক্ত।

বহির্জ্জগতের পদার্থনিচয়ের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরীণ নানা পদার্থ ও প্রতীকরূপে কালে অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি এখনও বর্ত্তমান এবং কতকগুলি অধুনা লোপ পাইয়াছে। হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যগত উজ্জ্বল আকাশ বা 'দহরাকাশ', নয়নান্তর্বর্ত্তী ছায়া বা ছায়াপুরুষ ইত্যাদি ঐরূপে এককালে প্রতীকরূপে অবলম্বিত

হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যে ঐ সকলের বিশেষ উল্লেখ থাকায়, উহাদের কালে প্রচলন থাকা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই ভূতপঞ্চের প্রত্যেকে এবং অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিও যে কালে সূক্ষ্মদর্শী মানব কর্ত্তৃক ব্রহ্মপ্রতীক-রূপে অবলম্বিত ও উপাসিত হয়—এ বিষয়ের প্রমাণও উপনিষদ্‌নিবদ্ধ "কং ব্রহ্মত্যুপাসীত—খং ব্রহ্ম—অন্নং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি বহুবিধ বচনাবলীতে উপলব্ধি হয়। শব্দপ্রতীক, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরভাবে আলোচিত হইয়া, ক্রমে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌-নিবদ্ধ গভীর প্রণবতত্ত্ব এবং নাদ ব্রহ্মবাদে পর্য্যবসিত হয়—তাহাও এ স্থলে উল্লেখ-যোগ্য। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত মনোগত পৃথক পৃথক ভাবের নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াই কালে ঐ বাদের উৎপত্তি হয়, এবং ক্রমে উহা বিপুলকায়া ধারণ করিয়া নাদ বা শব্দ হইতে জগতোৎপত্তি নির্দ্ধারিত করে।

বাহ্যান্তর ভেদে কত প্রতীকের যে, এইরূপে কালে কালে উদয় হইয়াছিল—তাহার সংখ্যা হওয়া সুকঠিন। ঐ সমস্ত প্রতীকের আলম্বনে যে যে শক্তিপ্রকাশ মানব আরোপ বা অনুভব করিত, এক মহান্ ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়া, কালে ঐ সকলকে তাঁহারই বিভূতিরূপে গণনা করিতে শিখিল। গীতায় দশমাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে পদার্থে যে যে ভগবদ্‌বিভূতি দর্শনের উপদেশ অর্জ্জুনকে করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই প্রাচীনকালে পৃথক্ পূজা পাইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাহ্যপ্রতীক সমুদায় একত্রীভূত হইয়া, এক বিরাট্ দেবতত্ত্বে এবং খণ্ড খণ্ড আন্তর প্রতীকসমূহ সমষ্টিভূত হইয়া, এক মহান্ আন্তর শক্তিতে কালে পর্য্যবসিত হইল—মানব, বিশ্ববিরাট্ এবং কুণ্ডলিনী শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল। তত্ত্বদালোচনার পূর্ব্বে আমরা, আবহমানকাল ধরিয়া মানবমনে দৃঢ় নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিতা, ভোগমোক্ষৈকসহায়া অন্য এক শক্তিপ্রতিমার কথা, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]　　　　[শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক।

একটু চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে যে, আমরা যে কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসকলের আলোকের সাহায্যেই সাধিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ পদ্ধতি, এইরূপে পুরাতনের সাহায্যে নূতনকে আয়ত্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অজ্ঞাত পূর্ব্ব বিষয়কে যদি কোন পূর্ব্বপরিচিত সত্যের সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে শ্রেণী বিশেষে জড়াইতে পারি—তাহা হইলেই ঐ বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়। আমরা কত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছি; উহাদের সকলগুলিই আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের নেপথ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা থাকে অবস্থিত। আবার যখনই কোনও নূতন কিছু আসিয়া আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করে, তখনই আমরা ভিতরে খুঁজিয়া দেখি যে, আমাদের জ্ঞানসৌধের কোন প্রকোষ্ঠে ইহার সম সমান থাক্ বা শ্রেণী আছে। কোনও গতিকে ঐরূপ একটি শ্রেণীর সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া পাইলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই বিষয়কে ঐ স্থানে সন্নিবেশিত করি। সেও তখন নিতান্ত ঘরের লোকের মত কাযকর্ম্মের সহায়তা করিয়া মিলিয়া মিশিয়া ঐ দলে থাকিয়া যায়।

ইহাকেই আমরা জ্ঞান লাভ বলিয়া থাকি। যখন সাধারণ লোকে কোনও বিষয়ের কিনারা করিতে না পারিয়া, সেটাকে ভূতের কীর্ত্তি বা ঐরূপ কিছু বলিয়া স্থির করে, তখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কারণ ভূতের অস্তিত্বটা পরিচিত ঘটনার মধ্যে না হইলেও ভূতুড়ে কাণ্ডের মত দুর্জ্ঞেয় ঘটনাবলি অতি সুলভ। কাজেই যখন কোনও ঘটনার কারণ নির্ণয় করা অতি দুরূহ হইয়া উঠে, সাধারণ লোকে তাহাকে ঐরূপ অজ্ঞেয় ঘটনাবলির দলে ফেলিয়া, উহাকে ভূতের কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য করে।

সুতরাং আইওনিয়ার দার্শনিকগণ (Ionic Philosophers) যখন জগৎ-কারণ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে জগৎ-সম্বন্ধিনী যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারই উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। জগতের বিষয়ে তাঁহারা যে পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন,

তাহা সন্তোষজনক না হইলেও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। সেই অতি প্রাচীন কালে পারিপার্শ্বিক তমোমেঘমণ্ডলের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া কেবলমাত্র গ্রীকগণের জ্ঞানপ্রভাই বিদ্যোতিত হইতেছিল। আধুনিক সভ্যতাভিমানী ইংরাজ ও জর্ম্মানের পূর্ব্বপুরুষগণ, উহার অনেক পরবর্ত্তী কালেও উলঙ্গ অবস্থায় বৃক্ষরসের দ্বারা অঙ্গশোভাবর্দ্ধন করিয়া, বনে বনে বিচরণ করিত। কাজেই স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিলে যে জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সমসাময়িক-অপর জাতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, তাহাই আবার সমধিক প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। থেলস্ প্রভৃতি আইওনীয়ানিবাসী দার্শনিকগণ উচ্চ বৈজ্ঞানিক সত্য সকল জ্ঞাত ছিলেন না, কাজেই তাঁহারা জগৎটাকে অতি স্থূলভাবে বুঝিতেন। তাঁহারা জগতে জল, ক্ষিতি, বায়ু ইত্যাদি আদিভূত-সকল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেন না, অথবা আর কিছু জগতে যে থাকিতে পারে, এ সন্দেহও তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। কারণ বলিতে তাঁহারা উপাদান কারণই বুঝিতেন, অথবা উপাদান কারণই তাঁহাদের নিকট যেন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাই জগতের উপাদান কারণ নির্ণয়েই তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র উপাদানই যেমন পদার্থ নহে (কারণ তাহা হইলে উপাদান, মৃত্তিকা ও উৎপন্ন বস্তু, ঘট অপৃথক বলিয়া বোধ হইত) সেইরূপ জল, বায়ু বা অগ্নি, জগৎ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল আদি ভৌতিক সত্তার প্রত্যেকটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সমবেত হইলে তবে জগৎ সৃষ্টি হয়। জগতে জল, অগ্নি ইত্যাদি ব্যতীত যে. ঐ সকল পদার্থের সমবায়, পরিমাণ ইত্যাদিও বর্ত্তমান আছে, তাহা আইওনীয় দার্শনিকগণ অত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখেন নাই। সে কার্য্য পিতাগোরাস্ বা পিতাগুরু (Pythagoras) ও তাঁহার শিষ্যাদির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও আদিভৌতিক সত্তাই পদার্থের কেবলমাত্র উপাদান নহে. ও পরিমাণ, সংযোগ ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত উপাদানই পদার্থ। এই পরিমাণ, সংযোগ ইত্যাদি আবার আমরা সংখ্যার দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া থাকি। কারণ উপাদান বস্তুর পরিমাণ সংখ্যার দ্বারাই নিরূপিত হয় এবং পদার্থটী কয়টী উপাদানের সংযোগে নির্ম্মিত, অন্য পদার্থের সহিত কি সম্বন্ধে অবস্থিত, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরও সংখ্যার দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তাপ্রণালীর দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া পিতাগোরাস্ বা পিতাগুরু স্থির করিয়াছিলেন যে, "সংখ্যাই জগতের মূল"।

পিতাগোরাস্ (Pythagoras) খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে আইওনীয়া প্রদেশে আবির্ভূত হন। ইঁহার বিষয়ে কোনও বিশ্বস্ত ইতিহাস নাই। কিন্তু কল্পনা নিরস্ত থাকিবার পাত্র নহে। জনশ্রুতির অস্পষ্টতা তাঁহার চারিদিকে এমন একটী অলৌকিকতার আবরণ গড়িয়া তুলিয়াছিল যে, দৈবী উৎপত্তির সংবাদ সাধারণের মধ্যে নির্ব্বিবাদে প্রচার লাভ করে। তাঁহার প্রথম জীবনের উল্লেখযোগ্য প্রধান ঘটনা এই যে, তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা নানা বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহের সুবিধা ও অবকাশ পাইয়াছিলেন। অনেকে এমনও অনুমান করে যে, তিনি ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তিনি মিশর দেশে গিয়াও নানা বিদ্যালাভ করেন এবং গণিত শাস্ত্রে কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জ্যামিতির পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এইরূপে ভ্রমণ ও শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত সকল প্রচার মানসে ইটালি (Italy) গমন করেন। সেখানে কিন্তু কেবল প্রচার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। নিজের নেতৃত্বে একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠন করিলেন এবং এইরূপে প্রায় তিন শত শিষ্যের ধর্ম্মজীবনের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কথিত আছে—ধনী ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। অনেক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইত। প্রথম পাঁচ বৎসর নীরবে আজ্ঞাপালন ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য অবস্থা বিশেষে ঐ সময় সংক্ষিপ্ত করা হইত। এই নিয়ম অব্যাহতভাবে পালিত হইলে পর ধর্ম্ম উপদেশ সকল শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ হইত। এইরূপে নানারূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল অভ্যস্ত হইলে গুরু স্বয়ং আসিয়া উপদেশ দান করিতেন এবং শিষ্যও বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গুরুবাক্যে নানা সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অবকাশ পাইত। কিন্তু তথাপি ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল রহস্য গোপনে রাখিতে হইত।

এই সম্প্রদায়ের সকলকেই পুত্রকলত্রাদি লইয়া একটী সাধারণ স্থানে ঠিক এক পরিবার ভুক্ত লোকের ন্যায় বাস করিতে হইত। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া প্রথম কাজ ছিল, সারাদিনের কর্ত্তব্য নিরূপণ , এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় দৈনন্দিন কার্য্যের হিসাব নিকাশ ও তদ্বিষয়ক ভাল মন্দ বিচার হইত। ইঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতেন এবং তৎপরে গ্রন্থাদি পাঠে মন দিতেন। তাহার পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে একত্র মিলিয়া নানা আলোচনা করিতেন। ভোজনের পূর্ব্বে সকলকে শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদি করিতে হইত।

আমিষ আহার ইঁহাদের নিষিদ্ধ ছিল। খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ রুটী, মধু এবং জল ব্যবহৃত হইত। আহারের পর সকলে নিজ নিজ কার্য্যে মন দিতেন। কেহ সাংসারিক কার্য্যে, কেহ স্নানে, কেহ বা পূজা, উপাসনায় ব্যাপৃত হইতেন। এতৎ সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের দৈনিক কার্য্যের এইরূপ নিয়ম ছিল।

এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা ব্যতীত পিথাগোরাস সাধারণের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তিনি বিবাহ করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশানুযায়ী নিজেও বিবাহ করিয়াছিলেন। যখন সাধারণে বাহির হইবার আবশ্যক হইত, তখন তিনি প্রাচ্য দেশীয় পোষাক পরিতেন। সাধারণের নিকট তিনি সাধনপ্রণালীর গুপ্ত রহস্য সকল প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু মোটামুটী ভাবে তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে থাকিতে ও পাপ হইতে বিরত হইতে বলিতেন।

পিথাগোরাসের নিজের কি মত ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে পিথাগোরাসের সম্প্রদায়ের যে মত, তাহা স্থূলভাবে বলা যাইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের মতে—"সংখ্যাই জগতের মূল।" কেবল শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই মত এক সৃষ্টিছাড়া কল্পনা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে—তাহা হইতে ঐ মতের একটা সঙ্গত অর্থ হইতে না পারে এমন নহে। সামান্য একটী উদাহরণ দ্বারা আমরা ঐ মত কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সম্মুখে ঐ যে দোয়াত রহিয়াছে, ওটী কি? ইহার উত্তরে বিনা বিচারে বলা যাইতে পারে যে, উহা কাচ-নির্ম্মিত। কিন্তু ঐ যে আলোর চিম্‌নিটী রহিয়াছে, উহাও ত কাচ-নির্ম্মিত। এই দোয়াত ও চিম্‌নির প্রভেদ কি? অর্থাৎ দোয়াতে কাচ ছাড়া আর কি আছে বলিয়া, ইহা দোয়াত এবং কাচ ভিন্ন চিম্‌নিতে আর কি আছে যে, উহা চিম্‌নি? দোয়াতের চিম্‌নি হওয়া বাধিত করিয়া যাহাতে দোয়াত করিয়াছে, সেটী কি? অধিক দূর না যাইয়া বলা যাইতে পারে যে, চতুষ্কোণ আকৃতিই দোয়াতকে চিম্‌নি হইতে পৃথক্ করিতেছে। এই আকৃতি কাচ নহে কিন্তু ইহা না হইলে দোয়াতের অস্তিত্ব থাকে না। আকৃতি দোয়াতের মূল, প্রত্যেক পদার্থের মূল, কারণ, আকৃতির দ্বারাই দোয়াতের দোয়াতত্ব এবং চিম্‌নির চিম্‌নিত্ব জ্ঞানগোচর হয়। কিন্তু আকৃতিই বা কি? কোনও পদার্থের আকৃতি, তাহার বিভিন্ন অংশ সকলের বিশেষ সমাবেশ পদ্ধতি ভিন্ন আর কিছুই নয। চতুষ্কোণ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, দোয়াতের চারি অংশ বা পার্শ্ব সকল সম আয়তন বিশিষ্ট। কিন্তু সম বা সমান বলিলে বুঝায় এই যে, উহাদের পরিমাণের সংখ্যা ভিন্ন নহে;—এক। আমরা কোন একটী পরিমাণকে একটী নাম দিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকি,

যথা এক হাত, এক গজ ইত্যাদি ; এবং যখন বলি, এই পদার্থ ঐ পদার্থের সহিত আয়তনে সমান বা অসমান, তখন পরিমাণের সংখ্যা দ্বারাই উহা নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, পিতাগোরীয়দিগের মত নিতান্ত অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য নহে—তাহাদের মতে "সংখ্যা" নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই জগতে নানা বিচিত্র পদার্থরাজি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সংখ্যা আবার তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—সান্ত ও অনন্ত। সান্ত ও অনন্ত "সংখ্যার" সংযোগই জগৎ সৃষ্টির কারণ।

পিতাগোরীয়েরা জন্মান্তরবাদী ছিলেন। তাঁহাদের মতে আত্মা দেহ কারাগারে আবদ্ধ। ইহা অবশ্য তাহার পূর্ব্ব দুষ্কৃতির শাস্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। ইউরোপীয়েরা বোধ হয় চিরকালই জন্মান্তরবাদকে এক বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাই অতি প্রাচীনকালেও পিতাগোরীয়দিগকে পরিহাসরসিক কবির ব্যঙ্গস্থল হইতে হইয়াছিল। ইহার একটী নিদর্শন আমরা না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। পিতাগোরাসকে লক্ষ্য করিয়া কোনও প্রাচীন কবি বলিতেছেন—

"One he was moved to pity—so men say—
Seeing a dog rough-handled by the way.
'Forbear thy hand · housed in yon cur doth lie
A friend of mine I knew him by his cry'."

ক্রমশঃ।

বোম্বাই হইতে শোলাপুরের পথে।

[স্বামী বোধানন্দ।]

শুভদিনে শুভক্ষণে গুরুজনের পাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া, জনৈক বন্ধুর সহিত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণে বাহির হইলাম। একেবারে বম্বে যাওয়া স্থির হইল। পথে ৺বৈদ্যনাথ ও ৺প্রয়াগ দর্শন করিয়া ৫ম দিবসে বম্বে পৌঁছিলাম। ঐ বৎসর ঐ সময় বম্বে নগরে ন্যাসান্যাল কংগ্রেস ও ইণ্ডষ্ট্রীয়াল এক্‌জিবিসনের অধি-

বেশন হইতেছে। বম্বে নগরে কয়েকটী পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুব বাসায় পৌঁছিলাম। তাঁহারা অতি আদর যত্নে আমাদিগকে বাসায় রাখিলেন ও আমবা যতদিন ইচ্ছা তাঁহাদের বাসায় থাকিতে পাবি—এইরূপ অভিমত প্রকাশ কবিলেন। বাস্তবিক আমবা যে কয়েক দিন তাঁহাদের সহিত ছিলাম, কি আনন্দ ও প্রীতি ভোগ করিযাছি, তাহা বলিতে পাবা যায় না। সকলেই যেন আপনাব হইতেও আপনার লোক, কিসে আমাদেব কোন কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা তাহাই চিন্তা। তাঁহাদেব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আমবা কথনই ভুলিতে পাবিব না। তিন দিনই কংগ্রেসের সভা দর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণ হইয়াছিল। এবার কংগ্রেস সমিতিব সভাপতি হইয়াছিলেন—মাননীয় সাব হেনবি কটন বাহাদুব। তাঁহাব চতুর্দ্দিকে মঞ্চোপরি মাননীয় বাবু সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাবেবল গোখ্‌লে, ফেবোজসা মেটা, স্বদেশ-প্রাণ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাল গঙ্গাধব তিলক প্রমুখ দিগ্‌গজ সুধীমণ্ডলী। সম্মুখে সহস্র সহস্র নিমন্ত্রিত ডেলিগেট্‌ ও দর্শকবৃন্দ। উপবে সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ, নিম্নে বিস্তৃত আস্তবণ ও কাষ্ঠাসন শ্রেণী। দ্বারদেশ ও কাষ্ঠস্তম্ভসমূহ পত্রপুষ্পে সুশোভিত। অতি বিনীত ভলন্টিয়ারগণ শান্তিরক্ষা ও অভ্যর্থনায় তৎপর। অসম্ভব জনতা, কিন্তু এমনই সুবন্দোনস্ত যে, কোনরূপ গোলমাল একেবাবেই নাই। হায়, সে মহতী সভা তিন বৎসবেই যে একপে ধ্বংস হইবে, তাহা তথন কে মনে কবিয়াছিল? যাহা হউক, সেবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সাব ফেবোজসা মেটা, প্রথমে সভাপতি মহাশয়কে ও আমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীকে যথোচিত ধন্যবাদ ও সম্বর্দ্ধনা দান করিলেন। তৎপবে মাননীয় বাবু সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে আসন গ্রহণ কবিতে অনুবোধ কবিলেন। তিনি দুই এক কথায় উক্ত কার্য্য সাধন করিবেন ভাবিযাছিলেন, কিন্তু সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাব বক্তৃতা শুনিবার জন্য এতই ঔৎসুক্য প্রকাশ কবিলেন যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে মহামতি কটন্‌ বাহাদুবের গুণকীর্ত্তন সূচক একটী ছোট খাট বক্তৃতা করিতে হইল। এইরূপে অন্যান্য মহোদয়গণও আপনাপন অভিমত প্রকাশ কবিবাব পর মহামতি কটনেব সাবগর্ভ বক্তৃতা আরম্ভ হইল। প্রায ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইবাব পব কটন বাহাদুব আসন পুনঃ গ্রহণ কবিলেন ও সে দিনকাব কার্য্য শেষ হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস অনেকগুলি প্রস্তাবের (resolutions) উত্থাপন ও সমর্থন হইলে কটন বাহাদুব নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তৎপরে ফেরোজসা যথোচিত বাক্যে সভাপতি মহাশয়কে ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

কংগ্রেস সভা শেষ হইবার পর উক্ত সভাগৃহেই সোসিয়াল কনফারেন্স নামক একটী সামাজিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত বরদাধিপতি উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেবারকার ঐ সভার মতামত সকলেই জানেন—সেজন্য আর বলিলাম না।

আমি ২ দিন ইণ্ডষ্ট্রিয়াল একজিবিসন (শ্রম ও শিল্প প্রদর্শনী) পরিদর্শন করিয়াছিলাম। বন্ধুটীর শিল্প সম্বন্ধে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় আরও ২ দিন বেশী দেখিয়াছিলেন। প্রত্যহ বৈকাল ৩ টার সময় প্রদর্শনীর দ্বার খোলা হইত ও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। এই সময়ের মধ্যে দর্শকগণকে সমস্ত দেখিয়া লইতে হইত। কিন্তু ব্যাপার এতই বেশী যে, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেখিয়া শেষ করা অসম্ভব। প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দর্শনী দিতে হইত, কিন্তু সে নানা বিষয়ের বিরাট্ ব্যাপার দেখিয়া এক টাকা দর্শনী দেওয়া সার্থক হইল—মনে হইত। সারি সারি কাষ্ঠ, লৌহ ও টিনের ছাদ যুক্ত বড় বড় গৃহ, এক দিকে—সুবিস্তৃত রাজপথ, অপর দিকে—অনন্ত সমুদ্র, তড়িত মালায় সুশোভিত উজ্জ্বল বাটীগুলি সন্ধ্যার পর দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হইত। শত শত ব্যক্তি বেলা ১টা হইতেই দ্বারদেশে অপেক্ষা করিত। ৩ টার সময় দরজা খুলিবামাত্রই সকলে বেগে প্রবেশ করিতে উদ্যত এবং সংকীর্ণ দ্বার দিয়া এই ভীষণ জনতা একেবারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় এক ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্, তাঁহারা এই জনতার মধ্য দিয়া জোর করিয়া প্রবেশ করিতেন। দুর্ব্বলেরা, শ্রীহরির নাম করিতে করিতে ১ ঘণ্টা কাল বাহিরে অপেক্ষা করিয়া, জনতা কমিলে তবে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিতেন।

প্রথম গৃহে প্রবেশ করিয়াই কতকগুলি পুরাতন ছবি ও কাচ, মাটি, পিতল, কাঁসা এবং চিনে মাটির নির্ম্মিত বাসন ও মূর্ত্তি দেখিলাম। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে প্রায় ১ ঘণ্টার বেশী সময় ঐ ঘরেই কাটিয়া গেল। এইরূপ ঘর প্রায় ২০ টার কম নহে। পাঠক ভাবিয়া লউন, যদি প্রত্যেক ঘরে আধ ঘণ্টা করিয়া দেখিতে সময় লাগে, তবে ১০ ঘণ্টার কমে মোটামুটি রকমে সব ঘরগুলি দেখা হয় না। কাজেই ৩টা হইতে ৯টা, এই ৬ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেখা একেবারে অসম্ভব। ভাল করিয়া সমস্ত দেখিতে হইলে ৩।৪ বার দর্শনের কমে কিছুতেই হইত না।

দ্বিতীয় গৃহে বিভিন্ন প্রদেশীয় বস্ত্র, তৃতীয় গৃহে সূচী কর্ম্মজাত শিল্প বিন্যাস, চতুর্থ গৃহে অস্ত্ররাজি, পঞ্চম গৃহে লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত কারুকর্ম্ম ইত্যাদি। কোন গৃহে দেশীয় কৃষিকুশল যন্ত্রসমূহ। কোন গৃহে বস্ত্র বয়নের তন্ত্র। কোন গৃহে

সতরঞ্চ, গালিচা ইত্যাদি। প্রায় সমস্ত গৃহই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শিল্প ও শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখিয়া বড়ই আশার সঞ্চার হইত। বর্ত্তমান ভারতসন্তানগণ যদি আপনাদের অবস্থা যথার্থ বুঝিয়া থাকেন ও আপনার দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনই যদি তাঁহাদের একান্ত ব্রত হয, তাহা হইলে দেশে যাহাতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসার বহুল প্রসার ও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া তাঁহাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসিগণ কালে ধর্ম্মঅর্থকামমোক্ষের অধিকারী হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রথমে অন্ন সংস্থান, তারপর ধর্ম্মানুগত থাকিয়া উত্তম উত্তম ঐহিক সুখের ভোগ না হইলে, ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের আশা অসম্ভব। কারণ, ভোগ ব্যতীত যথার্থ ত্যাগ হয় না। মোক্ষ যদি ত্যাগমূলক হয়, তবে সে মোক্ষের অধিকারী হইতে হইলে, প্রথমে কিছু ভোগের আবশ্যক। অন্নাভাবে শীর্ণ ব্যক্তির অন্নের চিন্তাই প্রবল; তাহাকে মোক্ষোপদেশ কঠিন প্রস্তরখণ্ড দানের ন্যায় হইবে। ভারতে এক কালে এই ভোগের প্রাচুর্য্য ছিল বলিয়াই এই ভারতভূমিতে মহাত্যাগী তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের আবির্ভাব হইযাছিল। এখন সে ভোগও নাই, কাজেই তত্ত্বজ্ঞানেরও তেমন স্ফূর্ত্তি নাই। অতএব বর্ত্তমান সময়ে ভারতের দুর্ভিক্ষমুখে কিছু অন্নদান আবশ্যক। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম, ইহাই আমাদের কর্ম্ম।

বম্বে সহরটী বাণিজ্য প্রধান। এখানে বড় বড় ডক্, বড় বড় সওদাগর, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য, ভারি ভারি কল কারখানারই প্রাদুর্ভাব। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি এখানে বাণিজ্যোপলক্ষে আসিয়া থাকে। গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় ও পার্সী, এই জাতীয় লোকের সংখ্যাই অধিক। সাধারণতঃ সকলে গুজরাটী ভাষাই কহিয়া থাকে। এখানে ট্রামের নিয়ম সুন্দর। এক আনা দিলেই যতদূর ইচ্ছা যাওয়া যায। দুই, তিন বা ততোধিক বার ট্রাম পরিবর্ত্তন করিলেও ঐ এক আনা মাত্র ভাড়া। গাড়ীগুলি সমস্তই রবার টায়ারের। বড় বড় ৬ তলা ৭ তলা বাড়ী। এখানে বাড়ীর ভাড়া অত্যন্ত অধিক। খাওয়া দাওয়ার খরচও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী লাগে। এখানকার পার্সীরা অত্যন্ত ধনী। যে অতি গরীব, তাহারও ২০।২৫ হাজার টাকার বিষয় আছে। বম্বে সহরের সমস্ত ভাল ভাল জায়গাই পার্সীদের দখলে। এখানে ইউরোপীয় প্রতাপ একেবারে নাই বলিলেই হয়। সাহেবেরা দেশীয়দিগকে যথেষ্ট খাতির করে। বোধ হয়, পার্সী, গুজরাটীর ধনবল ও বাণিজ্যবলই ইহার কারণ। পার্সীদের সামাজিক নিয়ম এক রকম ভাল খিচুড়ি। কতকটা সাহেবী, কতকটা হিঁদুয়ানী ও কতকটা মুসল-

মানী মিশিয়া একটা রকম। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় সাহেবদেরই মত, কেবল পুরুষদের মাথার টুপিটী ও গায়ের কোটটী একটু বিশেষ রকমের ও মেয়েদের গায়ের ঘাগরার উপর একখানি পাতলা রেশমী কাপড় বেষ্টিত মাত্র। মেয়ে পুরুষ সকলেই সুশিক্ষিত। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। কন্যা বয়স্থা হইলে আপনার স্বামী পছন্দ করিয়া বিবাহ করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ আছে। বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষে সদ্ভাব না হইলে পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিতে পারে। মেয়েরা সমস্ত গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করে, লেখাপড়া করে, অতি উৎকৃষ্ট সেলাই ও ছুঁচের কাজ করে এবং আবশ্যক হইলে হাটবাজারও করিয়া থাকে। অগ্নি ও সূর্য্য ইহাদের প্রধান উপাস্য। ইহাদের প্রত্যেক মন্দিরে একটী বেদীর উপর ধাতুময় আধারে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। ঐ অগ্নিতে মধ্যে মধ্যে চন্দন কাষ্ঠের চেলা দিয়া আগুনটীকে সচেতন রাখে। ইহারা প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ঐ অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া জপ, ধ্যানাদি করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে গিয়া অস্তগামী সূর্য্যের ভজনা করে। অগ্নি, ইহাদের কাছে এমন শুদ্ধ ও পবিত্র জিনিস যে, অগ্নিতে ইহারা শব দেহ দাহ করে না। ম্যালাবার পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরদেশে কয়েকটী প্রকাণ্ড অনাবৃত ছাদের উপর মৃতশরীর স্থাপন করে। শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীরা ঐ শরীর অচিরাৎ খাইয়া শেষ করে। এই প্রকাণ্ড ছাদ সকলের নাম Towers of Silence। আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া এক দিন ঐ স্থানটী দেখিতে গিয়াছিলাম। বম্বে নগরস্থ একটী পার্সীর সহিত আমাদের আলাপ হয়। সেই ভদ্রলোকটী আমাদিগকে ঐ স্থান (Towers of Silence) যাইবার পাস্ সংগ্রহ করিয়া দেন। বিনা পাসে পার্সী ভিন্ন ঐ স্থানে প্রবেশের অধিকার নাই। পাস্ দেখাইবামাত্র একটী লোক সসম্ভ্রমে আমাদিগকে পাহাড়ের উপর লইয়া গেল এবং সমস্ত ছাদগুলি নীচে হইতে একে একে দেখাইল। ছাদের উপর কেহ উঠিতে পায় না, এমন কি পার্সী মুদ্দাফরাস্ (under-takers) ভিন্ন অপর পার্সীরাও ছাদের উপর উঠে না। সর্ব্বসমেত ৫টী ছাদ আছে। উহার মধ্যে ২টী ছাদ ২টী সম্ভ্রান্ত পার্সী পরিবারের নিজব্যয়ে নির্ম্মিত। উহার উপর তাহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগেরই মৃত দেহ রক্ষিত হয়। অপর ৩টী সাধারণের; চারিদিকে বৃক্ষোপরি শত শত শকুনি, গৃধিনী ও কাক বসিয়া আছে। মৃত শরীর রাখিবামাত্রই উহারা অল্প সময় মধ্যেই খাইয়া শেষ করে। উহারা ঐ স্থানের পোষা। পরিদর্শকদিগের অনুমানের সুবিধার জন্য একটী ছাদের আদর্শ (Model) রাখা আছে। ছাদের উপর বৃত্তাকারের

তিনটী স্থান আছে। বৃত্ত তিনটীর কেন্দ্রস্থলে একটী গভীর কূপ আছে। বড় বৃত্তটীর ব্যাসার্দ্ধকে ৩ ভাগ করিয়া মধ্যে আরও দুইটী বৃত্তাকার স্থান আছে। সর্ব্ব-দূরবর্ত্তী বৃত্ত ও ২য় বৃত্তের পরিধির অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে সারি সারি ৪।৫ হাত লম্বা অর্দ্ধ হাত গভীর ও ২ হাত চওড়া অনেকগুলি গর্ত্ত আছে। ঐ সকল গর্ত্তে পুরুষদের শরীর রক্ষিত হয়। ঐরূপ ২য় ও ৩য় বৃত্তের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে ঐরূপ সারি সারি গর্ত্তের মধ্যে স্ত্রীলোকদের শরীর ও ৩য় বৃত্ত ও কেন্দ্রস্থ কূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে বালকবালিকা-দিগের শরীর রক্ষিত হয়। গৃধিনীগণ মাংস নিঃশেষিত করিবার পরই জলের দ্বারা অস্থি সকল ধৌত ও একত্রিত হইয়া কূপে নিহিত হয়। ঐ কূপমধ্যে দ্রাবক দ্রব্য যোগে অস্থিসকলকে দ্রবীভূত করা হয়। ঐ দ্রবময় অস্থি কৃত্রিম নালার মধ্য দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানে কোনরূপ দুর্গন্ধ নাই। পর্ব্বতশৃঙ্গে একটী অগ্নি-মন্দির আছে ও একজন পুরোহিত অনবরত ঐ স্থানে বাস করেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ বিচার নাই। গো-মাংস ভিন্ন অপর সমস্ত ভক্ষ্য মাংসই খাইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই উপবীত আছে। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহারা উপবীত স্কন্ধে রাখে না। কোমরের উপর ঘুন্‌সীর ন্যায় জড়াইয়া রাখে। ইহারা খুব বদান্য ও স্বজাতিপোষক। স্বজাতির উপকারের জন্য সঙ্গতিপন্নরা বহু দাতব্য চিকিৎসালয় অনাথালয়, দানশালা ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

বম্বে অবস্থান কালে আমরা এলিফাণ্টা (Elephanta) নামক দ্বীপের পর্ব্বতগুহা দেখিতে গিয়াছিলাম। এলিফাণ্টা এপোলো বন্দর হইতে ৭ মাইল দূরে। পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিলে ষ্টীম্ লাঞ্চ (Steam launch) যোগে যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনেক খরচ পড়ে। কোম্পানি লাঞ্চের এক দিনের ভাড়া প্রায় ১৫০ টাকা। ১০ জন মিলিয়া গেলেও প্রত্যেকের ১৫৲ টাকা করিয়া লাগে। এপোলো বন্দরে পালওয়ালা নৌকা (Sailing boat) পাওয়া যায়। একখানি নৌকার এলিফাণ্টা যাতায়াতের ভাড়া ৪।৫ টাকার অধিক নয়। অনুকূল বায়ু পাইলে ৬।৭ ঘণ্টার মধ্যেই যাওয়া আসা হয়, কিন্তু হাওয়ার সুবিধা না পাইলে ১০।১২ ঘণ্টা লাগে। এক্‌জিবিসন উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ হইতে ৩টী বাঙ্গালী বাবু, আমরা যে বাসায় থাকিতাম, সেই বাসায় আসিয়াছিলেন। আমরা এলিফাণ্টা দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি শুনিয়া তাঁহারাও যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাবু ৩টী ও আমরা ২জনে মিলিয়া এপোলো বন্দর হইতে একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। যাতায়াতের ৪৲ টাকা ভাড়া স্থির হইল। বেলা ৯ টার

সময় নৌকা ছাড়িল। হাওয়াটা খুব অনুকূল না হইলেও আমরা ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই এলিফাণ্টায় পৌঁছিলাম। বাবু ৩টী বাঙ্গালী হইলেও বরাবর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করা প্রযুক্ত নৌকারোহণে অভ্যস্ত ছিলেন না। তরঙ্গময় সমুদ্রের উপর দিয়া দোদুল্যমান একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া যাইতে যাইতে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গেল। বন্ধুর ও আমার নৌকা চড়া অভ্যাস ছিল বলিয়া কোনরূপ ভয় হয় নাই। আমরা বরং আরও স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিলাম। সমুদ্রের দৃশ্যটী অতি সুন্দর। মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও বৃক্ষতৃণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতল ক্ষেত্র দেখিয়া অতীব আনন্দ হইতে লাগিল। আমাদের নিকট একটী দূরবীক্ষণ (Binocle) ছিল—মাঝে মাঝে সেইটী চোখে লাগাইয়া তীরস্থ অট্টালিকা, সমুদ্রবক্ষস্থিত নৌকা, জাহাজ ও পাহাড় সকল দেখিতে দেখিতে এলিফাণ্টা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ দিন কংগ্রেস্ দর্শকগণের অনেকে নৌকা ও লাঞ্চ যোগে এলিফাণ্টা দেখিতে আসিয়াছিলেন। যাত্রিগণের নামিবার সুবিধার জন্য দ্বীপ হইতে প্রায় ১৫০।২০০ হাত দূর সমুদ্র গর্ভ পর্য্যন্ত একটী সরল প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর গাঁথা আছে। প্রাচীরটী উচ্চে ৪।৫ হাত ও চওড়া ২ হাত হইবে। নৌকা হইতে নামিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া যাইবার সময় বাবু তিনটীর মধ্যে এক-জনের হঠাৎ মাথা ঘুরিতে লাগিল; তিনি প্রাচীরের উপর বসিয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমার বন্ধু তাঁহাকে অতি সাবধানে ২ হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া উপর পর্য্যন্ত আনিয়া দিলেন। গুহাগুলি পাহাড়ের উপরে, প্রায় ২।৩ শত ফুট চড়াই করিয়া উঠিতে হয়। উঠিবার জন্য (sedan-chair) চেয়ারের বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেককে চারি আনা করিয়া দিতে হয়। আমাদের সঙ্গী ২টী বাবু চেয়ারে করিয়া উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখি, এক সাহেব আফিস্ করিয়া বসিয়া আছেন। শুনিলাম, তিনি নাকি ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক দর্শকগণের নিকট হইতে চারি আনা করিয়া ফিঃ আদায় করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ২ জনে ॥০ আট আনা দিয়া গুহা দেখিতে যাইলাম। সঙ্গিগণও ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুহাগুলি অতি অদ্ভুত। একটী পাহাড়ের এক পার্শ্ব গুহায় পূর্ণ। গুহা-গুলিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম, একটী বৃহৎ হল্ পাহাড়ের গায়ে খোদিত। হলটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০।৬০ ফুট ও প্রস্থে প্রায় ৪০ ফুট হইবে। মধ্যে মধ্যে ২।১টী প্রস্তরের থাম দ্বারা ছাদটী রক্ষিত। ঐ থামের অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বোধ হয় উপস্থিত ৪।৫টী মাত্র খাড়া আছে। এই হলের মধ্যে সম্মুখে একটী ব্রহ্মার খোদিত মূর্ত্তি। ব্রহ্মার এক পার্শ্বে শিব ও অপর পার্শ্বে বিষ্ণু।

ব্রহ্মার এক হাতে একটী পদ্ম, বিষ্ণুর এক হাতে একটী দাড়িম্ব ও শিবের এক হাতে একটী সর্প। এই তিনটী মূর্ত্তির হস্তস্থিত ঐ তিনটী দ্রব্য যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের পরিচায়ক। ঐ হলের চারি কোণে ও সম্মুখস্থ প্রধান মূর্ত্তিগুলির উভয় পার্শ্বে অনেক খোদিত পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তি আছে। প্রথম হলটীর দুই দিকে আরও ২টী গুহা আছে। সে গুলিও দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট ও প্রস্থে ১০।১২ ফুট হইবে। তাহার মধ্যেও অনেক মূর্ত্তি আছে। তৃতীয় গুহাটীর প্রাঙ্গণে একটী জলের ঝরণা আছে। তাহার জল অতি উপাদেয়। গুহাগুলির পরিবর্ত্তন অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, উহারা প্রায় ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিযাছে। মূর্ত্তিগুলিরও অনেক অঙ্গহানি হইয়াছে। বোধ হয়, ভিক্ষুদিগের নিমিত্ত বৌদ্ধ রাজগণ কর্ত্তৃক ঐ গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। অনেকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির ন্যায়। আমার বন্ধু গুহাগুলির ভিন্ন ভিন্ন ফটো লইলেন। গুহা দেখিতে ১ ঘণ্টা সময় লাগিল। একটু এদিক ওদিক বেড়াইয়া কিছু জলযোগ করিয়া, সঙ্গিগণের সহিত একত্রে নৌকায় আরোহণ করিযা, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই এপোলো বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এপোলো বন্দরে পৌঁছিয়া, তথা হইতে বম্বে সহরের প্রসিদ্ধ জাহাজের আড্ডা প্রিন্সেস্ ডক্ (Princess dock) দেখিতে যাইলাম। ডকে বড় বড় জাহাজে মাল বোঝাই হইতেছে, দেখিলাম। এদিক ওদিক সমস্ত ঘুরিয়া দেখিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইহার দুই এক দিন পরে আমরা কেনেরি (Kenheri) গুহা দেখিতে গিয়াছিলাম। কেনেরি, বম্বে সহর হইতে ২৮ মাইল দূরে। বম্বে হইতে (B. B. C. I.) বি, বি, সি, আই রেলওয়ে দিয়া ২২ মাইল দূর বরিব্লি ষ্টেসনে নামিয়া, ৬ মাইল হাঁটা পথে গেলে, কেনেরি গুহায় যাওয়া যায়। ৯ টার মধ্যে আহার করিয়া সন্নিকটস্থ গ্রাণ্টরোড্ ষ্টেসনে চড়িয়া, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বরিব্লি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তথা হইতে রাস্তা দেখাইবার জন্য একটী কুলি লওয়া গেল। প্রায় ৪ মাইল পথ যাইবার পর আমরা একটী ভুল পথে চলিয়া যাইলাম। আমাদের কুলিটী রাস্তা চিনিত না। ভুল পথে ২ মাইল যাইবার পর একটী জঙ্গলে পৌঁছিয়া কতকগুলি কাঠুরিয়ার সহিত দেখা হইল। ইঙ্গিতে তাহাদিগকে কেনেরির পথ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল, আমরা পথ ভুলিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তখন আমরা আবার সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া, যে স্থানটীতে পথ হারাইয়াছিলাম, সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই স্থানে রাস্তাটী ২ ভাগ হইয়াছিল ; সুতরাং অপর রাস্তাটী কেনেরি যাইবার পথ নিশ্চয় জানিয়া, সেইটীতেই যাইতে লাগিলাম।

প্রায় ২ মাইল পাহাড়ে চড়াই করিয়া অবশেষে কেনেরি গুহায় পৌছিলাম। সমস্ত পথটীই প্রায় জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছিল। রৌদ্র ও পাহাড় চড়াই বশতঃ আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কেনেরিতে পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গুহা দেখিতে যাইলাম। একটী পাহাড়েব একদিক একেবারে গুহায় পূর্ণ। প্রথমে একটী বৃহৎ হল, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ হাত ও প্রস্থে প্রায় ১৫।১৬ হাত; উপরটী খিলান। হলের মধ্যে একটী বৃহৎ স্তূপ। এই প্রথম গুহাটীর পার্শ্বে আরও ২।৩টী ছোট গুহা আছে। তাহাদেব প্রত্যেকের মধ্যেও একটী একটী স্তূপ আছে। এই নিম্নস্থ গুহাগুলি দেখিয়া আমরা ইহার উপরস্থ গুহাসকল দেখিতে যাইলাম। ইহার উপরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উচ্চ পর্য্যন্ত সমস্ত পাহাড়টী গুহাময়। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটী চৌকিদার ও ৩।৪টী কুলী এখানে সর্ব্বদা থাকে। আমবা অনেকগুলি গুহা দেখিলাম। গুহাগুলির সম্মুখে সংখ্যা লেখা আছে। সর্ব্বসমেত ১২৫টী গুহা আছে। স্তূপাদি দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, ঐ সকল গুহাও বৌদ্ধরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুহাগুলি ধ্যানোপযোগী, প্রত্যেক গুহার ভিতরে পাহাড়ের গায়ে একটী করিয়া উচ্চ বেদী আছে। সমস্ত গুহা সমায়তন নহে। প্রত্যেক গুহার সম্মুখে একটী করিয়া চৌবাচ্ছা আছে। বৃষ্টির জল পাহাড়ের উপর দিয়া আসিয়া এই সকল চৌবাচ্ছায় সংগৃহীত হয়। জল অতি পরিষ্কার। আমরা একটী চৌবাচ্ছাব জল পান কবিয়াছিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরিয়া গুহাগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া ফিরিবার প্রস্তাব করা গেল। পাহাড়েব উচ্চ শিখর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। আমার বন্ধুর ইচ্ছা যেন ১ বাত্রি এখানে কাটাইয়া যান। কিন্তু আমাদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ের একটী বাবু ছিলেন, তাঁহার পাছে অসুবিধা হয় ভাবিয়া, আমরা সন্ধ্যায় প্রায় ১ ঘণ্টা পুর্ব্বে নামিতে আরম্ভ কবিলাম। নামিবার সময় বেশী দেরি হইল না। ২ ঘণ্টার মধ্যেই বেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। ৭ টার গাড়ীতে চড়িয়া ৮ টার পরই বম্বে পৌছিলাম।

বম্বে সহরে আমরা ১৫ দিন ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে নগরের ভিতর ও তন্নিকটস্থ স্থান সমূহে যাহা কিছু দর্শনযোগ্য আছে, সকল দেখিয়া লওয়া গেল। অতঃপর আমি কার্লি কেভ দেখিয়া, পুনা ও শোলাপুর হইয়া, মান্দ্রাজে আসিবার স্থির করিলাম। আমার বন্ধু শোলাপুর পর্য্যন্ত আমার সহিত থাকিয়া নাসিক, এলোরা ও অজন্তা দর্শন করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বম্বে অবস্থান কালীন শোলাপুরের ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার আমাদের পরমবন্ধু বাবু

হরিপদ মিত্রের সহিত দেখা হয। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মাদ্রাজ যাইবার পথে তাঁহার বাসায় ২।৪ দিন থাকিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তিনি মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইযাছিলেন। শোলাপুরের সন্নিকটে বার্সিরোড নামক রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট তাঁহার সেই সময়ে থাকিবার কথা। তাঁহার পত্র পাইযা সেইথানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্থির হইল। বম্বে হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে কার্লিগুহা দেখিবার বন্দোবস্ত করা হইল। জি, আই, পি, রেলওযে দিয়া আমবা যাত্রা করিলাম। কার্লিষ্টেসন বম্বে হইতে ১০০ মাইলের কিছু অধিক। রাত্রি ১১ টার গাড়ীতে চডিযা ভোব ৫টার সময আমরা কার্লিষ্টেসনে পৌছিলাম। ষ্টেসনে পৌছিয়া ষ্টেসন-মাষ্টারের নিকট কার্লিগুহার ঠিকানা লওয়া গেল। ষ্টেসন হইতে গুহা প্রায় ৪ মাইল দূরে একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ৩॥ মাইল পথ সমতল ক্ষেত্রের উপব, আধ মাইল পাহাড়ের উপর চড়াই। ষ্টেসনে পৌছিয়া কাপড় চোপড ষ্টেসন-মাষ্টারের ঘরে রাখিযা আমরা গুহা দেখিতে চলিলাম। পাহাডের পাদদেশে পৌছিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা একটী ছোট গুহা দেখা গেল। চডাইটী একেবারে খাডা, অনেক কষ্টে উপরে উঠিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবুটীর সহিত আলাপ করা গেল। বাবুটী, আমরা বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছি শুনিয়া অতি যত্ন সহকারে গুহাগুলি দর্শন করাইলেন। এখানে একটী গুহাই বড় ও দর্শনযোগ্য। এ পর্য্যন্ত যতগুলি গুহা দেখিয়াছি, তাহার একটীও এত বৃহৎ ও এত শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট নয়। গুহাটী একটী দীর্ঘ হলেব ন্যায়, উপরটী খিলান। খিলানের গায়ে গোল গোল মোটা তক্তা মাবা। শুনিলাম, শব্দেব প্রতিধ্বনি রোধ করিবার জন্য এই ভাবে খিলানের গায়ে তক্তা মারা আছে। তক্তাগুলি অনেক দিনের হইলেও দেখিতে নূতন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০ খানা তক্তা ২।৩ হাত অন্তর মারা। ভিতরে একটী বৃহৎ স্তূপ। তাহার উপর বসিবার আসন। হলটীর ধারে পাহাড়ের গা হইতে ২ হাত দূরে ৪।৫ হাত অন্তর কতকগুলি থাম আছে। স্তূপটীর গায়ে চারি দিকে প্রদীপ রাখিবার স্থান। শব্দরোধের নিমিত্ত খিলানের গায়ের তক্তা, স্তূপ, আসন, হলের সুদীর্ঘতা দৃষ্টে বোধ হয়, কোন সময় এই গুহামধ্যে সন্ন্যাসিগণের সভা আহূত হইয়া, ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাদি হইত। সম্প্রতি এই গুহার সম্মুখে জনৈক শেঠ্ একটী ভগবতীর মন্দির স্থাপন করিযাছে। এই বৃহৎ গুহার পশ্চাদ্দিকে আরও ২টী গুহা আছে। সেগুলি অনেক ছোট ও ছাদ খিলান নহে। গুহাগুলি দেখিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুটীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। আমাব বন্ধু বড় গুহাটীর ২ খানি ফটো লইয়াছিলেন।

ষ্টেসনে আসিবার পথে একটী গ্রাম পাওয়া যায়। সেই গ্রামে কিছু পুরী ভাজাইয়া খাইয়া লওয়া গেল। বেলা ১২ টার পর আমরা ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিনই আমরা পুনা আসিবার স্থির করিলাম। পুনার ট্রেণ ৩ টার সময়। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নিকটস্থ ভোজা নামক গুহা দেখিয়া আসিলাম। ভোজা গুহাটী অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। এই গুহাটী দেখিতে ঠিক কার্লিগুহার মত। তবে অনেক ছোট। ইহার পার্শ্বে ২।৩টী ছোট গুহা আছে। প্রত্যেক গুহার সম্মুখে একটী করিয়া জলের চৌবাচ্চা। অত্যন্ত রৌদ্রে আমাদের বড় পিপাসা পাইয়াছিল। মনের সাধে চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল পেট ভরিয়া খাওয়া গেল। ভোজা কেভের ঠিক সম্মুখস্থ পাহাড়ের উপর শিবজীর দুর্গ ও দপ্তালয় এখনও বর্ত্তমান। ভোজা হইতে নামিয়া আসিবার পথে ষ্টেসনের সন্নিকটে বিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মার চিত্রশালা। আমরা চিত্রশালা দেখিবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু চিত্রশালার ম্যানেজার সাহেবটী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ থাকায় চিত্রশালার কার্য্য দেখা হইল না। আমাদের ট্রেণের সময় আগতপ্রায় দেখিয়া, সাহেবের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ষ্টেসনে পৌছিবামাত্রই ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। পুনা, কার্লি হইতে ৪।৫টী ষ্টেসনের পরই। আমরা ৪টার সময় পুনায় পৌছিলাম।

পুনা একটী ঐতিহাসিক নগর। ইহা পেশওয়াদিগের রাজধানী। এক সময়ে ইহার কতই ঐশ্বর্য্য, কতই শ্রী ছিল। এখন তাহার কিছুমাত্র নাই, কেবল কতকগুলি ভগ্ন প্রাসাদমাত্র সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানকার মহারাষ্ট্রীয়েরা নষ্টস্বাতন্ত্র্য হইলেও অত্যন্ত স্বদেশপ্রিয়। এখানে আমরা ২ দিবস মাত্র ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রগণের বাসায় থাকিয়া ২ দিনের মধ্যে দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিয়া লওয়া হইল। পেশওয়া বাজিরাওয়ের পার্ব্বতী-মন্দির একটী দেখিবার বিষয়। ঐ মন্দির একটী পাহাড়ের শিরোভাগে অবস্থিত। পাদদেশ হইতে মন্দির পর্য্যন্ত বড় বড় প্রস্তরের সিঁড়ি। মন্দিরটী কারুকার্য্যপূর্ণ, ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে ৪।৫ মাইল দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। মন্দিরের অপর পার্শ্বে পাহাড়ের উপর একটী উচ্চ প্রাসাদ আছে। বজ্রপাতে উহার অনেক অংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নদীসঙ্গম প্রভৃতি দেখিয়া, পুনা হইতে বার্সিরোড নামক ষ্টেসনে যাত্রা করা গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বার্সিরোড্ ষ্টেসনে আমাদের বন্ধু বাবু হরিপদ মিত্র মহাশয়ের থাকিবার কথা ছিল। বার্সি-রোড্ পুনা হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব। সন্ধ্যার সময় বার্সিরোড ষ্টেসনে

পৌঁছিয়া উক্ত বাবুর অনুসন্ধানে শুনিলাম, তিনি আমাদের জন্য তথায় ২ দিন অপেক্ষা করিয়া, তথা হইতে ২২ মাইল দূর বার্সিটাউন ষ্টেসনে গিয়াছেন। ক্রমে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। বার্সিটাউন যাইবার ট্রেণ পরদিন সকালে। ষ্টেসনের বিশ্রাম-গৃহে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া পরদিন বার্সিটাউনে পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলাম, হরিপদ বাবু ৩০ মাইল দূর ইড়সী নামক স্থানে পরিদর্শনার্থ গিয়াছেন। তাঁহার তাঁবু বার্সিটাউনেই ছিল। তাঁবুতে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন ইড়সী যাত্রা করা গেল। একখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া ২২।২৩ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া বাকী রাস্তা হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যার পর উক্ত বাবুর বাসায় পৌঁছিলাম। তাঁহার তাঁবুর জনৈক ভৃত্য আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল। সে পূর্ব্বে পৌঁছিয়া বাবুকে সংবাদ দিবামাত্র তিনি ১ মাইল দূর পর্য্যন্ত চৌকিদার পাঠাইয়া আমাদিগকে সসম্ভ্রমে বাঙ্গলায় লইয়া গেলেন। পৌঁছিয়াই দেখি, গরম জল তৈয়ারি। গরম জলে হাত পা ধুইয়া ও অর্দ্ধস্নান করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে হরি বাবুর সহিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমে চা ও দস্তুর মত জলযোগের ব্যবস্থা হইল। পরম যত্নের সহিত তাঁহারা আমাদিগকে খাওয়াইলেন। জলখাবার কিছুক্ষণ পরেই নানাবিধ ব্যঞ্জন ও দুগ্ধাদির যোগে অন্ন আহার করা গেল। সমস্ত দিনের পর অন্ন যেন অমৃতের ন্যায় লাগিল। আহারান্তে পুনরায় কথাবার্ত্তার পর একটী বড় ঘরে উত্তম বিছানার উপর সুনিদ্রা দিয়া শ্রান্তিদূর করা হইল। পরদিন প্রত্যূষে হরিবাবু আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটী প্রাচীন মন্দির দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। সমস্ত দিন সৎকথা ও সদালাপে কাটিয়া গেল। পর দিন তথা হইতে সকলে পুনরায় বার্সিটাউনে আসিলাম। সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া তৎপরদিন প্রত্যূষে আবার বার্সিরোড্ ষ্টেসনে আসা হইল। বার্সিরোড্ হইতে পাণ্ডারপুর নিকট। আমরা পাণ্ডারপুরের এত সন্নিকটে আসিয়াছি বলিয়া, হরিবাবু আমাদিগকে পাণ্ডারপুর যাইবার অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডারপুর, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রধান তীর্থ। উত্তর ভারতে কাশী যেমন প্রধান ও প্রসিদ্ধ তীর্থ, দক্ষিণ ভারতে পাণ্ডারপুরও তদ্রূপ। পাণ্ডারপুর, শোলাপুরের একটী সব-ডিভিসন। উহা হরিবাবুর এলাকাধীন। আমরা তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। আরও ভাবিলাম, এরূপ একটী পবিত্র স্থানের এত নিকটে আসিয়া দর্শন না করাও অতি হীনবুদ্ধির কার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ চৌকিদার পাঠাইয়া মেল্ টোঙ্গাওয়ালাকে ডাকাইয়া আনিলেন ও পরদিন আমাদিগকে পাণ্ডারপুর লইয়া যাইবার স্থির করিয়া দিলেন। পাণ্ডারপুরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকই তাঁহার বন্ধু।

ঐ সময়ে পাণ্ডারপুরে প্লেগের অত্যন্ত প্রকোপ ছিল। সেই জন্য সহরে আমাদিগকে রাখা তাঁহার ইচ্ছা হইল না। পাণ্ডারপুরের মিউনিসিপাল সেক্রেটারী বাবুর বাড়ীতে আমাদিগকে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উক্ত সেক্রেটারী বাবু সহরের বাহিরে থাকিতেন ও অতি ভদ্র লোক। হরিবাবুর পত্র পাইয়া তিনি, ২ মাইল দূর পর্য্যন্ত নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, নিজ বাসায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আমরা হরিপদ বাবুর সহিত ৪ দিন ছিলাম। সেই ৪ দিন কেবল সৎ-চর্চ্চাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে ভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ও ইঁহার অনুরোধে অনেকদিন ইঁহার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে স্বামীজির সহিত আলাপে কি কি কথা হইয়াছিল, তাহার চর্চ্চাতেই আনন্দে দিন কাটিয়াছিল। ঐ ৪ দিবসের মধ্যে বাজে কথা খুব অল্পই হইয়াছিল। হরিবাবুর স্বামীজির উপর এমনই ভক্তি ও শ্রদ্ধা যে, যখন স্বামীজির কথা হইত তখন তিনি আনন্দে বিভোর হইতেন। বিশেষ আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিলে যেরূপ আনন্দ ও প্রীতি হয়, হরিবাবুর বাসায় তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল। তিনি বালকের ন্যায় সরল ও গুরুভক্তিতে পূর্ণ।

পাণ্ডারপুরের বিশেষ বৃত্তান্ত ১৩১১ সালের ১লা বৈশাখের উদ্বোধনে বাহির হইয়াছে। এই জন্য তাহার বিবরণ আর বেশী করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। পাণ্ডারপুর, বার্সিরোড্ ষ্টেসন হইতে ৩১।৩২ মাইল। মেল টোঙ্গায় যাইলে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছান যায়। মেল টোঙ্গায় এক এক জনের ভাড়া ১।০ মাত্র। পাণ্ডারপুর ভীমা নদীর উপর অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকাযোগে নদী পার হইয়া পাণ্ডারপুর যাইতে হয়। অন্যান্য সময়ে নদীতে খুব কম জল থাকে। গাড়ীতে চড়িয়াই নদী পার হওয়া যায়। মিউনিসিপাল সেক্রেটারি মহাশয়ের প্রেরিত গাড়ী নদীর এপারেই আসিয়াছিল। টোঙ্গা হইতে নামিয়া সেই গাড়ীতে চড়িয়াই নদী পার হওয়া গেল। বেলা ১১॥০ টার সময় তাঁহার বাসায় পৌছিলাম। তিনি একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। পৌছিবামাত্র সযত্নে আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বিশ্রামের পর স্নান ও সকলে একত্র আহার করা হইল। বৈকালে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইলেন। স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়, সেক্রেটারী বাবুর বাসাতেই থাকিতেন। তিনি সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত আমাদের আলাপ করাইয়া

দিলেন। ২।৩ ঘণ্টা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার পর সকলে চলিয়া গেলেন।

পরদিন হেড্ মাষ্টার বাবু আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া মন্দির দি দর্শন করাইলেন। ইঠোবা, রুক্‌মায়ী, মারুতি, পুণ্ডলিক, বিষ্ণুপদ, পদ্মাবতী, গোপালপুর প্রভৃতির মন্দির দর্শন করা হইল। স্থানটী অতি পবিত্র। একস্থানে একত্রে এত মন্দির অতি অল্পই দেখা যায়। ইঠোবা ও রুক্মিণী দেবীর মন্দির অতি উচ্চ ও অতি প্রাচীন। এই সমস্ত মন্দিরের চিত্র এবং ঐতিহাসিক ও অন্য ন্য বিবরণ উপরোক্ত উদ্বোধন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত মোটামুটি দেখিতে ৪।৫ ঘণ্টা লাগিল। হেড্ মাষ্টার বাবুটী অতি যত্ন ও ঔৎসুক্যের সহিত সমস্ত দর্শনযোগ্য মন্দির ও স্থানগুলি আমাদিগকে দেখাইলেন। পাণ্ডারপুরে একটী রামানুজসম্প্রদায়ের আখড়া আছে। ঐ আখড়ার মোহান্তজীকে দর্শন করিলাম। উঁহার বয়স ১২০ বৎসর! শরীর একেবারে অথর্ব্ব। শিষ্যেরা সর্ব্বদা অতি ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকটে যাইবার পর পদসঞ্চারে বুঝিলেন, তাঁহাকে কেহ দর্শন করিতে আসিয়াছে। অতি কষ্টে কম্পমান হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং রামানুজাচার্য্যই আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পাণ্ডারপুরে আমরা ৩ দিন ছিলাম। তথা হইতে শোলাপুরে আসিয়া মুরারজী গোকুলদাসের কাপড়ের কলের উয়িভিং মাষ্টার (Weaving master) মহাত্মা ডোঙ্গোর সিংহের বাসায় ২ দিন ছিলাম। তৎপরে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলাম। আমার বন্ধু, শোলাপুর হইতে ফিরিয়া নাসিক, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি দর্শন করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

আদর্শ।

কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় অনেকেই ভগবানের দোহাই দিয়া থাকেন। কেহ বা কোন বিশেষ সুখসমৃদ্ধিকর বিষয়লাভে ঠাকুর দেবতার পূজা দেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, আমাদের দৈনিক কার্য্যকলাপে ও জীবন সংগ্রামের ঘটনাসমূহের মধ্যে ভগবানের কোন সম্পর্ক নাই?

* এই প্রবন্ধ, গত ১লা আগষ্ট ১৯০৮ তারিখে, কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

গীতা, ১০ম অধ্যায়, ৪২ শ্লোক।

গীতার এই শ্লোকের অর্থে মোটামুটি বুঝা যায় যে, যদিও লোকেব চক্ষে ভগবান্ কোথাও বা বিশিষ্টরূপে প্রকাশমান, কোথাও সেইরূপ নহেন, তত্রাচ তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বসময়ে সমভাবেই বর্ত্তমান আছেন। মানুষ, স্বীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যতদুর যাইতে পারে, ততদূর আর ভগবানের অস্তিত্বের প্রয়োজন বোধ করে না। আমরা সকলেই প্রত্যহ খাইদাই, কাযকর্ম্ম করি, কিন্তু ঐ রকম কাযকর্ম্মের মধ্যে ভগবানের কর্ত্তৃত্বটা যে কি ভাবে রহিয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকলের ভিতরেও তিনি নিশ্চয়ই আছেন, কেন না তিনি "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু তিনি যখন আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা, ইত্যাদি শক্তি দিয়াছেন, তখন সেগুলি যাহাতে উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তা ছাড়া আর আমরা কি করিতে পারি? যখন কোনও বিষয়ে আমার শক্তি কুলাইতেছে না মনে হইবে, তখন তাঁহার চরণে আশ্রয় লইব। তার বেশী আর একটু করা যাইতে পারে—এই সাংসারিক কাযকর্ম্ম করিতে করিতেই যতদূর পারি, তাঁহার স্মরণ মনন করিতে পারি।

এই আদর্শ কখনই নিন্দনীয় বলা যাইতে পারে না। এরূপ সাধু সংকল্প সংসারে অল্প লোকেতেই দেখা যায় এবং এরূপ লোকেই সংসারের অনেক রকম সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একপ অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি হইতে হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইতে পারিব, এ আশা নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক ও শান্তিপ্রদ।

এইরূপ আদর্শে যত্নশীল ব্যক্তির প্রতি এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে, ভগবানের স্মরণ মনন কাযটা 'যখন পারিব তখন করিব' বলিয়া মনের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া, করিতে একেবারে ভুলিয়া না যান। ঐ কার্য্যটা, বাস্তবিক যথাসাধ্য করা হইতেছে কি না, মধ্যে মধ্যে বিচার করিয়া দেখেন। যাঁহার ইচ্ছায় অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র, তারকারাজি অনন্ত ব্যোমপথে ছুটিতেছে, যিনি এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যাঁহার নিশ্বাসে আমাদের মত শত কোটি জীব জন্ম ও লয় পাইতেছে, তাঁহার পূজা ফেলিয়া ক্ষুদ্র সংসারের কাযকর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা কি ঘোরতর অজ্ঞানের পরিচয় নয়? আবার, যিনি অনন্ত অব্যক্ত

হইযাও আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের সকাতর ডাক শুনেন, ঈপ্সিত বস্তু দান করেন, দেখা দেন, শুষ্কহৃদয়ে আশাব সঞ্চার করেন, ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট মানুষেব মঙ্গলেব জন্য তদাকাবে আবির্ভূত হইয়া তাহাদেব সহিত একত্র আহার বিহার কবিতে কবিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট বদ্ধ জীবগণকে পুনঃ পুনঃ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবনের মহান্ লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিয়া যান, তাঁহাকে ভুলিযা কেবলমাত্র ক্ষুদ্র সংসারেব কাযকর্ম্ম, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রাদিতেই আবদ্ধ থাকিতে যে চায়, সে কি নিতান্ত অপ্রেমিক নয় ?

কোটি রূপে, কোটি ভাবে তিনি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, তত্রাচ আমবা, আমাদের চক্ষুর্দ্বয় যথাসাধ্য আবৃত করিয়া, অন্ধকাব প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিত্বটুকু লইয়া থাকিতে চাই, ইহা কি বাতুলতা নহে ? যদি অর্থোপার্জ্জন, পবিবারবর্গ প্রতিপালন অথবা পার্থিব বিদ্যালাভই সংসাবী জীবগণেব আদর্শ বলিয়া মনে হয়, তথাপি ভগবদারাধনা তত্তল্লাভে বিশেষ সহায়ক হওয়াব, ঐ বিষয়ে তাহাদের উপেক্ষা বা উদাসীনতাব কাবণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকাম মানব একটু স্থিবচিত্তে বিচার কবিলেই বুঝিতে পাবিবে যে, সীমাবদ্ধ জীবের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ। অতএব তৎসহায়ে পার্থিব ধনরত্ন লাভেব জন্য আজন্ম পবিশ্রম করিয়া সে যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পাবে, কোন পৃথ্বীশ্বরেব কৃপা লাভ করিতে পাবিলে নিমেষেব মধ্যে তাহাব উক্ত উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইতে পাবে—ভগবানের কৃপাব ত কথাই নাই। আর একটু অগ্রসব হইলে মানব দেখিতে পায় যে, যিনি সব দেখিতে পাইতেছেন, সর্ব্বদা আমাদেব সঙ্গে ঘুরিতেছেন, আমাদের চাহিবাব আগেই আমাদেব প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাত আছেন, তাঁহার নিকট আবার চাহিব কি ? কি চাহিলে আমাদিগের বাস্তবিক মঙ্গল হইবে, আমরা ঠিক জানি কি ? এই ভাব ঠিক ঠিক প্রাণে আসিলে মানব আব কখনও কোনও অনিত্য বস্তু লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবিতে পাবে না। কেবল মাত্র তাঁহাকেই চায়। সে তখন বুঝে, তাঁহাকে পেলেই সব পাওয়া যাবে। তাহার তখন মনে হয়, বিশ্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বর যখন সকল বিষয়ের মূল, তখন তাঁহাকে লাভ কবা ভিন্ন মানব-জীবনে অন্য কোনও উদ্দেশ্যের স্থান পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ! যাহা তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, তাহাই শুভ, তাহাই সত্য ; অপর যাহা কিছু, সকলই অশুভ, মিথ্যা, অসৎ। এইরূপ দৃঢ় ধারণার সহিত জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা আর কি উচ্চ আদর্শ হইতে পারে ? ধন্য সে, যে এই আদর্শ হৃদয়মধ্যে চিরকালের জন্য ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে !

ঐ ধারণার উদয় হইবার সঙ্গেই কি উপায়ে সেই পরম বস্তু লাভ করা যায়, এবং সেই বিষয়ে আমি কতদূর অধিকারী, এ প্রশ্ন সেই উচ্চাকাঙ্খী পুরুষের মনে স্বতঃই জাগিতে থাকে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বিঘ্নরাশি পর্ব্বতপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। কি করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়, তাহা সে তখনও জানে না। কাজেই যাহাদিগকে সাধু বলিয়া মনে হয়, তাহাদের সঙ্গ করিতে সে তখন অগ্রসর হয় এবং সেইরূপ ভাবে মনকে গড়িয়া জীবনের কার্য্য-কলাপ নিয়মিত করিয়া চলিতে চেষ্টা করে। তখনই তাহার জীবনে প্রকৃত যুদ্ধের ঢাক বাজিয়া উঠে। এক দিকে সংসারের প্রলোভনে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়াদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, আবার অপর দিকে নবানুষ্ঠিত বিন্দু বিন্দু ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সুদুর্লভ সাধুসঙ্গের প্রভাবে তাহার মন আত্মদৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। —এই অবস্থাই সাধকের বিষম যন্ত্রণাদায়ক! বাহ্যাভ্যন্তরের ঝটিকাঘাত প্রতিহত করিতে তখনও সে না শিখায় নিরন্তর পরাজয়ে অবসন্ন হয় এবং ক্ষণিক-ধর্ম্মালোক-দীপ্ত অজ্ঞানান্ধকার গভীরতর রূপ ধারণ করিয়া চিরকালের জন্য জীবনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—এইরূপ মনে করে।

এই সময়েই আবার তাহার জ্ঞানের গোচর বা অগোচর অবস্থায় "সন্দেহ" নামক ভীষণ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করে। সে ভাবে, "অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবানকে লাভ কি মুখের কথা? কত মুনি ঋষি হার মেনে-ছেন, কখনও কেহ কালে ভদ্রে অনেক তপ, জপ, আরাধনাদি করে তবে তাঁকে পায়! 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'—অতি অল্প লোকেই তার জন্য চেষ্টা করে, তার মধ্যে অতি অল্প লোকেই সিদ্ধ হয়; এইরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকের মধ্যেও কচিৎ কেহ ঠিক্ ঠিক্ ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে।" সন্দেহাকুল মানব তখন বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে বুঝে না যে, প্রেমময় ভগবান্ তাহাকে দমিয়ে দেবার জন্য গীতায় ঐরূপ বলেন নাই, ঐ অবস্থার উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন! হে ভ্রান্ত মানব, ঐ অবস্থায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাদা কথায় যাহা বলিতেন, তাহা স্মরণ করিও—"এক বোতল মদ খেয়ে যাব নেশা হয়, মদের দোকানে কত মন মদ আছে, তাহার খোঁজে কায কি? ঐশ্বর্য্যের দিকে দেখিলে তাঁহাকে (শ্রীভগবান্‌কে) অতি দূরে মনে হয়। প্রেম ভালবাসাই তাঁহাকে নিকট হইতেও নিকট, আপনার হইতেও আপনার করিয়া দেয়। তখন তাঁহার উপর জোর চলে, আব্দার চলে—'কেন তুমি আমায় দেখা দিবে না—দিতেই হবে—' ইত্যাদি বলা চলে।" অতএব হে মানব! মনে রাখিও, তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ

যাহাতে আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইবে, এইরূপ ভগবৎকৃপার অধিকারী তিনি তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহা লাভ করিতে হইলে আবশ্যক কেবলমাত্র—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"—এই দৃঢ় সংকল্প।

সংসারী জীব নানা মায়ায় আবদ্ধ। মনে করে—আমার বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি রয়েছে, ইহাদের ভরণ পোষণ আমি না করিলে আর কে করিবে? এসব দিকে নজর না রেখে দিবারাত্র ভগবান্ লাভের চেষ্টায় যদি ফিরি, তাহা হইলে তাহাদের উপর আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে। ভগবান্ লাভ করা দূরে থাক্, তাঁর নিকট হইতে আরো পেছিয়ে পড়্‌ব। আবার ভাবে—সংসারের এত হাঙ্গামে লিপ্ত থেকে কিরূপেই বা ভগবান্ লাভ হ'তে পারে। ঐরূপ মীমাংসা একবার মনে স্থান পাইলে মানব নিজের বুদ্ধিতেই নিজে জড়িয়ে পড়ে এবং উহার বাস্তবিক ভিত্তি আছে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ, সংসারের মধ্যে থেকে এক দিন এক ঘণ্টা কালও শ্রীভগবান্‌কে প্রাণের সহিত ডাকিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ কার্য্যে সাংসারিক কাযকর্ম্মের যতটুকু ক্ষতি হইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইয়াছে। যে এক দিনের জন্যও ভগবান্‌কে ঐরূপে ডেকে দেখে নাই, সে কেমন করে বুঝিবে যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌লে লাভ হয়, কি ক্ষতি হয়? সংসারের কাযকর্ম্ম সব চুকিয়ে এবং ভগবান্‌কে ডাকায় কি লাভ তাহা আগে বুঝে, তবে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে আরম্ভ কর্‌ব—এইরূপ সিদ্ধান্ত করে যিনি বসে আছেন, তাঁহার কোনকালেই ভগবান্‌কে ডাকা হবে না। ভগবান্‌কে ডাকিবার আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেই ঐরূপ ওজর আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়—ইহা নিশ্চিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করিবার জন্য আমরা কত পরিশ্রম করিয়া থাকি, কত রাত্রি জাগরণ করি, হয় ত অভাবক্লিষ্ট অথবা পীড়িত পিতামাতার সেবা করিতে পারি না। কেন? না—পরীক্ষা পাস করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরে তাঁহাদের অভাব বিশেষরূপে মোচন করিব! কিন্তু ঐ বিশ্বাস কিসে হয়? পরীক্ষায় সকলেই কিছু পাস হয় না, পাস হইয়াও সকলেই কিছু অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হয় না, তবে কেন আমি এত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত হই? তাহার কারণ এই দেখিতে পাই যে, এই প্রথাই চলিত প্রথা; সেজন্যই আমি ও আমার অভিভাবকেরা তাহার অনুসরণ করি, অথবা আমি আমার শক্তির উপর বিশ্বাস করি। ভাবি—এত লোকে পারিতেছে, আমিই বা কেন পারিব না? যদি না পারি ত আমার জীবনধারণই বৃথা। কেহ বা বিচার করিয়া দেখেন যে অন্য কোনও উপায়ে সুবিধামত জীবিকা উপার্জ্জনের পথ

দেখিতে পাই না অতএব পারি না পারি, চেষ্টা করিয়া দেখি। পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া কে কবে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পেরেছে? তবে ভগবানের আরাধনার ফলাফল নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্ব হইতে এত বাক্‌বিতণ্ডা কেন? কিন্তু সত্য নির্ণয়ের জন্য যদি কেহ সরল চিত্তে তর্ক যুক্তিতে অগ্রসর হন, তিনি হতাশ হন না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এমনি উদার ভাব যে, যে কোনও উপায়ে হউক না কেন, সরলচিত্তে অন্বেষণ করিলে, উহা জিজ্ঞাসুকে পথ দেখাইয়া দেয়।

ঈশ্বরলাভেচ্ছু নবীন সাধক আর এক প্রকার বিষম সন্দেহজালে আবদ্ধ হন। সংসারে থাকিয়া নানাপ্রকারে লোকের সাহায্য করিতে পারা যায়। গণ্য মান্য হইতে পারিলে বহু লোকের ও দেশের কল্যাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যহ আমরা দেখিতে পাই, ধনী ব্যক্তিরা বদান্যতাগুণে কত লোকের দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন। কত লোক আজীবন পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় পরহিতব্রতে উৎসর্গ করিতেছেন। দেশের কল্যাণের জন্য কত বিদ্বান্ লোক কত প্রকার পীড়ন আনন্দে সহ্য করিয়া চিরস্মরণীয় হইতেছেন ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির হেতুভূত হইতেছেন। কেহবা আজীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া বহু লোকের জীবনাতিপাতের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। ইঁহারা সকলেই যদি কেবলমাত্র ভগবান্ লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, তাহা হইলে জগতের অবস্থা আজ কি রকম হইত, তাহা কল্পনায় আনাও অসম্ভব।

এইরূপ সংশয়ের মোটামুটি উত্তর এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, সকলের দ্বারা সকল কার্য্য কখনই সম্ভবপর নহে এবং যিনি জগতের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন এবং একাল পর্য্যন্ত উহা চালাইয়া আসিয়াছেন জগৎ তাঁহারই ইচ্ছামত চলিতে থাকিবে। সৃষ্টি পালনের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি কাহাকেও নিমিত্ত-মাত্র করিয়া করাইয়া লন এবং বিষম সমস্যার স্থলে কখন বা স্বয়ং আভির্ভূত হন। অতএব তিনি আমাদ্বারা জগতের বাস্তবিক কল্যাণকর কোনও কার্য্য করাইবেন কি না, এ বিষয়ের মীমাংসার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—তাঁহার দর্শন লাভের পর তাঁহাকেই ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা। তাহা হইলে আমাদের দ্বারা অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব হইবে। তন্ন তন্ন করিয়া আমরা যদি অনুসন্ধান করি, তবে অনেক স্থলে দেখিতে পাইব যে, শ্রীভগবান্‌কে না ধরিয়া যাঁহারা কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাঁহা-দের করিয়া দ্বারা স্বার্থপ্রসূত অহিতকর কার্য্যই অধিক সাধিত হয়। যে জমিদার লক্ষ টাকা দান করিয়া সদাব্রত স্থাপনা করিয়াছেন, তাঁহার তহবিলের টাকা যে প্রজা-পীড়নোদ্ভূত নহে, সে বিষয়ে কেহ কি নিশ্চিত জানিয়াছেন? যিনি আজ লক্ষ টাকা

নাম কিনিবার জন্য দান করিতেছেন, তিনি যে তাহার দশগুণ টাকা অসৎ কার্য্যে ব্যয় করেন নাই, এ কথা কে সুনিশ্চিত বলিবে? কেবল একমাত্র ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, যে ব্যক্তি স্বার্থত্যাগ করিয়া ভগবান্ জ্ঞানে সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ লোকহিতকর কার্য্য করণে সমর্থ। তিনিই আমাদের প্রণম্য।

উপরি উক্ত কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা কাহারও কোনরূপ নিন্দা করিতেছি। যথার্থ লোকহিতকর কার্য্য করিতে হইলে কতদূর উচ্চ আদর্শে জীবন গঠন করিতে হইবে, তাহাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "কালীঘাটে মাকে দর্শন করিতে আসিয়া কেহ কেহ যেমন কাঙ্গালী বিদায় করিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, ঠাকুর দেখিতে এসে দেখে যে, মায়ের মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আর দর্শন করা হইল না"। যথার্থ নিঃস্বার্থ-ভাব প্রাণে না উদয় হইলে দেখাদেখি লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া, আমাদের অবস্থাও অনেক সময় তদ্রূপ হইয়া পড়ে—আমরা উদ্দেশ্যহারা হইয়া পড়ি। তাই বলে কি যাহারা ৺কালীমন্দিরে গিয়া দেবী দর্শনও করে না, কাঙ্গালী বিদায়ও করে না, তাহাদের অপেক্ষা যে শুধু কাঙ্গালী বিদায় করে, সে অপেক্ষাকৃত ভাল নয়?

জগতের আদিঅন্তভূর্ত পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাঁহারা তাঁহার সৃষ্ট জগতের দুঃখের অংশ হ্রাস ও সুখের অংশ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা সোনার শিকলে আবদ্ধ হইয়া তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকেন। অবশ্য অবিদ্যাপ্রসূত লৌহ-শিকল অপেক্ষা লোকের চক্ষে তাহা যে ভাল বোধ হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

ভগবান্‌লাভেচ্ছু ব্যক্তি সৎকার্য্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান যে, তাহাতেও অহঙ্কারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। তাঁহার দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনু-ষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি "লোকের উপকার করিতেছি অথবা আমি না করিলে এতটা অনিষ্ট হইত" এইরূপ ভাব কখনও মনে আসিতে দেন না। এই স্থলে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের জীবনের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। চিকাগো (Chicago) সহরে যে দিন তিনি ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা করিয়া সমগ্র পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলিকে মোহিত করিয়া বহুল সম্মানিত হইয়া-ছিলেন, সে রাত্রে তিনি নিভৃত শয়নকক্ষে আসিয়া এই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন যে, "মা, আমায় কি করিলে? আমি যে আর আগেকার মত তোমার সহিত যথা ইচ্ছা একলা থাকিতে পাইব না।" মহা কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে

জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি নিজে কিছুই করেন না—ভগবান্ তাঁহার ভিতরে থাকিয়া সব করাইতেছেন। ঐরূপ অনুভব অতি উচ্চ অবস্থার কথা। এ অবস্থা কল্পনা করিতে গেলেও আমরা শিহরিয়া উঠি! অজ্ঞ মানব বলিতে পারে—ভগবান্ ত সকলের মধ্যে থাকিয়াই কার্য্য করাইতেছেন। তবে এ আর আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য এই যে, ভগবান্ সব স্থানেই আছেন সত্য, কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে, কেবলমাত্র তিনিই ডাকিলে সাড়া দেন। বাস্তবিক লোকহিতকর কার্য্য, যে কার্য্যে অহিতের লেশমাত্র নাই, সে কার্য্য কেবলমাত্র তিনিই করিতে পারেন, যিনি ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাঁহারই কার্য্যে রত আছেন। ইহাই আমাদের মতে গীতায় লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নানাপ্রকার সন্দেহানলে দগ্ধ ভগবৎ-প্রেমাসক্ত নবীন সাধক যখন এইরূপে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই পরম পুরুষের সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হয়, তখনি তাহার কর্ণে এই আশাপ্রদ সুললিত বাণী বাজিয়া উঠে, "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—হে বীর! নির্ভয়ে অগ্রসর হও, তুমি আমাকে ডেকেছ, তোমার বিনাশ কোথায়? প্রবল বায়ুতরঙ্গায়িত সাগরে ভাসমান জীব তখন চাহিয়া দেখে যে, যদিও সে প্রতিমুহূর্ত্তে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গদ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছে, তত্রাচ প্রত্যেক তরঙ্গ তাহাকে সেই মহাসাগরের কূলের দিকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এই জন্যই বলি যে, একবার যে ব্যক্তি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ের কণামাত্র আলোক দেখিয়াছে, যে ব্যক্তি অনন্ত প্রেমময়ের বিন্দুমাত্রও আস্বাদ করিয়াছে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বপ্রকার চর্চ্চার মধ্যে ক্ষণমাত্রও যে ভগবানের বিশ্বব্যাপক অস্তিত্ব, অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য, পিতামাতা ভার্য্যা পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী সুহৃদাদি অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও ভালবাসা প্রাণে অনুভব করিয়াছে, তাহার সেই শুভমুহূর্ত্ত হইতেই বন্ধন মোচন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কর্ম্মফলে অথবা ভগবানের লীলার সহায় হইতে তাহাকে জন্মজন্মান্তরে আসিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধি, সর্ব্বভাবে শরণাপন্ন সে ব্যক্তি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া উঠে যে, "কেবলমাত্র এই করিও নাথ, যেন সম্পদে, আপদে, আলোকে, অন্ধকারে, সমভাবে তুমি আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশিত থাক, যেন নিদ্রাতেও তোমাকে ছাড়িয়া আছি, এ বোধ না আসে। তুমি যতবার ইচ্ছা তোমার গোলাম করিয়া খাটাও. জগতে উচ্চ বা নীচ পদস্থ যাহা করিতে হয়, কর; সুধু এইমাত্র প্রার্থনা যে, তোমাকে ছাড়া আছি—এ মিথ্যা ভ্রম বা মায়া আমাকে যেন কখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্রয় করিতে না পারে"।

বেদ ও বেদ্য।

[শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।]

ইতিহাস বলেন, জগতের মধ্যে হিন্দুই ধর্ম্ম-প্রাণ জাতি। আমার মনে হয়, ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও অনন্ত। কিম্বদন্তী আছে, হিন্দুর অসংখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে 'বেদ'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেবল প্রাচীন নহে, বেদবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বেদ নিত্য, অপৌরুষেয়, অনাদি, অনন্ত, যাবৎ সৃষ্টি তাবৎ বেদ। কিন্তু কথা হইতেছে, বাস্তবিকই কি বেদ নিত্য, অনাদি, অনন্ত? প্রকৃতই কি যাবৎ সৃষ্টি তাবৎ বেদ?

বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এতাদৃশ একটা দৃঢ় সংস্কার থাকিলেও মধ্যে অস্মদ্দেশে এমন এক যুগ আসিয়াছিল, যখন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনত্বের কথা উঠিলে, তাহার অধিকাংশ প্র পূর্ব্বক ক্ষিপ্ ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্তে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অতি সামান্য অংশমাত্রই প্রাচীন বলিয়া আমরা স্বীকার করিতাম! পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের হৃদয়ে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, বেদ অথবা অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমাদের কেহ উপদেশ প্রদান করিলে, আমরা তাহা 'চাষার গান' বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিম্বা স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের সকপোল-কল্পিত, কুর্ম্মনীতিপরিচ্ছিন্ন অংশমাত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিতাম! তখন আমাদের এমনিই মতিগতি হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগে দেখিতেছি, আমাদের সে মতিগতিতে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর সভাসমিতি করিয়া আমরা হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনত্বের প্রতিবাদ করিতে বসি না। বেদের সর্ব্বাংশকে যথাযথ পরিগ্রহণ না করিলেও ইহাকে নিতান্ত 'চাষার গান' বলিয়া উড়াইয়া দিই না। প্রত্নতত্বের আলোচনার সহিত আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, বেদ বাস্তবিকই হিন্দুজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র। কেবল হিন্দুজাতির কেন, কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিতের মতে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে বেদ নামধেয় গ্রন্থরাশিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া স্বদেশপ্রাণ বাল গঙ্গাধর তিলক অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদের কোন কোন অংশ নিশ্চয় খৃষ্ট জন্মাইবার অন্ততঃ ৮০০০ আট হাজার

বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকারে সংগৃহীত হয়। অতএব ঐ সকল অংশ যে আরও পূর্ব্বে সংকলিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়। বেদ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র, একথা অস্বীকার করিবার এখন আর উপায় নাই। তবে, বেদ যে নিত্য, অনাদি-অনন্ত—যাবৎ সৃষ্টি তাবৎ বেদ, বেদ যে সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল এবং উহা হইতেই যে সহস্রশীর্ষ-সহস্রবাহু-বিশিষ্ট এই বিরাট্ বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা সত্যাসত্য নির্ণয়ে বেদই যে আবহমানকাল ধরিয়া আমাদের, হিন্দুদের ভিতর যে এই সকল বিশ্বাস এবং তৎসহায়ক একমাত্র প্রমাণ—অনেকানেক শাস্ত্রীয় বচন পরম্পরা বিদ্যমান, সে সমুদায় লইয়া মতামত উপস্থিত হইতে পারে। দেখা যাউক, ঐ সকলের অভিপ্রায় কি? অনেকে বলিবেন, ঐ সমূহ ব্রাহ্মণদিগের গোঁড়ামীপ্রসূত অথবা ভারতের জন-সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য ভণ্ড স্বার্থপর ব্রাহ্মণকুলের কাল্পনিক স্তুতিবাক্যমাত্র। একথা স্বীকার করিলেও কিন্তু শান্তি নাই—মনে হয়, ইহার মূলে কি কোন সত্য নাই? গোঁড়ামী বা কাল্পনিকরচনা কি স্মরণাতীতকাল হইতে সত্য-বিরহিত হইয়া এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে আপনার প্রভাব বজায় রাখিতে পারে? আর এক কথা, বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যেই বেদের স্বরূপসম্বন্ধীয় উক্ত বাক্যাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ কি তাহা হইলে এতই স্বার্থপর ছিলেন যে, আপনাদিগের ও শাস্ত্রবিশেষের প্রাধান্য অটুট রাখিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে ঐরূপ অনৃত বাক্যসকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? যাঁহারা লব্ধতত্ত্ববিতপ্রসঙ্গ, সর্ব্বকালে সত্যেরই জয় হইয়া থাকে—একথার মর্ম্ম যাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতের ঋষিকুলের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু কর্ণপাত না করিলেই যে বিষয়টির মীমাংসা হইয়া গেল, তাহা ত নহে? ঐ বিষয়ের মীমাংসায় কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্গণ নিশ্চয়ই স্বার্থ-পর ছিলেন না; কিন্তু পরকালবর্ত্তী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আপনাদিগের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য ঐ সকল রচনাবলী বেদাদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া থাকি-বেন। কেননা, সাম, ঋক্, যজুঃ ইত্যাদি কতিপয় মন্ত্র বা গ্রন্থ লইয়াই ত বেদ। ঋষি-গণ যে উক্ত মন্ত্রের বা গ্রন্থনিচয়ের প্রণেতা, একথা নিশ্চয়। এবম্বিধ অবস্থায় যদি বেদ নিত্য, অনাদি-অনন্ত, অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে 'কমলাকান্তের দপ্তর' অথবা 'বেজায় আওয়াজ' প্রভৃতি আধুনিক রচনাবলীই কি দোষ করিল? ইহারাও কেন কোন্ অপরাধে নিত্য, অনাদি-অনন্ত, অপৌরুষেয় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না? আর এক কথা। শতপথ ব্রাহ্মণেরই একস্থানে আছে, বেদ

প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট। ঐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্যত্রে আছে, মনরূপ সমুদ্র হইতে বাক্-রূপ দণ্ডের দ্বারা দেবতারা বেদ মন্থন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া বেদত্রয়ের সৃষ্টি করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টি করিয়া বেদ সৃষ্টি করিলেন। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, পুরুষ-যজ্ঞ হইতে বেদ উৎপন্ন হয়। অথর্ব্ব বেদে আছে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎ-পন্ন। অতএব দেখা যাইতেছে, বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যেই বেদোৎপত্তি সম্বন্ধে রচনাবলী রহিয়াছে। তখন প্রশ্ন হইতেছে, বেদাদির মধ্যে উহার নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদক ঐ সকল বাক্যাবলীর অভিপ্রায় কি? ঐ সকলকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যদি না ধরা হয়, তবে এবম্বিধ বাক্যাবলীর আশয় কি? হিন্দুদর্শনাদি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলে অবগত আছেন যে, গোতমাদি সকল দার্শনিকগণ এবং সায়নাদি সকল টীকাকারগণই বেদকে প্রমাণশ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করিয়া-ছেন। বাস্তবিক বেদ, যদি বঙ্কিমাদি প্রণীত 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় হইত, তাহা হইলে কি স্মরণাতীত কাল হইতে উহার এতাদৃশ অপ্রতিহত-প্রতিপত্তি থাকিত? সায়ন ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। উক্ত বেদার্থনামক টীকায় তিনি বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ মানবকৃত নহে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মাধবা-চার্য্যও বেদকে 'কাল' 'আকাশাদি' নিত্য বস্তু সকলের ন্যায় প্রবাহনিত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাকে ইহার বক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'কুসুমাঞ্জলি'-কর্ত্তা বেদকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়, বৈশেষিকের মতে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। বেদ সম্বন্ধে সাংখ্যের মত যে কি, তাহা ঠিক বলা যায় না। যদিও সাংখ্য শাস্ত্রের মধ্যে বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত আছে, তথাপি সাংখ্যকার বেদকে ঠিক ঠিক মানিতেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিবেচনায় সাংখ্যের মতে বেদ না পৌরুষেয় অর্থাৎ মানবকৃত না অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরকৃত। মীমাংসকেরা কিন্তু বজ্রগম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিয়া থাকেন, বেদ—নিত্য, অনাদি-অনন্ত ও অপৌরুষেয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই মতাবলম্বী। মীমাংসকেরা বুঝাইয়াছেন, 'বেদ'ই 'শব্দ,' 'শব্দ' 'নিত্য', অতএব 'বেদ'ও নিত্য। যাহা নিত্য, তাহা কখন পৌরুষেয় হইতে পারে না। সুতরাং 'বেদ'—নিত্য ও অপৌরুষেয়।

ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকে বলিবেন, এরূপ যুক্তিপ্রদর্শন কেবল-মাত্র চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রদান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাঁহারা বলিবেন—

বাস্তবিক বেদ ও শব্দ কি একই পদার্থ যে, শব্দ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে বেদকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? আর শব্দ যে নিত্য, ইহারইবা প্রমাণ কি?

এতদুত্তরে আমরা বলি যে, ঐ সকল আশঙ্কা যে মীমাংসকদিগের মনোমধ্যে পুরাকালে উদিত হয় নাই, তাহা নহে। জৈমিনী-বাদরায়ণাদি ঋষি হইতে শঙ্করাবধি সকল আচার্য্যেরাই স্ব স্ব লেখনীপ্রসূত গ্রন্থসমূহে ঐ সকল আপাততঃ-আপত্তির স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, তন্মীমাংসার্থ নানাবিধ তর্কের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ঐ সকল যুক্তিজালের মধ্যে আপন আপন মীমাংসার প্রতিপোষক শ্রুতিবাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা সমগ্র তর্কজালকে যেরূপভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহা সমাহিতচিত্তে পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়!

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিন্তু আমরা উক্ত আচার্য্যপাদগণের তর্কজালসমূহের পুনরুক্তি করিয়া বিংশ শতাব্দীর পাঠকবৃন্দের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিব না। বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়টী যেরূপভাবে আলোচনা করিলে পাশ্চাত্য-ভাবে ভাবিত পাঠকের হৃদয়ে উহার সম্ভবপরতা উপলব্ধি হইতে পারে, যথাসাধ্য সেই ভাবেই উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তিসহায়ে বিচার করিলেও বেদ প্রকৃতই নিত্য, অনাদি-অনন্ত, অপৌরুষেয় এবং প্রমাণশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে।

বেদ কাহাকে বলে?

পুরাকালে ভরদ্বাজ ঋষি, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। কথিত আছে, মহর্ষির কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র তৎসমীপে বরপ্রদানার্থ আগমন করিলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ স্বীয় সঙ্কল্প ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করিলেন। মহর্ষির উক্ত সঙ্কল্প যে কার্য্যে পরিণত হইবার নহে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় শক্তিবলে অভ্রভেদিচূড় তিনটী পর্ব্বত সৃষ্টি করণান্তে তাহাদিগের প্রত্যেকটি হইতে এক এক মুষ্টি পাংশু লইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, "বেদা বা এতে অনন্তা বৈ বেদাঃ" (কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ)—হে ভরদ্বাজ! এই যে বহুযোজনব্যাপী বিশাল পর্ব্বতত্রয় দেখিতেছ, এই তিনটিই বেদ। ইহাদের উল্লঙ্ঘন যেমন মানবশক্তিতে সম্ভবে না, সমগ্র বেদাধ্যয়নও তদ্রূপ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব ঐ সংকল্প পরিত্যাগ কর।

দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত আখ্যানে মানববুদ্ধিপ্রসূত সসীম গ্রন্থরাশি বেদ

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া, কোন অসীম বস্তুই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—উহা কি ? বেদ কাহাকে বলে ?

বেদ শব্দশাস্ত্রে নানাবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়—বেদ অনন্ত ; বেদ ও ব্রহ্ম একপদার্থ। ব্রহ্ম বেদের এক পর্য্যায়মাত্র। যথা —"ব্রহ্মতত্ত্বতপো বেদে ন দ্বয়োঃ পুংসি বেধসি"—ইতি মেদিনী ; "বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম" —ইতি অমর। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, বেদ সর্ব্বদা নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনেই নিযুক্ত, তজ্জন্যই বেদের নাম 'ব্রহ্ম' হইয়াছে। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা"—গীতায় এস্থানে বেদ শব্দের দ্বারা বেদের সামান্য একাংশ কর্ম্মকাণ্ডমাত্রকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য করিয়াছেন, নতুবা সমগ্র বেদ যে জীবকে স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর ভোগসুখ লাভ করিতে উপদেশ দিতেছে, একথা বলা তাঁহার অভিপ্রেত নয়।

'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' (গীতা ৮।১১)—বেদ শব্দ এখানে উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদ শব্দ আবার কোথাও কোথাও ঋষি-বচন' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—"ঋষিবচনং হি বেদ।" আবার কখন বেদ শব্দ দ্বারা ব্যাকরণ শাস্ত্র বুঝায়—যথা—"বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং"(ছান্দোগ্য) এস্থলে "বেদং ব্যাকরণমিত্যর্থঃ"। ভগবান্ শঙ্কর বেদ শব্দের এস্থলে ব্যাকরণ এই অর্থ করিয়াছেন।

বেদ ও শব্দ।

শাস্ত্র বেদ বুঝাইতে 'শব্দ' এই কথাটির বহুলপ্রয়োগ করিয়াছেন। জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা, বাদরায়ণের উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রে ঐরূপ প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়।

শব্দ ও বাক্।

বেদাদি শাস্ত্রের অল্পমাত্র চর্চ্চাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋষিগণ বেদ বুঝাইতে 'বাক্' ও 'শব্দ' এতৎশব্দদ্বয়ের বহুলপ্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"শব্দ ইতি চেন্নাত" ইত্যাদি (বেঃ সূ ১।৩।২৪) ; "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদি (জৈঃ সূ ১।৩।১০) ; "বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য) ; "বাগেব বিশ্বভুবনানি জজ্ঞে" (শ্রুতি)। আবশ্যক হইলে এইরূপ আরও অনেক শ্রুতি-বাক্য উদ্ধার করা যাইতে পারে—যদ্দারা প্রমাণ হয় যে 'বাক্,' 'শব্দ' ও 'বেদ' ইহারা পরস্পর পরস্পরের পর্য্যায়মাত্র। 'বাক্' বা 'শব্দ' যখন বেদেরই পর্য্যায়মাত্র, তখন অত্যল্প চিন্তাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, বাক্ বা শব্দের

স্বরূপ ভাবনা আর বেদের স্বরূপ ভাবনা, উভয়ই এক পদার্থ। বাক্ বা শব্দের স্বরূপজ্ঞান হইলে বেদেরও স্বরূপজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। অতএব,—

বাক্ বা শব্দ কোন্ পদার্থ?

'মহাভাষ্যোদ্দ্যোত' বলিয়াছেন,'সা বাক্ যত্র ব্রহ্ম বর্ত্ততে চাৎ পুরাণাদি ইত্যর্থঃ, —অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্ম, বেদ ও পুরাণাদি বিদ্যমান অর্থাৎ বেদপুরাণাদি যাহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা থাকে বা যদাত্মক, তাহাই বাক্। ছান্দোগ্যে আছে, "বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি, যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বনং চতুর্থমিতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং, রাশিং দৈবং নিধিং" ইত্যাদি—অর্থাৎ ঋক্, সাম্, যজুঃ, অথর্ব্ব, পঞ্চম বেদ বা পুরাণেতিহাস, বেদ বা ব্যাকরণ (শব্দানুশাসন শাস্ত্র), পিত্র্য, রাশি, নিধি (মহাকলাদিনিধি শাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা ইত্যাদি সকলের বাক্ বা শব্দই প্রকাশক। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'বাগেব বিশ্বভুবনানি জজ্ঞে' অর্থাৎ বাক্ বা শব্দ হইতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এক স্থানে আছে, 'বাগ্বৈপরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং' ইত্যাদি (১।৪।৭) —*সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল নানা বাক্ বা শব্দ অব্যাকৃতাবস্থায় ছিল।* অর্থাৎ সমুদয় শব্দই তখন অবিভক্তভাবে বিদ্যমান বা সমুদ্রধ্বনিবৎ একত্র একীভূত ছিল। ঐ একীভূত অবস্থায় শব্দ সকলের উচ্চারণগত পার্থক্য বা নানারূপত্ব, যথা প্রকৃতি, প্রত্যয়, শব্দ, বাক্য প্রভৃতি, কিছুই ছিল না। পরে ইন্দ্র, বাক্ বা শব্দের ঈদৃশী অবস্থাকে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ নানাশব্দরূপে বিভক্ত করিয়া বিশ্ব-বিরাট্ সৃষ্টি করেন। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, এক অনাদিনিধন শব্দের বিবর্ত্তন হইতেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্তসূত্রে আছে— "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ" ইত্যাদি (১।৩।২৮) অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরোক্ত শাস্ত্রবচনগুলি দ্বারা যতদূর দেখা গেল, তাহাতে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, বাক্ বা শব্দ অর্থে লোকে সচরাচর যাহা বুঝে—'গোলমাল চণ্ডীপাঠ', তাহা বুঝাইতেছে না। সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক পাছে ভ্রমে পতিত হয়েন, এই জন্যই অপাপবিদ্ধ শাস্ত্রকারগণ বারম্বার বলিয়াছেন, এই বাক্ বা শব্দই বৈজ্ঞানিকদিগের আলোক, তাপ, তড়িৎ, অণু, পরমাণু; ইহাই সাংখ্যমতাবলম্বিগণের *প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি বিকার, শব্দই জ্ঞানবাদীদিগের জ্ঞানপদার্থ; শব্দই শূন্য-*বাদী বৈদান্তিকের মহাকাশ (vacuum) এবং শব্দই বাস্তব-বাদীদিগের বস্তু। শ

কথায় বাক্ বা শব্দ হইতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট, বাক্-বা-শব্দতেই উহা প্রতিষ্ঠিত এবং কালে শব্দেতেই উহা বিলীন হয়। কি মর্ত্ত্য, কি অমৃত, সর্ব্বভাবই শব্দাত্মক—বাঙ্ময়।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে কেবল আমাদের শাস্ত্রের মতেই বাক্ বা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। ঈশাহি খৃষ্টানের বাইবেলেও এ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। সেন্ট-জনের প্রথমেই লেখা আছে—In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. All this was made by him and without him not anything was made" অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে, কেবলমাত্র বাক্ বা শব্দই (word) ছিল। ঐ শব্দ বা বাক্ পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত ছিল এবং পরমাত্মার সহিত উহার কোনরূপ পার্থক্য না থাকায় উহা তদাত্মকই ছিল। উহা হইতেই এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। সংসারে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা উহা হইতে উদ্ভূত না হইয়াছে। সুতরাং বাক্ বা শব্দের দ্বারা শাস্ত্রকারগণ 'হট্টগোল'কে নির্দ্দেশ করেন নাই, একথা বেশ বুঝা গেল। অতএব এখন ইহাই বিবেচ্য যে, যে বাক্ বা শব্দ হইতেই এই ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কোন্ পদার্থ? কিরূপেই বা তাহার স্বরূপ বিজ্ঞেয়?

দেখা যায়, কোন বস্তুর স্বরূপ চিন্তা করা, আর তাহার জন্মাদি ষড়্বিধ ভাব-বিকার চিন্তা করা, একই পদার্থ। একথা বোধ হয় চিন্তাশীল পাঠককে ফুটাইয়া বলিতে হইবে না। জন্মাদি ষড়্বিধ ভাব-বিকার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহাত্মক। জন্মের পরই স্থিতি, স্থিতির পরই বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর বিপরিণতি বা পূর্ণতাপ্রাপ্তি, তারপর অপক্ষয়, তারপর বিনাশ এবং তদন্তে আবার জন্মস্থিত্যাদি। অবিচ্ছিন্ন প্রবহমান এই ষড়্বিধ ভাববিকার লইয়াই বস্তুর বস্তুত্ব, উহাতেই তাহার জীবন রচিত, উহাই তাহার ইতিহাস এবং উহাই তাহার ব্যবহারীকি স্বরূপ। কোন দ্রব্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমান এই ষড়্বিধ ভাব-বিকার যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার নামই উহার (ব্যবহারীকি) স্বরূপ অধ্যয়ন করা। অতএব শব্দের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে আমাদিগকে ইহার বিবিধ ভাব-বিকার অধ্যয়ন করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শাস্ত্রমতে 'বাগেব বিশ্বভুবনানি যজ্ঞে' অথবা বাক্ বা শব্দ হইতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে—বিশ্বভুবনই বাঙ্ময়। সুতরাং একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, বিশ্বভুবনের ষড়্বিধ ভাব-বিকার চিন্তা করিলেই শব্দেরও স্বরূপ চিন্তা করা হইবে। বিশ্বের ষড়্বিধ ভাব-বিকার লইয়াই বিশ্বজগতের ইতিহাস রচিত। বিশ্বের (universe) ইতিহাস বলিতে পণ্ডিত স্পেন্সারও

(Spencer) বিশ্বজগতের ষড়্‌বিধ ভাব-বিকারকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্পেন্সার বলিয়াছেন "a study of the entire history of the world must include its appearance from imperceptibility to perceptibility and from this to that again"। সুতরাং শব্দের স্বরূপ জানিতে হইলে, দৃশ্যমান বিশ্বের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক। আমরাও সেইজন্য এক্ষণে জগতের জন্মস্থিতি-ভঙ্গের বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রবন্ধের আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত কোথা হইতে কোথায় এবং কতদূরে আমরা অগ্রসর হইলাম, তদ্বিষয় একবার সংক্ষেপে দেখিয়া লইব।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

লেক লুজার্ণ, সুইট্‌জার্লাণ্ড।
২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬

কল্যাণবরেষু,—

অদ্য রা——বাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক লোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ তাঁহার মতে পুরুষদিগের এক দিন এবং মেয়েদিগের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই—

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়ে পুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরকদ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থে আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী অপাপী, সাধু অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী, সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ, সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসিবে, সেই ভেসে যাক্।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়েও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচজাতি, ঐ গরিব, ঐ ছোট-লোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা কি আমাদের ঠাকুরকে বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। "It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." * এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসী ভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কিপ্রকারে করতে হবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসবস্থলে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন ও কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার বা কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখ্‌লে, তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভালমানুষের মত ব্যবহার করে, ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক—গৃহস্থ হউন বা অসতী হউন।

আমি এক্ষণে সুইট্‌জার্লণ্ডে ভ্রমণ করিতেছি—শীঘ্রই জর্ম্মানিতে যাইব, প্রোফেসার ডয়সনের † সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাৎ এবং আগামী শীতে পুনরাগমন দেশে।

আমার প্রণয় জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

---

* ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটী উষ্ট্রের পক্ষে সূচীছিদ্রের মধ্যে প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ।—বাইবেল।

† অধ্যাপক ডয়সন জর্ম্মানির একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ইনি ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্র উত্তমরূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার বিশেষ পক্ষপাতী। বেদান্ত সম্বন্ধে উঁহার অনেক গুলি গ্রন্থ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসবদর্শনে।

বেলুড় মঠে আবার ঠাকুরের জন্মমহোৎসব হইয়া গেল। আবার একবার এই নব জগন্নাথক্ষেত্রে ভক্তসহ মাতামাতি করিলাম—মহোল্লাসে ঠাকুরের মহা-প্রসাদ ধারণ করিলাম—আর স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিলাম শুধু বেলুড়ে নয়, আজ জগতের নানাস্থানে এতদুপলক্ষে এইরূপ আনন্দোৎসব হইতেছে! দেখিলাম—অগাধ জনসঙ্ঘ, মহাপ্রসাদের জন্য হুড়াহুড়ি মারামারি, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীরামকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং সকলের পশ্চাতে, ঐ লতাপাতা ফল-ফুলে সুশোভিত নগ্ন-প্রায় সৌম্যমূর্ত্তি—যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা একদিন সকলে মিলিয়াছিলাম! ভাবিলাম—উনি আমাদের কে? এবং এই বিরাট্ জনসঙ্ঘেরই বা কে? ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে যাইয়া অন্তর্মুখী মন দেখিল, ব্রাহ্মসমাজের কেশব বাবুর জীবনীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। তখন 'অসাম্প্রদায়িক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকারী' পুরুষের কথা, তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত সংস্কারকের এই আপাতঃ পৌত্তলিকের নিকট শিক্ষার ব্যাপার—পাশ্চাত্যশিক্ষামদান্ধ আমার হৃদয়ে পরমহংসদেবের কথা আরও জানিবার কৌতূহল জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। তার পর 'উক্তি'তে এই মহাপুরুষের সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। 'পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যেমন পেঁয়াজ বলিয়া কিছু থাকে না, তেমনি আমি কে খুঁজিতে খুঁজিতে আমি বলিয়া কিছু পাই না। যাহা অবশিষ্ট থাকেন—তাহাই ঈশ্বর।' হৃদয়ে তাঁহার এইরূপ সরল বাঙ্গালায় উপদেশ সকল তীব্র আঘাত করিল। কেশব বাবুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ প্রতাপবাবুর 'My mind is still floating in the luminous atmosphere' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী, জীবনে নূতন আলোক আনিল। সে বহুপূর্ব্বের কথা—তখন অমৃতোপম কথামৃত গুপ্ত মহাশয়ের [illegible] বহিতে গুপ্ত ছিল। এই সময়ে ভক্ত রামচন্দ্র কলিকাতায় সাধারণে প্রকাশ করি-লেন—শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্তের নামও উল্লেখ করিলেন। কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে ভক্তসম্মিলনে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বার্ত্তালাপে কয়েকটী দিন উৎসাহে কাটিল। কিন্তু সেও ভাসা ভাসা, উপর উপর আনন্দ। পরিশেষে 'বরাহনগর মঠে'র ত্যাগী সাধুগণ এবং পরে আচার্য্যপ্রমুখ বিবেকানন্দ—এ হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা জীমূতমন্দ্রে ঘোষণা করিলেন। ধন্য স্বামীজি, তোমার কৃপায়

আজ শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিবার চেষ্টা করিতেছি—তুমি নিজ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ 'অম্বর ভাবসাগরের চিরউন্মাদ' জলন্ত ছবি জলন্তভাবে দেখাইয়া আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যথার্থই চিরকালের নিমিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছ!

শ্রীরামকৃষ্ণ কি ও কে? অসাম্প্রদায়িকতা, প্রত্যক্ষ অনুভব, কামকাঞ্চন বর্জ্জন, অপূর্ব্ব সমাধি, অপূর্ব্ব জ্ঞান, অপূর্ব্ব প্রেম—এই সকলের এক বিরাট্ সম্মিলন—আহা যতই বলি, ততই যেন বলিতে বাকি থাকে—আবার বলি—কঠোর তপস্যা, সরল বালকভাব, অপূর্ব্ব নির্ভরতা, অপূর্ব্ব দয়া—কত বলিব?

পাঠক, শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবে কি? চিত্রাদি ও গ্রন্থাদি তাঁহার ভাবের কিছু কিছু ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে—ইচ্ছা হয় ত ঐগুলির সঙ্গে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিও। কিন্তু এ সকল ত জড়—ইহারা সেই মহাচেতনের মন-বচনাতীত চৈতন্যগভীরতার কতটুকু সাক্ষ্য দিবে? তাই বলি, যে সকল চেতন জীব নিজ হৃদয়ে তাঁহাকে একটু আধটু ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের তত্ত্ব কর, তাঁহাদের তত্ত্ব কর। এখনও সকলে অন্তর্হিত হন নাই। পরে মহা আপসোস্ থাকিবে। ভাই—এই বেলা—যদি সাধ থাকে ত এই বেলা—আর দেরি করিও না। আর দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা ভুলিও না, ভুলিও না। যে মহা জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের [illegible] উঠিয়াছে, তাহাতে জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে! তুমি কি আপনাকে উহা হইতে নির্লিপ্ত রাখিবে? ভাই, ঠাকুরের কাছে আসিলে নিজের ভাব ছাড়িতে হয় না—তুমি যেমন, তোমার কাছে ঠাকুর ঠিক তেমনিটি হইয়া তোমার ভাষায় তোমার ভাবে তোমাকে উপদেশ করিবেন, পথ দেখাইয়া দিবেন! কি চাও ভাই? ভক্তি? ঠাকুর যে স্বয়ং ভক্তির জাহাজ। কি চাও ভাই? যোগ? ঐ দেখ অহরহ সহজ সমাধিযোগ। কি চাও ভাই? জ্ঞান? এই দেখ তাঁহার সহজ জ্ঞানে বড় বড় তথাকথিত জ্ঞানী স্তম্ভিত। কি চাও ভাই? কর্ম্ম? দেখিতেছ না ঠাকুর অহরহ কর্ম্মশীল? দেখিতেছ না তাঁহার 'কর্ম্ম-কঠোর'—গরীবের [illegible] পাপী তাপীর দুঃখে অহরহ ক্রন্দন, ভক্তদিগকে সকরুণ আহ্বান, রোগের প্রবল যাতনায়ও দূর হইতে কোন ভক্ত ভগবৎকথা দুটা শুনিতে আসিয়াছে—অমনি প্রভুর আপনার শারীরিক যাতনা সব ভুলিয়া তাহাকে উপদেশ দান? কে করিতে পারে এমন ক্রমাগত কার্য্যে—পরের বোঝা নিজ স্কন্ধে লইয়া—নিত্য তিল তিল করিয়া শরীর ক্ষয়?

ঈশ্বর ত একটা কথার কথা—ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌ছি। বর্ত্তমান যুগে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণই বল্‌ছেন—কথার কথা নয়—আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখিছি—

তোরাও যদি দেখ্‌বি ত আয়। ধর্ম্ম নিয়ে বকাবকি মারামারি দর্শনের চুলচেরা বিচার—শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা—হৃদয় তিক্ত—এমন সময়ে কে এ মহাপুরুষ আজ এ দ্বেষকোলাহলের ভিতর এ অমৃতময়ী বাণী শুনালেন—সব ধর্ম্ম সত্য—বিবাদ ত্যাগ কর—যা হোক একটা কিছু ধরে অধ্যবসায়ের সহিত সাধনে লেগে যাও? ভাই, শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি বিশ্বাস না হয় ত দুনিয়া প্রদক্ষিণ করে সব ধর্ম্ম, সব মত দেখে এস—তাঁকে যা পরীক্ষা কর্‌বার ইচ্ছে হয় করে বাজিয়ে নাও—প্রভু সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন—তোমায় দৃঢ় কোরে বল্‌ছি। তাঁকে গাল দাও, তাতে আপত্তি নাই; তাঁকে গাল দেবে না ত কাকে দেবে? আর কে তোমার একটা গাল খেয়ে দশটা গাল না দিয়ে চুপ করে থাক্‌বে? কিন্তু তাঁর বিষয় আলোচনা ছেড় না। তাঁকে বুঝ্‌তে কি পার্‌বে? মনেও কোরো না। তবে তোমার যেটুকু বোঝ্‌বার শক্তি আছে, তা না দিয়ে আর কি দিয়ে তাঁকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে? তাই কর। তিনি বড় হলেও তোমার বুদ্ধিতে তোমার মত ছোট হয়ে প্রকাশ হইবেন। ক্রমশঃ আধারও বাড়্‌তে থাক্‌বে আরো বেশী বেশী তাঁর প্রকাশ হতে থাক্‌বে।

আর বলি, হে যুবকসম্প্রদায়! হে অনাঘ্রাত পুষ্পতুল্য বিষয়বুদ্ধিলেশশূন্য-বালকগণ! তোমরা আ-ঠোকরান আম—ঠাকুর বল্‌তেন। তোমরা দেবতার ভোগে লাগিবার উপযুক্ত। তোমরা কি দেবসেবায় না লেগে, পিশাচ পিশাচীর ভোগের বস্তু হোতে যাবে? তা কখনই হইতে পারে না। ঐ দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁর মহা কাযের সহায়তার জন্য তোমাদের সকরুণ আহ্বান কর্‌ছেন। তোমরা কি তাঁর সুমধুর আহ্বান উপেক্ষা করিবে? বধীর হয়ে থাক্‌বে?

——শ্রীরামকৃষ্ণপন্থী।

সংবাদ।

গত ১৬ই ফাল্গুন রবিবার মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণমঠে ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তথায় সেদিন ভজন, হরিকথা, কাঙ্গালি-ভোজন এবং বক্তৃতা হয়। ডাক্তার এম, সি, ননজান্দা রাও বক্তৃতা করেন।

উক্ত দিবস ও তৎপর দিবস সোমবার, এই দিবসদ্বয়ে মহুলা রামকৃষ্ণ-অনাথ-আশ্রমে বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ও কতিপয় ভদ্র মহোদয়গণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নাগপুরস্থ ৺মুবলিধবের মন্দিরে শ্রীবামকৃষ্ণজন্মোৎসব সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। তথায়ও শ্রীবামকৃষ্ণদেবেব জীবনী সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ভজন, কীর্ত্তন এবং গরীবদেব ভোজন কবান হয়।

ঢাকায় তত্রস্থ বামকৃষ্ণ মিশনেব সভ্যগণ কর্ত্তৃক গত ১০ই ফাল্গুন সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবেব জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে যথাবিহিত পূজা, আবাত্রিক, হোম ও ভোগাদি দেওয়া হয এবং ১৬ই ফাল্গুন ববিবাব দিবসে শ্রীবামকৃষ্ণ-স্তোত্রাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া উপস্থিত জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ কবা হয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

The Complete Works of Swami Vivekananda (Mayavati Memorial Edition) তৃতীয় ভাগ। মূল্য ২॥০ টাকা। প্রবুদ্ধ ভারত আফিস, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত এবং তথায় ও উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্তব্য। উত্তমরূপে সংস্কৃত ও সম্পাদিত।

এই ভাগে ভক্তিযোগ এবং Colombo to Almoraয় প্রকাশিত অভিনন্দন ও বক্তৃতা সমূহ ব্যতীত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা এবং ভারতীয় অন্যান্য বক্তৃতা বা বক্তৃতার রিপোর্ট যতদুব সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিভাগে একখানি করিয়া স্বামীজির অতি সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি সন্নিবেশিত আছে। আর দুই ভাগে গ্রন্থাবলি সম্পূর্ণ হইবে।

এ পর্য্যন্ত স্বামীজির সমুদয় বক্তৃতা ও গ্রন্থ একত্র উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয় নাই। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র এই গ্রন্থাবলি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, আর এক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হইয়া সাধারণের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ। আট খণ্ড একত্রে। শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এস, সি, মিত্র এণ্ড কোং কর্ত্তৃক ৩৮নং নন্দলাল দের ষ্ট্রীট, কুটিঘাটা, বরাহনগর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং উদ্বোধন আফিস ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। তৃতীয় সংস্করণ, ২৭৬ পৃঃ, মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলি সংগ্রহ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। পরে সমুদয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে তাহাতে সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করিয়া একত্রে পুস্তকাকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর অনেক দিন ধরিয়া নানা কারণে উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। অনেকে এই 'আদি ও অমৃতময়' উপদেশ পুস্তকের অনুসন্ধান করিয়া নিরাশ হইয়াছেন। এক্ষণে সমুদয় বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া প্রকাশকগণ ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করাতে সাধারণের একটী বিশেষ অভাব মোচন হইল। সুরেশ বাবু এই সংস্করণে অনেকগুলি নূতন উপদেশ সংযোজিত করিয়াছেন। উপদেশসংখ্যা এই পুস্তকে ৭৫০ দাড়াইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের পরিচয় বঙ্গীয় পাঠককে এখন দেওয়া বাহুল্যমাত্র। সকলেই কোন না কোন আকারে ইহার সহিত পরিচিত। আমরা সকলকেই অবিলম্বে এই পুস্তক এক এক খানি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

'নমো রামকৃষ্ণায়।'

—)*(—

জন্মোৎসব গীতি।*

সিন্ধুড়া..............ধামার।

আনন্দ সাগরে আজি কেন ভাসে ত্রিভুবন ?
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ কা'র শুভ আগমন ?
হের বিশ্বপুরবাসী, অপরূপ রূপ রাশি,
শত অমানিশা নাশি' উদে কেবা জ্যোতি ঘন !
কেবা সে অমৃত ধারা যাহে সবে মাতোয়ারা,
ভুলি শোক ব্যাধি জরা শান্তি সুধা করে পান।
কার 'সমন্বয়' গানে বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গনে
দ্বেষ হিংসা ত্যজি আজি, জগতের জীবগণ !
জ্ঞান কর্ম্ম সমস্ফূর্ত্তি প্রেম-ঘন কার মূর্ত্তি
রামকৃষ্ণ নাম ধরি মহাশক্তি আগুয়ান্।
জড়িত কাম-কাঞ্চনে ত্রিতাপে তাপিত জনে
উদ্ধার হে কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু করি দান।
তুমি না করিলে দয়া, কিসে যাবে মোহমায়া,
যাচে হরি পদ-ছায়া অধম সন্তানগণ !

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

---

* ১৬ই ফাল্গুন বেলুড়মঠস্থ মহামহোৎসবে বাগবাজার বান্ধব-নাট্যসমাজ কর্তৃক গীত।

রামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য।

১৯০৮ সনের জানুয়ারি হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন হইতে যে দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্য করা হয়, তাহার সুবিস্তৃত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। আমরা এখানে উহা হইতে হিসাব নিকাশের তালিকাটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সর্ব্বশুদ্ধ আয় মোট—১৫২১৭॥৶৹

খরচের তালিকা।

যশোহর কেন্দ্র—

চাউল খরিদ—	৭১৸৹
লবণ	।৹
মোট—	৭২৲

মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র—

চাউল খরিদ—	২৬০৭॥/৩ পাই
সাজসরঞ্জাম —	২৫।/৬ "
রাহাখরচ—	৪৪৸/৬ "
নগদ দান—	৮।৶৬ "
পোষ্টেজ—	১৸৶৩ "
খুচরা খরচ—	১১৸৹
মোট—	২৬৯৯৸৶৹

(পুরী জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২৫০৲ টাকার হিসাব)

রুগ্নদিগকে নগদ দান—	১৬।৵৹
অনাথগণকে	২৩।৶৹
দুঃস্থ ভদ্রপরিবারগণকে—	৪২৭।৵৬ পাই
রুগ্নদিগকে বস্ত্র দান—	১৬১।৶৹
ঔষধ ও পথ্যাদি—	৭১।৵৯ "
অনাথ ও বিধবাদিগকে নগদ দান—	১৬৩৲
নব্বা গরিবখানায় দান—	৬০৲
ফতেপুর অনাথালয়ে "	১০৲
সস্তাদরে বিক্রয় নিমিত্ত বীজ খরিদ	৫৩৸৯ পাই
শিল্পিগণকে সাহায্য—	১৩৲
বীজ দ্বারা সাহায্য	২৩৯৶৹
কৃষকদের	১১৲
মোট—	১২৫০৲

পুরী কেন্দ্র—

(কৃষ্ণপ্রসাদ ওলাউঠা ক্যাম্প)

ঔষধ ও পথ্য—	৩১৸৩ পাই
সাজসরঞ্জাম	।৶৬ "
সেবকগণের খাইখরচ—	১১৸/৹
পোষ্টেজ ও পার্শেল খরচ—	॥৵৹
আলো—	৵৩ পাই
রাহা খরচ—	৫৲৬ "
খুচরা—	৸৵৬ "
মোট—	৫০৸৹

ফতেপুর—

চাউল ও মাণ্ডিয়া—	৬০৩৮৸/৯ পাই
রাস্তাদি মেরামত—	২৯২।৶৩ "
গরিবখানায় দান—	৩৮৶৬ "
সেবকগণের রাহাখরচ—	১১০॥৵৬ "
পাচক, সরদার ও মেট ইত্যাদির বেতনাদি—	২০।/৩ "
সাজসরঞ্জাম	২২॥৶৬ "
আলো—	৫৸৶৬ "
সেবকগণের খাইখরচ—	৭৮৸/৯ "
ডাক্তারি সাহায্য—	৸/৩ "

নগদ দান—	৮৻৬ পাই
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় খরচ—	৫৸৴৹ „
দানের নিমিত্ত বস্ত্র সেলাই—	৷৵৹ „
পোষ্টেজ ও পার্শেল খরচ—	১১৻৬ „
অন্যান্য খুচরা —	৭৴৹ „
অনাথাশ্রমে খরচ—	২৮৵৹
মোট—	৬৬৬৯৷৴৩

ভিতিপু—

চাউল ও মাশুল—	৩২৮৩৸৴৹
সেবকগণের রাহাখরচ—	৩২৷৮ পাই
„ খাই „	৫৫৶৩ „
আলো—	৩৷৴৯ „
পোষ্টেজ ও পার্শেল খরচ—	১৷৹
নগদ দান—	১৶৹
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় দান—	১৲
ডাক্তারি সাহায্য—	৸৹
সাজসরঞ্জাম—	৬৸৴৩ পাই
পাচক, চাকর, সরদারাদির বেতন—	৭৸৵৹
খুচরা—	১৷৴৬ পাই
মোট—	৩৩৯৫৵৫ পাই

সাতপাড়া—

চাউল খরিদ ব্যয় মাশুল—	৩৫৴৹
নগদ সাহায্য—	৵৹
সেবকগণের রাহাখরচ—	১৮৷৶৬ পাই
পোষ্টেজ—	৷৵৹
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে গরীবদের খাওয়ান—	৫৷৹
সাজসরঞ্জাম এবং খুচরা	৫৷৬ পাই
মোট—	৬৫৷৴৹

বেলুড় মঠ—

মণি অর্ডার কমিশন—	১১৯৵৹
পোষ্টেজ —	২৪৷৴৬ পাই
মুটে, গাড়ি ও অন্যান্য খুচরা—	৩৸৵২ „
অর্থ ভিক্ষা করিতে ও সেবকগণকে পাঠাইতে নৌকা, রেল ও ট্রাম ভাড়া—	২৬৸৵৩ „
টেলিগ্রাম	৷৵৹
আলো—	১৸৴৯ „
সাজসরঞ্জাম	৪২ ৶৯ „
ঔষধ, বিস্কুট বার্লি ইত্যাদি—	২৪৷৶৬ „
ষ্টেশনারি	৪৸৴৹
১৮ জন অতি দুঃস্থ ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য—	৭০৷৵৹
নূতন ও পুরাতন বস্ত্র এবং ঔষধ পাঠাইবার রেল ও ডাকমাশুল—	৪৫৻৩ পাই
১ খানি চেক বহি—	১৷৴৹
রসিদ ফরম—	৩৸৹
মোট—	৩৬৯ ৶২ পাই
হস্তে বাকি—	৬৪৫৷৶২ „
সর্ব্বশুদ্ধ মোট —	১৫২১৭৷৵৹

শান্তিসুধা ।

['ব' লিখিত ।]

চতুর্থ অধ্যায় ।

সংসার ও মায়া ।

শিষ্য—সংসারের যত লোক 'সংসার' 'সংসার' করি
এত বা উন্মত্ত কেন ? কেন নাহি ভজে হরি ?

রামকৃষ্ণ—কলায়ের ডালে আছে আস্বাদ কিঞ্চিৎ ।
কিন্তু হেন লোক আছে তাতেই পীরিত ॥

ভাল খাদ্য সব ফেলে বাটি বাটি খায় ।
হোক্ কফ হোক্ জ্বর তাই খেতে চায় ॥

বদ্ধজীব সেই মত কামিনী-কাঞ্চনে চায় ।
হোক্ তাহে সর্ব্বনাশ তবু হুঁস নাহি হয় ॥

হৃষ্ট পুষ্ট গাভী বৎস লাফে লাফে ধায় ।
প্রফুল্ল অন্তর কত সুন্দর দেখায় ॥
কিন্তু তার গলদেশে দড়ি বাঁধ যবে ।
ঘুচে যাবে ফুল্ল কান্তি, ক্রমে সে শুকাবে ॥

সবল বালক তথা প্রফুল্ল বদন ।
সংসারের মায়া জোরে মলিন [illegible]

ফুল্ল ফুল কামিনীরে [illegible] চায় ।
ধনীর ঐশ্বর্য্য দেখে [illegible] প্রায় ॥

ঈশ্বরের রূপ কিন্তু যদি হয় দরশন ।
তুচ্ছ হয় নারীমায়া মান যশ ধন জন ॥

ক্ষুদ্র শিশু নাহি বোঝে দাম্পত্য প্রণয় ।
সংসারী না বোঝে ধর্ম্মে কি আনন্দ হয় ॥

বাটিতে রসুন রেখে মাজ গন্ধ ছাড়ে তায়।
কামকাঞ্চনের লেপ মন হতে নাহি যায়॥
ও দুয়ে ডুবিলে মন আর কি প্রভুবে পায়?
কাকেতে ঠোক্‌রালে আম আর কি দেবে খায়?

দৈয়ের হাঁড়িতে দুধ কখন না ভাল রবে।
সংসারী মনেতে শুদ্ধা ভক্তি কভু নাহি হবে॥

হাজার সেয়ানা হোক কাজলের ঘরে যায়।
একটুও কালি তার নিশ্চয় লাগিবে গায়॥

কাম-কাঞ্চনের পঙ্কে যাহা'রা পশেছে।
সে পাঁক লাগেনি গায় হেন কেবা আছে?

সংসারী লোকের প্রভু এই তিন জন,—
আপিসে মনিব, আর কামিনী, কাঞ্চন॥

মুখে রক্ত পড়ে, উট তবু কাঁটা খায়।
না ছাড়ে সংসার লোক যত শোক পায়॥
এক পত্নী ম'রে যায়, আর বিয়ে করে।
পুত্রহারা চুল বাঁধে সোনা দানা পরে॥

মোকদ্দমা ক'রে লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়।
তবু পোড়া মোকদ্দমা ছাড়িতে না চায়॥

আয় নাই ভাত দিবে, তবু না ভাবয়।
বছর বছর ছেলে কিসে নাহি হয়॥

যাহার কেহই নাহি, কুকুর বিড়াল পোষে।
এমনি সংসার মায়া, ছাই ভস্মে মন তোষে॥

বিষ্ঠার কীটের সদা আনন্দ বিষ্ঠায়।
ভাল স্থানে রাখ যদি তবে ম'রে যায়॥

দুর্য্যোগেতে রেতে দুই মেছুনির মেয়ে।
মালীর মালঞ্চে ঢুকে রহিল শুইয়ে॥

সে বাগানে বেল যুঁই নানা জাতি ফুল।
গোলাপের গন্ধে অলি সদাই আকুল॥

সে গন্ধ তাদের নাহি উত্তম লাগিল।
বলে দিদি হেথা এসে একি কাল হোল॥
বিট্‌কেল ফুলের গন্ধে ঘুমানো কি যায়?
মালী ব্যাটা নিত্য শোয়, কেমনে ঘুমায়!
পরে এক যুক্তি দোঁহে করিলেক খাড়া।
নাকের নিকটে রাখে মাছের চোপড়া॥
মেছো গন্ধে তবে তারা সুখে নিদ্রা যায়।
মত্ত বিষয়ীর দশা ঠিক ওরি প্রায়॥
ঈশ্বরীয় কথা তার ভাল না লাগিবে।
বিষয়ের কথা তোলো হেসে কথা কবে॥

সংসারে আবদ্ধ জীব বয়স পঞ্চাশ।
কাল মৃত্যু হবে, আজ বসে খেলে তাস!

নূতন সহরে এসে লোক একজন।
ঘুরে ফিরে বাসা আগে করে নিরূপণ॥

তল্পী তল্পা ফেলে তথা তালা বন্ধ করে।
সহর দেখিতে যায় নিশ্চিন্ত অন্তরে॥

অন্য জন তথা এসে মনে মনে ভাবে।
সহর দেখার পর বাসা ঠিক হবে॥

তল্পী কাঁধে করি ফিরে রাস্তায় রাস্তায়।
চোরে পাছে মেরে লয় মনে কিন্তু ভয়॥

তল্পী মাঝে মন শোভা দেখে বা কখন?
সাধক ও সংসারীর প্রভেদ এমন!

বাসা ঠিক আগে করে।
সংসার দেখিবে পরে॥

শিষ্য—সংসারীও মাঝে মাঝে হরিনাম লয়।
বিষয়ের টান তবু কেন না কময় ॥

রামকৃষ্ণ—সংসারী স্বভাব হেরি ঘৃণ্য মাছি প্রায়।
এই দেখি ফুল মাঝে তখনি বিষ্ঠায় ॥

তপ্ত লৌহে জল ছিটা কতক্ষণ রয়?
বিষয়ী প্রাণের ভক্তি নিমেষে পলায় ॥

ফিট্ বাবু বন্ধু সনে 'ষ্টিক্' হাতে ক'রে।
বেড়াতে বেড়াতে নিজ বাগান ভিতরে ॥
বলেন তুলিয়া এক গোলাপ সুন্দর।
"কেমন বিউটিফুল গড়েছে ঈশ্বর" ॥

সংসারীর নাম লওয়া ঐরূপ ঠিক।
তাহার ঈশ্বর ভাব তেমতি ক্ষণিক ॥

ছেলেরা কোঁদল করে খেলার সময়।
ঈশ্বরের দিব্য লাগে একে অন্যে কয় ॥
বিষয়ী ঈশ্বর বলে সেইরূপ প্রায়।
ভাবহীন নামে কভু ভক্তি কি বাড়য়?

আল্লা আল্লা যে ফকীর মুখে শুধু বলে।
ত'ার কাছ থেকে আল্লা বহু দূরে চলে ॥
মূলা খেলে উঠে যথা ঢেকুর মূলার।
বিষয়ে ডুবিলে মন হেন দশা তার ॥

বেশী জল ঢেলে দুধে ক্ষীর করা বড় দায়।
বিষয়ে ডুবিলে মন বহু কষ্টে সিদ্ধি পায় ॥

আলিতে ইন্দুর গর্ত্ত সে ক্ষেতে কি জল থাকে?
কাম-কাঞ্চনেতে তৃষ্ণা সে মনে কি ভক্তি পাকে?

দাঁড়েতে বসিয়া তোতা রাধাকৃষ্ণ নাম বলে।
ট্যাঁ—ট্যাঁ করে মরে কিন্তু বিড়ালে ধরিতে এলে ॥

বিষয়ী মনের দশা উহারই প্রায়।
কনক কামিনী দেখে সব ভুলে যায়॥

ইসপিরিঙ্গের গদি সনে বস, পড়ে নেবে।
উঠিলে উঠিবে পুনঃ যেমন তেমনি হবে॥

বিষয়ী মনের দশা সেইরূপ জান।
ভজন ছাড়িলে পরে যেমন তেমন॥

'হরিশের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া।
কাশী যা'ব চলে আমি সংসার ছাড়িয়া'॥
বিষয়ী বলয়ে কিন্তু যেই বিয়ে হয়।
'হরিশের ছেলে দেখে যাইব' ভাবয়!
বালক বয়সে মতি দিলে ভগবানে।
ষোল আনা মন যায় তাঁহারই পানে॥
নতুবা হইলে বড় আট আনা পত্নী লয়।
চারি আনা সন্তানাদি, বাকী অর্থ নামে যায়॥

মাছিগুলা বসে বসে মিষ্টান্ন উপরে।
ছানা চিনি সুখে খায় ময়রার ঘরে॥
কিন্তু যদি নিয়ে যায় ময়লা মেথর।
অমনি উড়িয়া বসে তাহার উপর॥
মৌমাছি ছাড়িয়া মধু কোথাও না যায়।
সংসারী মক্ষিকা, সাধু মৌমাছির প্রায়॥

শুষ্ক দেশালাই প্রায় সাধকের মন।
হরিনাম সংঘর্ষণে জ্বলে হুতাশন॥
সংসারীর মন যেন ভিজা দেশালাই।
যতই ঘষনা কেন কিছু হবে নাই॥

পাথরে যেমন জল প্রবিষ্ট না হয়।
হরিনামে নাহি গলে সংসারীহৃদয়॥

প্রস্তরে না বসে সূচ, পশে মৃত্তিকায়।
সাধুতে পশয়ে ভক্তি বিষয়ীতে নয়॥

নদীপরে সেতু হেন বিষয়ীহৃদয়।
চলে যায় ধর্ম্মস্রোত ছোঁয় নাকো তায়॥

পাড়াগাঁয়ে বেজী পোষে গলে বাঁধে ভার।
দেয়াল ভিতরে গর্ত্তে বাসা রাখে তার॥
ঝোলে ভার যবে ভয়ে ঢোকে সে বাসায়।
ভারের টানেতে পরে নামে পুনরায়॥
ঘা খেয়ে বিষয়ী লয় বিভুর শরণ।
সংসারের টানে হয় আবার পতন॥

বিকারে রোগীর ঘরে তেঁতুল আচার।
কেমনে রোগের হাতে পাবে সে নিস্তার?
বিকার এ ভব রোগে মোহ অহঙ্কার।
কামিনীই এ সংসারে তেঁতুল আচার॥
আচারের নামেতেই মুখে উঠে জল।
কামিনীর রূপ মোহে পুরুষ পাগল॥
বিষয়ের তৃষ্ণা সদা করে ঝালাপালা।
ঘরেতে কাঞ্চন আছে জল এক জালা॥
সবেই বিকারী রোগী সংসার ভবনে।
কুপথ্য করিয়া রোগ সারিবে কেমনে?

চুলকে না চুলকাতে সুখ, শেষে ভারি জ্বলে
সংসারেরও সুখ যত সব তেমনি ফলে॥
কভু ঘায়ে বসে মাছি কভু পূজাফুলে।
অস্থির সংসারী মন পাপে পুণ্যে বুলে॥

শিষ্য—সংসারী লোকেরো কত বুদ্ধি দেখা যায়,—

রামকৃষ্ণ—বিষয়ীর হীন বুদ্ধি ধূর্ত্ত কাক প্রায়॥
এড়াইয়া ফাঁদ বটে চলে অনুক্ষণ।
কিন্তু দেখ বিষ্ঠা কৃমি সতত ভোজন॥

শিষ্য—সংসারী লোকেতে কত উপদেশ শোনে।

রামকৃষ্ণ—শোনে বটে কিন্তু তার না থাকে ধেয়ানে ॥

পাথরের দেয়ালেতে পেরেক না বসে।
উপদেশে হবে কিসে মত্ত অন্য বসে ॥

তলোয়ার নাহি বসে কুমীরের শক্ত গায়।
বিষয়ে উন্মত্ত প্রাণে সুকথা না স্থান পায় ॥

দেখিতে সুন্দর বটে সংসার আমড়া।
খুলে দেখ শস্য নাই হাড় ও চামড়া ॥

ভুঞ্জিলে অশেষ দুঃখ হয় অম্লশূল।
তবু সবে খাবে তারে ভাগ্য প্রতিকুল ॥

সর্পময় গৃহে বাস কঠিন যেমন।
নানা প্রলোভনময় সংসারে তেমন ॥
ছাগ শিশু বলে "মাগো," অঘ্রাণ আসিলে।
"কতই আনন্দ পাব বাসফুল খেলে ॥"
মা বলে, "তাবত বাছা, বেঁচে থাক আগে।
কত পূজা এর মাঝে, কত পাঠা লাগে ॥"
ভজনে লেগেই লোক বলে কবে পাব।
ভক্তি বাসফুল মোরা কখন খাইব ?
আমি বলি ওরে যাদু কালেতে পাইবে।
কনক কামিনী মায়া কেটে জাগ তবে ॥
বদ্ধজীব যবে বোঝে হেথা নাই সার।
তবে সে ছাড়িতে নারে আর এ সংসার ॥
সাপে ছুঁচো ধরে গন্ধ সহিবারে নারে।
উদ্গারিতে ইচ্ছা বটে কিন্তু তাকি পারে ?

শিষ্য—শুনি প্রভো তাঁহারই বিভূতি সংসার।
তবে কেন তাঁরে নাহি দেখি কোনধার ?

রামকৃষ্ণ—মেঘ উঠে ঢাকা দেয় উজল তপন।
মায়ার অহম্ তথা ঢাকে নারায়ণ ॥
উপাধি ব্যাধির প্রায়—অহঙ্কার হয়।
টাকাও উপাধি তুল্য, মত্ততা আনয় ॥
ভঁাড়ারিরে সঁপে দিয়ে কর্ত্তা তথা নাহি যায়।
অহমে বসায়ে মনে বিভুও নিশ্চিন্ত রয় ॥
ভঁাড়ারি জবাব দিলে।
কর্ত্তাটি ভঁাড়ারে চলে ॥

স্ত্রী পুত্রের ভালবাসা, তার নাম মায়া।
সর্ব্বভূতে ভালবাসা, তার নাম দয়া ॥
দয়া মায়া দুটি গুণে তফাৎ অনেক।
দয়া বটে ভাল, কিন্তু মায়াতেই ঠেক ॥

এই আছে এই নাই অনিত্য সংসার।
মায়া মুগ্ধ নর বলে 'আমার' 'আমার' ॥

চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে ভূপতি প্রবর।
লড়ে বলে মোর ধরা, হাসেন ঈশ্বর ॥
একচুল জমি নিয়া দুই সহোদর।
মাথা ফাটাফাটি করে, হাসেন ঈশ্বর ॥
'বাঁচাব' ডাক্তার বলে, আসন্ন মরণ।
হাসেন অজ্ঞতা হেরি ঈশ্বর তখন ॥
জল চ'লে ঘুনি মাঝে ঝিলমিল করে।
মহাসুখে মাছ ঢোকে ফাঁদের ভিতরে ॥
বাহির হইতে পরে পথ নাহি পায়।
জীব তথা পড়ে ফাঁদে মোহিনী মায়ায় ॥

'আমিই দিতেছি আলো'
জোনাকীটি মনে করে।
নক্ষত্র উদিলে তার
অহঙ্কার যায় দূরে ॥

আলোকের অহঙ্কার
নক্ষত্র গগনে গায়।
সুধাংশু উদিত হ'লে
কোথায় চলিয়া যায়॥
একপ বিচার যদি
থাকে মনে অনুক্ষণ।
দূরে যায় অহঙ্কার
শান্তি লভে সর্ব্বজন॥

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।
৩রা জানুযারি, ১৮৯৫।

প্রিয় মহাশয়,

প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আপনাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমার জীবনে অল্প কয়েক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় ভাব ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলনে সম্পূর্ণ আবার যাঁহারা তাহার উপর মনের ভাবসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি রাখেন—আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট—তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটী মনের ভাব বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভারতে কার্য্য আরম্ভ বেশ হইয়াছে আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নহে, মহা উদ্যমের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করিতে হইবে। এই—সময়, এখন আলস্য করিলে পরে আর কার্য্যের সুযোগ থাকিবে না। আমি কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিয়া এক্ষণে উহাকে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে। আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায় তাহা করিতে হইবে, উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্ম্ম-

সমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্র-স্বরূপ একখানি ইংরাজী ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।

প্রথমেই এইটী করিতে হইবে—আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই বড় বড় বিষয় দাঁড়াইয়া থাকে, কয়েকটী কারণে মান্দ্রাজই এক্ষণে এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোম্বাইএ সেই চিরদিনের জড়ত্ব; বাঙ্গালায় ভয়—এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, তেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। মান্দ্রাজই এক্ষণে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ভাবই সামঞ্জস্যভাবে ধারণা করিবার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট মধ্যপথে অবস্থিত রহিয়াছে।

সমাজের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এ বিষয় ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমার সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি? সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আমার প্রণালী এই। আমি কখন এটা মনে করিনা যে, আমার জাতি এত দিন ধরিয়া কেবল অন্যায় করিয়া আসিতেছে; কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই—আরো ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে সত্যে, মন্দ হইতে ভালোতে যাইতে হইবে না, সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভালো হইতে আরো ভালোয়, আরো ভালোয় যাইতে হইবে। আমি আমার স্বদেশবাসীকে বলি—এতদিন তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা বেশ হইয়াছে, এখন আরো ভালো করিবার সময় আসিয়াছে। এই জাতির কথাই ধরুন—সংস্কৃতে জাতি শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলেই ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা অর্থাৎ জাতির অর্থই সৃষ্টি। 'আমি এক—বহু হইব'—বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক থাকে—বহুত্ব বা বিচিত্রতাই সৃষ্টি। যদি এই বিচিত্রতা না থাকে, তবে সৃষ্টিই লোপ পাইবে।

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে, ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখনই উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, অথবা যখন উহার বিচিত্রতা উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই উহা মরিয়া যায়। 'জাতি'র আদিম অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ জাতি প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই।

ভারতের পতন হইল কখন? যখন এই জাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট হইবে। এখন ইহা আমাদের সত্য বলিয়াই বোধ হয় যে, এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎও নষ্ট হইবে। আধুনিক জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে, উহা প্রকৃত জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। উহা যথার্থই প্রকৃত জাতি অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতির ব্যাঘাত করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক জাতি প্রকৃতপক্ষে যথার্থ 'জাতি'র প্রভাবকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না আর যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসীগণকে এই বলিতে চাই যে, জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রত্যেক বদ্ধমূল আভিজাত্য অথবা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ই জাতির প্রতিবন্ধক—উহারা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব। এক্ষণে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যখনই উহা জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কৃতকার্য্য হইল, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ জাতি গঠন করিতে যে সকল বাধা আছে, সেই সকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া দিল, তখনই ইউরোপ উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত জাতির বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা—সেই জন্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা জন্মিবামাত্র বালকবালিকার জাতি নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজত্ব, ব্যক্তিত্ব আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়াছেন। আমরা যদি পুনরায় ইহাকে পূর্ণ তেজে চলিতে দিই, তবেই আমরা কেবল উঠিতে পারিব। আবার এই বিচিত্রতার অর্থ বৈষম্য বা কাহারও বিশেষ সুবিধা নহে। আমার ইহাই কার্য্যপ্রণালী—হিন্দুদের দেখানো যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষিগণ-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব ছাড়িতে হইবে। অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতিস্রোত বন্ধ হইয়াছিল- তাহার কারণ—তখন জীবনমরণের সমস্যা—উন্নতির সময় কৈ? এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই—এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে—স্বধর্ম্মত্যাগী ও মিশনরিগণের উপদিষ্ট ভাঙ্গাচোরার পথে নয়—আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে উন্নতি করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। শত শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ

একেবারে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করা হউক—তাহা হইলে সবই যথাস্থানে স্থাপিত বলিয়া মানাইবে ও সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্য্য-প্রণালী। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা নাই। প্রত্যেক জাতীর জীবনে একটী করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম্ম, উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জলস্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। আমার চিন্তাপ্রণালী অনুযায়ী একটা বিষয় বলা হইল। আশা করি, সময়ে আমার সমুদয় চিন্তারাশি প্রকাশ করিতে পারিব।

কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই দেশে এবং কেবল এখানেই সাহায্যের প্রত্যাশা করি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল আমার ভাব বিস্তার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। এখন আমার ইচ্ছা—ভারতেও একটা চেষ্টা হউক। কেবল একমাত্র মান্দ্রাজেই আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আ— ও অন্যান্য যুবকগণ খুব খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা "উৎসাহশীল যুবক" মাত্র। এই কারণে আমি তাহাদিগকে আপনার নিকট সমর্পন করিলাম। যদি আপনি ইহাদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চয় ধারণা—উহারা কৃতকার্য্য হইবে। আমি জানি না, কবে আমি ভারতে যাইব। তিনি যেমন চালাইতেছেন, আমি সেইরূপ চলিতেছি। আমি তাঁহার হাতে।

"এই জগতে ধনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠতম রত্নরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি—হে প্রভো, তোমার নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।"

"ভালবাসার পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকেই একমাত্র ভালবাসার পাত্র পাইয়াছি। আমি তোমার নিকট আপনাকে বলি দিলাম।"

——যজুর্ব্বেদসংহিতা।

প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরকৃতজ্ঞ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—এই পত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ-মঠ।

[স্বামী ব্রহ্মানন্দের বক্তৃতা।]

গত ২০শে জানুযারি বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিশনেব প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উপস্থিত থাকিযা এই মঠ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাধা করেন। সিষ্টার দেবমাতা, মহীশূরের দেওযান বাহাদুব এবং বাঙ্গালোরেব অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে দেওযান বাহাদুব বাঙ্গালোরবাসিগণেব মুখস্বরূপ হইয়া নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ কবিলেন।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, বামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট,

পূজনীয় স্বামীজি,

আমরা পরম আনন্দেব সহিত বাঙ্গালোবে আপনার স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। এই অঞ্চলে শ্রীবামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম এখনই এক রকম ঘরের কথা হইয়া দাঁডাইয়াছে। তাঁহাদেব কার্য্য জগতের সকল স্থলেই পবিজ্ঞাত।

আমবা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, শ্রীভগবান, গীতায়

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুথানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥'

বাক্যে যখনই ধর্ম্মেব গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে, তখনই বিগ্রহ ধাবণ করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইবার প্রতিজ্ঞা কবিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—শ্রীবামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে ভগবানেব এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইযাছে।

আমরা বাঙ্গালোবে আপনাদের কার্য্যেব জন্য একটী আশ্রমবাটী আপনাদের হস্তে দিতে পাবিতেছি—ইহাতে আমরা পবম আনন্দিত।

জগদীশ্বর আপনাদিগকে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম বিতরণ করিবার শক্তি প্রদান করুন, তাঁহার কৃপায় এই বাঙ্গালোব কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকে শুভ ভাবসমূহ বিস্তীর্ণ হউক।"

তৎপরে আর কতকগুলি অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। তন্মধ্যে কে, পি, পুত্তসা চেট্টি পঠিত অভিনন্দন পত্রটীর বঙ্গানুবাদ দিলাম—

"পূজ্যপাদ স্বামীজি,

জগতের সমুদয়ই জোয়ার ভাঁটার ন্যায় চলিতেছে। সভ্যতার গতি সর্ব্বদা একভাবে নহে। মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও প্রয়োজনীয় ধন ধর্ম্মও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। সময়ে সময়ে মহাপুরুষগণ উঠিয়া উচ্চ ও পবিত্র আদর্শে জীবনযাপন করিয়া অপরকে সেই আদর্শে উন্নত হইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ ঈশা, ভগবান্ বুদ্ধ ও ভগবান্ মহম্মদ উঠিয়া তাঁহাদের পবিত্র প্রভাবে জগৎ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জীবনের উচ্চতম সমস্যাসমূহ আবার জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষসমূহের উপর একরূপ তীব্র আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, এখন ধর্ম্মের উপর সর্ব্বত্রই লোকের একটা অশ্রদ্ধার ভাব দাঁড়াইয়াছে। উল্কার ক্ষণিক আলোক প্রকাশ হইতে জীবনের যদি আর কিছু অধিক মূল্য থাকে, যদি জীবনটা কেবল ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য না হয়, তবে যে সকল সাক্ষে আমরা অন্যান্য বিষয় সত্য বলিয়া জানিয়া থাকি, ইহারও সেই সকল প্রমাণ আবশ্যক।

সেই প্রমাণ বাস্তবিকই আমরা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা আবার পূর্ণ হইয়াছে। কেবল ভগবানই বর্ত্তমান কঠিন সমস্যাস্থলে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। আপনারা গীতায় ভগবানের 'যদা যদা' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাবাক্য সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার নিজের অলৌকিক জীবন ও তিনি তাঁহার শিষ্যগণের ভিতর দিয়া সমগ্র জগতের চিন্তাস্রোতের উপর আজ যে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তাহার আলোচনা করিলে আমাদের কোন সন্দেহই নাই যে, শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপে দেহধারণ করিয়া পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত—অথবা জাপান হইতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিস পর্য্যন্ত —সমগ্র জগতে সনাতন ধর্ম্মের বিস্তারের জন্যই এবার তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব। নতুবা আজ সর্ব্বত্র সকলের যে সম্মিলনের প্রবল চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহার অর্থ কি? যুগাবতার শ্রীভগবান্ দ্বারা প্রাচীন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ এবার উদারতর-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রাচীনকালের সমুদয় চিন্তারাশি সত্যের মুচিতে ফেলিয়া সুন্দররূপে গলাইয়া তাহার মধ্যের সারটুকু মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। এবং পুনরুদ্ধৃত সত্যই তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক সমগ্র জগতের সমক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষায় অপূর্ব্বভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

স্বামীজি, আপনি জানেন, কেবল বইপড়া ও প্রচারই যথেষ্ট নহে। লোকের

মনে ধর্ম্ম ও দর্শনের যথার্থ ভাব প্রবেশ করাইতে হইলে জীবনও সেইরূপ উচ্চভাবে গঠন করা আবশ্যক। আপনার নেতৃত্বাধীনে যে সন্ন্যাসিদল আছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি, ভারত ও জাপানে সত্যধর্ম্ম বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পূজনীয় স্বামীজি, আপনার হস্তে যেরূপ গুরুতর ভার রহিয়াছে, তাহা অতি সাহসী ব্যক্তিকেও বিচলিত করিতে পারে। যদি আমরা ধর্ম্মোন্নতির গতি ঠিক বুঝিয়া থাকি, তবে দুই এক শতাব্দীর মধ্যে এমন ফল ফলিবে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের মহা মহা কীর্ত্তিও হীনপ্রভ হইয়া যাইবে। আমরা সেই মহাজ্যোতির প্রস্রবণ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অতি সমীপবর্ত্তী বলিয়া এখনও তাঁহার শক্তি ও প্রভাব সম্যক্ ধারণা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সভ্যতালোকের বিস্তার এবং ভগবৎ-প্রদত্ত উপদেশসমূহের শক্তি ও সত্যতা দেখিয়া ভবিষ্যতের কার্য্য যে কতদূর উদার ও গভীর হইবে, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই।

স্বামীজি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ যে কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, আপনার উপর এক্ষণে তাহার ভার পড়িয়াছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা আপনার সহকারী রহিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে তাঁহাদের ন্যায় আরও অনেক ধর্ম্মবীরসমূহ সৃষ্টি করিতে এবং সমগ্র জগতে মানবজাতির ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে ভারতীয় উচ্চতম তত্ত্বসমূহ অক্ষতভাবে বিতরণ করিতে সমর্থ করেন।

স্বামীজি, আমরা আপনাদের বাঙ্গালোরের কার্য্য বরাবরই অতি শ্রদ্ধার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। শ্রীভগবান্ যখন কলিকাতায় সশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যের কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, পুনরায় তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে—ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর যখনই তাঁহার শক্তির প্রথম প্রকাশ দেখা গেল, তখন হইতে শ্রীভগবানের ঐশ্বরিক বাণী দাক্ষিণাত্যবাসীর হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটাইয়া দিল। মহীশূর ও মান্দ্রাজবাসী একদল উৎসাহশীল যুবকই প্রথমে আবিষ্কার করিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি। তিনি যখন সামান্যভাবে ভ্রমণ করিতেছিলেন—তাঁহার আমেরিকা যাইবার এবং সুদূর পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে আধুনিক সভ্যতাসম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট দেশসমূহে তাঁহার গুরুর উপদেশ প্রচার করিবার অনেক পূর্ব্বে—স্বর্গীয় মহারাজ চামরাজেন্দ্র ভোদেয়ার বাহাদুর এবং

তাঁহার বিখ্যাত মন্ত্রী সার কে, শেষাদ্রি আয়ার মহাশয় স্বামীজির মহনীয় গুণাবলি ও লোকহিতৈষণার শক্তি বুঝিয়াছিলেন। উক্ত মহারাজা স্বামীজির গলার স্বর ফনোগ্রাফ যন্ত্রে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আমেরিকায় যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে যখন স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশকে মোহিত ও জয় করিলেন, তখন অন্যান্য যে সকল স্থান তাঁহার মহৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, বাঙ্গালোর তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

পরে আপনার সহকারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ বাঙ্গালোরে যে অমূল্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা এত সম্প্রতি হইয়াছে যে, উহা মনে আনিতে কাহারও অধিক স্মৃতিশক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে না। স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন সমগ্র ভারতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তিনিই বর্ত্তমান বাঙ্গালোর মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আজ বাঙ্গালোরবাসী সাধারণে আপনাদের কার্য্যের জন্য আপনাদিগকে এই বাটী—যাহার দ্বার উন্মোচন করিতে আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি—প্রদান করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে।

স্বামীজি, দাক্ষিণাত্য হইতেই বড় বড় আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়া এই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তভূমিতে আজ পর্য্যন্ত বৈদিক ভাবরাশি জীবন্তভাবে রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতচর্চ্চা এখনও ভারতীয় পাণ্ডিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আমরা সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা ও আশা করি, এই বর্ত্তমান পুনরভ্যুদয়ে মহীশূর আপনার স্নেহময় নেতৃত্বাধীনে ভবিষ্যতেও যেন বড় বড় মহাত্মা প্রসব করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বহন করিতে সমর্থ হয়।

স্বামীজি, আমরা সকলেই একবাক্যে আপনার সাদর অভ্যর্থনায় যোগদান করিতেছি।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইংরাজিতে অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

"দেওয়ান সাহেব, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

সনাতন কাল হইতেই ভারত ধর্ম্মভূমি। ভারতের সম্পত্তি ঈশ্বর। সেইজন্যই ভারতবাসী বলেন, 'হে প্রভো, তোমার পাদপদ্মই আমার অমূল্যধন!' যথার্থই ঐ ধনের মূল্য নাই! উহা হইতে আর কিছু কি শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে? কখনই নহে।

সেই প্রভুই সকল পদার্থে বিদ্যমান,—তিনি যেমন সত্য, আর কিছুই তেমন

নহে। কেবল তিনিই সৎ—আর সব মিথ্যা। মানুষ এই মহাসত্য ভুলিয়া যায়; তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিতে হয়, তাহারা আত্মাস্বরূপ—আত্মাই সব—জগৎ মিথ্যা।

মদীয় আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মহাকার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে সমগ্র জগৎ ঐ আধ্যাত্মিকতায় রঞ্জিত হইবে। উহা উচ্চতম সত্যসমূহের জন্য, জীবনসমস্যার সার সমাধানের জন্য পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া আছে। তিনি আবির্ভূত হইয়া সাধনাদ্বারা দেখিলেন, সকল ধর্ম্মই সত্য এবং সার্ব্বজনীন প্রেমের আদর্শে কিরূপে জীবন যাপন করা যায়, তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়া গেলেন। তাঁহার আবির্ভাবে জগতের বায়ু আবার বিশুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার কৃপায় সকল দেশই ধন্য হইবে।

তাঁহার মহদাবির্ভাবের কথা বুঝিয়া যে সকল দেশ তাঁহাকে অন্যান্য দেশের অপেক্ষা অগ্রে গ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালোর যে তাহাদের অন্যতম, ইহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরা তাঁহার আহ্বান বুঝিয়াছ—তোমরা বড়ই ভাগ্যবান্। তোমরা যে এইরূপে তাঁহাকে অগ্রে বুঝিবে ও সাদরে গ্রহণ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কারণ, তোমাদের দেশ অনেক মহান্ আচার্য্যের জন্মভূমি—তোমাদের দেশে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এখনও প্রাচীন কালের ন্যায় পবিত্র ও অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে—আজকালকার হিন্দুরাজগণের মধ্যে তোমাদের মহারাজা একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

আমি এই কেন্দ্র হইতে অনেক মহৎ কার্য্যের আশা করি। প্রার্থনা করি—জগতে যে মহা আধ্যাত্মিক বন্যা উঠিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে তোমরা তাহার সম্পূর্ণ ভাগী হও।

আমি এক্ষণে আমার প্রিয় ভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তোমাদিগকে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিতে আহ্বান করিতেছি।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের বক্তৃতান্তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও সিষ্টার দেবমাতার বক্তৃতা হইল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন,—

"ভারত চিরদিনই ধর্ম্মভূমি, আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জগতের উচ্চ আদর্শ-ভ্রষ্ট ধর্ম্মসমূহের পুনরুজ্জীবনের জন্যই আসিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজকাল ঈশ্বরকে লোকে আর জীবনের লক্ষ্যরূপে দেখেনা। কিন্তু সকল শাস্ত্রেই বলিয়াছেন,

ঈশ্বরই সকল আকর্ষণের মূল—তিনিই সকল সৌন্দর্য্যের আকর; অতএব মানুষ যে কখন ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিবে, তাহা হইতেই পারে না। জগতের সমুদয় ঐশ্বর্য্য, ধন, গৌরব সকলই নশ্বর। বেদে ঈশ্বরকে পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সকল জীবাত্মার পক্ষেই জ্ঞানের জন্য প্রবল পিপাসা আবশ্যক, ঈশ্বরকে কখন ভুলা উচিত নয়। তিনিই সকলের পিতা-স্বরূপ। তিনি প্রেমময় পিতা—তাই তিনি তাঁহার সন্তানগণের কল্যাণের জন্য বার বার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য আবার পূর্ণ হইয়াছে। রামকৃষ্ণের জীবনটাই অলৌকিক। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেই আমেরিকা ও জর্ম্মানিতে অনেকে ভগবানের অবতাররূপে গণ্য করিতেছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই এক লক্ষ্যস্থলে লইয়া যাইতেছে। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ এবং অন্যান্য সকল আচার্য্য ও সাধুগণ সেই উচ্চতম সত্যে উপনীত হইবার এক এক পথ প্রচার করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মই ঐ এক সনাতন সত্যের উপর স্থাপিত। সকলেই অনন্ত সুখ চায়—আর সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ ভাব। জ্যামিতিশাস্ত্রে বলে—দুইটী বস্তু যদি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত সমান হয়, তবে সেই দুইটী পরস্পর সমান। যখন সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য—নিত্যসুখ, তখন সকল ধর্ম্মই সমান।"

তৎপরে দেওয়ান সাহেব মঠের চাবি লইয়া মিষ্টবাক্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে মঠের দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি মঠদ্বার উন্মুক্ত করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তির আবরণ খুলিয়া দিলে হোম আরম্ভ হইল। পণ্ডিতগণ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আরতি ও প্রসাদ বিতরণ হইয়া মঠ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাধা হইল।

এই মঠের জমি প্রায় ৪০ বিঘা এবং মঠ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত নারায়ণ আয়াঙ্গার এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রী উপেন্দ্রনাথ মোদক, বি, এ।

গ্রীক্ দর্শন।

আইওনীয় দার্শনিকেরা খুব সাদাসিদে সরল লোক ছিলেন। জগৎটা মোটামুটী তাঁহাদের চক্ষে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই ভাবেই সেটাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার তত্ত্ব নিরূপণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টা বড় যুক্তিযুক্ত হয় নাই। যে রহস্যের মীমাংসায় তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার গভীরতার যথাসম্ভব পরিমাণ না করিয়া ঐ বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের উচিত হয় নাই। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের জটিলতার মাত্রা তাঁহাদের নিকট যে পরিমাণে সামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই পরিমাণে তাঁহাদের সিদ্ধান্তসকলও ভ্রমদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা কোন একটী ভৌতিক সত্তাবিশেষ কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা জগতের যত কিছু ভেদ, বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনের মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতে যে বহুধা বৈচিত্র্য, পরিণাম ও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল যে নিত্য আপাতঃপ্রতীত নহে, তাহা কে বলিল? যাহার মীমাংসায় তাঁহারা ব্যস্ত, তাহার অস্তিত্বই যে ঘোর সন্দেহের আস্পদ নহে, এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন? ভেদ ও পরিণাম ত সর্ব্ববাদীসম্মত স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ঘটনা নহে। অন্ততঃ ইলিয়্যাটিক্ (Eleatic) দার্শনিকগণ ভেদ ও পরিণাম অলীক আকাশকুসুম বলিয়া মনে করিতেন। আবার অপর দিকে ভেদ ও পার্থক্যের মধ্যে অভেদ ও ঐক্য যে আছে, পরিবর্ত্তনের অন্তরালে যে নিত্যতা বিরাজ করে দেখা যায়, তাহাও সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধ সত্য নহে। হের্যাক্লাইটাস্ (Heraclitus) শত আপত্তি লইয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এই সকল নিতান্ত সঙ্গত ও অনিবার্য্য প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে জগদুৎপত্তির রহস্য ভেদের চেষ্টা বৃথা। সেই জন্য ঐ দুই সম্যক্রূপে বিরোধী মত অবলম্বন করিয়া ইলিয়্যাটিকগণ ও হের্যাক্লাইটাস্ তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইলিয়্যাটিকগণ (The Eleatics)।

ইলিয়্যাটিকগণের মধ্যে তিন জন দার্শনিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ জেনোফ্যানিস্ * (Xenophanes) এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন,

* জএর উচ্চারণ কতকটা পূর্ব্ববঙ্গীয় ধরণের।

পারমেনাইডিস্ (Parmenides) ইহাকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন, এবং জেনো (Zeno) ভিন্নমতাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে ইহার রক্ষা ও পরিপুষ্টি সাধন করেন। জেনোফ্যানিস্ স্বতন্ত্রভাবে কোনও দার্শনিক মত প্রচার করেন নাই। হোমার প্রভৃতি কবিগণের সৃষ্টিবিবরণ ও দেবদেবীকাহিনী গ্রীক্‌জনসাধারণে নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিত এবং ঐ সকল দেবদেবীর পূজা ও তুষ্টিসাধন ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। দুই এক জন চিন্তাশীল লোক যুক্তি ও বিচার পূর্ব্বক যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা তাঁহার নিজের এবং অল্প জনকয়েক যাহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিত তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। ঐরূপ নবাবিষ্কৃত যুক্তিসহায় সত্যসকল দেশের প্রচলিত মত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা বর্জ্জিত হইয়া, সাধারণের অলক্ষ্যে না হউক অন্ততঃ অবহেলায়, নিজ সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিত। জনসাধারণের ধর্ম্মমত ঐ সকলের দ্বারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াই যাইত। জেনোফ্যানিসের নিকট পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণপ্রচারিত ধর্ম্ম নিতান্ত অবাস্তব ও কল্পনাপ্রচুর কবিকাহিনী বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি গ্রীকগণের ধর্ম্মসংস্কার-কার্য্যে আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইহাতেই ইলিয়াটিক দর্শনের সূচনা হয়।

জেনোফ্যানিস্ (Xenophanes)।

এসিয়া মাইনরস্থ গ্রীক্ উপনিবেশ আইওনিয়ার কলোফন্ (Colophon) নামক স্থানে জেনোফ্যানিস জন্মগ্রহণ করেন (৫৭০ খ্রীঃ পূঃ)। পরে যখন ৫৪৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঐ সকল গ্রীক উপনিবেশ পারস্যের অধিকারভুক্ত হয়, তখন তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি প্রথমে সিসিলি দ্বীপে (Sicily) গমন করেন এবং তৎপরে বহুবৎসর যাবৎ গ্রীসদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাঁহার দেশবাসীরা ইটালীর ইলিয়া (Elea) নামক স্থানে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করায়, সেই স্থানেই বাস করিতে থাকেন। ঐ স্থানের নাম অনুসারে তৎপ্রচারিত মতাবলম্বীগণকে ইলিয়াটিক বলা হয়। তিনি প্রায় শতবর্ষকাল জীবিত ছিলেন।

জেনোফ্যানিস্ নানা দুঃখকষ্টে সারাজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন এবং কোন দিন অর্থ উপার্জ্জনে মন দেন নাই। জন্মাবধি কবিতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার জন্মভূমি কলোফন্ নগর কবিদিগের উৎপত্তিক্ষেত্র বলিয়া খুব পুরাকাল হইতে খ্যাতিলাভ করে। কাজেই সে স্থানে তাঁহার কাব্যানুরাগ পরিপুষ্ট হইবার ও কাব্যরস উপভোগ করিবার যথেষ্ট সুবিধা হয়। দৈবের প্রতিকূলতায় তিনি যে জীবনব্যাপী দারিদ্র্য

ও বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কাব্যচর্চ্চাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লন। তিনি কপর্দ্দকশূন্য হইয়া অর্দ্ধেক জীবন গ্রীসদেশ পর্য্যটন করিয়া কাটান। ঐ সময়ে কখন স্বরচিত, কখন বা অপরের রচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া ও গান গাহিয়া তিনি জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। একজন ক্রীতদাস তাঁহার বীণা ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। আর তিনি হাটে বাজারে বা আমোদ প্রমোদের স্থানে সেই বীণা বাজাইয়া গান গাইয়া শ্রোতাগণকে আকৃষ্ট করিতেন। ক্রমে তিনি তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন এবং নানারূপ কথোপকথন ও গল্পের ছলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের নিকট ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিতেন ও হোমার প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম্মের উদ্দেশে তাঁহার ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতার দ্বারা শাণিত সমালোচনার তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতেন। তাহাতে ফল এই হইত যে, প্রচলিত ধর্ম্মের সুতীব্র প্রতিবাদ আমোদের সংমিশ্রণে জনসাধারণের নিকট তত কঠোর বলিয়া বোধ হইত না, বরঞ্চ তাহা আমোদপ্রদ বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহারা মনোযোগ দিয়া ঐ সকল কথা শুনিত এবং স্বধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া নির্যাতিত না হইয়া জেনোফ্যানিস্ এইরূপে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় করিতেও সমর্থ হইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রীকগণের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। সেজন্য জনসাধারণের মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, সে কৌশল যদিও তিনি জ্ঞাত ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে অল্পবিস্তর নির্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হঠাৎ তিনি স্বদেশের ভাব ও ধর্ম্মের প্রতি এরূপ বিদ্রোহাচরণ করিলেন কেন?

অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে যৌবনকালে তিনি দেশের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দেশবাসীরা এরূপ ভোগলিপ্সু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছিল যে, পারস্যাধিপতি দেশ আক্রমণ করিলে তাহারা, শত্রুকে বাধা দিবার উদ্যমমাত্রও না করিয়া, নির্ব্বিবাদে ও অকুণ্ঠিত হৃদয়ে বিদেশীর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল। এই সকল দুর্ঘটনা তাঁহার হৃদয়ের উপরে এক স্থায়ী ও দুরপনেয় বিষাদ-কালিমা বিস্তার করে। তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহার কয়েকজন তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা দেশবাসীর সহিত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং সেই সঙ্গে দেশীয় ভাব, নীতি ও ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয় হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইল। কারণ,

যখন তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগের অবনতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদের নৈতিক আদর্শ খর্ব্ব ও ধর্ম্ম কুসংস্কারপূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাই তিনি, স্বদেশহিতৈষণা-রূপ সুমহৎ ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, আপনার হৃদয়ের বদ্ধমূল দেশীয় ভাব ও সংস্কার উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সমগ্র গ্রীকজাতির নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন যে, হোমার মানুষের প্রতিকৃতিতে দেবতা গড়িয়াছেন। তাহা না হইলে তাঁহার লিখিত কাহিনীতে মানুষের চক্ষেও যাহা অতি নীচ ও ঘৃণিত, এমন বৃত্তিসকল দ্বারা দেবতাদিগের চরিত্র কলুষিত দেখিতে পাওয়া যায় কেন?* তিনি হোমারের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিতেন যে, গোমহিষ ও সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তুসকল যদি মূর্ত্তি গঠন করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আপনা-দিগের অপেক্ষা উচ্চ পর্য্যায়ের জীবের প্রতিকৃতির অনুকরণে দেবমূর্ত্তি না গড়িয়া গোমহিষাদির মত দেবতাই গড়িত। † তিনি আরও বলিতেন যে, কাফ্রীরা দেবতাকে কাল ও স্থূলোষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করে ও গ্রীকেরা দেবতাকে সুশ্রী ও সুগঠিত বলিয়া বর্ণনা করে—ফলে একই কথা, যে যার মনোমত দেবতা গঠন করে। অতএব ঐ দুই জাতির কেহই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ঐ বিষয়ে কোনও আপত্তি করিতে পারে না।

তাঁহার মতে মনুষ্য ও দেবতাদিগের উপর এক অসীম শক্তিশালী পরম ঈশ্বর আছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও জন্মরহিত। অ্যারিষ্টট্ল্ (Aristotle) পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মত সঙ্কলন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, গগনমণ্ডলের বিপুল শূন্যতার দিকে চাহিয়া জেনোফ্যানিসের হৃদয়ে ধারণা হইয়াছিল যে, ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি জন্মমরণরহিত, কারণ, জেনোফ্যানিস্ বলিতেন যে, ঈশ্বরকে জন্মরহিত না বলিয়া কেবলমাত্র অমর বলিয়া কল্পনা করিলে তাঁহার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করা হয়। যেহেতু যদি তিনি উৎপত্তিশীল হন, তাহা হইলে এমন কাল কল্পনা করিতে হয়, যে সময় তিনি বর্ত্তমান ছিলেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার অসদ্‌গুণ-বর্জ্জিত, নহিলে তিনি মানবের নৈতিক আদর্শের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না।

* "Hesiod and Homer have attached to the gods
All that which brings shame and censure to men,
Stealing, adultry, and mutual deceit"

† 'Did beasts and lions only have hands
Works of art thereby to bring forth, as do men,
They would, in creating devine forms, give to them
What in image and size belongs to themselves."

ঈশ্বর, আকৃতি বা প্রকৃতি কোনও বিষয়েই মানুষের তুল্য নহেন। জেনোফ্যানিস্ এই ভাব বারংবার নানাপ্রকারে গ্রীকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ঈশ্বর কোন এক স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি সর্ব্বগত, সনাতন; সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণ। তিনি "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" তিনি জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন এবং নিজে স্থির ও অচঞ্চল রহিয়া জাগতিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি কোনও বিচার করিয়া যান নাই তবে তিনি শিক্ষা দিতেন যে, সৎভাবে সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপন করিবার শক্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত, কোনও রূপ সাংসারিক সুবিধা, সচ্ছন্দতার জন্য নহে। মানুষ কখন ভগবানকে সমগ্রভাবে জানিতে পারে না। তবে তিনি দয়াপরবশ হইয়া মানুষের নিকট ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাহাতেই মানুষের দিব্য জ্ঞানলাভ হয়।

দিনের পর দিন দারিদ্র্যদুঃখ ও আপদবিপত্তির মধ্যে জেনোফ্যানিস্ গ্রীকদেশে ও পরে ইলিয়াতে এই সত্য অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়া যান। পিতাগোরাসের মত অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ হিসাবে তাহার শিক্ষার কোনও শ্রেণীবিভাগ ছিল না। যাহা তাঁহার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইত, তাহাই তিনি অকপটে ও অসঙ্কোচে সকলের নিকট সমানভাবে ব্যক্ত করিতেন ও তাহাদিগকে ঐ সত্য অবলম্বন করিতে আহ্বান করিতেন। সত্যপ্রচার বিষয়ে তিনি কপটতা বা আত্মগোপন করিতেন না। ইহাতে তাঁহাকে অনেক সময় নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই, কারণ, এখনকার মত তখনও দেশের শাসনপ্রণালী প্রাচীন প্রথানুবর্ত্তিতার সমর্থন করিত ও চিন্তা ও বাক্যদ্বারা প্রচলিত সংস্কার উচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনচিন্তা প্রচারের পক্ষপাতী ছিল না।

কিন্তু হোমার প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে জেনোফ্যানিসের আপত্তি সকল যতই যুক্তিপূর্ণ বোধ হউক না, তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তসকল অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সে কাজ পারমেনাইডিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিধাতা যেন জেনোফ্যানিসকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পাঠান নাই। তিনি যেন যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছিলেন, তাই দেখা যায়, তিনি প্রথম জীবনে প্রবল দেশশত্রু পারসীকদিগের সহিত এবং পরে প্রবলতর দেশশত্রু কুসংস্কারপূর্ণ তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্ম ও ভোগাসক্ত কাপুরুষ স্বদেশবাসীদিগের আচার বিচার ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

গয়াধামে শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

এ পর্য্যন্ত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের যতগুলি জীবনীপুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন পুস্তকেই তাঁহার গয়াধামে গমনবার্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য স্বামীকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থখানি শঙ্কর-সম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তাঁহাদের গ্রাহ্য এবং ইহাতে যাহা নাই, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ইহার কারণ, এ গ্রন্থখানি একখানি প্রাচীন শঙ্কর-জীবনীর সার সঙ্কলনমাত্র, তাহা মাধবাচার্য্য স্বয়ংই গ্রন্থারম্ভে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"প্রাচীন শঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্॥"

প্রাচীন শঙ্করবিজয় যে একখানি গ্রন্থ, বহু নহে, তাহা কিন্তু নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় না। শুনা যায়, আচার্য্যের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ, আচার্য্যের দৈনন্দিন ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন, চিদ্বিলাস যতি বিরচিত 'শঙ্কর বিজয় বিলাস' গ্রন্থই সর্ব্বাদিম, কাহারো মতে আচার্য্যশিষ্য আনন্দ গিরিকৃত 'শঙ্কর বিজয়' প্রথম গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত চিৎসুখ চার্য্য প্রণীত 'শঙ্কর বিজয়' নামক গ্রন্থ আছে। মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকাকার ধনপতি সুরী ক্রমে প্রাচীন পদবী লাভ করিতেছেন, ইনি উহার টীকায়, মধ্যে মধ্যে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ শ্লোকগুলি আচার্য্যের দিগ্বিজয় সংক্রান্ত, ইহাতে বাল্য জীবন বা জীবনের অন্য কোন কথাই বর্ণিত হয় নাই। এই শ্লোকগুলি কোন্ প্রাচীন শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থের, তাহারও ধনপতি সুরী কোনও ইঙ্গিত করেন নাই। অধিক কি, উক্ত উদ্ধৃত শ্লোক হইতে যে একাধিক প্রাচীন শঙ্কর বিজয়ের অস্তিত্ব ছিল, তাহাও নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। যাহা হউক, উক্ত মাধবীয় শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বা উক্ত প্রাচীন শঙ্কর বিজয়ে আচার্য্যের গয়াধামে আগমন কথা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গয়াধামে যাইলে অন্যপ্রকার চিন্তার উদয় হয় এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিলে গয়াধামে যে আচার্য্যের আগমন হইয়াছিল, তাহাই অনুমিত হয়।

বাদেন বিজিতা বুদ্ধগয়া শ্রীশঙ্করেণ তু।
বুদ্ধৈরাক্রম বাদন্ত ত্যক্ত্বা ক্বাপি পলায়িতঃ॥

এই শ্লোকটীর প্রাপ্তি একটু কৌতূহলকর। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহাশয় ৺কাশীধামে এক সময়ে আচার্য্য শঙ্করের কথা সম্বন্ধে একটী দণ্ডী সন্ন্যাসীর সহিত আলোচনা করিতেছিলেন এবং তদুপলক্ষে উক্ত দণ্ডী স্বামী কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং একটী পুঁটুলী হইতে কাগজপত্র বাহির করিয়া আরও কয়েকটী শ্লোক পাঠ করেন। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দণ্ডী স্বামী মহাশয় তাঁহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তবে শ্লোকগুলির মূলানুসন্ধান কথায় স্বামীজি এইমাত্র বলিলেন যে, উহা সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রবাদরূপে প্রচলিত আছে, এবং তিনি উহা একটী সন্ন্যাসীর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর পণ্ডিত মহাশয় ভগ্নমনোরথ হইয়া অন্যান্য কথায় প্রবৃত্ত হইলে স্বামী মহাশয়ের বহির্দ্দেশে গমন আবশ্যক হয় এবং নিজ পুস্তকাদির পুঁটুলিটী তথায় রাখিয়া যাইতে বাধ্য হন। পণ্ডিত মহাশয় এই সুযোগে উক্ত কতিপয় শ্লোক নকল করিয়া লন, এবং স্বামী মহাশয়ের পুস্তকাদি যথাস্থানে রাখিয়া দেন।

উপরি উক্ত শ্লোকের মর্ম্মগ্রহণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আচার্য্য শঙ্কর গয়াধামে আসিয়াছিলেন এবং তত্রস্থ বৌদ্ধগণের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে।

সকলেই বিদিত আছেন গয়াধামের কিয়দ্দূরে বোধগয়া অবস্থিত এবং এই স্থানে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া, ইহা বৌদ্ধগণের পরম পবিত্র স্থান। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর মহারাজ অশোক এই অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে একটী বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অমরদেবশর্ম্মা নামক কোন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে এই স্থানটী বৌদ্ধগণের একটী প্রধান তীর্থরূপে পরিণত হয় এবং বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ইহা একটী আবাসস্থান হইয়া পড়ে। এই মন্দিরের ইতিহাস অতি বিস্তীর্ণ, কেবল ঐ বিষয় অবলম্বন করিয়া কত বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর যে দিগ্-বিজয়কালে এস্থলে আসিবেন না, ইহা যেন এক প্রকার আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, প্রচলিত জীবনী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও এ সম্বন্ধে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত শ্লোকের যে অভাব নাই, তাহা উক্ত সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শ্লোক দেখিলেই বুঝা যায়। কে বলিতে পারে, ঐ শ্লোকটী প্রাচীন শঙ্করবিজয়ের শ্লোক নহে?

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, উক্ত শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য্যের

গয়ায় গমন সত্য বলা চলে কি না? একদিকে দেখা যায়, বোধগয়ার মোহান্তের নিকট এ কথা প্রবাদস্বরূপে বর্ত্তমান নাই বা এরূপ কোন প্রবাদ তাঁহারা অবগত নহেন। অপর দিকে দেখিতে পাই যে, এরূপ প্রবাদ না থাকা উক্ত শ্লোকোক্ত বিষয়ের বাধক হইতে পারে না। কারণ, বর্ত্তমান মোহান্ত তাঁহার ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ-গুরুর নাম করিতে পারেন ও তাঁহাদের বিষয় ভালরূপ জানেন, তৎপূর্ব্বের কথা তিনি জানেন না, অথচ তাঁহারই ভাণ্ডার হইতে সে দিন একটী প্রাচীন তাম্রপত্র পাওয়া গিয়াছে, যাহা ১১৩৯ সম্বতের এবং তখন যে মোহান্ত ছিলেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র গিরি। ইনি বস্তুতঃ উক্ত দ্বাদশ পুরুষের পূর্ব্বের লোক। কেবল ইহাই নহে—বর্ত্তমান মোহান্ত কৃষ্ণদয়াল গিরির গুরুভাই নবহরি গিরি একখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য বিষয় বর্ণনানন্তর পরিশেষে যে সন্ন্যাস-পদ্ধতি লিখিয়াছেন, তাহাতে গুরু-তালিকা দিয়াছেন—তাহাতে ২৭ জন মোহান্তের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত মোহান্তের পীঠারোহণ ও অবস্থিতিকাল নাই সত্য, কিন্তু ২৭ জনের সময় গড়ে হিসাব করিয়া একটী সময় ধরিলে, তাহা যে আচার্য্য শঙ্করের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই, অবশ্য গড়ের হিসাব যে ঠিক হইবে, এমন মনে করা চলে না। শৃঙ্গেরী মঠের যে গুরুতালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে আজ পর্য্যন্ত ৩৩টী গুরুর নাম পাওয়া যায় এবং এতন্মতে আচার্য্যের সময় ৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ও পূর্ব্বোক্ত তালিকার এক-জনের জীবনপরিমাণকালমধ্যে। আজ প্রায় ৪ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, বলিতে কি, তাহা শৃঙ্গেরী মঠের তালিকার বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, বোধগয়ায় বর্ত্তমান মোহান্তের নিকট আচার্য্যের গয়াগমনবার্ত্তা প্রবাদরূপে অজ্ঞাত হইলেও অন্যত্র প্রচলিত প্রবাদের মিথ্যাত্ব সাধক হইতে পারে না এবং সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত শ্লোকটীর মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে পারে না। কেবল ইহাই নহে—বর্ত্তমানকালে মোহান্ত নির্ব্বাচনের যে প্রথা বোধগয়ার মঠে প্রচলিত আছে, তাহাও পূর্ব্বপ্রবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়ক নহে। অন্যান্য মঠের মত এখানে বর্ত্তমান মোহান্ত শিষ্য নির্ব্বাচন করিতে বা পীঠ প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। মোহান্তের দেহান্তে মোহান্তের শিষ্যগণ সমবেত হইয়া আপনাদিগের যাহাকে উপযুক্ত-পাত্র বিবেচনা করেন, তিনিই আসন পাইয়া থাকেন; অপরে নহে। এই নিয়মটী প্রকৃতপক্ষে পীঠসংক্রান্ত প্রাচীন প্রবাদরক্ষার অনুকূল নহে। যিনি পীঠাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, তিনি শিষ্য হইলেও গুরুর নিকট হইতে পীঠসংক্রান্ত সমস্ত কথা

ও প্রবাদ শুনিবার সুযোগ না পাইয়া থাকিতে পারেন। কারণ, শিষ্য হইলেই যে ঐ মঠে গুরুসন্নিধানে থাকিতেই হইবে, তাহারও নিয়ম নাই। যাউক, এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান মোহান্ত, শঙ্করাচার্য্যের গয়াগমনবার্ত্তা না জানিলেও তাঁহার গয়াগমন সম্ভব হইতে পারে। এক্ষণে গয়াধামের অন্য বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, প্রস্তাবিত বিষয়ের স্বপক্ষেই প্রমাণাধিক্য ঘটে কি না?

গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম যেখানে অবস্থিত, তাহার পার্শ্বেই গদাধরের মন্দির। এই মন্দিরটীও প্রাচীন। ইহার উত্তর দিকে এখনও যাহা অবস্থিত, তাহাতেও আচার্য্যের গয়াগমনবার্ত্তা অনুমিত হয়। গদাধরের মন্দিরের উত্তরে প্রাচীর-বেষ্টিত একটী প্রাঙ্গণ এখনও বর্ত্তমান, এখনও এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই বামদিকে আচার্য্যের চরণ-চিহ্ন পূজিত হইয়া থাকে। মহামুনি দত্তাত্রেয়েরও পাদপদ্ম এখানে বর্ত্তমান। উভয়ের চরণচিহ্ন, চারিটী ৬ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসের শ্বেতপ্রস্তরের পদ্মের মধ্যে বিরাজমান। চরণচিহ্নগুলি প্রায় ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ এবং প্রাঙ্গণমধ্য হইতে সমুত্থিত কয়েকটী স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত ছাদের নিম্নে অবস্থিত। ইহার উত্তরে একটী নাটমন্দির বর্ত্তমান। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রায় ২৫।৩০টী স্তম্ভের উপরে নির্ম্মিত, ছাদমাত্রের দ্বারা আবৃত— একটী সভাস্থল বলিলেও চলে। তাহার উত্তরে বাসোপযোগী কয়েকটী ভগ্ন গৃহ বর্ত্তমান। নাটমন্দিরের এক প্রান্তে একটী ছিন্ন তাকিয়া ও পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়াছিলাম। ইহাতে বোধ হয়, এখনও পর্য্যন্ত এই স্থানটী মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহা শঙ্কর স্বামীর মঠ ছিল। মঠটী ফল্গুনদীর ঠিক উপরে বলিলেই হয় এখনও পর্য্যন্ত ইহার ভগ্নদশা দেখিয়া, ইহার পূর্ব্বশোভা অনুমান করিতে পারা যায়। বহুদিন যাবৎ শঙ্করসম্প্রদায়ের মোহান্তগণ এই মঠে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন অবশেষে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবে ইহার প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং এক্ষণে ইহা পরিত্যক্ত গৃহে পরিণত হইয়া কালের প্রভাবের কথা দর্শকের চিত্তে উদয় করিয়া দিতেছে। শুনা যায়, দ্বৈতমত-প্রচারক মধ্বাচার্য্য, ১০৩৪ শকাব্দে আবির্ভূত হইয়া, এই স্থানে আগমন করেন এবং বিচারে শঙ্করমঠের অধিপতিকে পরাস্ত করেন এবং ক্রমে গয়ালিগণকে নিজমতে দীক্ষিত করেন। শঙ্করমতের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ মধ্বাচার্য্যের মঠও গদাধরের মন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং মঠ প্রাঙ্গণে মধ্বাচার্য্যের চরণচিহ্নও স্থাপিত রহিয়াছে। বোধগয়ার বর্ত্তমান মোহান্তের দ্বাদশ পুরুষ পূর্ব্বের মোহান্তগণসংক্রান্ত যে প্রবাদাদি বর্ত্তমান মোহান্ত অবগত নহেন, ইহার কারণ বোধ হয়, মধ্বাচার্য্যের প্রভাব বিস্তার। যাহা হউক, ইহা এক্ষণে অনুসন্ধানের বিষয়মধ্যে গণ্য করা অসঙ্গত নহে।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে গয়াধামে শঙ্করাগমন সম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা যে অবিসম্বাদিত সত্য, তাহা বলিবার অধিকার হয় না—কারণ ওরূপ বিক্ষিপ্ত শ্লোক যে কেহ কল্পনাবশে রচনা করে নাই, তাহার প্রমাণ কি? গয়ার শঙ্করপাদপদ্ম যে তাঁহার তথায় গমনোপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত, তাহারইবা প্রমাণ কই? তথাপি উভয়দিক আলোচনা করিলে বোধ হয়, খুব সম্ভব গয়ায় আচার্য্যের আগমন হইয়াছিল।

শঙ্করাবির্ভাব কাল হইতে বোধগয়ার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আংশিক একটা ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যায়। কারণ, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের যতগুলি প্রধান প্রধান মঠ আছে, তন্মধ্যে এই বোধগয়ার মঠ, কি প্রতিষ্ঠা, কি ঐশ্বর্য্যে, কোন অংশে বড় কম নহে। এজন্য বর্ত্তমান মোহান্তজী এবং তাঁহার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের নিকট যাহা অবগত হইলাম, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই পণ্ডিত মহাশয় বস্তুতঃই পরিচয়যোগ্য একজন উচ্চ-শ্রেণীর পণ্ডিত ও ভারতীয় সর্ব্ববিধ দর্শনমতে ইঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা আছে। বেদান্তদর্শনের সকল মতের সমালোচনা ইহার নিকট যেমন শুনিলাম, এমন কাশীতেও কম শুনিয়াছি এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখ্যাতির বিষয়, ইঁহার দর্শন-শাস্ত্রে উৎকট অনুরাগ ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত সদাচার। গয়া ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ইঁহার সমকক্ষ কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ইঁহার নবম পুরুষ ধরণীধর ভট্ট, ভাগবতাদি গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামীর ছাত্র ছিলেন এবং ১২৫৭ বিক্রমাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পণ্ডিতজি বলেন, শ্রীধরস্বামী শঙ্কর সম্প্রদায়ান্তর্গত পুরি নামধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন না।

পূর্ব্বোক্ত নরহরিগিরিবিরচিত গোধর্ম্মাদিসমুচ্চয় গ্রন্থ তাঁহার নিকট দেখিলাম। উহাতে বোধগয়া মঠের যে গুরুপরম্পরার তালিকা আছে, তাহা এই :—

শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্য যতের্ব্বভূব নারায়ণানন্দগিরির্যতীশঃ।
অদ্বৈত শাস্ত্রস্য শ্রমপূর্ণ কামাঃ রতস্তলোকঃ যদভেদাভিজ্ঞঃ॥
শিষ্যো হরিহরানন্দগিরিস্তস্য মহানভূৎ।
দেবানন্দ গিরিশ্চৈব তৎ শিষ্যো২পি বভূব হ॥
তৎশিষ্যোপি মহাপ্রাজ্ঞঃ জ্ঞান নন্দ গিরিস্মৃতঃ।
তস্যাপি বিমলানন্দ গিরির্নাম্না চ সংশ্রুতঃ॥
আত্মানন্দ গিরিস্তস্য শিষ্যশ্চৈব সুসাধকঃ।
তস্যাপি সচ্চিদানন্দ গিরিঃ শিষ্যো মহানভূৎ॥

তচ্ছিষ্যো জগদানন্দ গিরিশ্চৈব স জায়ত।
তচ্ছিষ্যোঽপি অচ্যুতানন্দগিরির্জাতো মহাসুধীঃ॥
সদানন্দ গিরিশ্চৈব তচ্ছিষ্যোঽপি মহানভূৎ।
ব্রহ্মনাথ গিরিস্তস্য তচ্ছিষ্যশ্চাভূন্মহাপ্রভুঃ॥
গৌতম নাথ গির্য্যাখ্য তচ্ছিষ্যোঽপিমহানভূৎ।
ভুবনেশ্বর নাথেতি চাদাবন্তে গিরিস্মৃতঃ॥
তচ্ছিষ্যোঽপি মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।
আদৌ লক্ষণ নাথেতি চান্তে গিরি সুসংস্মৃতঃ॥
বভূব স মহাযোগী তচ্ছিষ্যো বহু শিষ্যকঃ।
অদ্বৈত প্রবরোঽভিজ্ঞো গৌরীনাথ গিরিঃ স্মৃতঃ॥
গৌরীনাথ গিরেশ্চাপি নাম্নো ধবনাথ গিরিঃ স্মৃতঃ।
বিখ্যাতশ্চ গয়াক্ষেত্রে ঘমণ্ডীনাথ ইত্যপি॥
বাটীকাদ্যাপি তন্নাম্না ফল্গু নদ্যাস্তু পশ্চিমে।
নানা বৃক্ষ সমাযুক্তা নানা পক্ষী সুসেবিতা॥
তস্য সিদ্ধি মতঃ শিষ্যো জাতঃ পরম বুদ্ধিমান্।
যং চৈতন্য গিরিঃ নাম্না প্রবদন্তি জনা ভুবি॥
বহবস্তস্য শিষ্যাস্তু যোগশাস্ত্র বিশারদাঃ।
ত্যাসিনোঽপরে জাতাঃ কেপি স্থানং সমাশ্রিতাঃ॥
তেষাং মধ্যে মহাজ্ঞানী মহ দেব গিরিঃ স্মৃতঃ।
সিদ্ধানামগ্রণী সোভূৎ মৃতান্ যো জীবয়েৎ ক্ষণাৎ॥
যেন বুদ্ধালয়স্যৈব সমীপে বরদায়িনীং।
সামারাধাততা দেবাং বরং লব্ধ্বা যথেপ্সিতম্॥
দৈবসিদ্ধিমিমাং প্রাপ্য প্রখ্যাতঃ স্বেন তেজসা।
তেন কৃতমিদং স্থানং যত্র জীবন্তি জন্তবঃ॥
গয়ায়া দক্ষিণে ভাগে ফল্গু নদ্যাঃ সমীপগে।
পঞ্চক্রোশে গয়াক্ষেত্রে যত্র বোধিতরুঃ স্মৃতঃ॥
অন্নপূর্ণা সদা তুষ্টা ভিক্ষুণাং অপবর্গদা।
অদ্যাপি তিষ্ঠতি চাত্র তস্য যোগপ্রভাবতঃ॥
তস্য শিষ্যস্তু মেধাবী জাতো লালগিরির্মহান্।
সোঽপি সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্য স্বন্নদানাস্যকারয়ৎ॥

ঝঙ্গাখ্যাদি মঠাদিংশ্চ কৃতবান্ সহসাধকৈঃ।
তীর্থাদিম্বটনে নৈব যোগবিদ্যান্ প্রকাশয়ন্॥
তস্যাপি বহবঃ শিষ্যাঃ গুরোরাজ্ঞাপরায়ণাঃ।
যত্র কুত্রাপি চ তে সর্ব্বে নির্ম্মমিরে মঠাদিকান্॥
সমাধিলীনে তস্মিংস্তু কেশবাখ্য গিরির্মহান্।
দর্শনীয়তমো লোকেঽত্রাবির্ভূতো মহানসৌ॥
সোঽপীশ্বর বশন্নীতা সমাধিস্থো ভবন্মুনিঃ।
রাঘবাখ্য গিরিস্তত্র তস্য শিষ্যো মহানভূৎ॥
সোঽপি সিদ্ধিং সুসংপ্রাপ্য স্থানবৃদ্ধিমচীকরোৎ।
তস্মাদনন্তরো জাতো রামহিত গিরির্ম্মহান্॥
তিরোজাতে পরিব্রাজি চাবির্ভূতো মহানসৌ।
যো বালক গিরির্নাম্না প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধ সম্মতঃ॥
তস্য যোগগতস্যাথ শিষ্যঃ পরমবুদ্ধিমান্।
শিব গিরিশ্চ বিখ্যাতঃ সাক্ষাৎ শিব ইবাপরঃ॥
তস্মিন্নুপরতে যোগাদাবির্ভূতো মহানসৌ।
ব্রহ্মজ্ঞাননিধিঃ সাক্ষাৎ অভয় পদ গিরির্ম্মহান্॥
বৈকুণ্ঠন্তু গতে তস্মিন্ আবির্ভাবে হভবৎ প্রভুঃ।
হেমনারায়ণাখ্যাহসৌ গিরি বস্তে সুসংস্কৃতঃ॥
শ্রীমদ্ভাদা পদক গয়াক্ষেত্র পালস্য তস্য।
বারাণস্যাং প্রভব বিদুষো যোগনিষ্ঠস্য কারঃ॥
পৌষে কৃষ্ণে বসুযুগ নিবীন্দ্রদী সম্বৎসরেবৈ।
শ্রীদ্বাদশ্যাং রবিদিবসর্কে প্রাপ্তগঙ্গোবভূব॥
ততস্তবৈ দয়াধীশ বেদান্তার্থেষু নৈপুনঃ।
কৃষ্ণদয়ালু গিরির্নাম্না সিংহাসনে স্থিতোঽভবৎ॥

এতদ্বারা জানা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য হইতে এ মঠে ২৭ জন গুরু হইয়াছেন। যথা—

১। নারায়ণানন্দ গিরি।	৫। বিমলানন্দ গিরি।	৯। অচ্যুতানন্দ গিরি।
২। হরিহরানন্দ গিরি।	৬। আত্মানন্দ গিরি।	১০। সদানন্দ গিরি।
৩। দেবানন্দ গিরি।	৭। সচ্চিদানন্দ গিরি।	১১। ব্রহ্মনাথ গিরি।
৪। জ্ঞানানন্দ গিরি।	৮। জগদানন্দ গিরি।	১২। গৌতমনাথ গিরি।

১৩। ভুবনেশ্বর গিরি।	১৮। মহাদেব গিরি।	২৪। শিব গিরি।
১৪। লক্ষ্মণনাথ গিরি।	১৯। লালগিরি।	২৫। অভয়পদ গিরি।
১৫। গৌরীনাথ গিরি।	২০। কেশবগিরি।	২৬। হেমনারায়ণ গিরি।
১৬। উদ্ধবনাথ বা উধোনাথগিরি।	২১। রাঘবগিরি।	২৭। কৃষ্ণদয়াল গিরি।
১৭। চৈতন্ত গিরি।	২২। রামহিতগিরি।	
	২৩। বালক গিরি।	

মোহান্তজী উক্ত ২৭ জন গুরুর নাম আমার নিকট যে করেন নাই, ইহার কারণ যাহা বুঝিলাম, বোধ হয় তাদৃশ বলবৎ প্রমাণাভাব বশতঃ উহাতে তিনি সম্যক্ আস্থা স্থাপন করেন না।

উধোনাথের পূর্ব্বে এ মঠের কি অবস্থা ছিল তাহা তাঁহার সতীর্থ উক্ত গোধর্ম্মসমুচ্চয় গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর এখন জানিবার উপায় নাই এবং উহাও কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, উধোনাথ হইতে এ মঠের বৃত্তান্ত এইরূপ—

শুনা যায়, উধোনাথের সময় এ মঠের আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ ছিল; মঠ সম্পত্তির উপর ইহার আধিপত্য অক্ষুন্ন ছিল না, পাঁচজনে লুটিয়া খাইত। তিনি মঠের উন্নতির জন্য তপস্যা করিতে থাকেন। আসুরিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের বুদ্ধিবলের মাত্র শরণ গ্রহণ না করিয়া, বৈদিক ধর্ম্মানুসেবীর আচার অনুসারে তিনি তাঁহার ঐহিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু মাতা প্রসন্না হইলেন না—উধোনাথ তপস্যায় দেহপাত করিলেন। উধোনাথের শিষ্য—চৈতন্তনাথ। তিনি উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, তিনি গুরুর আসন পাইয়া গুরুর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আজীবন তপস্যাই করিলেন, কিন্তু মাতা প্রসন্না হইলেন না। চৈতন্তনাথের শিষ্য মহাদেবনাথ পূর্ব্বগুরুগণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইনি এইবার আরও দৃঢ়তা সহকারে তপস্যায় রত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর একাসনে তপস্যার পর একদিন মনোরথ সিদ্ধ হইল। মাতা অন্নপূর্ণা বর দিবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহাদেবনাথ মঠের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করিলেন, এবং অভ্যাগতকে এক মুষ্টি খাইতে দিবার সামর্থ্য ভিক্ষা করিলেন। মাতা তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে একটী তাম্র-নির্ম্মিত শরাব বা কটোরা দিলেন, এবং বলিলেন, তামার এই কটোরা দ্বারা যতই কেন দাও না, তোমার ভাণ্ডার শূন্য হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, অদ্যাবধি এই কটোরা করিয়াই অভ্যাগত ও অতিথিগণকে খাদ্য সামগ্রী বাটিয়া দেওয়া

হয়। এখানে কেহ কখন প্রত্যাখ্যাত হয় না। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্র পর্য্যন্ত সদাব্রত খুলিয়া রাখা হয়। এই মহাদেবনাথ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাতার কৃপায় ইঁহাদের যখন চাউল ডাইল প্রচুর হইয়া উঠিল, তখন অর্থের অভাবে ইঁহাদের লবণের অভাব বিশেষ উপলব্ধি হইতে লাগিল। মহাদেবনাথ তখন আবার মাতার শরণাপন্ন হইলেন, মাতাও ইহাদিগকে জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ ঘটিত দুরারোগ্য রোগের একটা ঔষধ বলিয়া দিলেন এবং তদুপলক্ষে প্রতি রোগীর নিকট একটী করিয়া টাকা লইতে আদেশ করেন। অদ্যাবধি ইঁহারা সেই ঔষধ তৈয়ারী করিয়া সকলকে দিয়া থাকেন; শুনিয়াছি, ইহাতে কোন রোগী এ পর্য্যন্ত হতাশ হয় নাই। এই ঔষধের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা মোহান্তজীর আদেশমত না লইলে ইহাতে ফল হয় না। এক সময়ে কোন একটী ভৃত্য অপহরণ করিয়া এক ব্যক্তিকে উক্ত ঔষধ বিক্রয় করিয়াছিল, সে ব্যক্তি তাহাতে রোগমুক্ত হয় নাই, পরে মোহান্তজীর নিকট হইতে আবার ঔষধ লইয়া আরোগ্যলাভ করে। মহাদেবনাথের সাধনাস্থল এখনও বোধি মন্দিরের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে গোলাকার একটী স্তম্ভরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা মাতা এখনও পর্য্যন্ত বিরাজমানা রহিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিটী কিন্তু একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি।

মহাদেবনাথের পর হইতে দুই পুরুষ পর্য্যন্ত এই মঠের নানারূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল। নানা দেশে নানা শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি যে সমস্ত শাখা মঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের তালিকা এই :—

১। মান্দ্রাজে তাঞ্জোর জেলায় নাবী মঠ। ইহা মহাদেবনাথের শিষ্য লালগিরিস্থাপিত,—ইহার আয় ৫০।৬০ হাজার টাকা।

২। পঞ্জাবে মঘিয়ানা জিলায় ঝঙ্গ মঠ, ইহাও লালগিরিস্থাপিত,—আয় ১২৫০০০ টাকা।

৩। রাজপুতানায় বিকানীরে আলোকসাগর কূপের ধারে একটী মঠ লালগিরিস্থাপিত। আয় অজ্ঞাত।

৪। জয়পুরে গল্‌তা নামক স্থানে লালমঠ। লালগিরিস্থাপিত।

৫। চাম্পারণ জেলায় লোহিয়ার মঠ। ইহা উধোনাথের ভাই ভকুনাথকর্ত্তৃক স্থাপিত। আয় ২৪০০০ হাজার টাকা।

৬। আরে রাজমঠ উহার তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থাপয়িতা অজ্ঞাত।

৭। বসোতা মঠ দ্বারভাঙ্গাতে অবস্থিত। ইহা রামহিতনাথের চেলা সুন্দরগিরিস্থাপিত।

৮। আমেদাবাদ জেলায় ভীমনাথ জালিয়া মঠ। প্রতিষ্ঠাতা অজ্ঞাত। ইহার আয় ৬০০০০ টাকা।

৯। কো'ল ছাপবা মঠ। আরা হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে। ১২০০০ আয়।

১০। লক্ষ্ণৌতে কালী মঠ।

১১। বায় বেবেলীতে দলমৌ মঠ। এই উভয় মঠের আয় ৪৫০০ টাকা।

১২। বীরভূম জেলায় লবপুর গ্রামে ফুল্লরা দেবী মঠ।

১৩। জ্বালামুখী মঠ। ইহা সর্ব্বগিরি কৃত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

১৪। পঞ্জাবে কাঙ্গরা উপত্যকায় বুড়া কেদার মঠ। আয় ৫০০০।

১৫। হুঁসিয়ারপুর ও জলন্ধরের মধ্যে একটী মঠ। নাম বিস্মৃত।

১৬। গোয়ালিয়রের পশ্চিমে একটী মঠ। নাম বিস্মৃত।

১৭। জয়পরের পূর্ব্বে একটী মঠ।

১৮। হায়দ্রাবাদ জেলায় আলোনা মঠ। ইহা লালগিরিবিস্থাপিত।

উক্ত ১৮টী মঠ ব্যতীত কত যে মঠ বিলুপ্ত ও ভগ্ন দশায় পতিত, তাহা মোহান্ত সব অবগত নহেন, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা এখনও তাঁহার স্মরণপথে জাগরূক রহিয়াছে

মঠের ভগ্নাবশেষ।	
১। স্বরস্বতী মঠ, ১ ক্রোশ বোধগয়া হইতে।	২। পাঁড বিঘা বোধগয়ার ১ ক্রোশ পশ্চিম।
২। বকরোর, বোধগয়ার পরপারে।	৩। নন্দয়া " " "
৩। লেবুরা—পরমপুর, বোধগয়ার ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে।	৪। গোবরিয়া, " " ৮ ক্রোশ দক্ষিণ।
৪। রাজাবিঘা, বোধগয়ার ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে।	৫। পরসাওয়া " ১॥০ ক্রোশ পশ্চিম।
৫। মাদার, বোধগয়ার ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অগ্নিকোণে।	৬। ইলারা তুলারা " ১ " "
৬। শিবরাজপুর, বোধগয়ার ১ ক্রোশ দক্ষিণে।	৭। পরহান্তা " ১॥ "
৭। কটোরেয়া, ঐর ১ ক্রোশ নৈঋতে।	৮। বুাঘোপুর " ৬ পূর্ব্ব।
লুপ্ত—গয়া জিলা।	৯। সকল বিঘা " ৫ ক্রোশ পশ্চিম।
১। মস্তত্তর, বোধগয়ার ১ক্রোশ পশ্চিম।	১০। গুরুয়া " ৭ " "
	১১। ধনাতন্দা " ১ " বায়ু।
	১২। খিরিসওয়া " ১॥ " উত্তর।

১৩। গোমতীবাগ, বোধগয়ার ১ ক্রোশ দক্ষিণ।
১৪। জয়নগর " ৩ "
১৫। রামধন বিঘা " "
১৬। স্বরূপ বিঘা " "
১৭। মরিচ বিঘা " ৩ "
১৮। রামপুর " ৩৷৹ "
১৯। হরদাসপুর " ৫ "
২০। বুলাড়া " ৫ "
২১। বিরানক " ৫ "
২২। গোপাল কেড়া " ৬ "
২৩। লালপুর " ৬ "
২৪। জয়গীর " ৮ "
২৫। শিবরাজপুর " ১ " বায়ু
২৬। নব রমের " ৮ " দক্ষিণ।

হাজারিবাগ।

১। সারপুর ভদুয়া (হাজারিবাগের পশ্চিম ৩৩ ক্রোশ)
২। বাঁকা "
৩। আমিন " সন্নিহিত।
৪। টেটবিঘা " "

দন্তার পরগণা—

১। গোঁসাই ডি
২। ভেগো
৩। কদামি
৪। বলগড়া
৫। বসবিয়া তবি
৬। কটাইয়া
৭। পাচ মহলা

পরগণ কেইডি—

১। বেলিয়া বাঁধ
২। কাঁধা চটি
৩। পাণ্ডা খা
৪। জগপুর

পরগণা চয়—

১। বলগড়া
২। ভগবান পুর
৩। নর চর
৪। সিংচবিঘা

পরগণা র সাত—

১। নথুয়া মারণ
২। পত্তি রামা
৩। মাধাপুর

পাটনা জিলায়—

১। মালপুরা } পাটনার ভিতর
২। গৌহাট } মহল্লা বিশেষ।
৩। সিমরা, দানাপুরের দক্ষিণ।

বোধগয়া মঠের শিষ্যগণ নানা দেশে যাইয়া যে সকল মঠ স্থাপন করেন, সেই গুলিকেই উহার শাখা মঠ বলিয়া আমরা অভিহিত করিলাম। শুনিলাম, সিন্ধু দেশে ১৫০টী ঐরূপ মঠ আছে, কিন্তু ঐ সকলের নাম, স্বামীজি বলিতে পারিলেন না।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা দেখিলাম, শব্দ, বাক্, বেদ ও ব্রহ্ম—ইহারা সমানার্থক, পরস্পর পরস্পরের পর্য্যায়মাত্র এবং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণ 'বেদ' বুঝাইতে 'বাক্ ও শব্দ' এতৎ পদদ্বয়ের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব বেদের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, শব্দের স্বরূপ অবশ্য বিজ্ঞেয়।

আবার শব্দ কোন্ পদার্থ? এ বিষয়ে শাস্ত্রকার কি বলিয়াছেন অনুসন্ধান করিতে যাইয়া জানিলাম, তাঁহারা বলেন—অনাদিনিধন শব্দই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই সমগ্র জগৎ শব্দেরই বিবিধ পরিণাম। অতএব দেখা গেল—অনন্তভাববিকারসমন্বিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শব্দাত্মকত্ব বা বাঙ্ময়ত্ব হেতু, শব্দের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে আমাদিগকে বিশ্বসংসারের জন্মস্থিতিভঙ্গের বিবরণ জানিতে হইবে। কারণ জন্মাদিষড়্বিধ ভাববিকার লইয়াই সর্ব্ববস্তুর জীবন বা ইতিহাস গঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করা, আর ইহার জন্মাদিষড়্বিধ ভাববিকার যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা,—একই কথা। অতএব বেদ কিং-স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই জানিতে হইবে, কি ভাবে বিশ্বের জন্ম, অস্তিত্ব, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ সংসাধিত হইয়া থাকে। জন্মাদি ছয় ভাববিকার, আবার পরস্পর কারণকার্য্যভাবে সম্বদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইহারা দেশকাল কৃত পৌর্ব্বাপর্য্য ভাবব্যঞ্জক। এইরূপে ভাববিকার ছয়টিই কার্য্যকারণভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ থাকিলেও, প্রস্তাবিত বিষয়টি সুখবোধ করিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে মোটামুটি জন্ম, স্থিতি ও লয় বা ভঙ্গ এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি। "জন্মাদ্যস্যযতঃ"—বেদান্ত-দর্শনের এই সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় ভগবান্ শঙ্কর একথা বেশ বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। অতএব বিশ্বের ইতিহাস বলিলে আমাদিগকে যথাক্রমে বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ইতিহাসই বুঝিতে হইবে। কিন্তু একজনে ত আর বিশ্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমাজে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। শব্দের স্বরূপ জানিতে হইলে অগ্রে ঐ মতসমূহের যথাসম্ভব সংক্ষেপে

আলোচনা অত্যাবশ্যক। বিশ্বের জন্মাদি সম্বন্ধে বিবিধ বাদের সুবিস্তৃত আলোচনা করিলে প্রবন্ধটি অযথা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া, আমরা কেবলমাত্র প্রধান প্রধান মতবাদগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

প্রথমে পাশ্চাত্য মতবাদগুলি আলোচিত হউক। বিশ্বকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পাশ্চাত্য সুধীগণ বিবিধ মতের অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রিবিধ বাদই প্রধান। এই তিনটিই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। পণ্ডিত Huxley বলিয়াছেন—"So far as I know, there are only three views—three hypotheses, which have ever been entertained or which can well be entertained respecting the past history of nature."—Theory of Evolution, p. 4.—অর্থাৎ আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে মনে হয়, বিশ্বের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে ত্রিবিধ বাদই জনসমাজে এ পর্য্যন্ত আদৃত হইয়াছে বা হইতে পারে। চিন্তাশীল হার্ব্বার্টও (Hurbart Spencer) বলিয়াছেন—"Respecting the origin of the universe, three verbally intelligible suppositions may be made"—অর্থাৎ বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে বোধগম্য ভাষায় ত্রিবিধ মতের অবতারণা করা যাইতে পারে। আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কিন্তু জানিতে পারিয়াছি যে, পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষিত সমাজে ঐ বিষয়ক চতুর্ব্বিধ প্রধান মত প্রচলিত আছে, যথা—(১) সৃষ্টিবাদ, (২) নির্নিমিত্তবাদ, (৩) স্বতঃসৃষ্টিবাদ ও (৪) ক্রমবিকাশবাদ।

১। সৃষ্টিবাদ বা The Theory of Creation

বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে সৃষ্টিবাদ বিবৃত আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ঐ মতের অসারতা নিঃশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ মহামতি Gladstone, বিজ্ঞানসাহায্যে বাইবেলোক্ত সৃষ্টিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর Huxley নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। বিশ্বের অতীত কাহিনী বাইবেলে যে যথাযথ লিপিবদ্ধ হয় নাই, Huxley তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সৃষ্টিবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, চিন্তাশীল Spencer এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন—বুঝিলাম কোন বহিঃশক্তি বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বল দেখি,

তোমার তথোক্ত ঈশ্বর কোন্ উপাদানে জগৎ সৃষ্টি করিলেন ? সৃষ্ট বস্তুকে সৃষ্টির পূর্ব্বে অত্যন্ত অসৎ বলিয়া স্বীকার করিলে, বলিতে পার কি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবে ? সদসতের যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ তুমি কোন্ উপায়ে স্থাপন করিবে ? আর এক কথা, তোমার বাহ্যকারণের অস্তিত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? কোথা হইতে তোমার এই তথাকথিত ঈশ্বর বা বাহ্যকারণ আসিল ?

বাইবেল উপদিষ্ট সৃষ্টিবাদ ক্রমশই বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শালী প্রভৃতি বলিয়াছেন—ঈশ্বরেচ্ছাই যে জগতের কেবলমাত্র কারণ নহে, সৃষ্টিবাদিগণ একথা ক্রমশঃ বুঝিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত আরও বিবিধ কারণ সংযোগে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, একথা তাঁহারা এখন অনেকে মানিতেছেন। এজন্য ক্রমবিকাশবাদিগণের সহিত নবীন সৃষ্টিবাদিগণের মিলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। নির্নিমিত্তবাদ বা The Theory of Self-existence.

বিশ্বসংসার যদি কোনও বাহ্য কারণ বা জগৎরূপ কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্-গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর হইতে সমুৎপন্ন না হইল, তবে কি ইহা স্বতঃবিদ্যমান, নিষ্কারণ ? সংসারকে নিষ্কারণ বলা, আর নির্নিমিত্তবাদের শরণাপন্ন হওয়া,—একই কথা। নির্নিমিত্তবাদীরাই বিশ্বকার্য্যকে স্বভাবসিদ্ধ কারণশূন্য বলিয়া প্রচার করেন। বিশ্বকে নির্নিমিত্ত বলিলে উহার স্বতঃসিদ্ধতা, বা স্বতঃবিদ্যমানরূপে স্বীকার করিতে হয়।

নিখিল সংসারকে যাঁহারা স্বতঃবিদ্যমানরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে বিশ্বকার্য্যের মূলে কোনও কারণ নাই এবং নিষ্কারণ বলিয়া সংসার অনাদি। বর্ত্তমানে আমরা এই বিশ্বসংসারকে যেরূপ দেখিতেছি, চিরদিনই উহা তদ্রূপ আছে ও থাকিবে। অনাদিত্ব হেতু ইহা অসৃষ্ট ও অনন্ত, কেননা সৃষ্ট বস্তুই জ্ঞানরাজ্যে সাদি ও সান্তরূপে প্রসিদ্ধ। স্বতঃবিদ্যমানবাদের মোট কথা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

আদিশূন্য বস্তুকেই অনাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। 'আদি' কোন্ পদার্থ ? ক্রমরূপান্তর প্রাপ্ত কোন একটি বিশেষ বস্তু বা ভাবের সর্ব্বাগ্রে স্থিত যে অবস্থা বা ভাবটী, যাহার অপর কোনও পূর্ব্বাবস্থা বা রূপ নাই, তাহাকেই ঐ বস্তু বা ভাববিশেষের আদি বলে। পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে অন্তঃ ও বহির্জ্জগতে বিদ্যমান বিবিধ রূপ ও ভাববিকারসমূহ দ্বারদ্বারী ন্যায়ে পরস্পর কারণকার্য্যভাবে সম্বদ্ধ।

যেটি যাহার প্রাক্-ভাব, সেইটিই তাহার কারণ। বিশ্ব-রাজ্য কোনও নির্দ্দিষ্ট কালাবচ্ছিন্ন নহে। ইহার কোনও প্রাক্-ভাব নাই। অনাদি কাল হইতে বিশ্ব-সংসার এবম্বিধভাবে স্বতঃবিদ্যমান বলিয়াই এই বিশ্ব নিষ্কারণ, নিত্যসিদ্ধ ও অনাদি।

স্বতঃবিদ্যমানবাদে সংসারকে নিষ্কারণ বলিয়া ইহার সৃষ্টিত্বে প্রতিষেধ করা হইয়াছে। পণ্ডিত স্পেন্সার (Spencer) বলিয়াছেন—"The assertion of self-existence is simply an indirect denial of creation Self-existence, therefore, necessarily means existence without a beginning. To conceive existence through infinite past time implies the conception of infinite past time, which is an impossibility"—First Prin p. 31—অর্থাৎ বিশ্ব-সংসারকে স্বতঃবিদ্যমান বলিলে উহার সৃষ্টিনিষেধ (উৎপত্তিনিষেধ)ই পাক-চক্রে করা হইয়া থাকে। স্বতঃবিদ্যমান পদের অর্থ নিশ্চয়ই আদি বা আরম্ভ-বিরহিত সত্তা। আরম্ভবিরহিত সত্তার উপলব্ধি করা এবং অনন্ত অতীতের উপলব্ধি করা,—একই কথা। ইহা কখন সম্ভবপর নয়। আর এক কথা—এই বিশ্বসংসারকে আদ্যন্তশূন্য বিকারবিরহিত নিরবচ্ছিন্ন সত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে, আদ্যন্তের ন্যায় মধ্যাবস্থায়ও উহার রূপান্তরের প্রতিষেধ নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু উহার বিবিধ রূপান্তরতা বা ভাববিকার যে বর্ত্তমান কালে আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার কি ?

৩। স্বতঃসৃষ্টিবাদ বা Self-Creation

এইরূপে বিশ্বসংসারের স্বতঃবিদ্যমানতা যুক্তিসহায়ে প্রমাণিত হইবার নয় বলিয়াই অনেকে স্বতঃসৃষ্টিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বতঃসৃষ্টিবাদে কার্য্যকারণপ্রণালী অবলম্বনে বিশ্বের স্বরূপে পৌঁছিবার চেষ্টা করা বৃথা। বিশ্বের রহস্য উদ্ভেদের সম্ভাবনা ত দূরের কথা, পদার্থ-তত্ত্ববিচার ও বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান হওয়াও নরের অসম্ভব। কারণ, স্বধর্ম্ম বিধর্ম্ম লইয়াই পদার্থতত্ত্বের বিচার হইয়া থাকে এবং কার্য্যকারণবিচারেই বস্তুবিশেষের স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। এই বিশ্বরূপ কার্য্য যাহা হইতে উদ্ভূত, তাহা সর্ব্বদা কার্য্যকারণসম্বন্ধবিচারের ভূমি অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। মানববুদ্ধি কিন্তু ঐ কার্য্যকারণ ভূমির এক পদও বাহিরে যাইতে অসমর্থ, কাজেই ঐ কারণের স্বরূপ জ্ঞানার্জ্জন মানববুদ্ধির নিতান্ত সুদূর-পরাহত। ইহা দেখিয়াই বেন, ওআণ্ট্, হেফ্ডিং প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দার্শনিক-

গণ স্বতঃস্থিতিবাদকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বতঃস্থিতিবাদের মতে সংসার অনাদি নহে অথবা ভাববিকারবর্জ্জিত অন্তর্বাহ্যশূন্য অচিন্তনীয় এক নিরবচ্ছিন্ন সত্তাও নহে। এই মতে বিবিধ নামরূপের আধার, চিদচিদাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মানবের বোধগম্য কোনও কারণাপেক্ষা না করিয়া এক সৎ পদার্থ হইতে আপনাআপনিই আবির্ভূত হইয়াছে। ঐ সৎপদবাচ্য বস্তুই মানবের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমরা দেখিতে পাই, চিজ্জড় লইয়াই বিশ্বসংসার রচিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদী পণ্ডিত ডেকার্টে বলেন, চিন্তাবৃত্তি বা মনন—চিৎ বা মনের এবম্বিস্তৃতি—অচিৎ বা জড়ের ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা প্রায় সকলেরই জানা কথা যে, চিদচিৎ উভয়ই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক। যাহা চিৎ, তাহা জড় নহে এবং যাহা জড়, তাহা চিৎ নহে। সুতরাং আশঙ্কা হইতেছে, বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক পদার্থদ্বয়ের অন্যান্য সম্বন্ধ কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে? জৈবদেহের বিবিধ ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় যে, মন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মাপন্ন হইলেও দেহের উপর কার্য্য করিয়া থাকে এবং দেহও মনের বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও তদুপরি ঘাত-প্রতিঘাত দানে সমর্থ। বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক ঐ দুইটি পদার্থের মধ্যে এইরূপ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া কিরূপে হইয়া থাকে—ইহার মীমাংসায় স্বতঃস্থিতিবাদ কি বলিয়া থাকে—তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

দ্বৈতবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিলে, বিরুদ্ধধর্ম্মাপন্ন পদার্থদ্বয়ের অন্যান্য সম্বন্ধ ব্যাখ্যাত হয় না এবং জ্ঞানের মূলীভূত অনুভূতির কোনই ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না বলিয়া, স্পিনোজাই (Spinoza) প্রথম, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক বলিয়া স্বীকৃত দেহ ও মন—চিৎ ও জড়—পদার্থদ্বয়কে অবিসম্বাদি একধর্ম্মাত্মক বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণাই স্বতঃস্থিতিবাদ বলিয়া পরিচিত। স্পিনোজা চিজ্জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, চিৎ পদার্থ এক ও অদ্বিতীয়, ইহার বহুত্ব অসম্ভব। চিৎ ও জড়, মন ও দেহ—ইহারা বিরুদ্ধধর্ম্মাপন্ন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে, পরন্তু একই পদার্থের ধন ও ঋণ (Positive and Negative) ভাবমাত্র, অথবা একই বস্তুর আন্তর ও বাহ্য (Internal and External) ভেদে দ্বিবিধ রূপমাত্র।

এই এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থই বিশ্বকার্য্যের মূল কারণ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহা চিৎ, কি জড়—তাহা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু গুণবিরহিত দ্রব্য মনুষ্য-কল্পনার গ্রাহ্য নয় বলিয়া, মানব পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি সহায়ে বুঝিতে যাইয়া, উক্ত অদ্বিতীয় পরমার্থ বস্তুতে বিসংবাদী দ্বিবিধ গুণের আরোপ করিয়া থাকে।

সুতরাং এক ভূমি হইতে অবলোকন করিলে, এই সৎ পদার্থই বিস্তৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত পরমাণুগঠিত পরিবর্ত্তনশীল বহুরূপে প্রতিভাত হয়। আর অপর ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ সৎ পদার্থই আবার বহির্জ্জগতে সংঘটিত বিবিধ ঘটনার অনুরূপ, আন্তর্জ্জাগতিক বিবিধ ভাব, ভাবনা ও জ্ঞানরূপে প্রতীত হয়। দেখা যায়, জড়রাজ্যের প্রত্যেক বিকারের সহিত মনোরাজ্যেও অনুরূপ পরিবর্ত্তন বা বিকার সমুপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাহিরে যেমন অণুপরমাণুসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডে সংশ্লিষ্ট হইয়া, বিবিধ ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত পৃথক্ পৃথক্ স্থূল দেহ স্বতঃ-নির্ম্মাণ করে, অন্তরেও তেমনি নানা ভাব ভাবনা, জ্ঞান ইত্যাদি নানাকারে একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া, স্বতঃই ভিন্ন ভিন্ন মনের সৃষ্টি করে। আবার—যেমন বহিঃস্থিত সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ জড়পিণ্ডসমূহের বিচিত্র সমাবেশে স্বতঃই এক বিরাট্ দেহের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি করিয়াই বিবিধ ভাবনা, ভাব ও জ্ঞানসমন্বিত বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন-সমূহের বিচিত্র সমাবেশে স্বতঃই এক অনন্ত বিরাট্ মনের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল যে, স্পিনোজার মতে, এক অদ্বিতীয় অনবচ্ছিন্ন সত্তাই বিবিধরূপে অস্মদ্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইতেছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে জীব আপ-নাকে বিবিধ ভাবনা, ভাব ও জ্ঞানের আকর মনস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করে, ব্যব-হারিক দৃষ্টিতে সেই আবার আপনাকে—তথা অপরকেও—অণুপরমাণুর সংস্থান-ভেদে বিরচিত বিস্তৃত বস্তুবিশেষ অর্থাৎ দেহাদিরূপে বুঝিয়া লয়। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ-বাদ। পণ্ডিত Spencer ইহাকে সর্ব্বব্রহ্মবাদেও অভিহিত করিয়াছেন, কেননা, সর্ব্ব-ব্রহ্মবাদে ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ, তদ্ব্যতীত বিশ্বকার্য্যের অন্য কারণ নাই।

স্পিনোজার সর্ব্বব্রহ্মবাদকে অনেকে ভারতের অদ্বৈতবাদের অনুরূপ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু ঐরূপ বুঝিবার কোন কারণই দেখিতে পাই না। দ্বৈত প্রতিষেধাত্মক একত্ববাদ কোন ভাবে প্রচার করিলেই যদি ভারতীয় অদ্বৈত-বাদ প্রচার করা হয়, তাহা হইলে আমাদের আর কোন কথা নাই। ভারতের অদ্বৈতবাদ যে কি বস্তু, আমরা যথাসময়ে তাহার যথাশক্তি আলোচনা করিব। এক্ষণে স্পিনোজার মত যতদূর আলোচনা করা হইল, তাহাতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্পিনোজার ঈশ্বর, দ্বৈতবাদীদিগের ঈশ্বরের ন্যায়, জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তিবিশেষ অথবা দণ্ডচক্রধারী কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণও নহেন। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বর ও জগৎ উভয়ে একই বস্তু অথবা ঈশ্বরই জগৎ, তিনিই কারণ এবং তিনিই কার্য্য। তিনিই দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম। দ্রব্য (Substance) গুণ

(Attribute) এবং প্রকারতা (modes)—এই তিনটিই স্পিনোজা কর্ত্তৃক পদার্থরূপে অবধারিত হইয়াছে। যাহা সপ্রমাণ, তাহাই স্পিনোজার দ্রব্য। যদ্বারা আমরা দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুমান করি, তাহাই "গুণ" পদার্থ এবং যাহা দ্রব্যের বিবর্ত্ত বা প্রকারতা, তাহাই স্পিনোজার কর্ম্মপদবাচ্য। দ্রব্য স্বয়ং সিদ্ধ: কেননা, কারণাপেক্ষা হইলে উহা কার্য্যপদার্থ বলিয়া অর্থাৎ অন্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা নয় বলিয়াই দ্রব্য স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ আপনিই আপনার কারণ এবং এতন্নিবন্ধনই দ্রব্য অপরিচ্ছিন্ন, অনন্যাপেক্ষ, অদ্বিতীয়, একমাত্র সৎপদার্থ। দ্রব্য অনন্যাপেক্ষ, কারণ উহা বিনা প্রয়োজনে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, বিশ্ব সংসার রচনা করে এবং অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয়, একমাত্র সৎ-পদার্থ বলিয়া উহা স্বাধীন, নিষ্কারণ, ও নিত্যমুক্তস্বভাব।

স্বতঃসৃষ্টিবাদের আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবরণ দিলাম। একটু চিন্তা করিলে বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, এ বাদও দোষবিনির্ম্মুক্ত নহে। স্পিনোজা জীব ও জড়জগতের বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে সৎপদার্থ এক, উহার বহুত্ব অসম্ভব। এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থই স্পিনোজার ইচ্ছা ও বুদ্ধিবিবর্জ্জিত ঈশ্বর। এই ঈশ্বর, সুপ্ত বা নির্গুণ অবস্থা হইতে স্বয়ং কোনও কারণাপেক্ষা না করিয়া উদিত বা সগুণাবস্থায় আগমন করিয়া, জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। কিন্তু কথা হইতেছে, স্পিনোজার ঈশ্বরের এবম্বিধ নির্গুণ অবস্থা কি মনুষ্যবুদ্ধিগম্য? যাহা ক্রিয়া ও গুণবিবর্জ্জিত, তাহা অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তোমার শাস্ত্র, সুপ্ত ঈশ্বর ক্রিয়াগুণবর্জ্জিত, সুতরাং অসৎ। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অসৎকে কোন্ ন্যায় অনুসারে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিবে? আবার ইচ্ছাবুদ্ধিবিহীন তোমার ঈশ্বর, কারণান্তর অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ংই সুপ্ত অবস্থা হইতে উদিত বস্থায় আগ-মন করেন, আচ্ছা বল দেখি, বিনা কারণে কি কার্য্য হয়? আর এক কথা, তোমরা বলিয়া থাক—ঈশ্বর স্বরূপে নির্গুণ। আবার মনন (Thought) ও বিস্তৃতি (Extension)—এই বিসংবাদী গুণদ্বয় তাঁহাতে অবিসংবাদী রূপে বিদ্যমান বলিয়া কল্পনা করিয়া থাক। আচ্ছা বলদেখি, অবিসংবাদীরূপে বর্ত্তমান ঐ গুণদ্বয়ের সহিত ঈশ্বরের বা মূল পদার্থের সম্বন্ধ কি? তোমার ঈশ্বরকে মননশীল কিম্বা বিস্তৃতিসম্পন্ন বলা যায় না। কারণ, কেবল উদিতাবস্থাতেই তাঁহাতে ঐ দুইটি গুণের আরোপ হয়। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত ঐ গুণদ্বয়ের ধর্ম্মাধর্ম্মী সম্বন্ধ স্থাপন হওয়া অসম্ভব।

অতএব স্বীকার করিতে হইবে, স্পিনোজার দর্শনে পরিদৃশ্যমান চিজ্জড়াত্মক

সংসারের রহস্য উদ্ভিন্ন হয় নাই। বহুর মধ্যে তিনি একের সন্ধান পাইয়াছেন বটে, কিন্তু উক্ত এক পদার্থ কিরূপে বিবিধগুণবিভূষিত বহুত্বে পরিণত হইয়া বিচিত্র ভাববিকারসমন্বিত সংসারসমুদ্ররূপে প্রতিভাত হয়, তাহার সমাচার তিনি অল্পমাত্রই প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

উত্তরাখণ্ডে কঠিন কেদার ও বদরী-বিশাল।

[শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।]

যে চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের উত্তর সীমা বলিয়া সর্ব্বকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, পুরাকালে যাহা আর্য্য মুনিঋষিদিগের মধ্যে 'তপোবন' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং দেব, কিন্নর, ও যক্ষগণের আবাসভূমি রূপে নিরূপিত হইয়াছিল, যথায় ভূতনাথ মহাদেব জগজ্জননী উমার সহিত নিত্য বিহার করেন এবং যাহা হরপ্রিয়া উমার জনক বলিয়া পুরাণে কথিত আছে, সুরনরপূজ্য সেই হিমালয়-পর্ব্বতের উপরেই ঐ দুই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। কঠোর পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে শ্রান্ত দেহ যখন আর চলে না, অথচ দেখিতে পায়, ৺কেদারনাথে পৌঁছিতে এখনও অনেক বিলম্ব, তখন যাত্রীদের ভক্তিপূর্ণ হৃদয় দেবদেবের উপর অভিমানে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে কঠিন কেদার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং পুরাকালে একটি বিশাল বদরী বৃক্ষ থাকাতেই অন্য তীর্থটির নাম বদরিকাশ্রম বা বদরী-বিশাল হইয়াছিল। শুনা যায়, পুরাকালে দক্ষের দুহিতা, ধর্ম্মভার্য্যা, শ্রীমতী মূর্ত্তির গর্ভে শ্রীভগবান্ অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন দুই মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সৃষ্টির কল্যাণের নিমিত্ত অতি কঠোর তপস্যা আচরণ করেন। নর ও নারায়ণ নামে ঐ দুই মূর্ত্তি সর্ব্বপুরাণে প্রসিদ্ধ আছেন এবং উঁহারাই যুগে যুগে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছেন। তপস্যাকালে অনঙ্গের সহচরী অপ্সরাগণ তাঁহাদের তপোভঙ্গ করিতে আগমন করিলে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা নিজ নিজ শরীর হইতে তদপেক্ষা অধিক সুন্দরী উর্ব্বশী প্রভৃতি কয়েকটি স্ত্রীমূর্ত্তি উৎপন্ন করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন। উর্ব্বশী প্রমুখ নারীকুলের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া

পূর্ব্বকথিত অপ্সরাগণের স্বকীয় রূপগর্ব্বে ধিক্কার উপস্থিত হয় এবং লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া পলায়ন করিয়া তাহারা অনঙ্গকে সংবাদ দেয় যে, নরনারায়ণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবেশ করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতঃপর কন্দর্পও আর তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিতে সাহসী হইল না। পুরাণ মুখে শুনা যায়, উহা সত্যযুগের কথা।

অদ্য পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ নরনারায়ণ মূর্ত্তিতে ঐ স্থানে তপস্যাচরণ করিতেছেন, কারণ, শাস্ত্র বলেন, শ্রীভগবান্ জগৎহিতার্থে চারি যুগ ঐ পুণ্যক্ষেত্রেই তপস্যাচরণ করিবেন। অলকনন্দাতীরে অবস্থিত এই বিশালা বদরী শ্রীভগবানের তপস্যাভূমি বলিয়াই চার ধামের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। নারায়ণের আশ্রম বিধায়, ইহার অপর একটি নাম বদরিনারায়ণ হইয়াছে। নারায়ণ এবং মহাদেব উভয়েরই নিত্যবিহারভূমি বলিয়া উত্তরাখণ্ডের এত মাহাত্ম্য—ভারতের শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সকল সম্প্রদায়মধ্যেই এত মান। কারণ ৺কেদার নাথ নামক লিঙ্গ মূর্ত্তিতে উমার সহিত ভবানীপতির হিমালয় পর্ব্বতে নিত্য অবস্থানের কথাও পুরাণশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। উক্ত কেদার নাথ মহাদেব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম, যথা, "কেদারং হিমবৎ পৃষ্ঠে"। আবার কিম্বদন্তি বলে, ভারতের সমুদায় প্রসিদ্ধ তীর্থ ও দেবদেবীগণ কলিকালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এই উত্তরাখণ্ডে অবস্থান করিতেছেন! কাজেই ভারতের সকল স্থান হইতেই হিন্দু সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ সকলেই ভগবানের এই ধাম দেখিতে আগমন করেন, তবে পঞ্জাবী ও দক্ষিণরাজ্যের লোকসংখ্যাই অধিক। বদরিনারায়ণ কেদার নাথ ও এতদঞ্চলের অপরাপর অনেক দেবমন্দির সকল হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গ সকলে অবস্থিত বলিয়া, গ্রীষ্মকালেই ঐ সকল তীর্থদর্শনের পথ খোলা থাকে, এ কারণ ঐ সময়েই এখানে যাত্রী সমাগম হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্যের সময় পাহাড়ে অত্যন্ত বৃষ্টি পতন হইয়া থাকে, এ কারণ যাত্রিগণকে সময়ে সময়ে এই পথে খুব ভিজিতে হয়। শীতকালে এই সকল স্থান তুষারপাতে আবৃত হয় বলিয়া, বদরিনারায়ণ ও কেদার নাথের মন্দিরে ৺শ্যামা পূজার দিন দীপ দান করিয়া, ৬ মাসের জন্য একেবারে মন্দির বন্ধ করিয়া পূজারী প্রভৃতি সকলে নিম্নতর পর্ব্বতে চলিয়া আসে। গ্রীষ্মের আগমনে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ঐ মন্দির আবার খোলা হয় ও যাত্রিগণ দেবদর্শন করিতে পায়। প্রবাদ আছে, ৺কেদার নাথ ও ৺বদরিনারায়ণের মন্দিরের ভিতর যে দীপ ৺শ্যামা পূজার রাত্রে জ্বালাইয়া উক্ত মন্দিরদ্বয় বন্ধ করা হয়, সেই দীপ ৬ মাস বাদে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে উক্ত

মন্দিরদ্বয় খুলিবার সময়, সমভাবে জ্বলিতেছে—দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার পাণ্ডাগণ এই দৃষ্টান্তদ্বারায়, শ্রীভগবান্ যে এই ধামে এখনও নিত্য বিরাজ করিতেছেন, ইহাই প্রমান করেন। তাঁহারা বলেন—যাত্রিগণ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া উক্ত মন্দিরের দ্বার খুলিবার সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলেই এবিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। শুনিলাম, ঐ বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতেই তথায় অনেক যাত্রীও সমবেত হয়।

কেদারবদরিনারায়ণ দর্শন করিতে হইলে হরিদ্বার হইতে যাত্রা করাই প্রশস্ত। অনেকে কাটগুদাম হইতেও গিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বিহিত নয়। হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়া কেদারবদরিকাশ্রম দর্শন পূর্ব্বক কাটগুদামে গিয়া রেলগাড়ি চড়িলে, উত্তর খণ্ডের সমুদায় দেবস্থান, তীর্থস্থান ও সওয়া লক্ষ পর্ব্বত শাস্ত্রবিহিতমতে পরিক্রমণ করা হয়। শাস্ত্রে তীর্থস্থান বা দেবমন্দিরকে নিজ দক্ষিণে রাখিয়া পরি-ক্রমণ করিবারই নিয়ম আছে, সেজন্য পরিক্রমণ করিবার ঐরূপ প্রথাই ভারতের সকল স্থানের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। আবার শাস্ত্রে বলেন যে, তীর্থ স্থান বা দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে না পারিলে, উহা পরিক্রমণ করিলেও তীর্থফল লাভ হয়। তীর্থবহুল উত্তরাখণ্ডের সমুদায় তীর্থ দর্শন করা এক ব্যক্তির পক্ষে একরূপ অসম্ভব, এ কারণে ঐরূপে পর্ব্বত পরিক্রমণের দ্বারা যাত্রিগণ সমগ্র তীর্থ দর্শনের ফললাভে যত্নবান্ হয়। আর এক কথা—যাত্রীদের কেদার ও বদরিনারায়ণ যাইবার সমুদায় বন্দোবস্তের যোগাড়, যথা, বাসা, পাণ্ডা, কুলি, কাণ্ডি, ঝাঁপান প্রভৃতি, যথেষ্ট পরিমাণে হরিদ্বারেই পাওয়া যায়। কিন্তু যাত্রিগণ হরিদ্বারে যে ঝাঁপান, কাণ্ডি বা কুলি ভাড়া করেন, তাহা কেদারবদরিনারায়ণ হইয়া বরাবর কাটগুদাম অবধি আসে না। কাটগুদাম হইতে ৪।৫ দিনের পথ উপরে মেহেলচটী পর্য্যন্ত আইসে। মেহেলচটী হইতে পুনরায় কাটগুদাম পর্য্যন্ত ঐ সকলের নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। এ কারণ মেহেলচটীতেও ঝাঁপান, কাণ্ডি ও কুলি যথেষ্ট মজুত থাকে। হরিদ্বার হইতে মেহেলচটী পর্য্যন্ত ঝাঁপানের ভাড়া ০।৮০ টাকা। ঝাঁপান এক রকম ডুলির ন্যায় যান। উহা ৪ জন লোকে বহন করে। ঐ পথের কাণ্ডি ভাড়া ৩০।৩৫ টাকা মাত্র। কাণ্ডি এক প্রকারের ঝুড়ি বা মোড়া বিশেষ। একজন মাত্র কুলি উহা পিঠে বাঁধিয়া বহন করে, এ কারণ উহাতে ক্ষীণকায় লোকই যাইতে পারে। খাদ্য, বিছানা প্রভৃতি দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য কুলি ভাড়া মন প্রতি ৩২৲ টাকা হিসাবে লাগিয়া

থাকে। তদ্ভিন্ন কুলিদিগকে প্রত্যহ ৫১০ হিসাবে জলপানি এবং পথিমধ্যে কোন স্থানে ২।৪ দিন অবস্থান করিলে, সেই ২।৪ দিনের খোরাকিও দিতে হয়। মেহেলচটী হইতে কাটগুদাম যাইতে ঝাঁপানের ভাড়া ১৫।২০ টাকা, কাণ্ডির ৮৲ টাকা এবং দ্রব্যাদি বহনকারী কুলিকে ৮৲ টাকা মন হিসাবে ভাড়া দিতে হয়।

সে আজ সাত আট বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি, কেদারবদরী দর্শন মানসে আউদ রোহিলখণ্ড রেলের লক্‌সর জংশনে গাড়ি বদল করিয়া, ডেরাডুন শাখা রেলে চড়িয়া হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় এক মাইল। ষ্টেশনে গাড়ি, পালকী প্রভৃতি সকল রকম সোয়ারি পাওয়া যায়, দেখিলাম। হরিদ্বার সহরটি পঞ্জাবের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত। এখানে পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়, সকল রকম দ্রব্যের দোকান, অনেকগুলি ধরমশালা, বাসাবাটী এবং সকল সম্প্রদায়ের মঠ আছে। হরিদ্বার একটী সামান্য সহর। এখানে বিষ্ণুপদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গা, হিমবানের শিবালিক নামক শ্রেণীকে পার্শ্বে রাখিয়া, পার্ব্বতীয় প্রদেশ ত্যাগ করতঃ ভারতের পর্ব্বতশূন্য সমতল প্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন, এ কারণ—অথবা ভগবান্ হর ও হরির উত্তরাখণ্ডের তপস্যাক্ষেত্র কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে যাইবার ইহাই দ্বার-স্বরূপ বলিয়া—এই স্থান হরদ্বার, হরিদ্বার এবং গঙ্গাদ্বার নামে অভিহিত। গঙ্গা এখানে দুই ধারা হইয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়াতে উহার মধ্যস্থলে একটী দ্বীপ জন্মিয়াছে। পশ্চিমের ধারার তীরে তীর্থাদি। উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম নদীতীরে ভিমগুডা নামক একটী কুণ্ড ও দেবমন্দির, পরে নদীর উপকূলে গৌরিশঙ্কর মহাদেবের প্রকাণ্ড মন্দির, তাহার পর উভয় ধারা বিভক্ত হইবার মুখে বিষ্ণুপদ বা ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট। ঐ ঘাটে ৩৯ ধাপ আছে, প্রথম ধাপ ২২॥ হাত ও শেষ ধাপ ৬০ হাত বিস্তৃত। নানসংহ্রত পূর্ব্বঘাট ক্ষুদ্র ছিল। যোগের সময় শৈব ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা ঐ সঙ্কীর্ণ ঘাটে স্নানের জন্য বিবাদ করিয়া অনেকে বিনষ্ট হইত। এজন্য গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ধনীদিগের সাহায্যে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুচরণ যোজিত করিয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুপদ ঘাটে গঙ্গার বিস্তার ৬৭০ হাত। ঘাটের উপর বিষ্ণুমন্দির ও অপরাপর মন্দির আছে। ইহার কিছু দূরেই কুশাবর্ত্ত ঘাট, এখানে পিতৃপুরুষকুলের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে হয়। তৎপরে দক্ষিণে কিছু দূরে একটী নদী গঙ্গায় পড়িতেছে। তথায় সর্ব্বনাথ মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি এবং বেদির গায়ে দুই ধারে চক্র ও সিংহ খোদিত আছে। এই মন্দিরের কিছু দূর

দক্ষিণে ভৈরব মন্দির। তৎপরে মায়াদেবী, মায়াদেবীর মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত, দ্বারে ৯০০ বর্ষের এক পাষাণ লিপি বর্ত্তমান। উহার অভ্যন্তরে ত্রিমস্তক চতুর্হস্ত অসুরনাশিনী দুর্গা বিরাজমানা। দেবীর হস্তে চক্র, ত্রিশূল ও মুণ্ড এবং নিকটে ৮হাত বিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি ও একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ষাঁড। এই মন্দিরের দক্ষিণে মায়াপুর। "অযোধ্যা মথুরা মায়া" প্রভৃতি যে সপ্ত মোক্ষ ক্ষেত্রের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, এই মায়াপুরই সেই শাস্ত্রোক্ত মায়া নামক মোক্ষ ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মায়াপুরের দক্ষিণেই গঙ্গা হইতে একটি কাটি খাল দক্ষিণ পশ্চিমে কড়কী গিয়াছে। খালের মধ্যে ভতনা নদীর মুখ। এই স্থানে নারায়ণ শিলা মন্দির বর্ত্তমান। উক্ত মন্দিরের এক একখান ইট চারিদিকে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ও তিন আঙ্গুল পুরু। উহার নিকটেই ৫০০ হাত সমচতুষ্কোণ বেণ কেল্লা। মায়াপুরের দক্ষিণে খাল আরম্ভের স্থানে, খাল পার হইয়া কিছু দূর দক্ষিণে যাইলেই পূর্ব্বোক্ত চরা বা দ্বীপের শেষে উপস্থিত হওয়া যায় এবং পূর্ব্বদিকের জলধারা হইতে এক ধারা আসিয়া পশ্চিম ধারায় মিলিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুই ধারার মিলন স্থানে জলের বিস্তার আন্দাজ দুই সহস্র হাত হইবে। উহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ কনখল তীর্থ। এই স্থানে ভগবান্ ভূতনাথ দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব আছেন। প্রাচীন মন্দির বটবৃক্ষে ভগ্ন হওয়ায় নূতন মন্দির ১৭৭০ শকে নির্ম্মিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে নেপাল-রাজ প্রদত্ত এক বৃহৎ ঘণ্টা। কনখলে অনেক মঠ ও মন্দির আছে। এই সকল মঠের মধ্যে কয়েকটিতে সাধু সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রপাঠের জন্য সংস্কৃত পাঠশালা আছে। বিষ্ণুপদ ঘাট হইতে কনখল পর্য্যন্ত দেড ক্রোশ পথের সর্ব্বত্রই তীর্থস্থান। হরিদ্বারস্থ হিমালয়ের নাম শিবালিক পর্ব্বত, পুরাণে উহারই নাম কনখল শ্রেণী। কনখল পর্ব্বতের উপর দেখিবার অনেকগুলি বিষয় আছে। যাত্রীরা সচরাচর যে পর্ব্বতে উঠে, তাহা হরিদ্বারের দিকে ঢালু। কিন্তু আলগা মাটি ও প্রস্তর খণ্ড থাকায় সাবধানে উঠিতে হয়। কুশাবর্ত্ত ঘাটের অপর পারে পর্ব্বতের উপর এক বেদী মধ্যে ৯ হাত উচ্চ এক প্রস্তর ত্রিশূল প্রোথিত আছে। শূলের উপর চন্দ্রসূর্য্যমূর্ত্তি, শূলদণ্ডে গণেশ এবং উহার নিম্নভাগে পূর্ব্বদিকে কালিকা দেবী ও পশ্চিমে হনুমান মূর্ত্তি খোদিত আছে। উহার অল্প দূরেই সূর্য্যকুণ্ড। হরিদ্বারে চৈত্র সংক্রান্তিই স্নানের বিশেষ কাল। দ্বাদশ বর্ষান্তে বৃহস্পতি কুম্ভরাশি প্রবেশ করিলে এখানে একটি বড় মেলা হয়, উহারই নাম কুম্ভমেলা। ১৮০০, ১৮১২ ও ১৮২৪ ইত্যাদি শকে উক্ত মেলা হইয়াছিল। মেলায় নাগা-

সন্ন্যাসীর বড় গোল। গভর্ণমেণ্ট সৈন্য সহ সতর্ক থাকেন। ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভারতীয় আচার্য্যগণের প্রাধান্যানুসারে তত্তচ্ছিষ্য সন্ন্যাসিগণ বিভক্ত হইয়া ঐ মেলায় অগ্র পশ্চাৎ স্নান করিয়া থাকেন। ঐ সময় যখন হাতির উপর মোহান্ত ও নিম্নে বিভূতিমণ্ডিত দীর্ঘশ্মশ্রু কতক জটাবল্কলধারী, কতক উলঙ্গ, খাকী, মাধ্বাচারী, রামানুজী, নাগা আদি ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়গণ স্বর্ণছত্র, চামর, ও পতাকাদি লইয়া দলে দলে নিজ নিজ গুরুর পার্শ্বে জয়ধ্বনি করিতে করিতে হরিদ্বারের অপ্রশস্ত পথ দিয়া বিষ্ণুপদ ঘাটে গমন করিতে থাকেন এবং উভয় পার্শ্বে গবর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্ম্মচারী ও রক্ষকগণ অতি সতর্কতার সহিত শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত থাকে, তখন মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। কতকগুলি "হর হর বম্ বম্" করিতে করিতে গিয়া জলে পড়িল। তাহার পর আর এক দল "হরে নারায়ণ হরে নারায়ণ" করিতে করিতে অগ্রসর হইল। আর এক দল 'জয় শিব শম্ভো', 'জয় শিব শম্ভো' করিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই রূপ দলের পর দল আসিয়া গঙ্গাদ্বার মুখরিত করিয়া তোলে। হরিদ্বারের নিকট মঠ ও পর্ব্বত না থাকিলে মেলার সময় সমাগত এই সকল অসংখ্য সন্ন্যাসীর বাসস্থান নির্ণয় করা ভার হইত, সন্দেহ নাই।

হরিদ্বারের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে, রেলষ্টেশনের পশ্চাতে, বনমধ্যে বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। হরিদ্বারের পূর্ব্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে গঙ্গার নীল নামক ধারা পার হইয়াই চণ্ডীর পাহাড়ের পাদদেশ। ঐ পাহাড়ের উপর ⁄চণ্ডী মাতার মন্দির। উক্ত চণ্ডীর পাহাড়ে উঠিবার দুইটি পথ আছে। একটী পথের প্রথমেই নীলকেশ্বর মহাদেবের মন্দির; অপরটীর মুখে পিছোড়নাথ মহাদেবের মন্দির অবস্থিত।

আমি ৮।১০ দিন হরিদ্বারে থাকিয়া এখানকার তীর্থাদি দর্শন করিলাম। পরে কেদারবদরিনারায়ণ যাইবার জন্য ২।৩ জন সঙ্গী যোগাড় করিয়া, বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এখান হইতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করিলাম। আমরা, প্রথম দিবস দুপুর বেলায় এখান হইতে পাঁচ ছয় মাইল* উত্তরে অবস্থিত সত্যনারায়ণ জীর মন্দিরমধ্যস্থ ধরমশালায় আহারাদি করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল দূরে ঋষিকেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঋষিকেশ গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এখানে অধিক শীত নাই বলিয়া অনেক সাধু ও সন্ন্যাসী বার মাস বাস করেন, একারণ ২।৩টী অন্নসত্র বা সদাব্রত বারমাস খোলা থাকে। এখানে অবস্থানকালে দেখিলাম, কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী, কেহ তিন মাস, কেহ

ছয় মাস, কেহ বা এক বৎসর নিয়মপূর্ব্বক অজগব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গঙ্গাব ধারে পড়িয়া আছেন। কেহ তাঁহাদেব নিকট খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায় তু খান, নতুবা অনশনেই দিন কাটান। এখানে একটী তীর্থকুণ্ড ও ভবতজীব মন্দির আছে এবং যাত্রীদের জন্য ২।৩টী ধরমশালা আছে। আমরা পর দিন এখান হইতে যাত্রা করিয়া ৩ মাইল দূরে অবস্থিত লছমন্ ঝোলায় উপস্থিত হইলাম। ঝোলা বা পোলের নিকটেই একটী মন্দিব আছে। মন্দির মধ্যে রাম, সীতা ও লক্ষণেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। লছমন ঝোলায় এখন বেশ পাকা পোল, লোহার দড়া ও কাষ্ঠ দ্বারায় নির্ম্মিত। শুনিলাম, পূর্ব্বে এখানে একটি দড়ির পোল ছিল। তদবলম্বনেই গঙ্গা পার হইতে হইত। উত্তরাখণ্ডের সর্ব্বত্রই আজকাল নদীপার হইবাব জন্য পাকা পোল নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকাব ন্যায় এখন আর প্রাণ হাতে করিয়া দড়ির ঝোলা বা পোলে পার হইতে হয় না। লছমন ঝোলার উপব দিয়া গঙ্গা পার হইয়া আমরা পব পার ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে ফুলবাড়ি চটি. মোহন চটি, গুলন চটি, বাঁদব বা হনুমান চটি, মহাদেব চটি, কাণ্ডী চটি, ব্যাস চটি, উগাব চটি প্রভৃতি চটিতে বিশ্রাম ও আহারাদি করিযা পঞ্চম দিবসে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। কেদাব বদরিব পথে ৪।৫ মাইল অন্তর বরাবর চটি আছে। চটিগুলির অধিকাংশই চালা ঘর। প্রত্যেক চটিতেই একটি বা ততোধিক মুদিব দোকান আছে। দোকানে চাল, দাল. আটা, লবণ, ঘৃত, জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে বড বড দোকানে পুবি, কচুরি, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, বেনে মসলা, কেরোসিন তৈল, দেয়াশালাই প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। চটিওয়ালাবা যাত্রীদেব নিকট হইতে চটিতে থাকিবাব জন্য কোনরূপ ভাডা লয় না; তবে তাহাদেব দোকান হইতে দ্রব্যাদি না লইলে যাত্রীদের চটিতে স্থান দেয না। বড বড চটিতে বাঁশের ছিলকাম নির্ম্মিত পাটী যাত্রীদের বসিবাব জন্য পাতা থাকে। প্রত্যেক চটিতেই বসুয়ের জন্য উনান তৈয়ারি আছে এবং যাত্রিগণের বসুই করিবার বা জল আনিবার বাসন না থাকিলে চটিওয়ালারাই উহা যাত্রীদিগকে জোগাড করিয়া ব্যবহার করিতে দেয়। প্রত্যেক চটির পার্শ্বে বা অতি নিকটেই জলেব ঝরণা থাকে। কেদারবদরীব পথে সর্ব্বত্রই স্থানে স্থানে গরুড, ভগবান, গনেশজী ও ভৈরব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রিগণ ঐ সকল স্থানে মিছরীর বাতাসা বা এলাচদানা ভোগ দিয়া থাকে। হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ ৬৫ মাইল। পথে কোন বড চড়াই বা উৎরাই নাই, কেবল হনুমান চটির নিকট একটী মাত্র বড চড়াই করিতে হয়।

দেবপ্রয়াগ, ভাগীরথী গঙ্গা ও অলকনন্দা নদীদ্বয়ের সঙ্গমে অবস্থিত। পাহাড়িরা নদী মাত্রকেই গঙ্গা বলে এবং যে স্থানেই দুই নদী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকেই প্রয়াগ বলে। দেবপ্রয়াগ, পাহাড়ের মধ্যে একটী ছোট সহর বা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার এক অংশ—যথা, সঙ্গমস্থল, পাণ্ডাদের বাটী প্রভৃতি—স্বাধীন গড়োয়ালের এবং অপর অংশ—যথা, পোষ্ট আফিস, বাজার, থানা প্রভৃতি—বৃটিশ গড়োয়ালের অন্তর্ভুক্ত। অলকনন্দা নদী, বৃটিশ ও স্বাধীন গড়োয়ালের সীমা অর্থাৎ অলকনন্দার বাম পাড় বৃটিশ গড়োয়ালের এবং দক্ষিণ পাড় স্বাধীন গড়োয়ালের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্বাধীন গড়োয়াল টিহিরী রাজ্যের এলাকাভুক্ত। আমরা, অলকনন্দার বাম পার্শ্বস্থ বদরিনারায়ণের রাস্তা ত্যাগ করিয়া, পাকা পোল দিয়া অলকনন্দা পার হইয়া সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলাম। এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দা-সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া সঙ্গমের উপরিস্থিত মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরটী পুরাতন। ভিতরে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কারশোভিত রামসীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। শুনিলাম এই মন্দিরের সমস্ত খরচপত্র টিহিরী রাজাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়। সঙ্গমস্থল হইতে অদূরে পর্ব্বতকোলে পর্য্যন্ত খুব ঘন বসতি। বদরিনারায়ণের সমুদায় পাণ্ডাদের বাটী এই স্থানে। তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন চার শত হইবে। এখানকার দোকানে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখান হইতে টিহিরী যাইবার একটী রাস্তা আছে। এই সকল দেখিয়া পনরায় উক্ত পুলের দ্বারায় অলকনন্দা পার হইয়া বদরিনারায়ণের রাস্তায় আসিলাম। এখান হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে ১৮ মাইল গমন করিয়া বৃটিশ গড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর সহর পাইলাম। পথে রাণীবাড়ি প্রভৃতি কয়েকটী চটি এবং একটী শিবমন্দির দেখিয়াছিলাম।

শ্রীনগর সহর অলকনন্দার পূর্ব্ব পারে উত্তর দক্ষিণে লম্বাভাবে অবস্থিত। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে অলকনন্দাতীরে গড়োয়ালের স্বাধীন হিন্দু রাজাদিগের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা এই নগর লইবার পূর্ব্বে ইহা টিহিরীরাজের অধীন ছিল। তখন টিহিরী রাজা এই স্থানেই থাকিতেন। এ কারণ সমগ্র গড়োয়ালের তখন ইহাই রাজধানী ছিল। ভগ্ন রাজবাটী খুব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্য্যখচিত। ইহা স্বাধীন গড়োয়ালরাজ্যের অস্তমিত গৌরবের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা এই পাহাড়ের আর কোথাও দেখা যায় না। এখন এই বাটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বাটীর পার্শ্বেই একটী মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া

আছে। বাজারের পথটী পাথরে বাঁধান ও বেশ প্রশস্ত. ইহার দুই দিকে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান। এই বাজার বা চকের সম্মুখেই নহবতখানা। শ্রীনগরের বাজারে সর্ব্বদা সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। পাহাড়ের চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূর পর্য্যন্ত গ্রামের দোকানদার ও মহাজনেরা এই স্থান হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইয়া যায়। সহরে বিস্তর লোকের বসবাস। এখানে মাইনর স্কুল, সরকারি হাঁসপাতাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি আছে। ইহা বৃটিশ গড়োয়ালের হেড কোয়ার্টার, এখান হইতে ৬ মাইল দূরে পাউড়ীতে সরকারি আফিসসমূহ ও আদালত আছে। শ্রীনগরে কেদারনাথ কমলেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি কয়েকটী শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে কমলেশ্বর মন্দির বা মঠই প্রধান। আউদ রোহিলখণ্ড রেলের নাজিবাবাদ (Najibabad) জংশন হইয়া, কড্‌ওয়ারা (Katdwara) ষ্টেশন হইতে লেন্‌সডোন (Lansdowne) ছাউনির নিকট দিয়া, এক পার্ব্বত্য পথ শ্রীনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শুনিলাম, এই পথে ২।৩ দিনেই শ্রীনগর আসা যায়। শ্রীনগরের অধিকাংশ অধিবাসীই শিক্ষিত ও সভ্য। উহাদের অনেকেই আবার সরকারি কর্ম্মচারী। এখানে সংস্কৃত বিদ্যারও বেশ আলোচনা আছে।

শ্রীনগর হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে প্রায় ২২ মাইল যাইলে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছান যায়: এখানে ৺কেদার নাথ হইতে মন্দাকিনী আসিয়া অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন। কেদারবদরিনারায়ণের পথে যে, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ নামে পঞ্চ প্রয়াগ আছে, তন্মধ্যে ইহাই দ্বিতীয় প্রযাগ। শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ আসিতে ধাড়ি চটি প্রভৃতি কয়েকটী চটি দেখিলাম। এই স্থানে অলকনন্দার বাম তট দিয়া যে রাস্তা বরাবর বদরিনারায়ণ গিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া একটী পাকা সেতুর উপর দিয়া অলকনন্দা পার হইয়া সঙ্গমস্থানে আসিতে হয়। মন্দাকিনী ও অলকনন্দা সঙ্গমের নিকটেই ২।৩টী দেবমন্দির আছে৭ যাত্রীদিগকে এই স্থানে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও দেবদর্শন করিতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগ একটী চটি মাত্র। এখানে কেবল ২।৪ ঘর লোকের বসতি আছে।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে মন্দাকিনীর ধারে ধারে ২০ মাইল অগ্রসর হইয়া গুপ্তকাশী পাইলাম। পথে কয়েকটী চটি এবং অগস্ত্য মুনির আশ্রম নামে একখানি গ্রাম আছে। অগস্ত্য মুনির আশ্রমটী মন্দাকিনীর পার্শ্বেই অবস্থিত ও রমণীয়। এখানেও কয়েকটী দেবমন্দির আছে। প্রবাদ যে, এখানে অগস্ত্য মুনি কিছু

দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি বা অগস্ত্যাশ্রম হইতে গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত পথ চড়াই করিতে অর্থাৎ নিম্নপর্ব্বত হইতে উচ্চতর পর্ব্বতে উঠিতে হয়। যাহা হউক হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোনরূপে গুপ্তকাশীতে পৌছিয়া আমরা মন্দিরমধ্যস্থ ধরমশালায় বাসা লইলাম। গুপ্তকাশী মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীরস্থ একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এখান হইতে বহু নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর অপর পারে আর একটী উচ্চ পর্ব্বতের উপর ওখি মঠ বা উষামঠ প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে যাইতে হইলে মন্দাকিনী তীরে নদী পার হইবার পাকা সেতু আছে, শুনিলাম। গুপ্তকাশীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয়ে ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত কয়েকটী সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাঙ্গণস্থ দেবালয়ের সম্মুখে একটী চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান জলের কুণ্ড আছে। ইহাতে কৌশল পূর্ব্বক দুইটী শীতল জলের ধারা, দুইটী পিত্তল নির্ম্মিত পশুমুখ দিয়া, প্রবাহিত করা হইয়াছে। যাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসিগণ এই জল স্নান ও রন্ধনাদির জন্য ব্যবহার করে। মন্দিরসংলগ্ন কাপড়ের দোকান, হালুইকরের দোকান প্রভৃতি অনেকগুলি দোকান আছে। গুপ্তকাশীতে প্রায় ৩০।৪০ ঘর লোকের বাস।

আমরা গুপ্তকাশী হইতে বাহির হইয়া, ৺কেদার নাথের রাস্তায় ২২ মাইল গিয়া ত্রিযুগীনারায়ণে উপস্থিত হইলাম। এই পথে কয়েকটী চটি আছে, তাহার মধ্যে ফাটা চটিটি বেশ বড়। এখানে অনেকগুলি পাকা বাটী আছে। ৺কেদারের পথে ত্রিযুগীনারায়ণ বেশ বড় গ্রাম। ইহা অত্যুচ্চ প্রশস্ত সমতল এক পর্ব্বতমস্তকে প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। ঐ পর্ব্বতমালার উপরিভাগ শুভ্রতুষারমণ্ডিত এবং নিম্নভাগ হরিৎবর্ণের বৃক্ষসমূহে ঘন আচ্ছাদিত। এই গ্রামে অনেকগুলি ধরমশালা এবং সকল দ্রব্যের দোকান, এমন কি সেকরার দোকান পর্য্যন্তও আছে। এখানে অনেক লোকের বাস—ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ ত্রিযুগীনারায়ণের পণ্ডা ও পূজারী। যাত্রীপ্রদত্ত দানই ইহাদের উপজীবিকা। এখানে সকল সময়েই শীতের তীব্রতা অনুভূত হয়। ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরের বহির্ভাগে দুই দিকে দুইটী পাথরে বাঁধান কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে যাত্রীদের স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। কুণ্ডের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। কুণ্ডে স্নান করিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটী চতুর্দ্দিকে পাথরে গাঁথা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত রহিয়াছে। শুনিলাম, ঐ অগ্নি সাক্ষী করিয়া হরপার্ব্বতীর পরিণয় হয়, তদবধি এই অগ্নিকুণ্ডে তিন যুগ

যাবৎ অগ্নি জ্বলিতেছে। মোটা মোটা কাষ্ঠখানি কষ্ঠ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে জ্বলিতেছে। যাত্রীদিগকে এই অগ্নিকুণ্ডে জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠ খরিদ করিয়া দিতে হয়। মন্দিরের ভিতরকার ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, ইহারই নাম ত্রিযুগীনারায়ণ। পার্শ্বে বদ্রীনাথজী, রামচন্দ্রজী, ছত্রপাল ভৈরব, গনেশ, মহাদেব, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি মূর্ত্তি বিরাজিত।

ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করিয়া আমরা, এখান হইতে অন্য একটী রাস্তা দিয়া এক মাইল আসিয়া, সোমপ্রয়াগ চটির নিকট পূর্ব্বোক্ত কেদার যাইবার রাস্তায় পৌঁছিলাম। এখানে কালী গঙ্গা আসিয়া মন্দাকিনীতে মিলিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে অন্যতম নহে। সঙ্গমস্থলে যাইতে হইলে এই রাস্তা হইতে অনেক দূর নীচে নামিতে হয়। আমরা সঙ্গমস্থলে না যাইয়া এই স্থানে একটী সেতুর সাহায্যে কালী গঙ্গা পার হইয়া মন্দাকিনীর ধার দিয়া ৺কেদারের দিকে চলিতে লাগিলাম। কালী গঙ্গা হইতে কেদার পর্য্যন্ত পথ ক্রমাগত চড়াই করিতে হয়। এইরূপে আমরা ক্রমে গৌরীকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৌরীকুণ্ড একখানি ছোট গ্রাম। এখানে ৺কেদার নাথের পাণ্ডাদের বাটী ও অপর কয়েক জন লোকের বাস আছে। কেদারের পথে ইহাই শেষ গ্রাম, ইহার পর আর লোকের বাস নাই। এখানে গৌরীকুণ্ড বা তপ্তকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। জল খুব গরম। কুণ্ডের নিকটে উমা মহেশ্বরের মন্দির আছে। আমরা এই সকল দেখিয়া এখান হইতে কেদার নাথ যাত্রা করিলাম। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে কেদার ১৯ মাইল।

৺কেদার নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে—উত্তরাখণ্ডে ভগবান্ বিষ্ণু নরনারায়ণ রূপে লোকহিতার্থ যেখানে নিয়ত তপস্যা করিতেছেন, সেই বদরিকাশ্রমের নিকট কেদার নামক হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে। ভক্তবৎসল শিব, ভগবান্ নরনারায়ণ ও অপরাপর ঋষিদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, পার্থিব লিঙ্গে তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিতেন। একদা ভগবান্ শিব, তাঁহাদের পূজায় অতীব প্রসন্ন হইয়া, বলিলেন, "জগত আপনাদিগের তপস্যা বা অপর কাহারও পূজা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, কেননা, আপনারা পূর্ণকাম, তথাপি আপনারা আমার পূজা করিতেছেন। ইহাতে আমি আপনাদের উপর বিশেষরূপে প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ করুন।" ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে পর, নরনারায়ণ বলিলেন— "হে দেবদেব! যদি প্রসন্ন হইয়া বরদানে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে

দেবপ্রয়াগ, ভাগীরথী গঙ্গা ও অলকনন্দা নদীদ্বয়ের সঙ্গমে অবস্থিত। পাহাড়িরা নদী মাত্রকেই গঙ্গা বলে এবং যে স্থানেই দুই নদী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকেই প্রয়াগ বলে। দেবপ্রয়াগ, পাহাড়ের মধ্যে একটী ছোট সহর বা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহার এক অংশ—যথা, সঙ্গমস্থল, পাণ্ডাদের বাটী প্রভৃতি—স্বাধীন গড়োয়ালের এবং অপর অংশ—যথা, পোষ্ট আফিস, বাজার, থানা প্রভৃতি—বৃটিশ গড়োয়ালের অন্তর্ভুক্ত। অলকনন্দা নদী, বৃটিশ ও স্বাধীন গড়োয়ালের সীমা অর্থাৎ অলকনন্দার বাম পাড় বৃটিশ গড়োয়ালের এবং দক্ষিণ পাড় স্বাধীন গড়োয়ালের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্বাধীন গড়োয়াল টিহিরী রাজার এলাকাভুক্ত। আমরা, অলকনন্দার বাম পার্শ্বস্থ বদরিনারায়ণের রাস্তা ত্যাগ করিয়া, পাকা পোল দিয়া অলকনন্দা পার হইয়া সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলাম। এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দা-সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া সঙ্গমের উপরিস্থিত মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরটী পুরাতন। ভিতর স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কারশোভিত রামসীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। শুনিলাম এই মন্দিরের সমস্ত খরচপত্র টিহিরী রাজাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়। সঙ্গমস্থল হইতে অদূরে পর্ব্বতকোল পর্য্যন্ত খুব ঘন বসতি। বদরিনারায়ণের সমুদায় পাণ্ডাদের বাটী এই স্থানে। তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন চার শত হইবে। এখানকার দোকানে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। এখান হইতে টিহিরী যাইবার একটী রাস্তা আছে। এই সকল দেখিয়া পুনরায় উক্ত পুলের দ্বারায় অলকনন্দা পার হইয়া বদরিনারায়ণের রাস্তায় আসিলাম। এখান হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে ১৮ মাইল গমন করিয়া বৃটিশ গড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর সহর পাইলাম। পথে রাণীবাড়ি প্রভৃতি কয়েকটী চটি এবং একটী শিবমন্দির দেখিয়াছিলাম।

শ্রীনগর সহর অলকনন্দার পূর্ব্ব পারে, উত্তর দক্ষিণে লম্বাভাবে অবস্থিত। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে অলকনন্দাতীরে গড়োয়ালের স্বাধীন হিন্দু রাজাদিগের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা এই নগর লইবার পূর্ব্বে ইহা টিহিরীরাজের অধীন ছিল। তখন টিহিরী রাজা এই স্থানেই থাকিতেন। এ কারণ সমগ্র গড়োয়ালের তখন ইহাই রাজধানী ছিল। ভগ্ন রাজবাটী খুব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্য্যখচিত। ইহা স্বাধীন গড়োয়ালরাজ্যের অস্তমিত গৌরবের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা এই পাহাড়ের আর কোথাও দেখা যায় না। এখন এই বাটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বাটীর পার্শ্বেই একটী মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া

আছে। বাজারের পথটী পাথরে বাঁধান ও বেশ প্রশস্ত, ইহার দুই দিকে নানা-বিধ দ্রব্যের দোকান। এই বাজার বা চকের সম্মুখেই নহবতখানা। শ্রীনগরের বাজারে সর্ব্বদা সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। পাহাড়ের চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূর পর্য্যন্ত গ্রামের দোকানদার ও মহাজনেরা এই স্থান হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া লইয়া যায়। সহরে বিস্তর লোকের বসবাস। এখানে মাইনর স্কুল, সরকারি হাঁস-পাতাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি আছে। ইহা বৃটিশ গড়োয়ালের হেড কোয়ার্টার, এখান হইতে ৬ মাইল দূরে পাউড়ীতে সরকারি আফিসসমূহ ও আদালত আছে। শ্রীনগরে কেদারনাথ কমলেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি কয়েকটী শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে কমলেশ্বর মন্দির বা মঠই প্রধান। আউদ রোহিলখণ্ড রেলের নাজিবাবাদ (Najibabad) জংশন হইয়া, কড্‌ওয়ারা (Katdwara) ষ্টেশন হইতে লেন্‌সডোন (Lansdowne) ছাউনির নিকট দিয়া, এক পার্ব্বত্য পথ শ্রীনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শুনিলাম, এই পথে ২।৩ দিনেই শ্রীনগর আসা যায়। শ্রীনগরের অধিকাংশ অধিবাসীই শিক্ষিত ও সভ্য। উঁহাদের অনেকেই আবার সরকারি কর্ম্মচারী। এখানে সংস্কৃত বিদ্যারও বেশ আলোচনা আছে।

শ্রীনগর হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে প্রায় ২২ মাইল যাইলে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছান যায়। এখানে ৺কেদার নাথ হইতে মন্দাকিনী আসিয়া অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন। কেদারবদরিনারায়ণের পথে যে, দেবপ্রয়াগ, রুদ্র-প্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও কর্ণপ্রয়াগ নামে পঞ্চ প্রয়াগ আছে, তন্মধ্যে ইহাই দ্বিতীয় প্রয়াগ। শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ আসিতে খাড়ি চটি প্রভৃতি কয়েকটী চটি দেখিলাম। এই স্থানে অলকনন্দার বাম তট দিয়া যে রাস্তা বরাবর বদরিনারায়ণ গিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া একটী পাকা সেতুর উপর দিয়া অলকনন্দা পার হইয়া সঙ্গমস্থানে আসিতে হয়। মন্দাকিনী ও অলকনন্দা সঙ্গমের নিকটেই ২।৩টী দেবমন্দির আছে। যাত্রীদিগকে এই স্থানে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও দেবদর্শন করিতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগ একটী চটি মাত্র। এখানে কেবল ২।৪ ঘর লোকের বসতি আছে।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে মন্দাকিনীর ধারে ধারে ২০ মাইল অগ্রসর হইয়া গুপ্ত-কাশী পাইলাম। পথে কয়েকটী চটি এবং অগস্ত্য মুনির আশ্রম নামে একখানি গ্রাম আছে। অগস্ত্য মুনির আশ্রমটী মন্দাকিনীর পার্শ্বেই অবস্থিত ও রমণীয়। এখানেও কয়েকটী দেবমন্দির আছে। প্রবাদ যে, এখানে অগস্ত্য মুনি কিছু

দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি বা অগস্ত্যাশ্রম হইতে গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত পথ চড়াই করিতে অর্থাৎ নিম্নপর্ব্বত হইতে উচ্চতর পর্ব্বতে উঠিতে হয়। যাহা হউক হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোনরূপে গুপ্তকাশীতে পৌঁছিয়া আমরা মন্দিরমধ্যস্থ ধরমশালায় বাসা লইলাম। গুপ্তকাশী মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীরস্থ একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এখান হইতে বহু নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর অপর পারে আর একটী উচ্চ পর্ব্বতের উপর ওখি মঠ বা উষামঠ প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে যাইতে হইলে মন্দাকিনী তীরে নদী পার হইবার পাকা সেতু আছে, শুনিলাম। গুপ্তকাশীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয়ে ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত কয়েকটী সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাঙ্গণস্থ দেবালয়ের সম্মুখে একটী চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান জলের কুণ্ড আছে। ইহাতে কৌশল পূর্ব্বক দুইটী শীতল জলের ধারা, দুইটী পিত্তল নির্ম্মিত পশুমুখ দিয়া, প্রবাহিত করা হইয়াছে। যাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসিগণ এই জল স্নান ও রন্ধনাদির জন্য ব্যবহার করে। মন্দিরসংলগ্ন কাপড়ের দোকান, হালুইকরের দোকান প্রভৃতি অনেকগুলি দোকান আছে। গুপ্তকাশীতে প্রায় ৩০।৪০ ঘর লোকের বাস।

আমরা গুপ্তকাশী হইতে বাহির হইয়া, ৺কেদার নাথের রাস্তায় ২২ মাইল গিয়া ত্রিযুগীনারায়ণে উপস্থিত হইলাম। এই পথে কয়েকটী চটি আছে, তাহার মধ্যে ফাটা চটিটি বেশ বড়। এখানে অনেকগুলি পাকা বাটী আছে। ৺কেদারের পথে ত্রিযুগীনারায়ণ বেশ বড় গ্রাম। ইহা অত্যুচ্চ প্রশস্ত সমতল এক পর্ব্বতমস্তকে প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। ঐ পর্ব্বতমালার উপরিভাগ শুভ্রতুষারমণ্ডিত এবং নিম্নভাগ হরিৎবর্ণের বৃক্ষসমূহে ঘন আচ্ছাদিত। এই গ্রামে অনেকগুলি ধরমশালা এবং সকল দ্রব্যের দোকান, এমন কি সেক্রার দোকান পর্য্যন্তও আছে। এখানে অনেক লোকের বাস—ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ ত্রিযুগীনারায়ণের পাণ্ডা ও পূজারী। যাত্রীপ্রদত্ত দানই ইহাদের উপজীবিকা। এখানে সকল সময়েই শীতের তীব্রতা অনুভূত হয়। ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরের বর্হিভাগে দুই দিকে দুইটী পাথরে বাঁধান কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে যাত্রীদের স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। কুণ্ডের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। কুণ্ডে স্নান করিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটী চতুর্দ্দিকে পাথরে গাঁথা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত রহিয়াছে। শুনিলাম, ঐ অগ্নি সাক্ষী করিয়া হরপার্ব্বতীর পরিণয় হয়, তদবধি এই অগ্নিকুণ্ডে তিন যুগ

যাবৎ অগ্নি জ্বলিতেছে। মোটা মোটা কাষ্ঠখানি কাষ্ঠ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে জ্বলিতেছে। যাত্রীদিগকে এই অগ্নিকুণ্ডে জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠ খরিদ করিয়া দিতে হয়। মন্দিরের ভিতরকার ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, ইহারই নাম ত্রিযুগীনারায়ণ। পার্শ্বে বদ্রীনাথজী, রামচন্দ্রজী, ছত্রপাল ভৈরব, গনেশ, মহাদেব, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি মূর্ত্তি বিরাজিত।

ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করিয়া আমরা, এখান হইতে অন্য একটী রাস্তা দিয়া এক মাইল আসিয়া, সোমপ্রয়াগ চটির নিকট পূর্ব্বোক্ত কেদার যাইবার রাস্তায় পৌঁছিলাম। এখানে কালী গঙ্গা আসিয়া মন্দাকিনীতে মিলিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে অন্যতম নহে। সঙ্গমস্থলে যাইতে হইলে এই রাস্তা হইতে অনেক দূর নীচে নামিতে হয়। আমরা সঙ্গমস্থলে না যাইয়া এই স্থানে একটী সেতুর সাহায্যে কালী গঙ্গা পার হইয়া মন্দাকিনীর ধার দিয়া ৺কেদারের দিকে চলিতে লাগিলাম। কালী গঙ্গা হইতে কেদার পর্য্যন্ত পথ ক্রমাগত চড়াই করিতে হয়। এইরূপে আমরা ক্রমে গৌরীকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৌরীকুণ্ড একখানি ছোট গ্রাম। এখানে ৺কেদার নাথের পাণ্ডাদের বাটী ও অপর কয়েক জন লোকের বাস আছে। কেদারের পথে ইহাই শেষ গ্রাম, ইহার পর আর লোকের বাস নাই। এখানে গৌরীকুণ্ড বা তপ্তকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। জল খুব গরম। কুণ্ডের নিকটে উমা মহেশ্বরের মন্দির আছে। আমরা এই সকল দেখিয়া এখান হইতে কেদার নাথ যাত্রা করিলাম। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে কেদার ১৯ মাইল।

৺কেদার নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে—উত্তরাখণ্ডে ভগবান্ বিষ্ণু নরনারায়ণ রূপে লোকহিতার্থ যেখানে নিরত তপস্যা করিতেছেন, সেই বদরিকাশ্রমের নিকট কেদার নামক হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আছে। ভক্তবৎসল শিব, ভগবান্ নরনারায়ণ ও অপরাপর ঋষিদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, পার্থিব লিঙ্গে তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিতেন। একদা ভগবান্ শিব, তাঁহাদের পূজায় অতীব প্রসন্ন হইয়া, বলিলেন, "জগতে আপনাদিগের তপস্যা বা অপর কাহারও পূজা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, কেননা, আপনারা পূর্ণকাম, তথাপি আপনারা আমার পূজা করিতেছেন। ইহাতে আমি আপনাদের উপর বিশেষরূপে প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ করুন।" ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে পর, নরনারায়ণ বলিলেন— "হে দেবদেব! যদি প্রসন্ন হইয়া বরদানে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে

সকলে যাহাতে অদ্যাবধি আপনার পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারে, তাহাই করুন, স্বীয় জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে এই স্থানে সর্ব্বকাল স্বয়ং অবস্থান করুন।" তাঁহারা এই বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শঙ্কর, 'তথাস্তু' বলিয়া, তদবধি সেই কেদার নামক হিমালয় শৃঙ্গে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে বহুজনহিতায় সর্ব্বকালের নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও সনাতন ঋষিগণও তদবধি বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

৺কেদার নাথ মন্দাকিনীর বাম তটে একটী চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতকোলে খানিকটা সমতল ঢালু জায়গার উপর অবস্থিত। মন্দাকিনীর দক্ষিণ পারে অর্থাৎ পশ্চিমদিকেও একটী উচ্চ তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত আছে। সম্মুখের বা উত্তর দিকের পর্ব্বতও তুষারাচ্ছন্ন এবং উহার মধ্য দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইয়া আসিতেছে। কেদারের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। যাহা দেখিয়াছি—সেই অনন্ত গাম্ভীর্য্যময় প্রকৃতির সৌম্য কঠোর মূর্ত্তি—তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। এই স্থানে আসিয়া উহা দর্শন করা ভিন্ন, উহার উপমা দিবার সংসারে কিছুই নাই। এখানে ধরমশালা, সদাব্রত এবং কয়েকটী দোকান আছে। জ্বালানি কাষ্ঠ এখানে বড়ই দুষ্প্রাপ্য, শীতও হাড় ভাঙ্গা। গৌরীকুণ্ড হইতে একটী পাণ্ডা আমাদের সহিত আসিয়াছিল। তাহার সাহায্যে প্রথমে আমরা মন্দাকিনীতে যাইয়া স্নান শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিয়া আসিলাম। তর্পণ করিবার সময় যেন হাতের আঙ্গুল খসিয়া যাইতে লাগিল। স্নানান্তে আমরা ৺কেদার নাথের দর্শনাভিলাষে মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরটী পাথরে নির্ম্মিত, উচ্চ ও বেশ প্রশস্ত, মন্দিরের উপরে সোণার কলস আছে। জানিলাম—এই মন্দিরটী অমরসিংহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের ভিতর কাল পাথরের ৺কেদার নাথ লিঙ্গ বিরাজমান। উক্ত লিঙ্গের উচ্চতা ২ হাত ও বেড় ৯ হাত হইবে। আকার—ষাঁড়ের পৃষ্ঠদেশস্থ ককুদের ন্যায়। কেদার নাথের মাথার উপর সোণার ছাতা টাঙ্গান আছে এবং আশাসোঁটা ও পূজার পাত্রাদি সকলই সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত। আমরা ৺কেদার নাথের গায়ে ঘৃত মাখাইয়া মন্দাকিনীর জলে স্নান করাইয়া দিলাম। পরে পাণ্ডার সাহায্যে পূজাদি করিয়া, মন্দিরমধ্যস্থ অপরাপর দেবদেবী দর্শনান্তে মন্দিরের বাহিরে কয়েকটী কুণ্ড ও দেবদেবী দর্শন করিলাম। ৺কেদার নাথের মন্দির ও উহার বাহিরে এক মাইলের মধ্যে এই কয়টী দেবদেবী ও তীর্থ আছে, যথা:—কেদার নাথ, উদয়কুণ্ড, নিশানকুণ্ড, অমৃত-কুণ্ড, রেতকুণ্ড, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, পঞ্চপাণ্ডব, দুধেশ্বর মহাদেব, হনুমান, গনেশ,

গরুডজী, পিতল ও পাথরের নন্দী, কৃষ্ণ ভগবান্, চুকুণ্ডা ভৈরব, হংসকুণ্ড, মন্দাকিনী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা। ৺কেদার নাথ হইতে উত্তর দিকের পর্ব্বতে (অর্থাৎ যে পর্ব্বতমধ্য হইতে মন্দাকিনী নির্গত হইয়া আসিতেছে) ২।৩ মাইল যাইলে "বাসুকী তলাও" নামক কুণ্ডে "মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থান" ও "মহা প্রস্থান" দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, ইহাই মহা প্রস্থানের পথ—এই পথেই মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহা প্রস্থানের পথের শেষে একটী খুব ঢালু চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগাত্র আছে—উহাকে ভৈরব ঝম্প কহে। পূর্ব্বে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিবার জন্য ভৈরব ঝম্প বা উক্ত ঢালু দিয়া নিচের বরফময় স্থানে নামিয়া যাইতেন। নিচে হইতে অত্যন্ত খাড়াই হেতু আর উঠিতে না পারায় এ স্থানেই প্রাণত্যাগ করিতেন। এ কারণ এখন গবর্ণমেণ্ট এদিকে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম যে, কেদার হইতে চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বদরিনারায়ণ পর্য্যন্ত একটী পথ আছে। এই পথে বদরিনারায়ণ খুব নিকট। কথিত আছে, পুরাকালে ঐ পথ দিয়া লোকে যাতায়াত করিতে পারিত এবং পূজারিগণ ৺কেদার নাথের পূজা করিয়া ঐ পথ দিয়া গমন করিয়া, সেই দিবসই বদরিকাশ্রমে গমন করতঃ নারায়ণের পূজা করিত। এখন ঐ পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ কিম্বদন্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। কারণ যথার্থই কেদারের ২৫ মাইল পূর্ব্ব দিকে বদরিনারায়ণ অবস্থিত, কিন্তু মধ্যে অনুল্লঙ্ঘনীয় তুষারকিরীটী পর্ব্বত ব্যবধান থাকায়, ১২০ মাইল পথ ঘুরিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হয়। ৺কেদার নাথে রাত্রে আরতির খুব ধুমধাম হয়। আমরা এখানে এক দিবা রাত্র মাত্র থাকিয়া, দারুণ শীতের প্রকোপে অধিককাল থাকা বিধেয় নয় ভাবিয়া, পর দিনই এখান হইতে বদরিনারায়ণ দেখিবার জন্য গুথি মঠে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার।*

(যুবকদিগের প্রতি)

[শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।]

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আজ সর্ব্বত্রই আলোচিত হইতেছে। সকলেই এই অবস্থা অপনোদন করিবার জন্য নানা উপায় স্থির করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তবুও সময়ে সময়ে আমাদের প্রকৃত অবস্থার কথা ভুলিয়া যাই। দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বদা মনে জাগরুক না থাকিলে, অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না, প্রতিকূল ভাগ্যচক্রের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আসে না। মদ্য-পানাসক্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত পানদোষে ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়; পানদোষ ত্যাগে ব্যাধিমুক্ত হওয়া সম্ভব—বেশ বোঝে, কিন্তু পরক্ষণেই মদিরার ক্ষণিক উত্তেজনার আনন্দ আস্বাদ করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় না—চিকিৎসকের শত নিষেধ উপেক্ষা করে—খোঁয়ারির অসহ্য যন্ত্রণা পুনরায় ভোগ করে। রিপুর তাড়নায়ও মানুষকে ঠিক এইরূপ অবস্থাগত দেখিতে পাওয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুচালিত হইয়া আমরা কতই না সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হই! সকলেই বোঝে, রিপুর বশীভূত হওয়ায় পদে পদে বিপদ, কিন্তু রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে কয়জন? রূপরসাদি বিষয়ের এমনই মোহিনী শক্তি যে, পূর্ব্বেকার সকল কষ্ট ভুলাইয়া দেয়, চিন্তাশক্তির লোপ করে এবং ইন্দ্রিয়নিচয়কে উত্তেজিত করিয়া পুনঃ পুনঃ মানবকে কুকর্ম্মে রত করে। এজন্য বাসনা প্রবল হইলে মন কোন বস্তুর স্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে না; রিপুর মোহিনী বেশ, তাহাকে ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা ভুলাইয়া দেয়। তাই আমাদের বিচার করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের প্রকৃত অবস্থার কথা আমাদের মনে থাকিতেছে কিম্বা ভুলিয়া যাইতেছি। যন্ত্রণার সময় ছটফট করা যেমন স্বাভাবিক, যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া যাওয়াও সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু সেই ভাগ্যবান্, যাহার সকল অবস্থার কথা স্মরণ থাকে। সংসারক্ষেত্রে তিনিই মানুষ, যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল প্রকার অবস্থার কথা মনে রাখিতে পারেন এবং ঐ সকলের মধ্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যৎ গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লন। এ কর্ম্মক্ষেত্রে

* এই প্রবন্ধ কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়।

তিনিই বাস্তবিক কর্ম্মী, যিনি নানা বিপদপাতেও আত্মহারা না হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ধীর স্থির অটলভাবে আপনার সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। এখানে তাঁহারই সাধনা সফল হয়, যিনি প্রতিকূল অবস্থার ভ্রুকুটিভঙ্গে কদাচ লক্ষভ্রষ্ট হন না। সে জন্য আমাদের বার বার দেখা উচিত যে, আমরা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মহারা হইয়া চলিয়াছি, অথবা স্থির লক্ষ্যের দিকে নিজ নিজ জীবন চালিত করিতেছি। কারণ, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে ও তাহা সর্ব্বদা মনে থাকিলে আমাদের লক্ষ্যহারা হওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারাও বড় সোজা নহে। অভিমানী মন স্বীয় দুর্ব্বলতা ক্রমাগত ঢাকিতেই চেষ্টা করে —ঐ দুর্ব্বলতাকে সততার আবরণে ঢাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে রাখিবার যত্ন করে। কাজেই আমাদেরও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন, নচেৎ ভুলক্রমেও দুর্ব্বলতা প্রশ্রয় পাইলে যথার্থ উন্নতির উপায় সুদূরপরাহত হইবে। সে জন্য মনে সন্দেহ হয়—আমরাও মোহান্ধকারে পতিত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা দেখিতে পাইতেছি না, এমন তো নয়? অথবা নিজ অবস্থার অজ্ঞানতার জন্যই সকল কার্য্যে বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহা তো নয়? কারণ দেখিতে পাই—কিসে প্রকৃত মঙ্গল হয়, কি রূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমাদের দেশে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করে, ইহা যে এখনও বাক্‌বিতণ্ডার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, এখনও পর্য্যন্ত কোন্ পথ অবলম্বন শ্রেয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। কাহারও মত—পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে আসিয়া আমাদের কত উন্নতি করিয়াছে। আমরা নূতন নূতন আচার ব্যবহার শিখিয়াছি, ইংরাজী ঢৌলে সভা সমিতি করিতে শিখিয়াছি, ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশের লোকের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি—এ সকল উন্নতির লক্ষণ নহে কি? কেহ বলিবেন—এখন আমরা রাজনীতির চর্চ্চা করিতে শিখিয়াছি, প্রজাশক্তির প্রাধান্যস্থাপনের জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই সকল ভাব কি আমাদের জাতীয় জীবনে লাভ নহে? এ সকল ভাব কি পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ছিল? আবার অনেকে বলিবেন—এখন আমরা আমাদের শিল্পোন্নতির জন্য প্রাণপণ করিতেছি, দেশীয় বাণিজ্য পুনঃস্থাপনের জন্য কত স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত—ইহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে যে, আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি? সত্য বটে, আমাদের নানা বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা হইতেছে এবং নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জাতীয় জীবন উৎকৃষ্টতর করিবার একটা ভাব দেখা যাইতেছে, সত্য বটে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মশীল হইতেছি এবং জড়ভাব পরিত্যাগ করিতে

সকলে যাহাতে অদ্যাবধি আপনার পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারে, তাহাই করুন, স্বীয় জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে এই স্থানে সর্ব্বকাল স্বয়ং অবস্থান করুন।" তাঁহারা এই বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শঙ্কর, 'তথাস্তু' বলিযা, তদবধি সেই কেদার নামক হিমালয় শৃঙ্গে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তিতে বহুজনহিতায় সর্ব্বকালের নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও সনাতন ঋষিগণও তদবধি বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

৺কেদার নাথ মন্দাকিনীর বাম তটে একটী চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতকোলে খানিকটা সমতল ঢালু জায়গার উপর অবস্থিত। মন্দাকিনীর দক্ষিণ পারে অর্থাৎ পশ্চিমদিকেও একটী উচ্চ তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত আছে। সম্মুখের বা উত্তর দিকের পর্ব্বতও তুষারাচ্ছন্ন এবং উহার মধ্য দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইয়া আসিতেছে। কেদারের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। যাহা দেখিযাছি—সেই অনন্ত গাম্ভীর্য্যময় প্রকৃতির সৌম্য কঠোর মূর্ত্তি—তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। এই স্থানে আসিয়া উহা দর্শন করা ভিন্ন, উহার উপমা দিবার সংসারে কিছুই নাই। এখানে ধরমশালা, সদাব্রত এবং কয়েকটী দোকান আছে। জ্বালানি কাষ্ঠ এখানে বড়ই দুষ্প্রাপ্য, শীতও হাড় ভাঙ্গা। গৌরীকুণ্ড হইতে একটী পাণ্ডা আমাদের সহিত আসিয়াছিল। তাহার সাহায্যে প্রথমে আমরা মন্দাকিনীতে যাইয়া স্নান শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করিয়া আসিলাম। তর্পণ করিবার সময় যেন হাতের আঙ্গুল খসিয়া যাইতে লাগিল। স্নানান্তে আমরা ৺কেদার নাথের দর্শনাভিলাষে মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরটী পাথরে নির্ম্মিত, উচ্চ ও বেশ প্রশস্ত; মন্দিরের উপরে সোণার কলস আছে। জানিলাম—এই মন্দিরটী অমরসিংহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের ভিতর কাল পাথরের ৺কেদার নাথ লিঙ্গ বিরাজমান। উক্ত লিঙ্গের উচ্চতা ২ হাত ও বেড় ৯ হাত হইবে। আকার—ষাঁড়ের পৃষ্ঠদেশস্থ ককুদের ন্যায়। কেদার নাথের মাথার উপর সোণার ছাতা টাঙ্গান আছে এবং আশাসোঁটা ও পূজার পাত্রাদি সকলই সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত। আমরা ৺কেদার নাথের গায়ে ঘৃত মাখাইয়া মন্দাকিনীর জলে স্নান করাইয়া দিলাম। পরে পাণ্ডার সাহায্যে পূজাদি করিয়া, মন্দিরমধ্যস্থ অপরাপর দেবদেবী দর্শনান্তে মন্দিরের বাহিরে কয়েকটী কুণ্ড ও দেবদেবী দর্শন করিলাম। ৺কেদার নাথের মন্দির ও উহার বাহিরে এক মাইলের মধ্যে এই কয়টী দেবদেবী ও তীর্থ আছে, যথা :—কেদার নাথ, উদয়কুণ্ড, নিশানকুণ্ড, অমৃত-কুণ্ড, রেতকুণ্ড, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, পঞ্চপাণ্ডব, দুধেশ্বর মহাদেব, হনুমান, গনেশ,

গরুড়জী, পিতল ও পাথরের নন্দী, কৃষ্ণ ভগবান্, চুকুণ্ডা ভৈরব, হংসকুণ্ড, মন্দাকিনী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা। ৺কেদার নাথ হইতে উত্তর দিকের পর্ব্বতে (অর্থাৎ যে পর্ব্বতমধ্য হইতে মন্দাকিনী নির্গত হইয়া আসিতেছে) ২।৩ মাইল যাইলে, "বাসুকী তলাও" নামক কুণ্ডে "মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থান" ও "মহা প্রস্থান" দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, ইহাই মহা প্রস্থানের পথ—এই পথেই মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহা প্রস্থানের পথের শেষে একটী খুব ঢালু চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগাত্র আছে—উহাকে ভৈরব ঝম্প কহে। পূর্ব্বে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিবার জন্য ভৈরব ঝম্প বা উক্ত ঢালু দিয়া নিচের বরফময় স্থানে নামিয়া যাইতেন। নিচে হইতে অত্যন্ত খাড়াই হেতু আর উঠিতে না পারায় এ স্থানেই প্রাণত্যাগ করিতেন। এ কারণ এখন গবর্ণমেণ্ট এদিকে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম যে, কেদার হইতে চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বদরিনারায়ণ পর্য্যন্ত একটী পথ আছে। এই পথে বদরিনারায়ণ খুব নিকট। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে ঐ পথ দিয়া লোকে যাতায়াত করিতে পারিত এবং পূজারিগণ ৺কেদার নাথের পূজা করিয়া ঐ পথ দিয়া গমন করিয়া, সেই দিবসই বদরিকাশ্রমে গমন করতঃ নারায়ণের পূজা করিত। এখন ঐ পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ কিম্বদন্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। কারণ যথার্থই কেদারের ২৫ মাইল পূর্ব্ব দিকে বদরিনারায়ণ অবস্থিত, কিন্তু মধ্যে অনুল্লঙ্ঘনীয় তুষারকিরীটী পর্ব্বত ব্যবধান থাকায়, ১২০ মাইল পথ ঘুরিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হয়। ৺কেদার নাথে রাত্রে আরতির খুব ধুমধাম হয়। আমরা এখানে এক দিবা রাত্র মাত্র থাকিয়া, দারুণ শীতের প্রকোপে অধিককাল থাকা বিধেয় নয় ভাবিয়া, পর দিনই এখান হইতে বদরিনারায়ণ দেখিবার জন্য উখি মঠে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার।*

(যুবকদিগের প্রতি)

[শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।]

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আজ সর্ব্বত্রই আলোচিত হইতেছে। সকলেই এই অবস্থা অপনোদন করিবার জন্য নানা উপায় স্থির করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তবুও সময়ে সময়ে আমাদের প্রকৃত অবস্থার কথা ভুলিয়া যাই। দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বদা মনে জাগরুক না থাকিলে, অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না, প্রতিকূল ভাগ্যচক্রের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প আসে না। মদ্য-পানাসক্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত পানদোষে ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়; পানদোষ ত্যাগে ব্যাধিমুক্ত হওয়া সম্ভব—বেশ বোঝে, কিন্তু পরক্ষণেই মদিরার ক্ষণিক উত্তেজনার আনন্দ আস্বাদ করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় না—চিকিৎসকের শত নিষেধ উপেক্ষা করে—খোঁয়ারির অসহ্য যন্ত্রণা পুনরায় ভোগ করে। রিপুর তাড়নায়ও মানুষকে ঠিক এইরূপ অবস্থাগত দেখিতে পাওয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুচালিত হইয়া আমরা কতই না সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হই! সকলেই বোঝে, রিপুর বশীভূত হওয়ায় পদে পদে বিপদ, কিন্তু রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে কয়জন? রূপরসাদি বিষয়ের এমনই মোহিনী শক্তি যে, পূর্ব্বেকার সকল কষ্ট ভুলাইয়া দেয়, চিন্তাশক্তির লোপ করে এবং ইন্দ্রিয়নিচয়কে উত্তেজিত করিয়া পুনঃ পুনঃ মানবকে কুকর্ম্মে রত করে। এজন্য বাসনা প্রবল হইলে মন কোন বস্তুর স্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে না; রিপুর মোহিনী বেশ, তাহাকে ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা ভুলাইয়া দেয়। তাই আমাদের বিচার করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের প্রকৃত অবস্থার কথা আমাদের মনে থাকিতেছে কিম্বা ভুলিয়া যাইতেছি। যন্ত্রণার সময় ছটফট করা যেমন স্বাভাবিক, যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া যাওয়াও সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু সেই ভাগ্যবান্, যাহার সকল অবস্থার কথা স্মরণ থাকে। সংসারক্ষেত্রে তিনিই মানুষ, যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল প্রকার অবস্থার কথা মনে রাখিতে পারেন এবং ঐ সকলের মধ্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যৎ গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লন। এ কর্ম্মক্ষেত্রে

---

* এই প্রবন্ধ কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়।

তিনিই বাস্তবিক কর্ম্মী, যিনি নানা বিপদপাতেও আত্মহারা না হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ধীর স্থির অটলভাবে আপনার সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। এখানে তাঁহারই সাধনা সফল হয়, যিনি প্রতিকূল অবস্থার ভ্রূকুটিভঙ্গে কদাচ লক্ষভ্রষ্ট হন না। সে জন্য আমাদের বার বার দেখা উচিত যে, আমরা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মহারা হইয়া চলিয়াছি, অথবা স্থির লক্ষ্যের দিকে নিজ নিজ জীবন চালিত করিতেছি। কারণ, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলে ও তাহা সর্ব্বদা মনে থাকিলে আমাদের লক্ষ্যহারা হওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারাও বড় সোজা নহে। অভিমানী মন স্বীয় দুর্ব্বলতা ক্রমাগত ঢাকিতেই চেষ্টা করে —ঐ দুর্ব্বলতাকে সত্তার আবরণে ঢাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে রাখিবার যত্ন করে। কাজেই আমাদেরও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন, নচেৎ ভুলক্রমেও দুর্ব্বলতা প্রশ্রয় পাইলে যথার্থ উন্নতির উপায় সুদূরপরাহত হইবে। সে জন্য মনে সন্দেহ হয়—আমরাও মোহান্ধকারে পতিত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা দেখিতে পাইতেছি না, এমন তো নয়? অথবা নিজ অবস্থার অজ্ঞানতার জন্যই সকল কার্য্যে বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, ইহা তো নয়? কারণ দেখিতে পাই—কিসে প্রকৃত মঙ্গল হয়, কিরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমাদের দেশে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করে, ইহা যে এখনও বাকবিতণ্ডার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, এখনও পর্য্যন্ত কোন্ পথ অবলম্বন শ্রেয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। কাহারও মত—পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশে আসিয়া আমাদের কত উন্নতি করিয়াছে। আমরা নূতন নূতন আচার ব্যবহার শিখিয়াছি, ইংরাজী ঢৌলে সভা সমিতি করিতে শিখিয়াছি, ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশের লোকের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি—এ সকল উন্নতির লক্ষণ নহে কি? কেহ বলিবেন—এখন আমরা রাজনীতির চর্চ্চা করিতে শিখিয়াছি, প্রজাশক্তির প্রাধান্যস্থাপনের জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই সকল ভাব কি আমাদের জাতীয় জীবনে লাভ নহে? এ সকল ভাব কি পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ছিল? আবার অনেকে বলিবেন—এখন আমরা আমাদের শিল্পোন্নতির জন্য প্রাণপণ করিতেছি, দেশীয় বাণিজ্য পুনঃস্থাপনের জন্য কত স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত—ইহাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নহে যে, আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি? সত্য বটে, আমাদের নানা বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা হইতেছে এবং নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জাতীয় জীবন উৎকৃষ্টতর করিবার একটা ভাব দেখা যাইতেছে, সত্য বটে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মশীল হইতেছি এবং জড়ভাব পরিত্যাগ করিতে

মহোৎসাহে চেষ্টা করিতেছি, সত্য বটে, আজ আমরা সমগ্র ভারত জুড়িয়া একটা অখণ্ড জাতীয় ভাব ও জাতীয় মর্য্যাদার মর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি, এবং আমাদের সকলের প্রাণে যেন একটা নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত বোধ করিতেছি ; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আনন্দে অধীর হইয়া অন্য সকল আবশ্যকীয় বিষয়ে দৃষ্টিশূন্য থাকিব ? উন্নতির ঐ সকল বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়াই কি নিশ্চয় বোধ হয় যে, আমাদের এই আপাতঃদৃশ্যমান উন্নতির অবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ? কারণ না বুঝিয়া যদি কেবল অনুকরণ তৎপরতায় ঐ সকল লক্ষণ আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, আমরা উন্নতিবোধে মোহের হস্তে পড়িয়া রহিয়াছি এবং যদি প্রকৃত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে থাকে, তবে ঐ মোহের জাল আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, কপটতা একেবারে দূর করিতে হইবে ; তবেই আমরা তদ্বিষয়ক সত্যানুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইব এবং জাতীয়জীবনের যথার্থ তত্ত্ব একবার ঐরূপে বুঝিতে পারিলে উহা কার্য্যে পরিণত করিতেও সক্ষম হইব, সন্দেহ নাই। তবে আসুন, আজ মনের কপাট খুলিয়া, আমরা সরল প্রাণে আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সব ভাত সুপক্ক হইয়াছে কি না।" এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও আমাদের ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান অবস্থার অভ্যন্তরীণ দোষ-গুণরাজি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা বিশাল ভারতের বিশাল সমাজশরীর নানা খণ্ড খণ্ড সমাজের সমষ্টি—উহাদের প্রত্যেকের উন্নতি অবনতির আলোচনা আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা সেজন্য আমাদের খণ্ড সমাজেরই উন্নতিসাধক কয়েকটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

বহির্দ্দৃষ্টি দূরে রাখিয়া আমাদের সমাজের এবং পরস্পরের জীবনের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়ে আশার আলো ফুটিয়া উঠে, কিম্বা নিরাশার অন্ধকার আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তাহাই এখন একটু স্থিরচিত্তে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাধারণ বাঙ্গালীর অবস্থা দিন দিন চাকরীমাত্র ভরসা হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং তাহাতেও কোন প্রকারে কেবলমাত্র প্রাণ ধারণ চলিতেছে। চাকরীশূন্য অবস্থায় পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে হয়। দশজনে একমন একপ্রাণ হইয়া বাণিজ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া কর্ম্মজীবনে কৃতকার্য্য হওয়া, এখনও কথার কথা হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থাপন্ন হইয়া কে কতদূর জাতির উন্নতিসাধন

করিতে সক্ষম? অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, সমবেত চেষ্টা নাই—কিসে আমরা মনুষ্যোচিত গর্ব্ব করিতে সক্ষম হইব? "আমি শ্রেষ্ঠ"—একথা জোর করিয়া বলিলেই ত আর শ্রেষ্ঠ হইব না। আমাকে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে, কার্য্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে হইবে, তবেই না অপরে অবনতমস্তকে আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে? নচেৎ শুধু বড়াই করিয়া বেড়াইলে কি ফল লাভ হইবে? আমাদের অবস্থা দেখিয়া পাশ্চাত্য জাতির মনে যে সকল ধারণার উদয় হয়, তাহা কি সম্পূর্ণ ভুল? ইউরোপবাসী আমাদের অবস্থা কিরূপ ভাবিয়া থাকেন, তৎ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আপনার ভূয়োদর্শন সহায়ে প্রত্যক্ষ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"ত্রিংশকোটী মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িতপ্রাণ, দাসসুলভপরিশ্রমসহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, যেন তেন প্রকারেণ বর্ত্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচচাতুরীপ্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বল-বানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আশাহীনের সমুচিত কদর্য্য-বিভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদণ্ড-হীন, পূতিগন্ধপূর্ণমাংসখণ্ড-ব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।" (—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।) অবশ্য ইহা "বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি" লোকের কথা। তত্রাচ স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়াই তাহারা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে এবং বাস্তবিক কি আমরা ঐ সকল দোষে কতকপরিমাণেও কলঙ্কিত নহি?

আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অদম্য উৎসাহ কই? পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি? পরস্পরের ঈর্ষা কত-পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছি? বলবানের পদলেহক না হইয়া চালাকি ছাড়িয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে কতদূর চেষ্টা করিতেছি? অধীনস্থ দুর্ব্বল ব্যক্তি, আমাদিগকে যমস্বরূপ না দেখিয়া, আশ্রয়দাতা, জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট অবলম্বনরূপে ভাবিয়া জুড়াইতেছে কি? আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ এই উচ্চভাববাজির পরিচয় প্রদান করে কি? ইহাই আমাদের বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়—এই চিন্তা যেন আমাদের উন্মাদ করিয়া তোলে। কতদূর শ্রদ্ধাবান্ হইতেছি, কতদূর দাসসুলভ ঈর্ষা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছি, স্বজনোন্নতি দেখিয়া কতদূর আনন্দে মগ্ন হইতে পারি, বীরের ন্যায় কতদূর উদ্যমশীল হইয়া আশাপূর্ণ নেত্রে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাই—এই সমস্ত দেখিয়াই বুঝিতে হইবে,

আমরা দিন দিন কত উন্নতি করিতেছি। নচেৎ বাক্য মাত্রে দিগ্বিজয় করিয়া জয়ডঙ্কারে উচ্চ নিনাদে বায়ু কম্পিত করিলে, দেশটিকে পাগলা গারদে দাঁড় করাইব।

হে উদ্‌যোগী যুবকসম্প্রদায, তোমাদেরই সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি, দেশটা দেখিয়াছ কি? সমাজের অবস্থা বেশ করিয়া বুঝিয়াছ কি? কোথায় কণ্টক ফুটিয়া দেশ ও সমাজশরীরকে যন্ত্রণার আগার করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? বুঝিয়াছ কি, কেন সমাজ নিস্পন্দ? কেন দেশের লোক আশাহীন, উদ্যমহীন, শ্রদ্ধাহীন, স্বার্থপরতার আধার হইয়া পড়িয়াছে—এ চিন্তা কখন করিয়াছ কি? জানিও, মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থায় মানুষ ভীরু বা বীর হয়, অবস্থায় মানুষ স্বদেশবৎসল বা দেশবৈরী হয়, অবস্থায় ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক রূপে পরিণত হয়, অবস্থায় প্রজাপালক বা প্রজাপীড়ক হইয়া দাঁড়ায়, অবস্থার মানুষকে যে কর্ম্মে উত্তেজনা করে মানুষ অবাধে তাহা সম্পন্ন করে এবং এই অবস্থা আমাদেরই সৃজিত। দূরদর্শিতার অভাবে আমরাই স্বকৃতবন্ধনে জড়িত হইয়া নানারূপ ফল ভোগ করি। সেরূপ প্রাতঃস্মরণীয় লোক কয়জন জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা, অবস্থার ভ্রুকুটিভঙ্গি অবহেলা করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া, আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যান? তেমন শক্তিমান্ পুরুষ কয়জন দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা, লৌকিক সামাজিক সকল প্রকার তাচ্ছিল্য ও অসুবিধা পদদলিত করিয়া, আপন গন্তব্যস্থলে যাইতে চেষ্টা করেন ও সফলকাম হন। তাই মনে হয়, কাহাকেও কোন মহৎ কার্য্যে উত্তেজনা করিবার সময় প্রথমে বুঝা উচিত, তাহার অবস্থা সেই কার্য্যসাধনের অনুকূল কি না। অবস্থা না বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে যাইলে, কেবল হটকারিতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। তাহাতে কার্য্যহানি হয়, কার্য্য সফল ত হয়ই না।

তাই বলি হে যুবক! তোমার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে, অপরকে তোমার বাঞ্ছিত সৎকার্য্যে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে, একবার বাঙ্গালীর সংসার বেশ করিয়া দেখিও। দেখিও, কি ভীষণ যন্ত্রণা ঘরে ঘরে বিদ্যমান। অন্নের সংস্থান কয়টি সংসারে আছে, তাহার খবর লইও। নিষ্ঠুর দেশাচারের অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া, কি মহাশ্মশানে বাঙ্গালীর গৃহ দিনে দিনে পরিণত হইতেছে, তাহা বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিও। ঐ দেখ, নিরন্ন যুবক, অতি সামান্য উপার্জ্জনমাত্রসহায়ে আনন্দে সাজসজ্জা পরিধান করিয়া, উদ্বাহবন্ধন গ্রহণ করিতে যাইতেছে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধর্ম্মযাজক সকলের আনন্দ দেখ, ভবিষ্যৎচিন্তাবিরহিত তাহাদের বিকট অট্টহাসি

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিও না। আজ বড় আনন্দ, বালকের বংশরক্ষার উপায় হইল! বংশ রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপালন করা হইবে এবং পুত্রমুখ দেখিয়া নরকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে! হায়! আমাদের ধর্ম্ম কি বাস্তবিক এতই নীচ কুসংস্কারপূর্ণ, এত মনুষ্যত্বহীনতার প্রশ্রয় দেয়? ধর্ম্ম কি মনুষ্যকে পিশাচ করিয়া তোলে, একেবারে দায়িত্বজ্ঞান শূন্য করে? তবে ত ইহা ধর্ম নয়, মহা অধর্ম্ম! তার পর দেখ নাই কি, বাঙ্গালীর সংসারে উপার্জ্জনশীল গৃহকর্ত্তা নয়ন মুদিলেই পুত্রপরিবার দশদিক্ শূন্যময় দেখে—কোনরূপ সম্বল নাই যে গ্রাসাচ্ছাদন চলে? দেখ নাই, ছুটি পেটের ভাতের জন্য তাহাদের লোকের দ্বারে দ্বারে দরখাস্ত হাতে করিয়া ঘুরিতে হয়? প্রতিনিয়তই ত এই ঘটনা ঘটিতেছে। যিনি সংসার স্থাপন করিলেন, তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই! তিনি চক্ষু বুজিলে পরিণীতা পত্নীর অবস্থা কি হইবে, এ ভাবনা তাঁহার নহে! পুত্রকন্যাগণকে জন্ম দিয়াই পিতার কার্য্য সমাধা হইল! 'সন্তানপালন' অর্থ কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা এই পর্য্যন্ত—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সংসারে কি করিয়া বালক আপনার উপায় করিতে সমর্থ হইবে, সে দুর্ভাবনা পিতার নহে! আর ভাবিয়াই বা কি করিবে উপায় কি আছে? ভাবিবার সামর্থ্য জন্মিবার পূর্ব্বেই যে, সমাজ তাহার গলে বিষম বন্ধন দিয়াছে। এখন কাজেই নিরুপায় দেখিয়া সে, হতাশ জীবনভার দীর্ঘশ্বাসমাত্র সম্বল লইয়া, বহন করিতে থাকে। জাগ্রৎ-স্বপনে স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গের কষ্ট দেখিয়া, দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহার জীয়ন্তে ত প্রত্যক্ষ নরকভোগ, অন্তে কি তা জগদম্বাই জানেন! কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ নিদারুণ শোকের ছবি অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না—অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কোন বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয় না। যিনি এইরূপ শেলসম যন্ত্রণা নিজে ভোগ করিতেছেন, যাহাতে অপরকে ঐরূপ দুঃখভোগ না করিতে হয়, সেজন্য তাহাদের সাবধান করিবার বিশেষ আগ্রহও তাঁহার দেখা যায় না। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, লজ্জায় ঘৃণায় হৃদয় শতধা হয়—এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থাপন্ন আমরাই আমাদিগকে নিত্য করিতেছি। আমরাই ঐরূপে মাতৃভূমির সহস্র কলঙ্কের সৃজনকর্ত্তা হইয়াছি ও আজও হইতেছি! আমরাই জন্মরোগী, উৎসাহহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য, লক্ষ লক্ষ নরনারীর ঐরূপে জন্মদাতা হইতেছি! আমরাই দেশের কলঙ্ক, সমাজের ঘৃণ্য ঐরূপ মানবকুলের অভিভাবক হইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি! এতই অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি যে, ইহার জন্য কিছুমাত্র অনুতপ্ত নহি, অনুতাপ আসিয়া যে ঐরূপ স্বকৃত পাপের কিছুমাত্র শান্তি করিবে, আমরা সে অবস্থারও

অধম হইয়া পড়িয়াছি! অনায়াসে মনকে প্রবোধ দিই—ঈশ্বর সব করিতেছেন, যার অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে, সকলেই আপন আপন অদৃষ্ট লইয়া পৃথিবীতে আসে, কে কাহার জন্য দায়ী! যে ঈশ্বরবিশ্বাস সাধনমার্গের শেষ অবস্থা, যে ঈশ্বর-নির্ভরতা আসিলে আর কোন অভাব থাকে না—আমাদের প্রতারক মন সেই অবস্থার ভাণ করিতে চাহে! কিন্তু ভাণ দেখানই হয়, যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি হয় না।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তসঙ্গে পুরুষকার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"ঐ পুরুষকারের জ্বালায়ই জ্বলিয়া মরিতেছি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"কুক্কুর শৃগালের পুরুষার্থকে পুরুষার্থ বলে না। পুরুষার্থ ছিল অর্জ্জুনের, যখন যাহা ইচ্ছা, তখন তাহাই করিতে বা করাইয়া লইতে পারিতেন।" বাস্তবিক অর্জ্জুনেরই যথার্থ ঈশ্বরনির্ভরতা ছিল। আমরা অবিশ্বাসী, হীনস্বার্থ-চালিত অন্তঃকরণ মোহের আবরণে ঢাকিয়া আপনাকে ভুলাইয়া ঈশ্বরের দোহাই দিই মাত্র। আমরা ভগবান্‌কে আহাম্মকের রাজা মনে করিয়া লই। ফলও তদ্রূপ হইয়াছে—শান্তি আমাদের সংসার হইতে দূরে পলাইয়াছে! এই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যতদিন না আমরা সরল পথে চলিতে শিখি, ততদিন কেহ বলিতে পারেন কি, আমাদের যথার্থ কল্যাণ সম্ভব? শরীরের ক্ষত স্থান চাপা দিয়া রাখিলে ক্রমশঃ পচ ধরিবে—উহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বুদ্ধিমান্ বোঝে, ক্ষতস্থানের সময়ে চিকিৎসা না করিলে, পরিণামে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আমরাও আর কতকাল আহাম্মকের ন্যায় গড্ডালিকাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চলিব? আমাদের প্রকৃত অবস্থা আমাদেরই বুঝিতে ও ধরিতে হইবে, উহার চিকিৎসা আমাদেরই হস্তে।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা স্বামীজি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহা জড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্ম্মা তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তোলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে,

তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?"(—ভাব্বার কথা।) স্বামীজির কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে। আমরা যেরূপ অবস্থায় পতিত —এ অবস্থায় থাকিয়া ঐ সকল দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে, কখন কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব কি? আমাদের এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। কার্য্য করিতে সক্ষম হইব, এরূপ অবস্থা আনয়ন করিতে হইবে। যদি তাহা পারি, তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে; নচেৎ ভারবাহী পশুর ন্যায় কালাতিপাত করিয়া, কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া যাইতেই হইবে। নাবালক অবস্থায়ই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ, পঞ্চদশায়ই সন্তানের জনক, সংসারে প্রবেশ করিয়াই উদরান্নের জন্য দশদিক্ শূণ্যময় দর্শন —এই না আমাদের অবস্থা? শুধু আপনার উদর নহে, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে না হইতেই একটি সংসার আমাদিগকে চালাইতে হয়! কাজেই এরূপ লোকের নিকট আর কতদূর আশা করা যায়? এরূপ লোকের আদর্শ, বর্ত্তমানে আর কি হইবে? দেশের উন্নতি না উদরপূর্ত্তি? ধর্ম্মের উজ্জ্বলাদর্শ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা, না উদরের জ্বালা নিবারণের চেষ্টা—কোন্ চেষ্টা আমাদের অগ্রে আসবে? যথাযথ কর্ত্তব্যসাধনে প্রয়াসী হওয়া, কিম্বা যেন তেন প্রকারেণ উদরান্নের সংস্থানে যত্নপর হওয়া—কোন্ দিকে আমাদের মন ছুটিবে? কে এমন মুখ আছে যে বলিবে, এরূপ অবস্থাপন্নের অন্নসংস্থান লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? কে এমন নিষ্ঠুর নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, আমাদিগের এ অবস্থায় এরূপ হিতোপদেশ দান করিবে যে, পুত্রপরিবার মরে মরুক, তোমার লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি অর্থোপার্জনপ্রবৃত্তি ত্যাগ কর? যদি কেহ থাকেন, তিনি সংসার দেখেন নাই; তিনি পৃথিবী কি নিয়মে চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। মানবমন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহার বাতুলতা এ কঠোর সংসারের কঠোর রাজ্যে চলিবে না। পূর্ণদ্রষ্টা স্বামীজি বলিয়াছেন—

'দেব', 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে! প্রেমের প্রেরণ!! (—বীরবাণী।)

যে সন্তান-প্রেমে জননী প্রাণদান করিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসার জ্বলন্ত ছবি সংসারে দেখান, স্বার্থপর দস্যুহৃদয়ে অপরকে হত্যা করিবার সময়ও সেই প্রেমই বিদ্যমান; কারণ, দস্যুও পত্নীপ্রেমে, সন্তানস্নেহে অপরের লুণ্ঠন করে। সেও আমাদের ন্যায় আপন পুত্রপরিবারের সুখসচ্ছন্দ অভিলাষী। বিধাতা তাহাকে মাতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি সদ্গুণ হইতে একেবারে বঞ্চিত করেন নাই।

কিন্তু কঠোর বিপরীত অবস্থার তাড়নায় সে সমাজের ঘৃণ্য দস্যু হইয়াছে। সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিয়াই ক্ষান্ত। কিন্তু অন্য উপায় না পাইলে সে করেই বা কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা অবস্থার দাস। অবস্থার ইঙ্গিতে আমরা সৎকার্য্য বা মন্দকার্য্য করিয়া থাকি। অনুকূল অবস্থায় সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সম্পন্ন করা যেমন সহজ, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিযা ঐরূপ করা তত সহজ নহে। যদি আমরা যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে ইচ্ছা করি, মনুষ্যত্বলাভ করিবার জন্য যদি যথার্থই আমাদের মন প্রাণ ধাবিত হইয়া থাকে, তবে অনুকূল অবস্থার সৃজন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। যে অবস্থাসহায়ে উচ্চভাববাজি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে পারিব ও দিন দিন আরও উন্নতি করিতে পারিব, সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি সমাজে অগ্রে করিতে হইবে। তাহা যদি পারি, তবেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাইতে ও সফলকাম হইতে পারিব। নতুবা কেবল সমালোচনা করিয়াই জীবনক্ষয় করিলে পরিণামে কি লাভ হইবে? অমুক ব্যক্তি এরূপ কেন করে, অমুকের এই করা উচিত ছিল, কেবলমাত্র ইত্যাকার বচনের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার হইবে না। তাহাতে আরও কপটতার বৃদ্ধি পাইবে, আরও আত্মগোপনপ্রয়াসপ্রবৃত্তি প্রবল হইবে, পরিণাম আরও ভীষণ হইবে। সংস্কারকের প্রধান কর্ত্তব্য, কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করা এবং পরে যাহাতে সেই অনিষ্টমূল কারণ দূর হয়, তাহার চেষ্টা করা। যিনি দেশের কল্যাণ চাহেন, যিনি সমাজের কল্যাণ চাহেন, যিনি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, অনিষ্টের মূল উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করা। হে উদ্যমশীল যুবক! ভবিষ্যৎ ভারত তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া আছে। অদ্যকার কার্য্য কল্যকার কারণ হইবে। অদ্যকার বালক তুমিই কয়েকবর্ষ পরে সংসারী হইবে এবং তোমারই আদর্শে ভবিষ্যৎ গঠিত হইতে চলিবে। বৃথা সময় অতিবাহিত করিযা আর কতদিন যাইবে? এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট পথ স্থির করিয়া না লইলে শেষে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখ, আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য কি? কেমন করিয়া আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিব? হে যুবক! তোমার নিরাশাব্যঞ্জক মুখছবি মুছিয়া ফেল, চতুর্দ্দিক্ তমসাচ্ছন্ন দেখিয়া হতাশ হইও না; ভাবিও না, হতাশ্বাস ভিন্ন আমাদের আর কিছুই নাই; মনে কখন স্থান দিও না, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে ঋষির বংশধরগণ ভগবানের কৃপাবঞ্চিত।

ক্রমশঃ।

হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভমেলা।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা।

হরিদ্বার, প্রযাগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এক একটী মহামেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই মেলায় ভারতের বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও সাধু সম্প্রদায় একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর ধর্ম্মচর্চ্চা, ভাব-বিনিময় এবং সংসারতাপিত অসংখ্য নরনারীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। প্রতি ছয় বৎসর অন্তর আবার অর্দ্ধকুম্ভ হইয়া থাকে। ইহাতেও কুম্ভের মত না হইলেও, অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রিগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এ বৎসর মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি হইতে হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভমেলা বসিয়াছে ও প্রায় এক মাসের উপর মেলা থাকিবে। বলা বাহুল্য, সাধু সন্ন্যাসী বা যাত্রিগণ পীড়িত হইলে, তাঁহাদের সেবার ভার সম্পূর্ণরূপেই কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উপর পড়িবে। কারণ, তথায় অন্যরূপ ভাল হাঁসপাতাল প্রভৃতির বন্দোবস্ত নাই বলিলেই চলে।

বিগত বর্ষাকালে পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানেই ভীষণ জ্বররোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহা সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন। হরিদ্বারও এই জ্বরের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় নাই। ঐ সময়ে কনখল সেবাশ্রমের সেবকগণ অসংখ্য রুগ্ন ও সাধু সন্ন্যাসী ও দরিদ্র নারায়ণগণের পরিচর্য্যা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে আশ্রমের ঔষধাদি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সাধারণের সাহায্য পাইয়াই সেবকগণ এতদিন সেবাকার্য্য-সাধনে সক্ষম হইযাছেন। এই আশ্রমের এখনও কোনও রূপ স্থায়ী ফণ্ড হয় নাই। যাহা কিছু মাসিক সাহায্য ও এককালীন দান পাওয়া যায়, তাহা মাসে মাসেই সেবাকার্য্যে ফুরাইয়া যায়, বিশেষ উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। সুতরাং এইরূপ প্রয়োজনের সময়-বিশেষে সাহায্য না করিলে সেবাকার্য্যের বিশেষ ক্রটী হইবে। হিন্দু কোনকালেই সাধুসেবায় কুণ্ঠিত নহেন, সুতরাং আমরা অসঙ্কুচিতচিত্তে সাধারণের নিকট উক্ত সেবাশ্রমের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সত্বর—স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ (সাহারাণপুর) ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শান্তি-সুধা।

['ব' লিখিত।]

পঞ্চম অধ্যায়।

সংসার-বিরাগ।
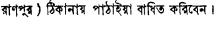
শিষ্য—সংসারের কাজ কর্ম্ম, অথবা সঞ্চয়।
সংসারীর কভুও কি উচিত না হয়?

রামকৃষ্ণ—'সংসারে থাকিব, তবু না রহিব কাজে'।
সংসারীর এই কথা কভু নাহি সাজে॥

পাখীরা ছানার তরে করিছে সঞ্চয়।
সংসারীর সঞ্চয়েতে দোষ নাহি হয়॥

শব-সাধকেরা সাথে রাখে ছোলা জল।
শবমুখে হয় দিতে হইলে চঞ্চল॥

রাখিও যোগাড় পত্নীপুত্র পালনের।
নতুবা নিতান্ত বিঘ্ন হ'বে সাধনের॥

মৌমাছি সঞ্চয় করে, মধু নেয় পরে।
ত্যাগী জন নিজ তরে সঞ্চয় না করে॥

পনরটা গাঁটওয়ালা সাধু যদি দেখ।
কদাপি তাহার প্রতি বিশ্বাস না রেখ॥

সঞ্চয় না করে 'পঞ্ছী আউর দরবেশ'।
মনে নাহি রাখে সাধু কামনার লেশ॥

শিষ্য—মায়ামোহময় প্রভো, এ বিশ্বসংসার।
কেমনে এসব হ'তে পাইব নিস্তার?

রামকৃষ্ণ—মায়াভূতগ্রস্ত যদি নিজে টের পায়।
অমনি ছাড়িয়া তারে সে ভূত পলায়॥

অন্ন ভৃত্য নাহি পেয়ে গুরু মহাশয়।
মুচি নিয়ে শিষ্যবাড়ী উপস্থিত হয়॥
ধরা পড়া মাত্র মুচি করে পলায়ন।
সংসারাসক্তের মনে মায়াও তেমন॥

অর্থে বস্ত্র, বিলাসিতা, ডাল ভাত হয়।
ভগবান্ লাভ এতে হবেনা নিশ্চয়॥
হাড়, মাংস, নাড়িভুঁড়ি, সুন্দরীর দেহে।
এই ভেবে মজিওনা কভু আর মোহে॥
এরূপ বিচারে মন ঈশ্বরেতে ধায়।
কামিনীকাঞ্চন'পরে আসক্তি পালায়॥

যে রঙে ছোপা'বে বস্ত্র সেই রঙ হ'বে।
সঙ্গ অনুসারে মন ভাল মন্দ র'বে॥

এক পাশে শিশু পুত্র আর পাশে পতি।
বাৎসল্য পুত্রের পরে, প্রেম পতি প্রতি॥

মনেতেই বদ্ধ জীব, মুক্ত সেই মনে।
মনস্থির হ'লে ভয় থাকেনা বন্ধনে॥
মন যদি ভাবে, 'আমি ঈশ্বরসন্তান।
বদ্ধ নই আমি কভু, মুক্ত মোর প্রাণ॥'
দৃঢ় ভাবে যদি ভাবে দিবায় নিশায়।
ভাবিতে ভাবিতে মন তাই হ'য়ে যায়॥

খৃষ্টানের পুঁথি মাঝে শুধু 'পাপ' 'পাপ'।
এই ভেবে কভু নাহি ঘুচে মনস্তাপ॥
'আমি বদ্ধ' 'আমি পাপী' বল বার বার।
'বদ্ধ পাপী' হ'য়ে রবে সন্দেহ কি তার॥
দৃঢ় ভাবে যদি ভাব 'আমি মুক্ত জীব'।
নিঃসন্দেহ হ'য়ে যা'বে ভ্রান্তিমুক্ত শিব॥
নাম নিয়ে এই কথা বল দৃঢ় ভাবে।
'নিয়েছি তাঁহার নাম, পাপ কেন র'বে?'

দৃঢ়তাব কাছে যায় টুটিযা বন্ধন।
ঈশ্ববেব নামে হয় মুক্ত ভক্তমন॥
এক ঘটি কাঁদে লোক মাগ ছেলে তরে।
ঈশ্বরেব তরে এক ফোঁটা নাহি ঝরে॥

বহু দিন ছিল বনে নির্জ্জন সাধক।
তাব পব সংসারেতে আসেন জনক॥

ফুটপাথে চারা গাছে বেড়া দিতে হয়।
বড় হইলে হাতী ঘোড়া তায় বাঁধা রয়॥
সংসারে প্রথম কিছু বসিবে নির্জ্জনে।
নতুবা অনেক বিঘ্ন হইবে সাধনে॥

কুমীর উপরে ভাসে, লোক তাড়নায়।
জলে ডুবে যায়, পুনঃ শরীব ভাসায়॥
মায়ায ডুবিয়া যাও পরিবাব টানে।
কিন্তু মাঝে মাঝে উঠে ডেকো তাঁবে প্রাণে॥

"মাগুব মাছেব ঝোল, যুবতী মেযেব কোল।
সব পাবি, আব পাপী, বল সদা হবিবোল॥"
এইরূপ প্রলোভনে যত সংসাবীকে টানি।
হরি বোল বলাইত নিত্যানন্দ গুণমণি॥
"মাগুর মাছেব ঝোল এই প্রেম অশ্রুধারা।
যুবতী মেয়েব কোল দেখ এই বসুন্ধরা॥
নাচ হরিবোল বলি বাহিরিবে অশ্রুজল।
দেও গড়াগড়ি প'ড়ে আছে পুণ্য ধবাতল॥"

ভিজা দেশলাই কাঠি কভু নাহি জ্বলে।
রহিলে বিষয় বুদ্ধি ঈশ্বর না মিলে॥

কাদামাখা ছুঁচ্‌টিরে চুম্বক না টানে।
ঈশ্বর না আসে কভু পাপময় প্রাণে॥
অনুতাপানলে যদি সব ধু'য়ে যায়।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রাণ তাঁর দেখা পায়॥

যতক্ষণ মাছ থাকে কাক পিছে ধায়।
মাছ ফেলে বসে চিল শান্তিতে শাখায় ॥

সংসারী লোকের হয় অশান্তি সতত।
সংসার ছাড়িলে প্রাণ শান্তি লভে কত ॥

সংসারে পাগল হয়ে তবে কেন রও ?
পাগল হইবে যদি তাঁর নামে হও ॥

ছুঁইলে পরশমণি লৌহ তরবার।
সোনা হয়, কারো নাহি করে অপকার ॥

যত সাবধান হও কাজলের ঘরে।
কিছু কালি অবশ্যই লাগে গাত্র' পরে ॥
যুবতী সমীপে যত হও সাবধান।
তথাপিও ভয়—হবে কলুষিত প্রাণ ॥
খই ভাজ, লাফিয়ে যা খোলা ছেড়ে যায়।
মল্লিকা ফুলের মত তাহা শোভা পায় ॥
খোলামাঝে যে সকল খই ভাজা হ'য়।
কোন কোন টার গায় লাল দাগ রয় ॥
তত্ত্বজ্ঞানী থাকে যদি মিশিয়া সংসারে।
তা'র মনে কিছু কিছু দাগ হ'তে পারে ॥
গুটি পোকা নাহি যায় নিজ বাসা ছেড়ে।
কোন কোন গুটি পোকা কেটে এসে পড়ে ॥
একটী চাষা'র ছিল আদরের ধন।
এক মাত্র ছেলে, তাঁর হইল মরণ ॥
এক ফোঁটা অশ্রু নাই চাষার নয়নে।
সবে জিজ্ঞাসিল "শোক ভুলিলে কেমনে ?"
চাষা বলে, "কাল রাতে দেখেছি স্বপন।
আমি রাজা সাত রাজপুত্রের মরণ ॥
কার তরে কাঁদি তাই বলনা আমায়।
সাত ছেলে তরে, কিম্বা ইহার মায়ায় ?"

জ্ঞানী দেখে জ্ঞাননেত্রে অনিত্য সংসার।
শোক দুঃখে কভু নাহি মন টলে তার॥

সোনা গালা শক্ত যদি পাঁচ বার জাকে।
সাধন কঠিন তার যে সংসারে থাকে॥

বহু নীচে যায় নর কামিনীর টানে।
যারে ভূতে পায় সেত ভূত নাহি জানে॥

হচ্ছে, হবে, সময়ত হয়নি এখন।
মন্দ বৈরাগ্যের হয় এইত লক্ষণ॥
তীব্র বৈরাগ্যেতে খুব ব্যাকুলতা হয়।
নিজ ছেলে তরে যথা মায়ের হৃদয়॥

অনাবৃষ্টি, খানা কেটে মাঠে আনে জল।
কৃষকের একমাত্র ইহাই সম্বল॥
এক চাষা জিদ করে, "যতক্ষণে হয়।
আজ মোর ক্ষেতে জল আনিব নিশ্চয়॥"
দুপহর হ'য়ে গেল নাহি গেল ঘরে।
গালি খেয়ে ঘরে ফিরে পত্নী গেল পরে॥
সন্ধ্যার সময়ে ক্ষেতে জল এল পরে।
বাড়ী যেয়ে বসে চাষা হুঁকা নিয়া করে॥
আর একজন চাষা সেও সেই মাঠে।
জল আনিবার তরে ক্ষেতে খানা কাটে॥
পত্নী এসে দিতে ডাক অমনি চলিল।
পরদিন তরে তার সে কাজ রহিল॥
তীব্র মন্দ বৈরাগ্যের এই ভেদ জানি।
ঈশলাভ তরে উঠে পড়ে লাগে জ্ঞানী॥

সংসার হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও।
সত্বর ঈশ্বর পানে একেবারে ধাও॥
'ভাই মোর বৈরাগ্যের করে আয়োজন'।
স্বামী পাশে বলে কোন নারী একজন॥

স্বামী বলে, 'দূর পাগ্‌লি, করি আয়োজন।
ছাড়িয়া সংসার কেবা গিয়াছে কখন?'
'তা হ'লে কেমনে যায়?' 'এই দেখ চেয়ে।'
এই বলে ঘর হ'তে গেল বনে ধেয়ে॥
এইরূপে দৃঢ় ভাবে ছাড়িলে সংসার।
মায়াজালে বদ্ধ নর নাহি হয় আর॥

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(কলিকাতাবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।)

[চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যজাতির নিকট হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ টাউনহলে সভা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঐ সভায় কতকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রটী তাহার উত্তরস্বরূপ স্বামীজি লিখিয়াছিলেন।]

নিউইয়র্ক।

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মহাশয়,

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং আমার স্বীয় নগরনিবাসিগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়া যে মধুর বচনগুলি পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি।

হে মহাশয়, আমার ক্ষুদ্র কার্য্যও যে আপনারা সাদরে অনুমোদন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া বাঁচিতে পারে না আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়—ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধজাতিদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন,—'অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না, ধর্ম্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ—ইহার অনিবার্য্য ফল এই হইল যে, যে জাতি প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সমুদয় জাতির মধ্যে তুচ্ছতাচ্ছল্য ও ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়মের অব্যর্থ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি।

আদান প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম আর ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য বাহির করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর অবিচারিতভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে। বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম, যে দিন হইতে অপর জাতিসকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেই দিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল আর যতদিন না পুনরায় জীবনে ফিরিতেছি—যতদিন না আবার বিস্তারশীল হইতেছি—ততদিন কিছুতেই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যস্থ কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেরাও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু যিনি বিদেশ ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এই শক্তি বা ঐ শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি-প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার

যোগ্য? আসুন আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিত ভাবে কাযে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কোন ব্যক্তি যাহা পাইবার প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, জগতের কোন শক্তিই তাহা পাইবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ নহে। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরো গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন।

ভবদীয় বশম্বদ

বিবেকানন্দ।

আমাদের অভাব।

[শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন।]

শূন্যপথে অনন্ত অনন্ত পরমাণুর লম্ফ ঝম্ফ আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস, তাহার ফলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমন্বিত অনন্ত জগতের বিকাশ এবং ক্রমশঃ তাহাতে পর্ব্বত, নদ নদী, বন উপবনাদির উদ্ভব—ইহা আমরা বিচারবুদ্ধিতে বুঝিতে পারি, কিন্তু ভাবিতে গেলে বিহ্বল হইতে হয়।

মহা আকর্ষণবলে পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম পরমাণুর সংযোগে স্থূল পরমাণুর জন্ম; ঐ শক্তিবলেই আবার অনন্ত অনন্ত খণ্ড জগতের প্রকাশ এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য লীলার মহিমা প্রকাশ করা—ইহাও ভাবিতে গেলে বিহ্বল হইতে হয়। আবার আকর্ষণবিকর্ষণের ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর উৎপত্তি—জড়ে চেতনার বিকাশ, এখানেও আবার জড় ও চেতনের আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া স্ব স্ব স্থানে নিয়মিত থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য করা—একথাও ভাবিয়া দেখিলে কম বিস্ময়কর নহে! আবার ভাব দেখি, ঐ আকর্ষণই পুনঃ মনের উপর কার্য্য করিয়া প্রকৃতির নানা বিচিত্রতা জীবকে উপভোগ করাইতেছে। ঐ মহা আকর্ষণবলেই পুং স্ত্রীর

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে গত ২৭শে জানুয়ারি তারিখে পঠিত।

সংযোগ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মোহ ভালবাসা আদির উদ্ভব হইতেছে—কেমন না দ্বৈতে অদ্বৈত, বহুতে এক, অনিত্যে নিত্য বিশ্ব-বিরাট্ তোমায় পাগল করিয়া তোলে? কেমন না বহির্জগতের জড়শক্তি আকর্ষণই মানবান্তরে প্রেমরূপে প্রকাশিত উপলব্ধি করিয়া তোমায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়? নিশ্চয়ই তোমার মনে হইবে, জগতে প্রেমই একমাত্র শক্তি; প্রেমই নিঃস্বার্থতা, প্রেমই স্বার্থপরতা, প্রেমই আকর্ষণ, প্রেমই বিকর্ষণ।

শুনিতে পাওয়া যায়, সাপে যখন ডিম পাড়ে, সে তাহার ডিমগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে; তখন তাহার যত ভালবাসা বা মোহ ঐ ডিমগুলির উপর। কিন্তু যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্ছাগুলি বাহির হয়, সে, সেগুলিকে খাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করে—যেগুলি তাহার মধ্যে ছটকাইয়া পলাইতে পাবে, সেইগুলিই বাঁচিয়া যায়। তাহার ভালবাসা ডিমেই পর্য্যবসিত। প্রেমশক্তির ক্রমবিকাশে তির্য্যক্‌জাতির মধ্যে আবার ঐ ভালবাসার গভীরত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূত হয় এবং মানবেই ইহার পূর্ণ বিকাশ ও প্রতাপ লক্ষিত হয়। এইরূপে ক্রমবিকাশ—আর কাহারও নহে—প্রেমেরই ক্রমবিকাশ—প্রেমময় আত্মার স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইবার জন্যই নানা শরীরে উচ্চতর উচ্চতম প্রেমবিকাশ—জগতের আদি অন্তে প্রেমলীলারই প্রকাশ।

ঐ প্রেমরূপী মহা আকর্ষণ যখন জীবের দেহবুদ্ধির উপর কার্য্য করে, তখন তাহারই বলে চালিত হইয়া জীব স্বার্থোপভোগে রত হয়। ঐ প্রেমের ক্রমবিকাশেই সে ক্রমে তাহার স্বার্থের গতি বাড়াইয়া দেয়, বর্ব্বর উচ্ছৃঙ্খল মানব প্রেমে সমাজবন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বার্থ পরিতৃপ্তি করিবার জন্য যে মানব পরস্বাপহরণ, লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি, অত্যাচার অনাচারে রত, প্রেমের কুহকমন্ত্রবলে—স্বার্থের গণ্ডি বাড়িয়া গেলে—সেই কালে সমাজের সৃষ্টি করে, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে এবং পরে জগতের কল্যাণে রত হয়। এইরূপে যখন ঐ প্রেম-শক্তি ক্রমে শ্রীভগবানের অন্বেষণে স্বস্বরূপ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়, তখনই মানবে দেবত্ব ও ঈশ্বরত্বের বিকাশ হয়। জগতের মহাপুরুষগণই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। "আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে ঐহিক উন্নতি লাভ ও মনের উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার উদ্ভব হয় এবং নিজের উপর প্রয়োগ করিলে মানুষকে ঈশ্বর করিয়া তোলে।"

ছেলেবেলায় একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটী পাশ্চাত্য দেশের। এক দিন কোন মহিলা আপন শিশু সন্তানটিকে উঠানে রাখিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা।

কোথা হইতে একটা ঈগল পক্ষী আসিয়া ছেলেটিকে লইয়া শূন্যে উড়িয়া চলিল। মা তাহা দেখিলেন—দেখিয়াই উন্মত্তার ন্যায় ঈগলের অনুসরণ করিলেন। অদূরে একটি পাহাড়। সেথায় মনুষ্যের চলাচল নাই—পাহাড়টি এতই বনাকীর্ণ ও পথ এতই বন্ধুর! ঈগল সেই উচ্চ পাহাড়ের উপর একটি বৃক্ষশাখায় যাইয়া শিশুটিকে লইয়া বসিল। মার আর সময় নাই—দেরী হইলে শিশুটিকে হারাইতে হইবে। পাগলিনীর ন্যায় মা ছুটিয়াছেন। পথে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল, শিশুটির আশা ছাড়িয়া দিতে বলিল। কে কাহার কথা শুনে? পা কাটিল, গা ছিঁড়িল, যেখানে কেহ উঠিতে সাহস করিত না—মা বেগে সেই পর্ব্বতগাত্রে উঠিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই দেখা গেল—ঈগল তাড়িত, মার বক্ষে শিশু শোভা পাইতেছে। প্রেমের প্রতাপ দৃষ্ট হইল, অসম্ভব সম্ভব হইল, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিল।

ভূতের ভয়ে ভীতা, সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হইতে ভয়ে কম্পমানা, এমন মাতাও যদি নিজ সন্তানকে বাঘের মুখে দেখেন, তখনি তাঁর সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়—নির্ভীক হৃদয়ে তিনি তখন বাঘের মুখ হইতে শিশুটি কাড়িয়া লইবার জন্য ধাবিতা হন।

কিসে ভীরু নির্ভীক হয়, কাপুরুষ বীর হয়, দুর্ব্বল বলীয়ান্ হয়? কেমন করিয়া সতী জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়? দেশ-সেবক দেশের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে, ভক্ত শ্রীভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, মহাপুরুষ জগতের জন্য আত্মবলিদান করেন? ঐ প্রেমই তাঁহাদের প্রত্যেকের চালক, সকল কর্ম্মের নিয়ামক,—উহাই বিশ্বলীলার একমাত্র নায়ক। ঐ প্রেমেরই আর এক নাম শক্তি, উহারই প্রভাবে অঘটন সংঘটন হয়।

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, একতরি করে পারাপার—
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', 'প্রেম,'—এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব' 'দেব' বল আর কেবা? কেবা বল সবারে চালায়?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে! প্রেমের প্রেরণ!!

হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে?"—বীরবাণী।

স্বামীজি আরও বলিতেন—"বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু।" আজ সকলেই আমরা কার্য্য করিতে ইচ্ছুক—দেশের যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, সে কায করিব এরূপ আশা পোষণ করি। আমরা যেন স্বামীজির ঐ কথাটি না ভুলিয়া যাই—যেন ঐ তত্ত্ব সর্ব্বদা আমরা চিন্তায় ধারণ করি। নতুবা আমাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা হইবে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে। কারণ যাহাতে প্রেম সঙ্কুচিত হয়, তাহার ফলে পশুত্ব, অসুরত্ব, কাপুরুষত্বই আসিয়া উদয় হয়।

মহাপুরুষেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার নিকট ভয় বলিয়া কোন জিনিষ নাই, স্বার্থ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না—স্বার্থের গণ্ডি তাঁহাদের ভিতর অনন্ত ব্যাপী হইয়া গিয়া স্বার্থকে সম্পূর্ণ নাশ করিয়া ফেলে। দরিদ্র, অজ্ঞদিগের জন্য যাঁহার হৃদয় প্রেমে কাতর, তিনিই যথার্থ মহাত্মা। একথা স্বামীজিই বলিয়াছেন—"তাঁহাকে আমি মহাত্মা বলি, গরীবের জন্য যাঁহার হৃদয়ের শোণিত পাত হয়, নতুবা তিনি দুরাত্মা। যতদিন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অনাহারে অজ্ঞানান্ধকারে রহিয়াছে, ততদিন তাহাদের ব্যয়ে শিক্ষিত অথচ তাহাদের অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগশূন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য করি।" আর একস্থানে স্বামীজি ঐ দরিদ্র, পীড়িত ও অজ্ঞদিগকে ভগবান্ জ্ঞানে সেবা করিতে আমাদের বলিতেছেন—"The poor, the down-trodden, the ignorant—let them be your God." ভক্ত ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন—তাঁহার এক কণা প্রেম পাইবার জন্য জন্মজন্মান্তর গ্রহণে কাতর হন না, জ্ঞানী মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপাত করেন, কর্ম্মী কর্ম্মের জন্য না পারেন করিতে এমন কিছুই নাই, যোগী মনের সর্ব্ববৃত্তি একীভূত করিয়া আত্মোপলব্ধি করিবার জন্য অমানুষিক ক্লেশ স্বীকার করিতে সদা প্রস্তুত,—সকলেই আপন আপন আদর্শানুসারে প্রেমস্বরূপকেই উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। যদি কাহারও সাধ্য থাকে, এইখানে একবার স্বামীজির মহাপ্রেমের গভীরত্ব, অসীমত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করুন—"আমি তোমার ভক্তি বা মুক্তির কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখি না, বরং অপরের কল্যাণ করিয়া আমি লক্ষ লক্ষ নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি। ইহাই আমার ধর্ম্ম।" আবার বলিয়াছেন, "আমি যেন বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া

সহস্র সহস্র দুঃখ কষ্ট সহ্য করি, যাহাতে আমি সমুদয় আত্মার সমষ্টিস্বরূপ যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, কেবলমাত্র যে ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি—সেই ঈশ্বরের পূজা করিতে পারি। সর্ব্বোপরি, দুষ্ট নারায়ণ, দুঃখী নারায়ণ, সর্ব্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ আমার উপাসনার বিশেষ পাত্র।”

পুরাণে শুনিয়াছি, সমুদ্রমন্থনে হলাহল উঠিয়াছিল। সে বিষ জগতের দেবাসুর সকলেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল দেবদেব মহাদেবই সে হলাহল গ্রহণ করেন;—নীলকণ্ঠেই সে বিষ আশ্রয়লাভ করে। সেইরূপ সমাজ হইতে যাহারা তাড়িত, জগতে যাহারা সর্ব্বলোকের ঘৃণিত, সকলের ত্যজ্য—তাহারাই স্বামীজির গ্রাহ্য—তাঁহার অসীম প্রেমালিঙ্গনে আশ্রয়প্রাপ্ত। "My God the wicked, my God the miserable"—স্বামীজির ঐ কথাগুলি উচ্চারণেও মন উন্নত হয়, হৃদয় প্রসারিত হয়। আবার তাহাদের জন্য তাঁহার শত সহস্র দুঃখ ভোগ করিতেও প্রাণের ইচ্ছা! এ আদর্শের কথা, এ অনন্ত প্রেমের কথা প্রকাশ করা মানবভাষার বিষয় নহে।

স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ আমরা সকলে তাঁহারই লীলাস্থলে সমবেত। আজ যেন স্বামীজির নিকট হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আমাদের এই প্রার্থনা ওঠে যে, আমরা যেন ঐ অসীম, অনন্ত প্রেমের কণামাত্র পাইবার অধিকারী হইতে পারি। আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, প্রেমের অভাবই আমাদের যথার্থ অভাব, ইহার অভাবেই যত গোল, যত অসামঞ্জস্য, যত ভীরুতা, যত দুর্ব্বলতা; যেন বুঝিতে পারি যে, প্রেম আসিলেই আমাদের সব অভাব দূর হইবে—আমরা মানুষ হইব—আমাদের ভিতর অসীম শক্তির প্রকাশ হইবে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক্ দর্শন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক বি, এ।

পার্মেনাইডিস্ (Parmenides)—জেনোফ্যানিসের সিদ্ধান্তগুলির যৌক্তিকতা প্রদর্শন ও তাহাদিগের শৃঙ্খলাবিধানই পার্মেনাইডিস্ কৃত দর্শনের উদ্দেশ্য। অস্তিত্ব, সৎ বা অস্তি এই ভাবটী দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া পার্মেনাইডিস্

বলিলেন যে, সৎ বা অস্তি, পরিণতির ফল নহে (Being cannot become what it is)। অর্থাৎ সৎ বস্তু—নিত্য ও ধ্রুব, তাহাতে পরিবর্ত্তন নাই, তাহা আপনা হইতে ভিন্ন কোন দ্বিতীয় পদার্থের পরিণামে উৎপন্ন নহে। অথবা ইহাব উৎপত্তিই নাই; কারণ, সৎ পদার্থ যদি উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তির প্রাক্কালে ইহার অনস্তিত্ব ও ইহাব জনকরূপী সদিতব অসৎ পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা কবিতে হয়। কিন্তু অসৎ বা নাস্তিব অস্তিত্ব কল্পনা বন্ধ্যাপুত্র কল্পনার ন্যায় নিষ্ফল, নিরর্থক ও অসম্ভব; এবং সেই নাস্তি হইতে অস্তির উৎপত্তি তদধিক নিরর্থক ও অসম্ভব। এইরূপে দেখা যায় যে, অস্তি পদার্থ (Being) —অজ ও অনাদি। অপর পক্ষে ইহার বিনাশ বা পরিবর্ত্তনও কল্পনাতীত। কারণ, সৎ পদার্থ সদিতর পদার্থে পরিণত হইলে, সৎ হইতে অসতের সৃষ্টি মানিয়া লওয়াব বিড়ম্বনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কব। আবার সৎ পদার্থ যদি সৎ পদার্থেই পরিণত হয বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাকে পবিবর্ত্তন বলিয়া বর্ণনা করা চলে না; কারণ, আপনার আপনাতে পরিণতি কি আপনাতে আপনার স্থিতির সহিত অভিন্ন নহে? কাজেই বলিতে হয়, অস্তি বা সৎ বস্তু অনাদি অনন্ত, আগম অপায় বিহীন, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, সনাতন। ইহাতে নাস্তিত্বের লেশ মাত্র নাই, সেজন্য ইহাকে অসীম বলা যায় না; কাবণ, অসীম শব্দ সীমার অভাবজ্ঞাপক এবং কোনরূপ অভাবার্থক শব্দের দ্বারা অস্তি বা সৎ পদার্থের নির্ব্বাচন হইতে পারে না। ইহাকে জানিবার জন্য কোনও স্বতন্ত্র জ্ঞাতাব অস্তিত্বেব আবশ্যকতা নাই, ইহা নিজে একই কালে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। চিৎ ও সৎ একই পদার্থ অথবা সৎ চিত্তেরই বিশেষণ—চিৎ পদার্থই সত্তাবান্। সৎ পদার্থ আপনাতে আপনি এমনি পূর্ণ যে, ইহাকে বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। পূর্ণতা ও অস্তিত্বই সৎ, শূন্যতা ও নাস্তিত্বই অসৎ। ইহাই যথার্থ জ্ঞান (Knowledge), পারমার্থিক জ্ঞান, উপনিষদের ভাষায—পবজ্ঞান; বহুধা বৈচিত্র্যের জ্ঞান, পরিবর্ত্তনের জ্ঞান, অসম্পূর্ণতার জ্ঞান—ভ্রান্ত জ্ঞান (Opinion), ব্যবহারিক জ্ঞান, অপর জ্ঞান। সদ্‌বস্তুই সত্য (Real), পবিণতি ভাণ (Appearance) মাত্র—এই জ্ঞান শুদ্ধবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অপরবিধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ। তাহা ভেদবৈচিত্র্যের ইন্দ্রজাল বচনা কবিয়া মানবকে মুগ্ধ করে। কিন্তু এই অস্তি পদার্থ এক না বহু? পার্‌মেনাইডিস্ বলেন—এক; কারণ, সদ্বস্তু বহু ও পৃথক্ হইলে তাহারা কিসেব দ্বারা পৃথক্ হইবে—অস্তির দ্বারা না নাস্তির দ্বারা? কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, নাস্তি অসৎ। অতএব অস্তির দ্বারা বিহিত পার্থক্য পার্থক্যই নহে, তাহা অভিন্নতা।

অবকাশ ও শূন্যতা যখন অসৎ ও দুই বস্তুর মধ্যবর্ত্তী শূন্যতাই কেবল যখন তাহাদিগকে পৃথক করিতে সমর্থ, তখন সদ্বস্তু এক, অভিন্ন ও অব্যয়।

এইরূপ দার্শনিক মত হইতে কোনও সৃষ্টিবিবরণ আশা করা যায় না। কারণ সৃষ্টির অর্থ এক হইতে বহুর উৎপত্তি। কিন্তু বহু ও উৎপত্তির জ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে এবং ইন্দ্রিয় আবার প্রবঞ্চক যাদুকর অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্, তখন সৃষ্টি সত্য নহে, ভাণ মাত্র এই পর্য্যন্তই বলা যায়। মানুষ যে কেন এই ইন্দ্রিয়ের শঠতা দ্বারা প্রতারিত হয়, তাহা বলা যায় না; তবে তাহা দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু শোচনা করিয়াও কোন ফল নাই। যাহা হউক বুদ্ধি এমন দুর্ব্বলা নয় যে, ইন্দ্রিয়প্রদর্শিত ভ্রান্তজ্ঞানের মধ্যে কোনও ঐক্য সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিবে না। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানই পার্‌মেনাইডিসের সৃষ্টিতত্ত্ব। জগৎ দুইটী শক্তিসংযোগের ফলে উৎপন্ন। প্রকাশস্বভাব শক্তি যখন তমঃ-স্বভাব শক্তির উপর জয়ী হয়, তখনই জগৎ সৃষ্ট হয়। ঐ শক্তিদ্বয় হইতে তেজঃ ক্ষিতি, উষ্ণ শীত এইরূপ জাগতিক যত কিছু দ্বন্দ্ব নির্গত হইয়াছে। প্রকাশশক্তি পুরুষ ও তমঃশক্তি স্ত্রী স্থানীয়, এই শক্তিযুগলই জগতের জনকজননীস্বরূপ। সকল পদার্থেই ঐ দুই শক্তি অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। মানবেও ঐ দুই শক্তি বিরাজ করে। যে মানুষে প্রকাশশক্তি অধিকমাত্রায় বর্ত্তমান, সে ভ্রান্তজ্ঞানের উপর জয়ী হইয়াছে—পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে সে সত্যের ধারণায় সক্ষম হইয়াছে। যে তমঃশক্তিপ্রধান, সে তমঃস্বভাব—সে অজ্ঞান।

ইহাই ইলিয়্যাটিক দর্শনের সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট ও পরিণত অবস্থা। এ মতের আর কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। তবে আপত্তিকারিগণের কোলাহল নিবৃত্তি না হওয়ায় ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সাধারণে স্বীকৃত হয় নাই।

জেনো (Zeno) এই দর্শনের সমস্ত বিপক্ষ মত নিরাশ করিয়া ইহার অসম্পূর্ণতা দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত ইলিয়্যাটিকগণ বলিয়াছেন যে, নাস্তি অসৎ অতএব উৎপত্তি-বিনাশ-অর্থশূন্য শব্দমাত্র; জেনো বলিলেন, শুধু ঐ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, যখন কোন দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তখন সেই মতে কেবল অসঙ্গতির অভাব দেখাইলেই যথেষ্ট হয় না। কারণ, প্রতিবাদীও ত ঐরূপে আপনার মতকে সত্য বলিয়া খাড়া করিতে পারে। যে প্রমাণের দ্বারা স্বমতের প্রতিষ্ঠা হয়, শুধু সেই প্রমাণ কোন মতস্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নহে; বিরোধী মতের অপ্রতিষ্ঠা-সাধনের জন্য প্রমাণান্তর আবশ্যক। পার্‌মেনাইডিস্ বলিলেন, সৎপদার্থ নিত্য,

অপরিণামী; কারণ, সৎপদার্থ পরিণামশীল বলিলে অসৎ নাস্তিরও অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। জেনো বলিলেন যে, যদি স্বীকার করা যায় যে, পরিবর্ত্তন অসৎ নহে সৎ, তাহা হইলে উহা যে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট, তাহা প্রমাণ করা বেশী দুরূহ নহে। পরিমাণ ও গতি তাঁহার মতে বহুত্ব ও পরিবর্ত্তনের মূল। তাই তিনি ঐ দুয়ের বিরুদ্ধে বহুতর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরিমাণ বাস্তবিক সত্য নহে; কারণ, অণুত্ব ও মহত্ব—উভয়ই—পরিমাণে বর্ত্তমান। ইহা মহৎ; কারণ, ইহা অনন্ত ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি, আবার ইহা সূক্ষ্ম, যেহেতু উহা অনন্তভাগে বিভাজ্য এবং যে সকল অংশের সংযোগে ইহা নির্ম্মিত, তাহারা আয়তনবিহীন, কারণ, অনন্তভাগে বিভক্ত করার পরেও ঐ অংশসকল যদি আয়তনবিশিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে উহাদিগকে আরও অংশীকৃত করা যাইতে পারিত। তাহা পারা যায় না, অতএব ঐরূপ বিভাগের পরে বর্ত্তমান অণু বা অংশসকল নিশ্চয় আয়তনবিহীন।

গতির সত্যতা নিরাকরণ করিবার জন্য জেনো চারিটী প্রমাণ প্রয়োগ করেন—

(১) কোন একটী বিন্দু যদি একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, তাহা হইলে গন্তব্য দেশে পৌছিবার পূর্ব্বে ঐ পথের মধ্যদেশে তাহাকে পৌছিতে হইবে। এবং ঐ মধ্যস্থানকে যদি প্রথমে গম্যস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অর্দ্ধপথেরও মধ্যস্থান অতিক্রম করিয়া তবে উহার অন্তে উপনীত হইতে হইবে। কিন্তু যেহেতু একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অনন্তভাগে বিভাজ্য, সেহেতু উহা কোনকালেও অতিক্রম করা যাইবে না।

(২) যদি কোনও তীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, তাহা হইলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে মাত্র। কাজেই প্রকৃত-পক্ষে আমরা গতির পরিবর্ত্তে স্থিতিই দেখিতে পাই।

(৩) কোন ক্ষিপ্রগামী বস্তু বা ব্যক্তি কোন দিন মন্দগামী বস্তু বা ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না—যদি ঐ মন্দগামী বস্তু বা ব্যক্তি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাকে। আমরা নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে জেনোর যুক্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১	২	৩	৪	৫

ক খ

"খ" যদি মন্দগামী হয় এবং যদি ক্ষিপ্রগামী "ক" এর অপেক্ষা "১" পরিমিত স্থান অগ্রসর হইয়া থাকে এবং যদি সমকালে "ক" "খ"য়ের দ্বিগুণ বেগে গমন করে,

তাহা হইলে "ক" যখন প্রথমাংশ অতিক্রম করিবে, "খ" তখন দ্বিতীয়াংশের অন্তে গমন করিয়াছে। "ক" যখন দ্বিতীয়াংশ অতিক্রম করিবে, "খ" তখন তৃতীয়াংশের অন্তে গিয়াছে, এইরূপে অতি সঙ্কীর্ণ পথও অনন্ত অংশে বিভাজ্য বলিয়া "ক" কখনও "খ"কে ধরিতে পারিবে না।

(৪) সমান দৈর্ঘ্যের তিনটী সমান্তরাল রেখা যদি অঙ্কিত করা যায় এবং যদি তাহাদিগকে এরূপভাবে স্থাপন করা হয় যে, ১নং রেখা যেখানে শেষ হইয়াছে, ২নং রেখা তাহার ঠিক নিম্নদেশে আরম্ভ হইবে, আর ৩নং রেখা ১নং রেখার মধ্য বিন্দুর নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইবে, এবং যদি ১নং রেখা স্থির থাকে এবং অপর রেখাদ্বয় তীর চিহ্ন প্রদর্শিত পরস্পরের বিপরীত দিকে সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ২নং রেখার মধ্য বিন্দু যখন ১নং রেখার দক্ষিণ প্রান্তর নিম্নদেশে পৌঁছিবে, তখন ৩নং রেখার বামপ্রান্ত ২নং রেখার মধ্য বিন্দুর নিম্নদেশে উপনীত হইবে। এখন সহজেই দেখা যায় যে, ২নং রেখার মধ্যবিন্দু ১নং রেখার অর্দ্ধপরিমিত দেশ অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু ঐ মধ্যবিন্দু আবার ৩নং রেখার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে বাম প্রান্তে গমন করিয়াছে অর্থাৎ ১নং রেখার সম পরিমিত দেশ অতিক্রম করিয়াছে (যেহেতু ১নং ও ৩নং রেখা সম-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট)। কাজেই বলিতে হয় যে, ২নং রেখার মধ্যবিন্দু একই কালে ১নং রেখার সমপরিমিত ও অর্দ্ধপরিমিত দেশ অতিক্রম করিয়াছে।
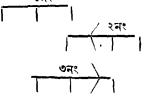
এই সকল যুক্তিদ্বারা জেনো গতির অসত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কোন বিরুদ্ধবাদী নাকি জেনোর ঐ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে কিছু দূর গমন করিয়া ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যতঃ এই সকল যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে যখন কোনও বিষয়ে যুক্তির অভাব অনুভব করে, তখন যুক্তি ব্যতীত আর কিছু তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ, জেনো ব্যবহারিকভাবে গতির অস্তিত্ব লোপ করিতে বসেন নাই; তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, গতির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। জেনোর যুক্তি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তাহা আজও পর্য্যন্ত নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হয় নাই। এরিস্টটল্ জেনোর যুক্তির অনেক উত্তর দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে জেনোর মত সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। "It can be questioned whether the

Aristotelian answers are fully satisfactory for the first three arguments. Bayle has attacked them * *. Hegel defends Aristotle against Bayle. Yet Hegel himself also sees in motion a contradiction, nevertheless, he regards motion as a real fact. Herbert denies the reality of motion on account of the contradiction, which, in his opinion, it involves"
—Uberweg's Hist. of Phil., P. 59.

ক্রমশঃ।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রতিকার।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।

আকাশে যেমন ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া নাবিক দিগ্‌ভ্রষ্ট হয় না, পৃথিবীতেও তদ্রূপ ধ্রুবতারা আসিয়া লক্ষ্যশূন্য মানবকে গন্তব্যপথ দেখাইয়া যান। দুঃখের অতলজলে নিমজ্জমান প্রায় এই অবস্থায় এক একবার স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ধাবিত হয়। মনে হয়, যেন তিনিই আমাদের এ জটিল জীবনসমস্যা বুঝিয়াছিলেন; মনে হয়, সর্ব্বত্যাগী, কেবলমাত্র মানবকল্যাণাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসীর তপস্যা বিফল হয় নাই; মনে হয়, তিনি যে পথ সাধনবলে দর্শন করিয়া আমাদের প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত উন্নতির সোপান। তাঁহার কথায় বুঝি যে, আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সকল অনিষ্টের মূল—আমাদের দিন দিন শ্রদ্ধাহীন হওয়া। শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা, ঋষিপ্রদর্শিত পথে বিশ্বাস, এ সকল ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এই শ্রদ্ধাহীনত্বই আমাদের হতশ্রী হইবার কারণ। যেদিন ভারতবাসী ঋষিবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আবরিত করিয়া, নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল, সেইদিন হইতেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। জগদ্‌গুরু আচার্য্যগণের উপদেশের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার দুঃসাহস যেদিন হইতে সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সমাজ হীনবীর্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলে কথনই আমরা এরূপ অশাস্ত্রীয় বিধিসকল সমাজে প্রচলিত করিতে পারিতাম না। আচার্য্য-

গণের আদর্শ ঠিক থাকিলে, কথন আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতাম না। যদি উঠিতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় আমাদিগকে তাঁহাদের আদর্শ ধরিয়াই উঠিতে হইবে। তাই স্বামীজির উপদেশ—আমাদের পুনরায় শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে হইবে।

"এই শ্রদ্ধা শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা বড় কঠিন; এই শ্রদ্ধার প্রভাব ও কার্য্যকারিতা অতিশয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্র কি হইল, দেখ। শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় হইল, অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি, আমিও কিছু কার্য্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তথন যে সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন। * * * আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে; তজ্জন্যই আমাদের এই উপস্থিত দুর্দ্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ—এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার অভাবেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। * * * এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক।"

—ভারতে বিবেকানন্দ।

আমরা যে সকল জাতিকে আজ খুব উন্নত বলিয়া দেখিতেছি তাহাদেরও উন্নতির কারণ—তাহারা শ্রদ্ধাবান্। তাহাদের জাতীয় জীবনে, তাহাদের জাতীয় আদর্শে তাহারা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্; তাহাদের জাতীয় গৌরবে তাহারা সম্পূর্ণ গৌরবান্বিত। কিন্তু অবস্থার ফেরে তাহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরা, আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের জাতীয় আদর্শে আস্থাশূন্য হইয়াছি। দেশভেদে, তাহাদের শিক্ষায় আমাদের শিক্ষাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া পড়িতেছি—নিজের সম্পত্তি চিনিতেও পারিতেছি না। আর সর্ব্বোপরি সর্ব্বনাশ—আমরা আমাদের গাম্ভীর্য্য পর্য্যন্ত হারাইয়াছি। যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সেই দেশবাসী মনুষ্যলোকে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, যে শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী প্রাচ্য দেশবাসীর আচার ব্যবহার প্রভৃতিও অতি ধীরতা ও শ্রদ্ধাসহকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নপর হয়, সেই শিক্ষা ভারতবাসীকে কেবলমাত্র বাচালতাই প্রদান করিয়াছে। সকল বিষয়ে আমরা বাচালতায় বাহাদুরী লইতেই অগ্রসর। বাচালতার ফলে কোন্ জাতি কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রদ্ধা কই? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অপূর্ব্ব চরিত স্মরণ করিয়া

আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি কে? পাশ্চাত্য আলোকের তীব্র কিরণে আমাদের চক্ষু যেন ঝলসাইয়া দিয়াছে। তাই পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপে, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে শিক্ষার বিষয় ও উন্নতির উপায় কিছুই দেখিতে পাই না। এই গভীর অন্ধকারে আমরা পতিত। পূর্ব্বপুরুষগণের "অমানব প্রতিভার" প্রতি তাচ্ছিল্য ও উপহাস করিতে শিখিয়া আমরাও উপহাসাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। নিজের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস হারাইয়াছি। আপনাকে মানুষ মনে করিলে, মানুষে যাহা করিতে পারে বা পারিয়াছে, তাহা আমিই বা না করিতে পারিব কেন? সে বিশ্বাস কি আমাদের আছে? বিশ্বাসবলে মানুষের অসাধ্য কিছু থাকে কি? বিশ্বাসবলই যে প্রধান বল, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়া স্বামীজি তাঁহার কোন বন্ধুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—

"নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists আসিতেছে—ইংরাজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে, তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে, ঐ Irishmanকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বল্‌ছিল, 'Pat, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম।'—আজন্ম শুনিতে শুনিতে Patএর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat hypnotize কর্‌লে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল—'Pat, তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব কর্ত্তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ্,'—Pat ঘাড় তুল্‌লে, দেখ্‌লে ঠিক কথাই ত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।' ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্চে, তাও একান্ত অনস্তিভাবপূর্ণ (Negative)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধার' লোপ।"

—পত্রাবলি।)

এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা আমাদের আনয়ন করিতে হইবে—"অতএব এই শ্রদ্ধাই আমি চাই। আমাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস আর এই বিশ্বাস উপার্জ্জন করারূপ মহান্ কার্য্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে ভয়ানক এক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া—গাম্ভীর্য্যের অভাব—এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।"

—ভারতে বিবেকানন্দ।

ঈশ্বর করুন—স্বামীজির উপদেশ যেন আমাদের উপর বিফলে না যায়; তাঁহার আশীর্ব্বাদে যেন আমরা সকলে শ্রদ্ধাবান্ হইতে শিখি। শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা, সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা চাই। একবার হৃদয়ে শ্রদ্ধা আসিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না, কোন্ মন্ত্রে আমাদের জাতীয় জীবন চালিত। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাদের সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিলে আর বৃথা কার্য্যে অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে না। শ্রদ্ধা আমাদের শিখাইবা দিবে—আমাদের দেশ কি, আমাদের জাতীয় জীবন কোন্ স্রোতে চালিত, হিন্দুর চক্ষে উন্নতির অর্থ কি, জাতীয় উদ্দেশ্য কোন্ উচ্চলক্ষ্যে ধাবিত। আমাদের দেশ এক অসাধারণ দেশ। আমাদের জাতি একটি অলৌকিক জাতি। পৃথিবীর ভিতরে থাকিলেও আমাদের জীবনের লক্ষ্য অপার্থিব বিষয়ে নিবদ্ধ। বাচালতার স্থান ভারতবর্ষ নহে—ভারতের জাতীয় শৈশব অবস্থা বহুদিন গত হইয়াছে—Experiment অনেক হইয়া গিয়াছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন পুস্তকচর্ব্বণকারীর কার্য্যস্থল ভারতের বাহিরে, ভারতে নহে। প্রবীন ভারত নানা অবস্থা ভোগ করিয়া এখন দ্রষ্টার স্থান অধিকার করিয়াছে। অমানুষিক তপস্যার ফলে ভূলোক দ্যুলোকের রহস্য ভেদ করিয়া আপন মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে। সহস্র ঝঞ্ঝাবাতে সে গৌরব এখনও হীনপ্রভ নহে—কখন হইবার নহে। জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থলে ঋষিমূর্ত্তি বিরাজিত—কার সাধ্য সে আসন টলায়। আমাদের কার্য্য কি, আমাদের কর্ত্তব্য কি, আমাদের কল্যাণ কিসে, তাহা উহা দেখিয়া স্থির করিতে হইবে।

"আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহমান। তারপর সেই পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্য্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাস-বলে, সেই অতীত মহত্ত্বের জ্বলন্ত ধারণা হইতেই এমন এক ভারত গঠন করিতে হইবে, যাহা সে পূর্ব্বে কখনই ছিল না।" —ভারতে বিবেকানন্দ।

আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ধর্ম্মজীবন গঠনেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধন যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদের পবিত্র জীবনালোচনা করিয়া ইহাই দেখিতে পাই। বাল্যকালে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন, ইহকালপরকালতত্ত্বে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়া ভোগবাসনা শেষ করিবার জন্য কিছুদিন সংসার ধর্ম্ম পালন, তৎপরে বানপ্রস্থ অবলম্বন, শেষ সন্ন্যাস বা পূর্ণত্যাগ। ত্যাগই লক্ষ্য—যাহাতে সেই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারা যায়, অধ্যয়ন কাল হইতেই তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকিত এবং তদনুযায়ী কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইত। সংসারধর্ম্ম পালনকালেও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিত হইত? এখন আমরা বলিয়া থাকি, যাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন তাঁহারাই ব্রহ্মচর্য্য পালনে যত্নপর হউন, কিন্তু আমরা, যাহারা সংসার আশ্রমে আছি, বিবাহ করিয়াছি, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন নাই। এই ভ্রমধারণাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। ঐ ভ্রমধারণাপ্রযুক্তই বর্ত্তমানে পশুপদবীতে পৌছিয়াছি। সংসার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছি বলিয়া পত্নী দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইতে না হইতেই তাহার গর্ভে বৎসর বৎসর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার প্রয়াসী হইতে শাস্ত্র কখন উপদেশ করেন নাই। পরমহংসদেব বলিতেন, "গাছ যতদিন ছোট থাকে, ততদিন তাহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয় তা না হইলে গরুবাছুরে খাইয়া ফেলিবে, পরে গাছ বড় হইলে তাহাতেই হাতী বাঁধিয়া রাখ না কেন, বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।" অপরিণতবয়স্ক বালকের ত কথাই নাই, যৌবনেও সকলেরই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা উচিত—কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া যাহাতে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বনাশ না হয়, সে বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মিত জীবন সংসার আশ্রমে অবস্থিতি করিলেও আর অবনতির ভয় থাকে না। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, মনুষ্যজীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন, কোনরূপ উচ্চ আদর্শে যাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ হইয়াছে, সংসারক্ষেত্রে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ উচ্চভাবের পরিচয় দান করিবেই করিবে। তিনি নিশ্চয় বুঝিবেন, মানবের বিবাহ-বন্ধন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়পরিচালনার জন্য, পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিবার জন্য নহে। তিনি দেখিবেন, হিন্দুর বিবাহবন্ধন আবার অতি উচ্চ পবিত্র ভাবের উপর স্থাপিত। ভারতবর্ষ ব্যতীত দাম্পত্যপ্রণয়ের এত উচ্চভাব আর কোন দেশে এখনও প্রবেশ করে নাই। ভারতবর্ষই একদিন এই ভাবের আদর্শ স্থান ছিল, কিন্তু হায়, আজ আমরা কোথায় পতিত। যদি উঠিতে

পারি, তবেই আমাদের ঋষিকুলে জন্ম সার্থক হইবে। তাই স্বামীজি কাতরস্বরে বলিয়াছেন—"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না, তুমি আজন্ম 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না, তোমার সমাজ বিরাট্ মহামায়ের ছায়া মাত্র।" (—বর্ত্তমান ভারত।)

অন্যান্য জাতির চক্ষে রমণী ভোগের বস্তু। হিন্দুর স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। সাধন অর্জ্জিত ভাবরাজি জগৎ হইতে লোপ না হয়, তাই সন্তানকামনা। সন্তান, বংশমর্য্যাদা, কুলমর্য্যাদা, ধর্ম্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, তাই পুত্রমুখ দর্শনে উচ্চগতি লাভ—এ কথা প্রসিদ্ধ। বিবাহিত জীবন হইলেই পশুপদবীতে দাঁড়াইতে হইবে—ইহা হিন্দুভাববিবর্জ্জিত। এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে, যথার্থ হিন্দুজীবনের দায়িত্বজ্ঞান আমাদের কতটুকু আছে। সন্তান, ধর্ম্মমর্য্যাদা, বংশের মান বজায় রাখিবে, সে ত দূরের কথা, উদরান্নের জন্য সে এখনি যে কত অসদুপায় অবলম্বন করিতেছে—ইহার জন্য চিন্তিত কে? বিদেশী ভাষায়, বিদেশী শিক্ষায়, বিজাতীয় ভাব আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া, আমাদিগকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। এখনও আমাদের চৈতন্য হইবে কি?

মহাভারত পাঠে দেখিতে পাই, রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট সন্তান কামনা করিলে, শ্রীভগবান্ ভগবতীর নিকট সুসন্তান কামনা করিয়া বহুদিন তপস্যায় কাটাইলেন। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ যখন সুপুত্র লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবী আরাধনায় নিযুক্ত, তখন সাধারণ জীবের কথা কি? অবতার লোকশিক্ষার নিমিত্ত আগমন করেন। তিনি স্বয়ং যাহা আচরণ করিয়া করিতে বলিয়াছেন, সে শিক্ষা ভুলিলে বিপদ্জালে জড়িত হইতেই হইবে। সেজন্য বারবার বলি, ঐ আদর্শ ধরিয়াই আমাদের আবার উঠিতে হইবে। পরমহংসদেব, এক দিন তাঁহার কোন বালকভক্তের মলিন মুখ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসায় যখন বুঝিলেন যে, চাকরী করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম জন্য ম্লান হইয়াছে, তখন বলিয়াছিলেন, "দেখ্, তুই তোর জননীর জন্য চাকরী স্বীকার করিয়াছিস্ তাই, নচেৎ বলতুম, ধিক্ তোকে, ধিক্ তোর জীবনে।" কিন্তু আমরা দাস্যবৃত্তিপরায়ণ হইয়া এই ধিক্ জীবন লইয়া কতই না আস্ফালন করি। আর কত দিন আমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিব! কামকাঞ্চনের ক্রীতদাস হইয়া সমাজের কি দুর্গতিই না হইয়াছে। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে কোন প্রকার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নহে। অর্থ সম্বন্ধে পরস্পরে বিশ্বাস আমাদের নাই বলিলেই হয়। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি এ

অবস্থায় কিরূপে সম্ভবপর? যেরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত, বাল্যবিবাহ যথাসম্ভব নিবারণ, বিবাহিত জীবনে যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং সম্যক্‌রূপে চরিত্রগঠন না হইলে এ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ কখনই করিতে পারিব না। হিন্দু আদর্শ হইতে আজ আমরা বহুদূরে অবস্থিত। স্বদেশী বিদেশী নানা ভাবরাশি মিশিয়া আমাদের মস্তিষ্ক বিকল করিয়া দিতেছে। এই বহুভাববিপর্য্যয় অবস্থায় পড়িয়া আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের জাতীয় জীবন অপদার্থ নহে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হীন আদর্শে গঠিত নহে, আমাদের জীবন-গঠন-প্রণালী কুসংস্কারাচ্ছন্ন নহে। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রদ্ধা আসিতেই হইবে। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া চরিত্রগঠন করিতে পারিলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর হইবেই হইবে এবং দুর্ব্বলতা দূর হইলেই কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

উত্তরাখণ্ডে কঠিন কেদার ও বদরী-বিশাল।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক।

কেদার হইতে যাত্রা করিয়া আমরা পূর্ব্বে গুপ্ত কাশী হইতে যে পথ দিয়া ৺কেদারনাথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই গুপ্তকাশীর এক মাইল উপর পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিলাম। এখানে একটী চটি আছে। ত্রিযুগী নারায়ণের ভিতর দিয়া ঐ চটিতে না আসিয়া উহার এক মাইল নীচে যে অন্য একটী অপেক্ষাকৃত সমতল রাস্তা আছে, সেই পথ দিয়া এখানে আসিলাম। অনন্তর ঐ চটি হইতে সোজা পথে পাহাড় ওৎরাই করিয়া অর্থাৎ উচ্চতর পর্ব্বত হইতে নিম্নতর পর্ব্বতে নামিতে নামিতে একেবারে মন্দাকিনীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূর্ব্বোক্ত পাকা-সেতু দিয়া নদী পার হইয়া পরপারস্থ পর্ব্বত চড়াই করিয়া ওখি মঠে পৌঁছিলাম। কেদার হইতে ওখি মঠ প্রায় ৪২ মাইল। ওখি মঠ একটী অত্যুচ্চ সুবৃহৎ পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। মঠের সম্মুখভাগটি দোতলা। নিম্নতলের ঘরসকলে অনেকগুলি বাসন, কাপড় ও বেনে মসলার দোকান আছে। মঠমধ্যে অনেকগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। কৈলাসনাথ মহাদেব এই মঠের প্রধান দেবতা। দাক্ষিণাত্যের এক জন জঙ্গম সাধু এই মঠের মোহান্ত। ইনিই আবার ৺কেদার-

নাথের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী ও মোহান্ত। ওখি মঠের মোহান্তজীর ঐশ্বর্য্য বড় কম নহে। এই মঠের মধ্যে একটী ঘরে ভূতপূর্ব্ব মোহান্তদিগেব মধ্যে কয়েকজনের আসন আছে। শীতকালে তুষার পড়িতে আরম্ভ হইলে পূজারিগণ ৺কেদারনাথের মন্দির বন্ধ করিয়া এই ওখি মঠেই প্রত্যাগমন করিয়া অবস্থান করেন। এবং তখন ঐ মঠেই উদ্দেশে ৺কেদারনাথের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। ওখি মঠে অনেক-গুলি লোকের বসবাস এবং এখানে পোষ্ট আফিস্ ও সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। ওখি মঠ যে কাহার প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিশ্চয় করা যায় না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের প্রতিষ্ঠিত।

ওখি মঠ দেখিয়া আমরা এবার বদরিনারায়ণের দিকে যাত্রা করিলাম। পথে দুর্গা চটির পরে ৺তুঙ্গনাথেব পাহাড়। ঐ পাহাড়ে উঠিতে হইলে সাত মাইল চড়াই করিতে হয়। আমরা ৪ মাইল চড়াই কবিয়া একটী চটিতে পৌছিলাম। দেখি-লাম, এই চটি হইতে একটী রাস্তা নিচে দিয়া ভিমঘোড়া নামক স্থানে এবং অপর একটী রাস্তা উক্ত পর্ব্বতের উপরে ৺তুঙ্গনাথের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা ঐ চটি হইতে বাকি ৩ মাইল পাহাড় চড়াই করিয়া তুঙ্গনাথ মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটী পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত, এ কারণ এখান হইতে অনেকদূর পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই জলের ঝরনা ও কুণ্ড আছে। মন্দিরটী পাথর নির্ম্মিত ও বেশ বড়। ভিতরে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি, পার্ব্বতী দেবী, নন্দী, গণেশ প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। প্রধান মন্দিরের বাহিরে আরও ২।৩টী ছোট ছোট মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তুঙ্গনাথ পঞ্চ কেদারের অন্যতম। তুঙ্গনাথের পাহাড়ে উঠিবার সময় এক প্রকার বড় বড় মাছি আমাদিগকে বড ব্যস্ত করিতে লাগিল। শুনিলাম, এই মাছি কামড়াইলে সেই স্থান হইতে প্রথম একবিন্দু রক্ত নির্গত হয়, পবে চুলকাইতে থাকে এবং ক্রমে ফুলিয়া পাঁচড়ার মত পাকিয়া উঠে। আমরা ৺তুঙ্গনাথ দর্শন করিয়া ঐ মন্দিরের পিছনের রাস্তা দিয়া ওৎরাই কবিয়া একেবারে বদবিনারায়ণেব রাস্তায়, ভিমঘোড়া চটিতে উপস্থিত হইলাম। তুঙ্গনাথ হইতে ভিমঘোড়া পর্য্যন্ত এই ওৎরাইটী অত্যন্ত বিকট, খুব সাবধানে নামা উচিত। ভিমঘোড়ার চটিটী বেশী বড় নয়—কয়েকখানি চালাঘরমাত্রে সম্পূর্ণ। এখানে পর্ব্বতগাত্রে একটী প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাই-লাম। স্থানীয় লোকে বলিল যে, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানকালে মহাবীর ভীমের এইখানে পতন হয় এবং তাঁহার মৃত শরীব ঐ গুহায় বা গহ্বরে সমাহিত হয়—এ কারণ ঐ স্থানেব নাম ভীমগুহা বা ভীমগাড়া হয়। পরে সাধারণ লোকে উহাকে

বর্ত্তমান নামে অভিহিত করে। গুহার নাম হইতে ঐ স্থানের নামও উহাই হইয়াছে। ভিমঘোড়া হইতে যাত্রা করিয়া পথে ৺সিদ্ধেশ্বর মহাদেব ও ৺গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করিয়া আমরা অলকনন্দার দক্ষিণ তীরে লালসাঙ্গা চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ওখি মঠ হইতে লালসাঙ্গা ২৭ মাইল।

লালসাঙ্গা গ্রামখানি অলকনন্দার বাম পাড়ে উচ্চ স্থানে অবস্থিত; যাত্রী থাকিবার চটিগুলি কিন্তু নদীর দক্ষিণ পাড়ে। চটি হইতে গ্রামে যাইবার জন্য অলকনন্দার উপর, দড়ির ঝোলা বা পুল আছে। উহার উপর দিয়া এককালে পাশাপাশি একজনের অধিক লোক যাওয়া যায় না। একটু বাতাস উঠিলে ঐ ঝোলা আবার দুলিতে থাকে; কাজেই সে সময় উহার উপর দিয়া লোক যাতায়াত বন্ধ করিতে হয়। আমাদের পরবর্ত্তী যাত্রীদের মুখে শুনিয়াছি যে, এখন ঐ স্থানে পাকা সেতু হইয়া গিয়াছে। লালসাঙ্গা গ্রামে পোষ্ট আফিস্‌, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং থানা আছে। কেদারবদরিনারায়ণের পথে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া যাত্রিগণের প্রায়ই নানা রকম অসুখ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হয়, এ কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই পথে, স্থানে স্থানে রোগিগণের শুশ্রূষার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিয়াছেন। লালসাঙ্গা গ্রাম হইতে অলকনন্দার বাম তট দিয়া মেহেল চটিতে যাইতে হয়। যাত্রীরা ৺বদরিনারায়ণ দেখিয়া ঐ পথে ফিরিয়া যায়। পূর্ব্বে লালসাঙ্গা গ্রাম অলকনন্দা তীরেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু ঘোনা হ্রদের জলপ্লাবনে ঐ গ্রাম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, পাহাড়ের উপর বর্ত্তমান গ্রামখানি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। লালসাঙ্গার অদূরেই ঘোনা হ্রদ অলকনন্দার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। নদীর গর্ভে উক্ত হ্রদের একটি পাড় ধস্ ভাঙ্গিয়া নদীর মাঝামাঝি বাঁধের মত পড়ায়, অলকনন্দা নদীর স্রোত প্রায় নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং নদীর জলে ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া ঘোনা হ্রদ ভীষণাকার ধারণ করে। নিত্য বর্দ্ধনশীল জলের ঠেলায় ঐ বাঁধ একদিন নদীর স্রোতে সহসা ভাসিয়া যাইল এবং বহুকালের নিরুদ্ধ জলরাশি এককালে নদীগর্ভে পতিত হইয়া ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত করিল। ইহাতে অলকনন্দা তীরস্থ পূর্ব্বেকার অনেক গ্রাম ও বসবাস নষ্ট হইয়া যায়।

আমরা লালসাঙ্গার চটিতে সেদিন থাকিয়া, পরদিন প্রাতে এখান হইতে যাত্রা করিলাম এবং দুপুর বেলায় পিপুল চটিতে পৌছিলাম। পিপুল চটিটী বেশ বড়। চটিতেই ২০।২৫ ঘর স্থানীয় লোকের বাস। আমরা এখানে আহারাদি করিয়া দুপুর বেলায় একটু বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন করিলাম।

নিদ্রা ভাঙ্গিলে বৈকালে পুনরায় যাত্রা করিবার সময় দেখি যে, আমাদের ভাত রাঁধিবার পিতলের হাঁড়িটি যাহা দুপুর বেলায় আহারাদির পর আমরা মাজিয়া ধুইয়া পার্শ্বে রাখিয়া শুইয়াছিলাম, তাহা তথায় নাই! চটিওয়ালা দোকানদারকে ঐ কথা বলিলে সে বলিল যে, 'আমিও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, হাঁড়ি কে লইয়াছে, জানি না।' দোকানদার আরও বলিল যে, যদি কোন যাত্রী চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর পাওয়া যাইবে না, নচেৎ স্থানীয় অপর কোন দোকানদার যদি নিজ যাত্রীর জন্য উক্ত হাঁড়ি ঐ চটিওয়ালার মনে করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়া থাকে, তবে উহা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে; কারণ, পাহাড়ী লোকের চুরি করা অভ্যাস নাই। যাহা হউক, উহা পাইবার আশা আমরা এক রকম ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু এখানে পাঠককে বলা উচিত যে, দোকানদার যাহা বলিয়াছিল, সত্য সত্যই আমরা পরে তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম! বদরিনারায়ণ হইতে ফিরিবার সময় উক্ত দোকানী আমাদিগকে ঐ হাঁড়ি ফিরাইয়া দিয়াছিল! তখন তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, যথার্থই উক্ত হাঁড়ি অপর চটিওয়ালা, আমাদের চটিওয়ালার হাঁড়িবোধে ভ্রমক্রমে লইয়া গিয়াছিল! পাহাড়ে চটিওয়ালারা আপন আপন যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যাদি কখন কখন না বলিয়াও লইয়া যাইয়া থাকে, এরূপ প্রথা আছে। কিন্তু বাস্তবিকই এখনও এই পাহাড়িদের মধ্যে চুরি রোগ প্রবেশ করে নাই। ইহাদের এতদূর সরল বিশ্বাস যে, যাত্রিগণ চটিতে উপস্থিত হইলে, এখনও ইহারা প্রথমে পয়সা না লইয়া তাহাদিগকে চাল, দাল, আটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি দিয়া থাকে; এবং যাত্রিগণ খাওয়াদাওয়ার পর কিম্বা ঐ স্থান হইতে অন্যত্র গমনকালে যাহার যখন ইচ্ছা, উক্ত দ্রব্যের মূল্য দিয়া থাকে। এমন কি কোন্ যাত্রীকে কত পয়সার দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে তাহাও সকল সময় মনে না থাকায়, যাত্রী স্বয়ং উহাদের যাহা প্রাপ্য হইয়াছে বলে, তাহাই যথার্থ বলিয়া উহারা গ্রহণ করিয়া থাকে! মানুষের প্রতি মানুষের এরূপ বিশ্বাস ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে হিন্দুদের সম্বন্ধে এরূপ গল্প পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখানে উহা যথার্থই প্রত্যক্ষ করিলাম। বোধ হয়, বৈদেশিক জাতির সংসর্গ অধিক না হওয়াতেই এখানে হিন্দু চরিত্রের এই খাঁটি ভাবটুকু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পিপুল চটি হইতে ২ মাইল দূরে যাইলে গরুড়গঙ্গা নামক একটী প্রকাণ্ড ঝরণার নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে গরুড় ভগবানের মন্দির ও গরুড়-

গঙ্গার জলস্রোত যথায় পতিত হইতেছে, তথায় বাঁধ দিয়া একটী কুণ্ডের মত করিয়া রাখা আছে। এই কুণ্ড হইতে সাধু ও যাত্রিগণ ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া বদরিকাশ্রমে অবস্থিত গরুড় শিলা নামক পর্ব্বতগাত্রে স্পর্শ করাইয়া লইয়া নিকটে রাখিয়া দেয়। প্রবাদ এই যে, ঐ প্রস্তরখণ্ড নিকটে থাকিলে আর সর্পভয় থাকে না। গরুড়গঙ্গা হইতে আমরা গোপাল চটি হইয়া পাতালগঙ্গায় উপস্থিত হইলাম। এখানে পোল পার হইলেই পরপারে চটি আছে। চটি হইতে পাতালগঙ্গার জল অনেক নীচু—দেখিলেই বোধ হয়, যেন যথার্থই পাতাল দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে। আমরা পাতালগঙ্গা হইতে যাত্রা করিয়া পথে কুমার চটি পার হইয়া কিছুদূর আসিয়া দেখি যে, রাস্তা দুই দিকে বিভক্ত হইয়াছে। শুনিলাম, উপরের রাস্তায় যাইলে জ্যোসী মঠে যাওয়া যায় এবং নিচের রাস্তা বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগ গিয়াছে। অতঃপর আমরা উপরকার রাস্তা দিয়া চড়াই করিয়া জ্যোসী মঠে উপস্থিত হইলাম।

জ্যোসী মঠ একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। উহা একটী ছোট খাট সহর বিশেষ এবং গাড়োয়ালের একটী সবডিবিসন্। এ কারণ এখানে সরকারি জেল-খানা, কাছারী, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট আফিস্, পুলিস প্রভৃতি এবং সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান, এমন কি, পোদ্দারের দোকান পর্য্যন্ত আছে। এখানে অনেক লোকের বসবাস ও পাকাবাটী যথেষ্ট আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত জ্যোসী মঠ প্রস্তর ও কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহার তিন দিকে দোতলা কোটা ও এক দিকে মন্দির আছে। এখানে শঙ্করাচার্য্যের গদি এবং নৃসিংহজী মূর্ত্তি ও অপরাপর কয়েকটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এক সময় শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত এই জ্যোসী মঠের নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন সে গৌরবের কিছুই নাই। এমন কি, শঙ্করসম্প্রদায় হস্তেও এখন আর ঐ মঠ নাই—অপর সম্প্রদায়স্থ সাধুরাই এখন ঐ মঠের সত্ত্বাধিকারী। শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারি মঠের মধ্যে এই জ্যোসী মঠ, পূর্ব্বে দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি, পর্ব্বত ও সাগর নামধারী সন্ন্যাসি-বৃন্দের হস্তে ছিল। এইরূপ দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গগিরী বা শৃঙ্গেরি মঠ, উক্ত সম্প্রদায়ের পুরী, ভারতী ও সরস্বতী; দ্বারকায় সারদা মঠ, তীর্থ ও আশ্রমের এবং শ্রীক্ষেত্রের গোবর্দ্ধন মঠ, বন ও অরণ্য উপাধিধারীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল বলিয়া কথিত আছে। জ্যোসী মঠের বাহিরে একটী ঝরনার জল ধাতুনির্ম্মিত ২।৩ টী পশুমুখ মধ্য দিয়া নির্গত হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোসী মঠের কিছু দূরেই একটী খুব প্রাচীন দেবীমন্দির আছে। মন্দির মধ্যগত দেবীমূর্ত্তি অধুনা বিকৃত অবস্থায়

পড়িয়া আছে। শীতকালে বদরিনারায়ণে তুষারপাত হইতে আরম্ভ হইলে, তথাকার পূজারিগণ বদরিনারায়ণের মন্দির বন্ধ করিয়া, এই জ্যোসী মঠে ফিরিয়া আসেন এবং সমুদায় শীতকাল এই জ্যোসী মঠেই ৺বদরিনারায়ণের উদ্দেশে পূজা করেন। জ্যোসী মঠ হইতে তিব্বতের মানস-সরোবরে যাইবার একটি পথ আছে। শুনিলাম, এখান হইতে তিব্বত প্রদেশে গমন করা এই পথেই সর্ব্বাপেক্ষা নিকট।

আমরা জ্যোসী মঠ দেখিয়া এখান হইতে দেড় মাইল ওৎরাই করিলাম। পরে একটী কাঠের পোলের দ্বারায় বিষ্ণুগঙ্গা পার হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। লালসাঙ্গা হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ ২৮ মাইল। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা ও মন্দাকিনী সঙ্গম। সঙ্গমের উপরেই একটী নবপ্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দির। ঐ মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া একটী পাথরের সিঁড়ি সঙ্গমের জল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সিঁড়ির দুই দিকে জল পর্য্যন্ত লোহার মোটা শিকল লাগান আছে। যাত্রিগণ ঐ শিকল ধরিয়াই সঙ্গমে স্নান করে। কারণ, এখানে নদীর জল খুব প্রবলবেগে বহিতেছে, ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা এই জলে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলাম। পরে আহারাদির পর এখান হইতে বাহির হইয়া ৮ মাইল পরে পাণ্ডুকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেকগুলি চটি আছে এবং চটির বাজারটি নিতান্ত ছোট নয়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে শিবলিঙ্গ ও অপরাপর দেবদেবী মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে স্বর্ণ নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি। প্রবাদ এই যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে ঐ মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। মন্দিরের আশে পাশে ৪।৫ খানি পাথরের কোটাবাড়ি আছে। আমরা পাণ্ডুকেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া পথে হনুমান চটিতে অবস্থান করিলাম। পরে ৯ মাইল দূরে একটী কাঠের সেতু যোগে অলকনন্দা পার হইয়া বদরিনারায়ণে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে এই অলকনন্দা নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"ভগবান বিষ্ণু, বলিরাজের যজ্ঞে গমনান্তর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন পাদক্ষেপ করেন, তখন দক্ষিণচরণে ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন ঊর্দ্ধদিকে বামপদ উৎক্ষেপণ করিতে যাইবেন, অমনি তদীয় বামপদের অঙ্গুষ্ঠ নখে অণ্ডকটাহের উপবিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া একটী ছিদ্র হইল। ঐ ছিদ্র দিয়া এক জলধারা নির্গত হইয়া সহস্র যুগ পরিমিত কাল স্বর্গে পতিত হইয়াছিল। সাক্ষাৎ বিষ্ণুর পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঐ ধারা স্বর্গে 'ভাগীরথী', 'জাহ্নবী', প্রভৃতি নাম ভিন্ন অন্যান্য নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদই স্বর্গের মস্তক। ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ 'ইঁহার তীরে তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি হয়—ইঁহা অপেক্ষা আর

কোন নদীই বড় নহে'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্ব স্ব জটাসমূহের দ্বারা ঐ গঙ্গাকে ধারণ করিতেছেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ঐ স্থান হইতে আকাশপথদ্বারা অবতীর্ণ হইয়া, চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া প্রথমে সুমেরুমস্তকস্থ ব্রহ্মসদনে পতিত হন। তথায় পৃথক্ পৃথক্ নামে চারি ধারায় বিভিন্ন হইয়া চারি দিকে গমন পূর্ব্বক সরিৎপতি সাগরে প্রবিষ্টা হইয়াছেন। সেই চারিটী ধারার নাম—সীতা, অলকনন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে অলকনন্দা ব্রহ্মসদনের দক্ষিণে অনেকানেক পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম পূর্ব্বক অদম্য তীব্রবেগে হেমকূটে প্রবাহিতা হন। তথা হইতে সমগ্র উত্তর ভারত-বর্ষ ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণ দিকে লবণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে স্নানার্থ আগমনশীল পুরুষের পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদির ফল দুর্ল্লভ হয় না।" আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে অলকনন্দা তিব্বতের মানস-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া, হিমালয়ের মধ্য দিয়া আসিয়া, ভারতবর্ষ প্লাবিত করতঃ দক্ষিণ সমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বদরিনারায়ণ বা বদরিকাশ্রমস্থ ৺নারায়ণের মন্দির এই অলকনন্দার দক্ষিণ তটে সমুদ্রজল হইতে দশ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে পূর্ব্বে ব্যাস ও অপরাপর অনেক মুনি ঋষিগণের আশ্রম ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য উদ্ধব, ভগবানের দেহত্যাগের পর তাঁহার আজ্ঞামত এই স্থানে আসিয়া, তপস্যা করিয়াছিলেন। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে অর্জ্জুন যখন স্বর্গে দেবরাজের নিকট অস্ত্র শিক্ষার্থ গমন করেন, তখন যুধিষ্ঠিরাদি এখানে অনেক দিবস বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটেই অর্জ্জুন, কিরাতরূপী মহাদেবকে বাহুযুদ্ধে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন কত যে রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। বদরিকাশ্রম, পর্ব্বতকোলে অলকনন্দাতীরে লম্বাভাবে অবস্থিত। অলকনন্দার পরপারেও অপর একটী উচ্চ পর্ব্বত অবস্থিত। নদীর দুই দিকের দুইটী পর্ব্বতই অত্যুচ্চ—আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডাগণ ইহার একটীকে "নর" ও অপরটীকে "নারায়ণ" বলে। বদরিনারায়ণে যাত্রীদের থাকিবার জন্য পাণ্ডাদের নির্ম্মিত অনেকগুলি বাটী আছে। তদ্ভিন্ন এখানে ধরমশালা, ছত্র, সকল দ্রব্যের দোকান, পোষ্ট আফিস, থানা প্রভৃতিও আছে। বদরিনারায়ণের মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত এবং এখানকার অন্য সকল বাটি অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত। মন্দিরের উপরিভাগ কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং শিখরদেশ স্বর্ণনির্ম্মিত কলসে শোভিত। রাস্তা হইতে একটী সিঁড়ি দিয়া উঠিলে এই মন্দিরের প্রকাণ্ড দ্বারে পৌঁছান যায়।

দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ; এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ঘর ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ ঘরে অবস্থিত, প্রাঙ্গণমধ্যে বদরিনারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটী আন্দাজ ৩০ হাত উচ্চ হইবে। মন্দিরের বাহিরের যাত্রিগণের প্রবেশ করিবার জন্য দুই দিকে দুইটি দ্বার আছে। ভিতরের ঘরের মধ্যস্থলে শ্যামপাষাণের নির্ম্মিত চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি বেদিকার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বিরাজিত। শ্রীমূর্ত্তি সুবর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কারে ভূষিত। মুকুটে বজ্রমণি শোভা পাইতেছে এবং মূর্ত্তির ভিতর হইতে যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মস্তকের উপর সুবর্ণ নির্ম্মিত ও মুক্তার ঝালর শোভিত ছত্র শোভা পাইতেছে। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী সুবর্ণমণ্ডিত আসাসোটা দাঁড় করান আছে। পূজার দ্রব্যাদি সমুদায় সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত। শ্রীমূর্ত্তি ঈষৎ ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন, এই মূর্ত্তি পরশপাথরে নির্ম্মিত। ৺বদরিনারায়ণের মূর্ত্তির পার্শ্বে ব্রহ্মা, গণেশ, প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। ঘরটী কিছু অন্ধকার। আমরা যখন দর্শন করিতে যাই, তখন শৃঙ্গার আরতি হওয়ায় শ্রীভগবানের রূপ বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বের একটী ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী দেবী প্রতিষ্ঠিতা। তৎপার্শ্বেই ভোগ রসুয়ের মহল। ৺বদরিনারায়ণের খিচুড়ি ও অন্নভোগ হইয়া থাকে এবং শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও সকল জাতি একত্র মিলিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রসাদী অন্নই শুকাইয়া, মহাপ্রসাদ করিয়া যাত্রিগণ দেশে লইয়া আসে। মন্দিরে এখন মালাবারের ব্রাহ্মণেরা পূজা করেন। ব্যয়ের জন্য গাড়োয়ালে ১৭৫ ও কুমায়ুনে ৫৬ খানি দেবোত্তর গ্রাম আছে। ঐ সকলের বার্ষিক আয় প্রায় ২ হাজার টাকা। এখানকার প্রধান পূজারিকে রাওল কহে। দেওয়ালীর দিন মন্দিরে দীপ দান করিয়া পূজারিগণ এই মন্দির বন্ধ করিয়া পাণ্ডুকেশ্বর ও জ্যোসী মঠে চলিয়া আসেন। বদরিনারায়ণ কাহার প্রতিষ্ঠিত বা এই মন্দির কাহার নির্ম্মিত, সে বিষয় এখানকার পাণ্ডারা বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। প্রবাদ এইরূপ যে, শঙ্করাচার্য্য জল হইতে তুলিয়া এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; কিন্তু স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে রামানুজ সম্প্রদায়ের ইতিহাসের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, "এই রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণু, লক্ষ্মী, রাম, কৃষ্ণ এবং অন্য অন্য মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। দক্ষিণা পথে লক্ষ্মী বালাজী, রামনাথ ও রঙ্গনাথ, উৎকলে জগন্নাথ, হিমালয়ে বদরিনাথ এবং দ্বারকাদি অন্য অন্য তীর্থস্থানে অনেকবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে"।

মন্দিরের ফটক দিয়া বাহির হইয়া অলকনন্দার জলে যাইতে বাম পার্শ্বে একটী গুহার মধ্যে গরুড় শিলা আছে। গরুড়গঙ্গা হইতে আনীত নুড়িসকল যাত্রিগণ এই শিলায় স্পর্শ করাইয়া লয়। এই স্থানের নিকটই তপ্তকুণ্ড নামক চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান একটি কুণ্ড আছে। উহার মধ্যে ধাতুনির্ম্মিত দুইটী পশুমুখ দিয়া দুইটী ঝরনার জল আসিয়া পড়িতেছে। একটীর জল ঠাণ্ডা, অপরটীর জল খুব গরম। এই উভয় জল মিলিত হওয়ায় তপ্তকুণ্ডের জল বেশ সুখ-উষ্ণ হইয়াছে। যাত্রিগণকে এখানে স্নান ও পূজাদি করিতে হয়। তপ্তকুণ্ড হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে কিছুদূর যাইলেই ব্রহ্মকপালী নামক একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর অলকনন্দা-জলে উপদ্বীপের ন্যায় রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে যাত্রিগণকে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতে হয়। এখানে ৺বদরিনারায়ণের প্রসাদী অন্ন ও তুলসী-পত্র দ্বারায় পিণ্ডদান হইয়া থাকে। উত্তরাখণ্ডের ইহাই গয়াক্ষেত্র। পাণ্ডারা বলে, এই স্থানে পিণ্ডদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মকপালির উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ কথিত আছে—পূর্ব্ব কল্পে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার দেহ হইতে প্রথমে সনক, সনন্দ প্রভৃতি, পরে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এবং দেবগণের উৎপত্তি হয়। শেষে বাক্ নামে একটী মনোহারিণী কন্যা উৎপন্ন হয়। তিনি ব্রহ্মার মনহরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যাকে কামনা করিলে, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ পিতার এই প্রকার অধর্ম্ম প্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। পুত্রদের অনুরোধে ব্রহ্মা প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু স্বীয় অন্যায় চেষ্টায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া পুত্রদের সমক্ষেই আপনার তৎকালিক তনু ত্যাগ করিলেন। সেই দেহ পৃথিবীতে পতিত হইলে এই স্থানে তাহার মস্তক পতিত হয়। এ কারণ ইহার ব্রহ্ম-কপালি নাম হইয়াছে।

এই স্থানের সমসমান অপর পারেই ব্যাসগুহা। তথায় যাইতে হইলে সেতু-যোগে নদী পার হইয়া অলকনন্দার ধারে ধারে দুই মাইল উপর দিকে যাইতে হয়। আমরা তথায় না যাইয়া অলকনন্দার এপার হইতেই দূরে পর্ব্বতগাত্রে ব্যাসগুহা দেখিয়াই সন্তুষ্ট রহিলাম। শুনিলাম, গুহার মধ্যে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি নাই। বদরিনারায়ণের মন্দির হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে উপরে আর একটু যাইলেই বাঁহাতি পর্ব্বতকোলে নন্দ, যশোদা প্রভৃতি কয়েকটী ভগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা বলেন, এখানে নন্দ, যশোদা তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটই অলকনন্দা পার হইবার একটী কাঠের সেতু আছে। ঐ সেতু দিয়া অলকনন্দা পার হইলেই মানা গ্রাম। এখানে ২০।২৫ ঘর লোকের

বাস ও ২।৩টী দেবমন্দির আছে। মানা গ্রামের পরই অলকনন্দার বাম তটে পাহাড়ের উপর কয়েকটী দেবমন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। পাণ্ডারা বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে কোন মুনি ঋষির আশ্রম ছিল। এই স্থান হইতে ১ মাইল যাইলে বসুধারা জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তিন চারি শত হাত উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে একটী ঝরণার জল অনেকগুলি ধারায় বিভক্ত হইয়া ঠিক সোজাভাবে এককালে নিচে পতিত হইতেছে। ঐ জলধারা যেখানে পতিত হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত ধোঁয়া বা কুয়াসার ন্যায় জলকণায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জলপ্রপাতের নিকটেই বসুদেব ও দেবকীর মূর্ত্তি আছে। এখানে অনেক সাধুসন্ন্যাসী এবং যাত্রিগণ স্নান করিতে আসেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিক্ কেবল বরফে আচ্ছন্ন। উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিলে আর বড় একটা পর্ব্বত দেখা যায় না, বোধ হয়, যেন হিমালয়ের এদিককার পর্ব্বতমালার শেষ সীমায় আসিয়াছি। এখান হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে কৈলাস ও মানস-সরোবর যাইবার রাস্তা আছে; ইহাকে মানা পথ বলে।

বদরিনারায়ণ হইতে বসুধারা ৫।৬ মাইল পথ। বদরিনারায়ণে খুব শীত কিন্তু কেদারনাথ অপেক্ষা শীত কম বলিয়া আমার বোধ হইল। এখানে প্রতি বৎসর ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার যাত্রী দর্শনার্থ আগমন করে। আমরা বদরিনারায়ণে তিন দিবস থাকিয়া, এখানকার তীর্থস্থান সকল দেখিয়া, লালসাঙ্গা হইতে যে পথে এখানে আসিয়াছিলাম, পুনরায় সেই পথেই এখান হইতে ফিরিলাম। আমরা আসিবার সময় জ্যোসী মঠ দেখিয়া আসিয়াছিলাম, এ কারণ ফিরিবার সময় বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে উপরের রাস্তা দিয়া জ্যোসী মঠ হইয়া না আসিয়া নিচের রাস্তা দিয়া কুমার চটি হইয়া লালসাঙ্গায় উপস্থিত হইলাম।

বদরিনারায়ণ হইতে লালসাঙ্গা ৪৫ মাইল। আমরা অলকনন্দার দক্ষিণ তটস্থিত লালসাঙ্গার চটিতে আহারাদি করিয়া অদূরে দড়ির ঝোলা বা পুল পার হইয়া অলকনন্দার বাম তট দিয়া নন্দপ্রয়াগের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে কপিল চটি পার হইয়া লালসাঙ্গা হইতে ১৬ মাইল দূরে নন্দপ্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে অলকনন্দার সহিত নন্দা নদীর সঙ্গম হইয়াছে। যাত্রীদিগকে এই সঙ্গমস্থলে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। নন্দপ্রয়াগের বাজারটী বেশ ভাল। এখানে সকল প্রকার জিনিষপত্র পাওয়া যায়। বাজার মধ্যে মহাদেবের মন্দির আছে। আমরা এখান হইতে একটী পাকা সেতু দিয়া নন্দা নদী পার হইয়া কর্ণপ্রয়াগের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে নরসিংহ চটি,

একটী ভগ্ন বহুকালের পুরাতন মঠ বা আশ্রম এবং কাঙ্কা চটি পার হইয়া কর্ণপ্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ হইতে ১১ মাইল দূর ও লালসাঙ্গা হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অলকনন্দার সহিত কর্ণগঙ্গা বা পিণ্ডার নদীর সঙ্গম হইয়াছে। কেদারবদরীনারায়ণের পথে পঞ্চ-প্রয়াগের মধ্যে ইহাই শেষ প্রয়াগ। আমরা প্রথমে সঙ্গমস্থানে যাইয়া স্নানাদি করিলাম। সঙ্গমস্থলের উপরেই কর্ণবীরের এক প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির আছে। আমরা এই সকল দেখিয়া, এখান হইতে একটী পাকা সাঁকো দিয়া কর্ণগঙ্গা পার হইয়া, পরপারে চটিতে পৌছিলাম। কর্ণপ্রয়াগে অনেকগুলি দোকান আছে। বাজারে ভাল মিষ্টান্নও পাওয়া যায়। এখানে থানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রভৃতি আছে। কর্ণগঙ্গাই গড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলার সীমানা। কর্ণগঙ্গার পর হইতেই কুমায়ুন জেলা আরম্ভ। আমরা, কর্ণপ্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া, কুমায়ুন জেলার মধ্য দিয়া পাগলি চটি, আদ-বদরী, আকরোট চটি প্রভৃতি হইয়া, কর্ণপ্রযাগ হইতে ২৯ মাইল দূরে মেহেল চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথে আদ-বদরী বা আদিবদরীর মন্দির, প্রস্তরনির্ম্মিত ও খুব বড। মন্দিরমধ্যে বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, এবং মন্দিরমধ্যে ও বাহিরের প্রাঙ্গণে অপর অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। হিমালয়ের পঞ্চ-বদরীর মধ্যে এই আদ-বদরী অন্যতম।

মেহেল চটিতে পৌছিলে আমাদের পূর্ব্বনিযুক্ত মুটে, তাহার মজুরি লইয়া, বিদায় হইল এবং ঐখান হইতে কাটগুদাম যাইবার জন্য আমরা নূতন মুটে নিযুক্ত করিলাম। মেহেল চটি হইতে কাটগুদাম ৭২ মাইল। আমরা মেহেল চটি হইতে যাত্রা করিয়া পথে রামপুর হইয়া বেতালি চটিতে উপস্থিত হইলাম। এই চটির নিকটেই আদি কেদার বা আদ-কেদারের মন্দির অবস্থিত। ইহা হিমালয়ের পঞ্চ-কেদারের মধ্যে একটী কেদার। আমরা আদ-কেদার দেখিয়া এখান হইতে যাত্রা করিলাম। খানিক পথে আসিয়াই রাণীখেৎ নামক ইংরাজদের সেনা-নিবাস স্থান দেখিতে পাইলাম। এখান হইতে একটী রাস্তা রাণীখেৎ মধ্য দিয়া কাটগুদাম গিয়াছে। এই পথে যাইলে ১৫।১৬ মাইল রাস্তা কম হয় এবং এক দিন পূর্ব্বে যাত্রিগণ কাটগুদাম পৌছিতে পারে। কিন্তু পল্টনমধ্যে পাছে কোন সংক্রামক রোগ প্রবেশ করে, এজন্য রাণীখেতের মধ্য দিয়া যাত্রিগণকে যাইতে দেয় না। এ কারণ এই পথের মুখে একটী চৌকিঘর বা থানা আছে। এই থানার লোকে আমাদিগকে রাণীখেৎ দিয়া যাইতে নিষেধ করায়, আমরা ঘোর

পথে কাটগুদাম যাত্রা করিলাম। পথে রেউনী, সায়েদদেবী, কাকরী ঘাট, খায়েরণা গরমপানি, ভোয়ালী প্রভৃতি চটি হইয়া ভীমতালে উপস্থিত হইলাম। রাণীখেৎ হইতে ভীমতাল আসিতে আমরা দুরবর্ত্তী পর্ব্বতের উপর আলমোড়া সহর দেখিতে পাইলাম। ভীমতালে আসিবার পথের মধ্য হইতে কুমায়ুনের রাজধানী আলমোড়া সহর ও নইনিতাল সহরে যাইবার জন্য দুইটী পৃথক্ রাস্তা আছে, দেখিলাম।

ভীমতাল একটী প্রকাণ্ড সরোবর। ইহার চতুর্দ্দিক্ ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা। এক পারে একটী বড় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে সাহেবদের কয়েকটী বাঙ্গালা আছে। আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া একেবারে কাটগুদামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাটগুদাম, আউদ রোহিলখণ্ড রেলের বাঁশ বেরেলী জংসন হইতে যে শাখা পথ আছে, তাহারই শেষ ষ্টেশন। এখানে সাহেবদের ৩।৪টী হোটেল আছে, কিন্তু হিন্দু যাত্রীদের থাকিবার বড়ই অসুবিধা। কেদার-বদরীর রাস্তায়, বিশেষতঃ গড়োয়াল জেলায়, ভাল ফল মূল এবং শাক সবজী বড় একটা পাওয়া যায় না; তবে চুরী নামক এক রকম বৃক্ষ আছে, ইহার ফল পিয়ারার মত এবং খাইতে সুমিষ্ট। কিন্তু কুমায়ুন জেলায় পীচ্, সেও বা আপেল প্রভৃতি ফল এবং শাক সবজী যথেষ্ট পাওয়া যায়। উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ের ফাটে, মধ্যে মধ্যে একরূপ আঠা পাথর চুয়াইয়া পড়ে। উহাকে ইংরাজেরা বিটুমেন ও বৈদ্যেরা শিলাজতু বলে। এখানে জহরমুরা নামক এক রকম পাথর ও জটামাংসীও পাওয়া যায়; এই দুই পদার্থও বৈদ্যেরা ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। গড়োয়াল অপেক্ষা কুমায়ুনের লোকেরা অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সভ্যভব্য।

কাটগুদামে রেলগাড়ি চড়িয়া আমরা নগাধিপ হিমবান্‌কে সভক্তি প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার অভ্যন্তরে প্রকৃতির যে বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য এতদিন দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহা আর জীবনে হয়ত দর্শন হইবে না ভাবিয়া, বিষণ্নচিত্তে তাঁহাকে শেষ দর্শন করিতে লাগিলাম। রেলগাড়ি কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ঐ ভাবের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার পবিত্র দর্শন আমাদিগের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত করিল এবং উন্মত্ত সংসারের অর্থশূন্য তাণ্ডব নৃত্যের ভিতর আনিয়া ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল।

শঙ্কর-প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]　　[শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

উদ্বোধনে আচার্য্য শঙ্করের প্রসঙ্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়া শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য নানা কারণে উহা এতদিন সমাপ্ত করিতে পারি নাই। অদ্য ঈশ্বরেচ্ছায় আবার সেই কার্য্যে ব্রতী হইলাম। শঙ্করের জন্মভূমি পর্য্যন্ত গিয়াই পাঠকের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন সেইখান হইতেই আবার প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলাম। এবার যত শীঘ্র পারি, ইহা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা আছে। তবে উদ্বোধনের স্থান-সঙ্কীর্ণতার জন্য বোধ হয় এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইতে আরও তিন চার সংখ্যা লাগিবে।

শঙ্করের জন্মভূমি কালাডি হইতে ত্রিচুরে ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে বন্ধুবর কুঞ্জন মেনন ও তাঁহার মামাত ভাই। ত্রিচুরে ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর আর আমাকে সে ব্রাহ্মণের হোটেলে থাকিতে দিলেন না, নিজের বাগান বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, সুতরাং আমিও হোটেল হইতে আমার জিনিষ পত্র উঠাইয়া আনিলাম। কুঞ্জন মেনন জাতিতে নায়ার ও শিক্ষিত; তাঁহার ইচ্ছা— আমার সঙ্গে একত্র আহারাদি করেন কিন্তু মাতুলের ভয়ে ও সমাজ শাসন স্মরণ করিয়া, তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইত না। যাহা হউক, তাঁহার বাটীতে কালাডি হইতে ফিরিয়া দুই দিন মাত্র ছিলাম। দিনে ও রাত্রে সেই ব্রাহ্মণের হোটেলে অন্নভোজন করিয়া, সকাল বিকালে ফল, মূল ও দুগ্ধ ইত্যাদি বন্ধুবরের বাটীতে খাইতাম। কারণ, না খাইলে বন্ধুবর বড়ই দুঃখিত হইতেন। এই সময় বন্ধুবরের সঙ্গে ইঁহাদের জাতীয় কথা সমুদায় শুনিতাম এবং ইঁহার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে শঙ্কর সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদসমূহ সংগ্রহ করিতাম। এই সমস্ত সংবাদের অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বেই পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিয়াছি; যেগুলি বলা হয় নাই, সেইগুলি এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহার মধ্যে একটী অপূর্ব্ব সংবাদ এই যে, আচার্য্য শঙ্কর স্বদেশের জন্য একখানি স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ইহা তথায় শঙ্করস্মৃতি বা "লঘুধর্ম্মপ্রকাশিকা" গ্রন্থ নামে পরিচিত। আমাদের দেশে যেমন রঘুনন্দন, বেহারে যেমন বাচস্পতি মিশ্র, আরও

পশ্চিমে যেমন বিজ্ঞানেশ্বর, মালাবার প্রদেশে তদ্রূপ শঙ্কর। বইখানির কথা শুনিয়াই উহা দেখিতে চাহিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ উহা স্বগৃহ হইতে আনিয়া আমায় দেখাইলেন। এই গ্রন্থখানি ৪ অধ্যায়ে চারি চারি পাদে বিভক্ত, এবং স্মৃত্যুক্ত যাবতীয় কথা এই ১৬ পরিচ্ছেদের মধ্যে কৌশলক্রমে সজ্জিত। ইহা এখনও ছাপা হয় নাই। নম্বুরী ভিন্ন এ গ্রন্থ অপরের প্রাপ্য নহে; পণ্ডিত মহাশয় নম্বুরী ব্রাহ্মণ না হইলেও ইহা বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, নম্বুরিগণের নিকট এইরূপ অনেক অমূল্য গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহারা প্রাণান্তেও উহা অপরকে দিবে না। এজন্য উহা সংগ্রহ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হয নাই। নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের এতাদৃশ কৃপণতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা ভারতীয় সমাজতত্ত্ব আলোচনাকারীব নিকট খুব প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের এতাদৃশ কৃপণতার কারণ যে কেবল গোঁড়ামি, তাহা নহে। অনধিকারীর হস্তে উচ্চ জিনিষের মর্য্যাদাহানির ভয় অনেক সময় এতাদৃশ কৃপ-ণতার কারণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এস্থলে শুধু তাহাই নহে। শুনিলাম, নম্বুরিগণ নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবাব জন্য ও নায়ারদিগকে সমাজে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য এই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন না। ত্রিচূরের মঠ তিনটীতে এবং কোচিন ও কালিকাটের রাজার বাটীতে এখনও অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে। ঐগুলিতে নায়ার ও নম্বুরিগণেব প্রাচীন ইতিহাস বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইলে পাছে তাহাদের সমাজে বর্ত্তমান প্রাধান্য কমিয়া যায়, এই কারণে ঐগুলি প্রকাশ কবিতে নম্বুরিগণ নারাজ। শুনিলাম—আচার্য্য শঙ্করের নামে ইঁহারা অনেক বিষয় আরোপ করিয়া নিজ কার্য্য সাধন কবিয়া থাকেন। আচার্য্যের পরবর্ত্তী অনেক সমাজনেতা আচার্য্যের নামে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া দিয়াছেন। শঙ্করস্মৃতি গ্রন্থখানিও যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ নহে, এই সব কথা শুনিয়া তাহাতে আমার সন্দেহ জন্মিল। বলিতে কি, পণ্ডিত মহাশয়ও আমারই দলভুক্ত।

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পারিলাম। এটী এদেশের প্রাচীন ঘটনা স্মরণ রাখিবার একটী সাঙ্কেতিক কৌশল। ইঁহারা বিভিন্ন অক্ষর দ্বারা বিভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া, সেই অক্ষরসমূহকে একত্রিত করিয়া, এক একটী শব্দ প্রস্তুত করেন। সেই শব্দটীর অর্থ করিলে ও শব্দটীর অবয়ব-স্বরূপ অক্ষরগুলি দ্বারা সূচিত সংখ্যা বাহির করিলে বুঝাইবে—কলির আরম্ভ-

দিন হইতে কতদিন পরে উক্ত শব্দনির্দ্দিষ্ট ঘটনাটী হইয়াছে। এই প্রথানুসরণে ইঁহারা শঙ্করাচার্য্যের সময়, বড় বড় রাজার সময় প্রভৃতি স্মরণ করিয়া রাখেন। আচার্য্য শঙ্করের সময় জ্ঞাপক শব্দ যাহা শুনিলাম, তাহা এই—"আচার্য্যবাগভেদ্যা"। ইহা হইতে পাওয়া যায় ১৪৩৪১৬০ সংখ্যা। অর্থাৎ কলির অত দিন অর্থাৎ ৩৯৩২ বৎসর পরে আচার্য্যের ভাষ্য রচনা হয়। এই প্রকার আরও অনেক শব্দ পণ্ডিত মহাশয়ের কণ্ঠস্থ রহিয়াছে দেখিলাম; তবে আমার প্রয়োজন কেবল আচার্য্যের বিষয় অবগত হওয়া, সুতরাং আমি আর অন্যদিকে মন দিলাম না। এই সময়টী পণ্ডিত মহাশয় আচার্য্যের ভাষ্য রচনা কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু এবিষয়ে মতান্তরও লক্ষিত হয়। কারণ, ট্রাভ্যাঙ্কোরের ইতিহাস-লেখক শাংকুনি মেনন, এই সময়কে আচার্য্যের তিরোভাবের পর যে দিন এতদ্দেশ-বাসী সকলে মিলিত হইয়া সভা করিয়া আচার্য্যের মতানুবর্ত্তনে সংকল্প করে, সেইদিননির্দ্দেশক বলেন। যাহা হউক, এইরূপ শব্দ ইঁহাদের প্রাচীন গ্রন্থে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে আচার্য্য সম্বন্ধে এ দেশের প্রাচীন প্রবাদ অনেক জানিতে পারা যাইতে পারে—ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। পণ্ডিত মহাশয় নম্বুরী ব্রাহ্মণ নহেন, তজ্জন্য অবশ্য এবিষয়ে ইঁহার কথায় সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, আচার্য্য সম্বন্ধে এখানে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম, এইরূপে সংগ্রহ করিয়া জিলা স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট বিদায় লইতে গেলাম এবং তাঁহার সন্ধান প্রদানের ফলে যে আমি আচার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলাম, তজ্জন্য তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। কালাডি হইতে ফিরিয়া-এইরূপে দুইদিন ত্রিচুরে কাটাইলাম এবং পরদিন বেলা ৯ টার গাড়িতে শৃঙ্গেরী দর্শনার্থ প্রথমতঃ ব্যাঙ্গালোরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে পঁহুছিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় একেবারে ব্যাঙ্গালোরের টিকিট পাইলাম না। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ট্রেণ ছাড়িবার সময়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রেলকোম্পানীর ভাড়ার হিসাব করিয়া ব্যাঙ্গালোরের ভাড়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কাজেই, এই রেলের সহিত মাদ্রাজ রেলের যে জংশন ষ্টেসন, সেই সোরণুর ষ্টেসন পর্য্যন্ত একখানি টিকিট লইতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমিও ।৹ আনা দিয়া একখানি সোর-ণুরের টিকিট লইয়া গাড়িতে উঠিলাম। সোরণুর আসিতে প্রায় মধ্যাহ্ণ অতীত হইল, তবে পথের দৃশ্যে ক্ষুধার কষ্ট আমাকে তাদৃশ অভিভূত করিতে পারে নাই। সেই আঁব কাঁটালের বৃক্ষে পরিপূর্ণ, শস্যশ্যামলভূমির দৃশ্য জন্মভূমি বঙ্গভূমির

কথা মনে করাইয়া দিতেছিল, সেই ঈষৎ রক্তাভ 'বেলে' ও 'কাঁকুরে' জমি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলসমূহের মধ্যে বেলের গতির দরুন নানা আকার ধারণ করিয়া ভারতের নানা স্থানের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছিল। নূতন জিনিষ দেখিলেই মানুষের মন উহাকে পূর্ব্বদৃষ্টের কতকটা অনুরূপ ও কতকটা অননুরূপ স্থির করিয়া নূতনত্বের আনন্দ উপভোগ করিতে চায়, আমারও মন এই কার্য্যে এতই ব্যাপৃত হইয়াছিল যে, ক্ষুধার কষ্ট আমাকে তাদৃশ কাতর করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, যথা সময়ে সোবণুরে পঁহুছিলাম এবং পূর্ব্বের মত এক ব্রাহ্মণের হোটেলে অন্ন ভোজনের নিমিত্ত ষ্টেশন হইতে যেমন বহির্গত হইতেছি, অমনি আমার কুলির ইঙ্গিতে একটী ব্রাহ্মণ আমায় আহ্বান করিলেন; আমিও, আর হোটেল খুঁজিতে হইল না দেখিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ৫।৭ মিনিট পরেই ব্রাহ্মণের বাটী পঁহুছিলাম ও বাটীটীর পারিপাট্য দেখিয়া পথশ্রান্তি বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। ক্ষুদ্র দ্বিতল চালাবাটী হইলেও বিলাতি মাটীর মেজে, মাটীর দেওয়াল, প্রাঙ্গণটী এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, জুতা পায় দিয়া যাইতে সংকোচ বোধ হইতেছিল। বাস্তবিক এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমি আর ভারতের কোথাও দেখি নাই। ইঁহাদের পরিচ্ছন্নতা ও ঘরের ভিতর জিনিষ পত্রের সাজান গুছান অবস্থা দেখিয়া জন্মভূমি বঙ্গভূমির কথা স্মরণ করিয়া নিজের লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এ সময় ভারতের প্রায় সকল স্থানই প্লেগ রাক্ষসীর লীলাভূমি ছিল, কিন্তু মালাবার এখনও মুক্ত; অবশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে তাহার অন্যতম কারণ, একথা মনে উদয় হইতে আর বিলম্ব হইল না। কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যে আমি ভোজনার্থ প্রস্তুত হইলাম, ব্রাহ্মণীও ইতিমধ্যে পাতা পাতিয়া অন্নপূর্ণার মত গরম ভাত লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার ভাবটী দেখিয়া আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল, পরিদর্শক পথিকের প্রাদেশিক প্রথা পর্য্যবেক্ষণ প্রবৃত্তি যেন কিয়ৎকালের জন্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। পাঁপর ভাজা, নারিকেল ভাজা, নারিকেল তৈল সংযোগে কাঁচকলা, কচু, কুমড়া প্রভৃতির ঝাল ঝাল ডাল্‌নার মত তরকারী, কলাইয়ের ডাল প্রভৃতি কতিপয় উপকরণ সংযোগে সরু চালের গরম ভাত ক্ষুধার মুখে বড়ই মধুর লাগিল। আমিও পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিয়া ট্রেণ ফেলের ভয়ে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের হস্তে ।৵০ দিয়া ষ্টেসন মুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে আসিয়া কিন্তু দেখিলাম—এখনও যথেষ্ট সময় আছে, অতএব একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অতঃপর একেবারে ব্যাঙ্গা-লোরের টিকিট ক্রয় করিলাম। মূল্য বোধ হয় ৪৲ টাকার মধ্যে। যথাসময়ে

ব্যাঙ্গালোর অভিমুখ হইতে ডাকগাড়ি আসিল, ভিড় না থাকায় অপর একটী যাত্রীর সহিত একটী ঘর দখল করিয়া বসিলাম। এ গাড়িটী মাদ্রাজ যাইবে সুতবাং ব্যাঙ্গালোর পথে পড়িবে না; এজন্য ইরোদ জালারপেট জংশনে গাড়ি পরিবর্ত্তন করিতে হইল। তখন প্রায় মধ্যরাত্র, বায়ু শীতল হইলেও শীত বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এখানেও গাড়ি পরিবর্ত্তনে বিশেষ অসুবিধা হইল না, তবে এবার গাড়িতে ভিড পাইলাম। প্রায় বেলা ৯।১০টাব সময় ব্যাঙ্গালোরে পঁহুছিলাম এবং একটা শকট সাহায্যে এখানকার শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ-মঠে যাইবার সংকল্প করিলাম। গাড়োয়ান আশ্রম চিনিত না, তথাপি আমাকে গাড়িতে লইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে একটা প্রকাণ্ড ও সুন্দব ধর্ম্মশালার সম্মুখ দিয়া একটা বাগানবাটীতে লইয়া আসিল। কিন্তু দুঃখেব বিষয় ইহা সে আশ্রম নহে, এখানে মধ্যে মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়েব সন্ন্যাসিগণ উপদেশাদি দিয়া থাকেন, এই মাত্র। আশ্রমেব ঠিকানাটি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ-মঠ হইতে জানিযা লইলেও সে সময় কিছুতেই মনে পড়িল না, সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা কবিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে একটী ভদ্রলোক একজনেব বাটী দেখাইযা দিল। এখানে একটী ভদ্র-লোক সপবিবারে বাস কবেন, ইনি মঠেব পবিচিত, এই মাত্র ইঁহাব সহিত মঠের সম্বন্ধ। কিন্তু আমাব ভাগ্যক্রমে ইনি আবার বাটীতে ছিলেন না, গাড়ো-যানেব ডাকে ইঁহার স্ত্রী ভিতর হইতে বাহিবে আসিলেন এবং আমি রামকৃষ্ণ-মঠে যাইব শুনিযা, তাঁহাব স্বামীব আগমন অপেক্ষা কবিবাব জন্য বাহিবেব বৈঠকখানায় বসিতে অনুবোধ করিলেন। ইনি কর্ণাট ভাষায কথা কহিতেছিলেন, সুতরাং গাড়োয়ান তাহার হিন্দি ভাষাব সামান্য জ্ঞানসাহায্যে আমাকে তাঁহাব কথা বুঝাইয়া দিল। বাটীতে একটী মাত্র যুবতী বমণী বুঝিতে পাবিয়া আমি তাঁহার অনুবোধ বক্ষা কবিতে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু তিনি আমাব মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া যেন আমাদেব দেশেব অবরোধ প্রথাব কথা স্মবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, মায়েব মত করিয়া আমাকে অনেক অনুবোধ কবিলেন। আমি এদেশের স্ত্রীস্বাধীনতাব কথা জানিলেও অনুনয় সহকারে সসম্মানে তাঁহাব অনুবোধ প্রত্যা-খ্যান করিয়া পথিমধ্যেই গাড়িব উপবে তাঁহাব স্বামীব জন্য অপেক্ষা করিতে লাগি-লাম। স্ত্রীলোকটী অতিথিসংকাব করিতে না পাইযা একটু যেন দুঃখিত ও অবাক্ হইযা দাঁড়াইয়া বহিলেন। ইতিমধ্যেই ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বামীর আগমন হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর মুখে সব শুনিয়া, আমি কেন তাঁহার বাটীতে পদার্পণ কবি নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আমাদের দেশের অবরোধ

প্রথার প্রভাবে আমি ওরূপ আচরণ করিয়াছি বুঝিয়া, তাঁহাদের দেশের প্রথার পরিচয় দিতে দিতে, রামকৃষ্ণ-মঠের পথ প্রদর্শন করিলেন।

এ সময় মঠে বিমলানন্দ স্বামী, বোধানন্দ স্বামী, ও ব্রহ্মচারী যোগীন্দ্রনাথ অবস্থিতি করিতেছিলেন *। মঠবাটিটী ব্যাঙ্গালোর প্রাচীন দুর্গের মধ্যে। দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাস্তা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দুর্গের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ, এখন সৈন্যাবাস ভবনে পরিপূর্ণ না হইয়া, একটী ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনতিদূরে একটী ধনীর দ্বিতল বাগানবাটী এখন মঠরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এ সময় প্লেগ এস্থানে খুব প্রবল। যে স্থানে দুর্গ প্রাচীর ভঙ্গ করা হইয়াছে, সেই স্থানে দুর্গ ভবনের কিয়দংশ বর্ত্তমান ছিল, তাহাই এখন প্লেগরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের হাঁসপাতাল এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে একটী পতিত ভূখণ্ডে মৃতদিগের রক্ষা করিবার ও ডোমগণের বাসের স্থান। দৃশ্যটী নবাগতের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে।

আমাদের গাড়িটী একেবারে গাড়ি-বারাণ্ডার নীচে যাইল। উপরে যাইয়া স্বামিগণের দর্শনে ও তাঁহাদের সহিত সাদর সম্ভাষণে মনে হইল—যেন নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। যাহা হউক, অনেক দিনের পর আবার বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া রামেশ্বর হইতে শঙ্করের জন্মভূমি এবং ভারতের পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপ-কূল পর্য্যন্ত ভ্রমণের শ্রান্তি ভুলিয়া গেলাম, ধাতু যেন প্রকৃতিস্থ হইল।

এতদিন পর্য্যন্ত শৃঙ্গেরী ঠিক কোথায়, কোন্ পথে কিরূপে যাইতে হয়, তাহা বহু লোককে জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও জানিতে পারি নাই। শঙ্করের বাটীতে বা ত্রিচুরেও শৃঙ্গেরীর বিবরণ কিছুই জানিতে পারি নাই, কিন্তু এইবার ব্যাঙ্গালোরে আসিয়া স্বামিগণের চেষ্টায় একটী লোকের সন্ধান পাইলাম, ইনি শৃঙ্গেরী গিয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরীর তালুকদারের সঙ্গে ইঁহার পত্রব্যবহার আছে। আমি শৃঙ্গেরী যাইব শুনিয়া ইনি আমাকে পথঘাটের কথা সব বলিলেন বটে, কিন্তু সেখানে সেইবার নূতন প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও জানাইলেন। ইহাতে আমরা সকলেই চিন্তিত হইলাম এবং পত্রদ্বারা শৃঙ্গেরীর তাৎকালিক অবস্থা জানিবার জন্য সেই ভদ্র-

* ইহার মধ্যে স্বামী বোধানন্দ মাত্র বর্ত্তমান আছেন। তিনি এক্ষণে আমেরিকার পিট্সবর্গ সহরে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। বিমলানন্দ স্বামীর দেহত্যাগের কথা উদ্বোধন-পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। ব্রহ্মচারী যোগীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী উমানন্দ নাম ধারণ করেন। অল্প দিন হইল, ব্যাঙ্গালোরে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। উক্ত মঠে এক্ষণে স্বামী আত্মানন্দ রহিয়াছেন।

লোকটীকে অনুরোধ করিলাম। তিনিও তদ্দণ্ডে শৃঙ্গেরীর তালুকদারকে পত্র লিখিলেন।

এ দিকে পত্রের উত্তর আসিতে ৪।৫ দিন বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকায়, আমি ইতিমধ্যে মহীশূর দর্শনে বহির্গত হইলাম। ১৫ই মার্চ্চ ১৯০৫ সালে মহীশূর যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় গাড়িতে উঠিয়া পরদিন প্রত্যুষে মহীশূরে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বে মহীশূরের রাজার পুস্তকালয়ের কথা শুনিয়াছিলাম এবং সেই পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব শাস্ত্রী বি. এর কথাও কর্ণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং গাড়োয়ানকে একেবারে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতে বলিলাম। ভাবিলাম, মহাদেব শাস্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ না ঘটিলেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন ব্রাহ্মণের হোটেলে আশ্রয় লইব। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটী পঁহুছিয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন দেখিলাম না। তাঁহার ভদ্রতা ও যত্নের কথা স্মরণ করিলে এখনও কৃতজ্ঞতাবসে হৃদয় অভিভূত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যুবক ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। শঙ্কর-মতে ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। ইনি গীতার শঙ্করভাষ্য, তৈত্তিরীয় উপ-নিষদের শঙ্করভাষ্য ও ভারতী তীর্থের দীপিকা প্রভৃতির অতি সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাজার পক্ষ হইতেও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঁহারই তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি শৃঙ্গেরীর শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং যারপর-নাই গুরুভক্ত। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আমার সহিত কেবল আচার্য্য শঙ্করেরই কথা হইল। অতঃপর আহারাদি সমাপন হইবার পর আমাকে পুস্তকালয়ে লইয়া গেলেন। পুস্তকালয় ইঁহার বাটী হইতে অনতিদূরে অতি সুন্দর দুর্ব্বাদলশ্যামল প্রান্তরের মধ্যে। সেখানে যাইয়াই লাইব্রেরিয়ানকে আমার জন্য যাবতীয় শঙ্করজীবনীপুস্তক বাহির করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লাইব্রেরিয়ান্ কতকগুলি পুঁথি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ইহার মধ্যে অস্মদ্দেশপ্রসিদ্ধ দুইখানি শঙ্করবিজয় ছাড়া আরও তিন খানি নূতন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেল, যথা—

১। তিরুমূল দীক্ষিত কৃত শঙ্কর অভ্যুদয়।

২। পুরুষোত্তম ভারতী কৃত শঙ্করবিজয় সংগ্রহ।

৩। বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ কৃত লঘুশঙ্কর বিজয়।

এই গ্রন্থগুলির নাম ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই, ইহাদের অস্তিত্ব দেখিয়া আমার যারপরনাই আনন্দ হইল। তবে পুস্তকগুলি শঙ্করের সময়ের গ্রন্থ নহে বলিয়া তৎপরেই মনে একটু বিষাদের সঞ্চার হইল। তাহার পর সমস্ত দিন শঙ্কর

সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। মহাদেব শাস্ত্রী আমার সঙ্গে এইরূপ আলাপ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আনন্দের চিহ্নস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশিত সমুদায় গ্রন্থ (১০ টাকা মূল্যের) আমায় উপহার দিলেন। উপহারের ত মূল্য দেওয়া চলে না অথচ আমার নিকট তখন এমন কিছু নাই, যাহা আমি তাঁহাকে উপহারস্বরূপ দিতে পারি, সুতরাং কতকটা লজ্জিত ভাবে আমাকে সেই উপহার গ্রহণ করিতে হইল। তাহার পর তাঁহার পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়া, শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে মহীশূর দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। বালকদ্বয়, অনতিবিলম্বে আমাকে সঙ্গে লইয়া, রাজার বাটী, সাধারণ লাইব্রেরী, বাজার প্রভৃতি নানাস্থান দেখাইল। দূর হইতে একটী পর্ব্বতের উপর মহিষ-মর্দ্দিনীর মন্দির দেখাইল এবং এই স্থলেই যে মহিষাসুর বধ হইয়াছিল, তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। বালকদ্বয় নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিল না, একজন বোধ হয় তখন এফ, এ পড়িতেছিল। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। বাটী ফিরিতে রাত্রি হইল, অথচ প্রায় ৯টা রাত্রির গাড়িতে ব্যাঙ্গালোরে ফিরিবার ইচ্ছা, সুতরাং তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া, বালক দুইটীর সঙ্গেই ষ্টেশনে আসিলাম। মহীশূরে শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে এ প্রদেশবাসীদিগের সম্বন্ধে একটী শ্রদ্ধা লইয়া গন্তব্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ।*

[শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।]

ভাগীরথী-পাদ-বিধৌত দক্ষিণেশ্বর গ্রামের ভবতারিণীর পূর্ব্বসেবক শ্রীযুত গদাধর ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মজগতে অধুনা কত উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, তাহা স্থির করা মাদৃশ অধম ব্যক্তির আয়াসসাধ্য নহে। যুগান্তরকারী মহাভাবসম্পন্ন সেই মহা-

---

* গত ১১ই মাঘ বেলুড় মঠে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির বাৎসরিক বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভার অধিবেশনে পঠিত।

সমন্বয়াচার্য্যের প্রচারিত জগৎকল্যাণপ্রদ কথামৃত পানে সভ্য জগতের অনেকে এখন আত্মহারা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি স্বদেশে, কি বিদেশে এই মহাপুরুষের কথা লইয়া বহুতর আলোচনা বর্ত্তমানে হইতেছে, দেখা ও শুনা যায়। কিছু কাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত ইয়ুরোপের পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর, এই মহাত্মার অলৌকিক ভাবে ও কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া, বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক তদীয় জীবনী ও উপদেশাবলীর কিয়দংশের অনুবাদ পুস্তকনিবদ্ধ করিয়া, স্বীয় অসাধারণ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাপকের লেখনী, ঐ লোকোত্তর পুরুষের জীবনবিবরণ লিখিয়া, চিরযশস্বিনী হইয়া রহিল। আজ সেই মহাপুরুষের জীবন-কথা, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-তরণীর প্রধান সহায় স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত গুরুপদসমর্পিত জীবনকথার আলোচনা করা, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয় নহে। আমরা উপস্থিত দেখাইতে চেষ্টা পাইব যে, এই পুণ্যভূমি ভারতে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যাদি অবতারকুলের আবির্ভাব সত্ত্বেও আবার এ নব কলেবর ধারণ করিয়া কি নিমিত্ত সেই পুরাণ পুরুষ এবং তল্লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হইলেন। ভারতে ঐ দুই পুরুষপুঙ্গবের বর্ত্তমান যুগে জন্মগ্রহণের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা কি, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া মাত্র—আমাদের প্রয়াস।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, তাহাতে দেখিতেছি, এই অতীতোজ্জ্বল দেবতার লীলাভূমি ভারত নানাকারণে শতধা বিধ্বস্ত এবং ভারতবাসী শতভাবে প্রপীড়িত, শতলাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত। ভারতসন্তান মহা আলস্যের উপর যেন গাঢ় নিদ্রাভিভূত। তাহার জীবন বিষম অবসাদপূর্ণ! ভারতের সর্ব্বত্রই যেন নিশ্চেষ্টতা, নিরুদ্যমতা ও নিরুৎসাহে পূর্ণ, কাহারও যেন সংজ্ঞা নাই, চেতনা নাই। এ হেন অবস্থায় এমন দেশে ঐরূপ তপোদ্দীপ্ত মহাকর্ম্মী ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাব বিস্ময়কর হইলেও নিরর্থক নহে! ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে আমাদের এই কয়টী অভাব নয়নগোচর হয়। প্রথম ও প্রধান—আমাদের মতানৈক্য, দ্বিতীয়—আমাদের উদ্যমরাহিত্য, তৃতীয়—কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা ধারণা, তাহাতে এইমাত্র বুঝিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, এই তিনটী হেয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, অধঃপতিত আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়ের সত্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রথম—মতানৈক্য। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ নানা দোষের আকর হইলেও কেহ কি আয়াস

স্বীকার পূর্ব্বক তাহার উদ্ঘোষণে ও উৎপাটনে সচেষ্ট হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন? না! কারণ, কেহ কাহারও কথার উপর শ্রদ্ধা রাখেন না। কেহ কাহার কথায় বিশ্বাস করেন না। এই মতানৈক্যের মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর —ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতানৈক্য। মানবে মানবে অদ্যাবধি যত প্রকার অনৈক্য ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতার অভাবে যত দ্বন্দ্ব, যত রক্তপাত, যত অমানুষিক অত্যাচার ঘটিয়াছে, এরূপ আর কোনও ক্ষেত্রে একতার অভাবে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কথঞ্চিৎ সুখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মের প্রসূতি ভারতে নানা ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও ইয়ুরোপ খণ্ডের মধ্যযুগের ইতিহাসস্থ Burning of the Heretics প্রভৃতি ঘটনার পুনরভিনয় ঘটে নাই। বর্ত্তমানকালে আমরা রাজনীতি বা সমাজনীতি অবলম্বনে এক মত হইতে যতই চেষ্টা করি না কেন, যতদিন না সার্ব্বভৌমিক হিন্দুধর্ম্মের পরম উদারভাব গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাশূন্য হই, ততদিন পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে একতার অভাব আমাদের ভিতর সমানভাবেই থাকিবে। তাই জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমাদের নিকটে ও জগৎ-সমক্ষে এই অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন কথা প্রচার করিলেন, "যত মত তত পথ"। তাই তিনি বর্ত্তমান যুগে জীবনব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধন দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ মহাতত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক স্বকীয় ছাঁচে জীবন গঠন করিতে আমাদের উপদেশ করিয়াছেন। তাই মহাপুরুষের মহা শিষ্য মহামনস্বী বিবেকানন্দ জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—

"সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ও ইহাদের ফলস্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রবরাশি উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে পঙ্কিল করিয়াছে, সভ্যতার নিধনসাধন করিয়াছে, ও যাবতীয় জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশার সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে, এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইত।"

—চিকোগো বক্তৃতা।

স্বামীজি বুঝিয়াছিলেন যে, মহা শক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য জগতে নূতন কথা প্রচার করিতেছেন। এ নূতন অমৃতের আস্বাদনে মৃত প্রাচ্যও পুনরুজ্জীবিত হইবে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে। তাই সেই চিকাগোর অভূত-পূর্ব্ব ধর্ম্মসাম্মিলনীর উদ্বোধন দিনে জ্বলন্ত ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছিলেন—

"কিন্তু, ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে; এবং আমি সর্ব্বতোভাবে ইহাই

আশা করি যে, এই ধর্ম্মসমিতির সম্মানার্থ অদ্য যে ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল, সেই ঘণ্টানিনাদই ধর্ম্মোন্মত্ততা দ্বারা এবং তরবারি অথবা কুতর্কাদি দ্বারা উৎপাটিত বহুবিধ উৎপাত-পরম্পরার ও একই চরমলক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ববিধ অসদ্ভাবের সমূলে নিধন-সমাচার ঘোষণা করুক।"

—চিকাগো বক্তৃতা।

যাহাতে উক্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে,

"তাঁহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্ম্মের পতাকার উপর ইহাই লেখা থাকিবে যে, 'বিবাদ করিও না—পরস্পর সহায়তা কর,' 'পরস্পরকে বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিয়া ধারণা কর,' 'কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।"

—চিকাগো বক্তৃতা।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সকল ধর্ম্মেই সার আছে এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সকল ধর্ম্মই যে সত্য, তাহা আমাদের শাস্ত্রে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ব্বে এ ভাব ত কথনও এতটা জীবন্ত আকার ধারণ করে নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বহুকালাবধি এদেশে প্রচারিত, কিন্তু এই সমন্বয়বাদ-রূপ দেবী-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কথা ত ইতিপূর্ব্বে কথনও শোনা যায় নাই! এ ভাব যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন উৎসর্গের প্রভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্যভূমে এবং অধুনা ভারতেও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ ম্যাক্সমূলর লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামক পুস্তকের সমালোচনাকালে Anglo-Indian সমাজের মুখপত্র, এলাহাবাদের Pioneer, পরমহংসদেবের উক্তির মধ্যে অপর ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি সূচক দুইটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার বিশ্বজনীন উদারভাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিনিবদ্ধ তত্ত্ব—যে নামে ভগবান্‌কে ডাক না কেন, ভগবান্ দেখা দিবেন,—আজকালকার চিন্তার অঙ্গস্বরূপ হইলেও অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে এত স্পষ্টভাবে প্রচারিত ছিল না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার পবিত্র জীবনোপনিষদের ভাষ্যকার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শত সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিপূর্ণ অস্মদ্দেশে অধুনা জন্মগ্রহণের কি আবশ্যকতা। ভারতবাসীর দ্বারা মহাশক্তির পুনঃ উদ্বোধন হইবে। তাই

ভারতকে উত্তোলিত করিবার জন্য এই দুই, দুইযে এক, মহাশক্তির বিকাশ। —"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

আমাদের সমাজ-শরীরে বহুকাল হইতে প্রবিষ্ট মহা অনর্থকর, অনিষ্টকর, অপর দোষ—উদ্যমরাহিত্য, ভারত সমাজ হইতে যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয়, তদ্বিষয়ে এই মহাপুরুষদ্বয় আমাদের কি ভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাই এখন দেখা যাউক। উপর উপর দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। কিন্তু সেই তথাকথিত মূর্খ ব্রাহ্মণ কিরূপে সপ্ত সমুদ্র পার পর্য্যন্ত এই বিরাট্ জাতির পিতৃ-পিতামহাগত সনাতন ধর্ম্মের জয়ঘোষণা নিজ শক্তিবলে অত্যল্পকালেই সাধিত করিলেন, তাহা কি চিন্তার বিষয়, আলোচনার যোগ্য নহে? এই নিরুৎসাহের দেশে, এই অবসাদপূর্ণ মৃতবৎ জাতির মধ্যে, এই পরস্পর-কলহপ্রিয় অথচ অকর্ম্মণ্য লোকসঙ্ঘের ভিতরে একজন নগণ্য পল্লীগ্রামবাসী, অশিক্ষিত, আপাতদৃষ্টিতে পরপ্রত্যাশী ব্রাহ্মণ, কি উপায়ে এতটা বড়, এতটা যশস্বী, এতটা বিখ্যাত, এতটা প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন, তাহা কি আমাদের নিত্য অনুসন্ধিৎসার বিষয় নহে? তাঁহার অমানুষিক অপূর্ব্ব জীবন-বেদ পাঠ করা কি আমাদের নিত্যকর্ত্তব্যের মধ্যে নহে? তাহার মহাশক্তির খেলা নিত্য দর্শন করিয়াও কি এখন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবা উচিত যে, এ দেশের আর কোনও উপায় নাই, এ দেশের আর উন্নতির আশা নাই, এ দেশের আর কল্যাণ হইবার কোন পথও নাই? আর স্বামী বিবেকানন্দও ত কলিকাতাবাসী একজন সামান্য যুবক, অথবা তিনি যেমন লিখিয়াছেন—"অসহায় ছিন্ন বাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ"কারী জনৈক সন্ন্যাসীমাত্র। তবে কি প্রকারে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হইলেন? কি প্রকারে তিনি সমগ্র সভ্যজগতে বাঙ্গালী জাতির গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন? কি প্রকারে তিনি এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর—যাহা ভারতের বাহিঃস্থ ভূখণ্ডে নানা কুসংস্কারপূর্ণ, নগণ্য, অনালোচনীয় কিম্ভূতকিমাকার একটা ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া পরিগণিত ছিল, জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইলেন? কি প্রকারে তিনি, স্বজাতির, স্বধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিয়া, স্বয়ং যশস্বী ও স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের মহামহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেন? কেন অধুনাতন সভ্য জগতের এক প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ আমেরিকা বলিয়া উঠিল?—

"Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation." অর্থাৎ—বিবেকা-

নন্দ নিশ্চিতই ধর্ম্ম মহাসভায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই শিক্ষিত জাতির নিকট মিশনরি প্রেরণ করা কি মূর্খতা!

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর যতটা আমরা জানিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ ও কঠোর তপস্যার কথা সর্ব্বাগ্রে নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়। সে কথা অতি অদ্ভুত, সে বিবরণ অতি বিস্ময়কর। দ্বাদশবর্ষব্যাপী সে কঠোর বৈরাগ্য ও সাধন লোমহর্ষণকারী। একাশনে, অর্দ্ধাশনে, কখনও বা অনশনে দিবা-যামিনী "কোথা মা ব্রহ্মময়ী, কখন হবে দেখা" প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একভাবে বিভোর থাকা, শরীরস্থ অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াদির লোপ করিয়া কেবলমাত্র ভগবতী-ধ্যানে রত থাকা—সে জ্বলন্ত ধর্ম্মাদর্শ এদেশে বিশেষ আবশ্যক। তপস্যার কঠোরতায় তাঁহার মুখ দিয়া শোণিতধারা নির্গত হইয়াছিল, শুনা যায়। সর্ব্বদাই বাহ্যজ্ঞানহারা থাকিতেন, এমন কি, বহু চেষ্টাতেও চেতনা আসিত না। সে অনন্ত উৎসাহ, অদ্ভুত উদ্যম, অনানুষিক চেষ্টা লইয়া ঈশ্বর-সাধনা জগতে বিরল। উহার ফল কি? স্বামীজি বলিয়াছেন—

"যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া যথার্থ একটী মাত্রও মহৎ চিন্তা করিয়া মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে।"

—মদীয় আচার্য্যদেব।

ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরস্থ দেব-দেবী-মন্দির-সংলগ্ন নির্জ্জন উদ্যানের এক নিভৃত কোণে বিল্ব-তরুমূলে ও পঞ্চবটীতলে লোকলোচনের অগোচরে যে সাধন উপাসনা হইয়াছিল, তাহার ফল সসাগরা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; শ্রীরামকৃষ্ণের নব ধর্ম্মসমন্বয়তত্ত্ব আমাদের চক্ষের সমক্ষে সমগ্র জগতে যুগান্তরকারী মহা ভাববিপর্য্যয় আনয়ন করিতেছে।

আজ সভ্য জগতের অনেক প্রদেশ তাঁহার অত্যদ্ভুত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কঠোর সাধনার সফলতার পুরস্কারস্বরূপ বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব পাইয়া ধন্য জ্ঞান করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় বসিয়া, জন্ম-জরা-ব্যাধিগ্রস্ত, ত্রিতাপে তাপিত মানবমণ্ডলী মনপ্রাণ শীতল করিতেছে। সে অদ্ভুত তপস্যা বৃথায় যায় নাই। অপর দিকে, সেই গুরুগতপ্রাণ, ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনব্যাপী পরিশ্রমও জগৎ-সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আমার পরমাত্মীয়, কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত, হাবড়ার উকিল স্বর্গীয় নন্দলাল দেব, স্বামীজির কলেজের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, অধ্যয়ন কালে সহপাঠিগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, "তোমরা বড় জোর কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ হাকিম প্রভৃতি হইবে; কিন্তু দেখিও, I shall chalk out a new path for myself (আমি নিজের জন্য নূতন পথ করিয়া লইব)।" এ কথাটী তিনি বার বার তেজস্বিতার সহিত বলিতেন। এখন দেখা যাইতেছে, বাস্তবিকই স্বামীজি কেমন New path chalk out করিয়াছেন। বরাহনগর মঠে গুরুভাইগণের তত্ত্বাবধান ও একসঙ্গে ধ্যান তপ জপ করিতে করিতে যখন স্বামীজি, হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন কোন মহান্ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, মঠ হইতে বহির্গত হইলেন ও ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন কাশীধামে একবার আসিয়াছিলেন। তথাকার জ্ঞানী ও ভক্ত জমিদার স্বর্গীয় প্রমদা দাস মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"Someday I shall come upon society as a bomb-shell (আমি একদিন সমাজে বোমার মত পড়িব)।" সকলেই জ্ঞাত আছেন, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। চিকাগোর মহাসভায় সেই বোমা ফাটিয়াছিল। আজকালও অনেক বোমার কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু একথা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে ঐরূপ নরঘাতী বোমার আবশ্যকতা নাই বলিলেই হয়। আমরা স্বামীজির ন্যায় নর-রূপী বোমা চাই, যাহার অগ্ন্যুৎপাতে সমগ্র হিন্দুস্থানে ও জগতে অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তির মঙ্গলময়ী বার্ত্তা বিঘোষিত হইবে। আমরা চাই—পুরুষসিংহ, যাহার কামকাঞ্চন-ত্যাগে ও আজীবন পরিশ্রমে জগতে রামকৃষ্ণপ্রবর্ত্তিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বার্ত্তা কীর্ত্তিত হইবে, শান্তির, ধর্ম্মের, সত্যের সংসার স্থাপিত হইবে। এই যে দেশ সত্ত্বগুণের দোহাই দিয়া মহা তমোগুণাশ্রয়ী হইয়া পড়িতেছে, এই যে দেশ উন্নতি, উদ্যম, উৎসাহের নামে মহা ধ্বংসের পথে চলিতেছে, এই যে দেশ সার্ব্বভৌমিক মহা প্রেম-ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর না হইয়া, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-রূপ ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া চিরবিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে—কে ইহাকে ঐ সকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণে সমর্থ? জ্ঞানভক্তির মহাতরঙ্গ উত্তোলনকারী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ রূপ মহাপুরুষগণের আবির্ভাবই এখন এদেশে নিতান্ত প্রয়োজন। উদ্যম-মাত্র-রহিত মৃতবৎ আমাদের দেশের জন্য স্বামীজি কি চাহিতেন, শুনিবেন কি?

"যাহা (উপস্থিত) আমাদের নাই, বোধ হয়, পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের

ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইয়ুরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই **উদ্যম**, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই **কার্য্যকারিতা**, সেই একতাবন্ধন, সেই **উন্নতি-তৃষ্ণা**; চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিতদৃষ্টি, আর চাই—আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

—ভাববার কথা।

তাই স্বজাতির স্বদেশের মহাকল্যাণকামী সেই মহাপুরুষ, পরপদদলিত, পর মুখাপেক্ষী, পর-প্রত্যাশী স্বদেশবাসীকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত" শুনাইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাই তিনি বার বার আমাদের বলিতেন, তোমরা অমৃতের সন্তান (Children of Immortal bliss), অমৃতের অধিকারী। এইবার আমরা আমাদের সমাজশরীরে প্রবিষ্ট তৃতীয় দোষ—কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা সকলেই কি উপস্থিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নহি? শ্রীভগবান্‌কে স্বাক্ষী রাখিয়া সত্য কথা যদি বলি, তাহা হইলে আমাদের সকলকেই বলিতে হইবে, আমাদের জাতিগত ইতিকর্ত্তব্য বর্ত্তমানে বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না। আমরা কোনদিকে যাইব, কি করিব, কিসে মঙ্গল হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতেছি না। যে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদিগকে যখন যেদিকে লইয়া যান, আমরা যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া সেই দিকেই যাইতে থাকি। এই বর্ত্তমানে একজন রাজনিতিজ্ঞ, রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া অশেষ গবেষণা ও যুক্তি দেখাইয়া আমাদিগকে একদিকে লইয়া গেলেন; কিছুকালের জন্য আমরা ভাবিলাম, রাজনীতির চর্চ্চা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। আবার ইতিপূর্ব্বে একদিন একজন সমাজসংস্কারক পণ্ডিতের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে এতটা বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান সামাজিক আচারব্যবহারগুলির আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন না করিলে আমরা কিছুতেই উন্নতি করিতে পারিব না, ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরে হয়ত একদিন কোনও নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মনোহারিণী বক্তৃতা শ্রবণে বিচলিত হইয়া উঠিয়া এমন হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিব যে, পশ্চাতে বহু অনুতাপ করিতে বাধ্য হইব। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি বাস্তবিক এইরূপ নহে? কিন্তু পতিত, পদদলিত, পরমুখাপেক্ষী জাতির প্রধান কর্ত্তব্য নহে কি, স্বজাতির প্রতিষ্ঠা ও তাহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়া

তুলা? এ বিষয়ে মতভেদ হইতেই পারে না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা এই—আত্মাকে মুক্ত কর ও জগতের হিত কর—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" জীবনধারণ কর। মানব জন্মগ্রহণ করিলেই এইভাবে জীবন যাপন তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক, আত্মার মোক্ষ লাভের উপায় কি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ বিষয়িনী শিক্ষা তাঁহার জনৈক শিষ্য এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"প্রথমে চরিত্র গঠন কর—প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব উপার্জ্জন কর—ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত এই ছিল যে, 'যখন কমল প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরগণ আপনা আপনিই মধু খুঁজিতে আসিয়া থাকে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।'"

—মদীয় আচার্য্যদেব।

স্বামীজিও ঐ কথাই আমাদিগকে বারম্বার বলিযাছেন—"চরিত্রবান্ হও, ধর্ম্ম লাভ কর, মনুষ্যত্ব লাভ কর। কায়মনোবাক্যেতেও যেন অপবিত্র না হও। যেমন করিয়া পার পূতচরিত হইয়া আগে ধর্ম্মলাভে যত্নপরায়ণ হও, তবেই কর্ত্তব্য সাধন হইবে, নতুবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' আপনাকেই আপনার উদ্ধার করিতে হইবে। যে যার আপনার উদ্ধার করুক।" আমরা সকলে এটী বেশ বুঝিতে পারি যে, ব্যক্তিগত উন্নতিসাধন সমাধা হইলে জাতিগত উন্নতির জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। সকলে আপনার আত্মাকে মুক্ত করিতে হইবে ভাবিয়া যত্নপরায়ণ হইলে, পরের কল্যাণের জন্য বড় বেশী চেষ্টা পাইতে হয় না। বাল্যকালে বন্ধুগৃহে একখানি চিত্র দেখিয়াছিলাম। সেখানি ইংলণ্ডের পল্লীচিত্র। একটী রাস্তার ধারে একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর। কুটীরবাসী কৃষক ও কৃষককামিনী প্রাতে উঠিয়া কুটীরের সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিতেছে। আর ঐ চিত্রের নিম্নে এই কয়টী কথা লিখা আছে—"If each before his own door sweep, the village would be clean"—যদি সকলে নিজের নিজের বাড়ীর সামনে ঝাঁট দেয়, তবে সমুদয় গ্রামটীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। চিত্রগত শিক্ষাটি বাস্তবিকই সত্য। কারণ, ব্যষ্টির উন্নতির উপরই সমষ্টির উন্নতি নির্ভর করে। তাই ব্যক্তিগত উন্নতি লাভ করাই আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। তাই জগৎসমক্ষে ও বিশেষতঃ আমাদের সমক্ষে বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতের একমাত্র অধিনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ বিষয়িনী জ্বলন্ত ঘোষণা তাঁহার জনৈক শিষ্য এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"মতামত, সম্প্রদায়, চার্চ্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা করিও না, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার ততই জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্ম্মধন উপার্জ্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ, সকল মতে, সকল পথেই কিছু না কিছু ভাল আছে। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, ধর্ম্ম অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। কেবল যাহারা নিজেরা ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, তাহারাই অপরের ভিতর ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইতে পারে। তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানজ্যোতিরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।"

—মদীয় আচার্য্যদেব।

এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান ব্যাধি নিরূপিত হইয়া তাহার প্রতীকারের উপায়ও স্থির হইল। কিন্তু কি উপায়ে উক্ত ব্যাধিনাশক পবিত্রতা লাভ করা যাইতে পারে, এ বিষয়ের মীমাংসা চাই। ধর্ম্মলাভ, পবিত্র হওয়া ভিন্ন যখন সম্ভবপর নহে, তখন ধর্ম্ম ও পবিত্রতা কিরূপে লব্ধ হয়, তাহার আলোচনা আবশ্যক। স্বামীজি, এই কথার উত্তরে ভারতের সমগ্র ঋষিকুলের ঐ বিসয়িনী মীমাংসার ('ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ') প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—বৈদিক দোহাই দিতেছেন—"Neither through wealth, nor through projeny, but through renunciation alone, is immortality to be reached." তাই তিনি শুনাইতেছেন—"Tremendous renunciation is the one secret of spirituality", "Renunciation is the back-ground of all religious thoughts." ত্যাগই ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায়, ত্যাগই পবিত্রতা লাভের একমাত্র পথ, ত্যাগই ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট সাধন। অতঃপর এখনও যগ্যপি আমরা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের সহিত কামকাঞ্চনত্যাগী মহাবৈরাগ্যবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্পর্ক বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অন্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন—'মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধন।' আমরা এক্ষণে দেখিলাম, তিনি ও তচ্ছিষ্য বিবেকানন্দ মুখে ত্যাগের কথা কহিয়াছিলেন, মনে ও কার্য্যে তাহার কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ত্যাগমাত্র-

সহায়েই তাঁহারা নিজ নিজ জীবন গঠন করিয়া যে পরম সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার কথাই 'জগদ্ধিতায়' দ্বারে দ্বারে জ্ঞাপন করিয়াছেন। উপসংহারে বর্ত্তমানকালে অনুষ্ঠেয় সমাজগত কর্ত্তব্যের কথা স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের এখানে উল্লেখ করিব। কারণ, সেগুলি বিশদ করিয়া বলিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সেগুলি এই—প্রথম, ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতি; দ্বিতীয়, সাধারণে শিক্ষার বিস্তার; তৃতীয়, ভারতকে জগতের ধর্ম্মগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। অতএব দেখা যাইতেছে, আর আমাদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কালযাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে। আদর্শ পাইয়াছি এবং ঐ আদর্শের সহিত আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধও বেশ বুঝিতেছি। তবে আসুন, সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া কায়মনোবাক্যে ঐ পথে চলিতে থাকি, দেখি এ জীবনে কতটা হয়।

ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ।

বিগত ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র কলিকাতা টাউনহলে ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বেলা ১২ টা হইতে ৫॥০টা ৬টা পর্য্যন্ত প্রতিদিন সঙ্ঘ বসিয়াছিল এবং দুই হইতে তিন সহস্র পর্য্যন্ত ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমদিবসের অধিবেশনে সঙ্গীতাদির পর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, দ্বারবঙ্গাধিপকে সঙ্ঘের সভাপতিত্বপদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিয়া যাহা বলেন, তাহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া গেল—

"১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরে যে জাগতিক ধর্ম্মমহাসভা হয়, নিঃসংশয় তাহা হইতেই এই ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের কল্পনা আসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি সেই ধর্ম্মমহাসভার অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন, তিনি ভারতে আসিয়া ভারতবাসীর মধ্যে এই ভাবের প্রচার করেন, আর ধর্ম্মপাল—যিনি এই সভা অলঙ্কৃত করিতেছেন এবং যিনি এখনই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন—তিনিও ইহার আবশ্যকতা প্রচারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামীজি জগতে অধিকদিন রহিলেন না। তিনি অতি শীঘ্রই আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন, সুতরাং অনেক

বর্ষ ধরিয়া এই ভাব আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। অবশেষে আমার হাইকোর্ট হইতে অবসরগ্রহণের পর বিগত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির কয়েকজন প্রধান সভ্য এই বিষয় লইয়া উৎসাহের সহিত আন্দোলন ও চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়, এবং উক্ত সমিতি ধর্ম্মসঙ্ঘের বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করেন। * *

এশিয়া সভ্যজগতের সমুদয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মের জন্মভূমি এবং ভারত— অধিকাংশ মানব যে সকল ধর্ম্মাবলম্বী—তাহাদের জননী বলিয়া পরিচিত হইবার গৌরবের যথার্থই অধিকারী। * * উপাসনা ও প্রেম সকল ধর্ম্মেরই সার কথা। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে শাক্তবৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, উহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই,—গোঁড়ারাই কেবল ভেদ দেখে। এইরূপ অন্যান্য বিবিধ ধর্ম্ম ও তাহার বহু শাখা প্রশাখা দেখিয়া মনে হইতে পারে, ইহাদের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের বীজসমূহ রহিয়াছে, কিন্তু মূলতঃ উহারা একই সারসত্যের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র।

প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম্ম মূলতঃ এক হইলেও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের ব্যাখ্যার দোষে বিভিন্নতা ও বিরোধ হইয়া থাকে। মূল লক্ষ্যটী না বুঝিয়া কেবল শব্দ লইয়া বিচারে আসল সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় আবার দেখা যায়, অনেকে নিজ নিজ ধর্ম্মের তত্ত্বগুলিই ঠিক ঠিক বুঝে না। আশা করি, এইরূপ ধর্ম্মসঙ্ঘের দ্বারা আমরা নিজেদের ধর্ম্ম ও অপরের ধর্ম্ম উভয়ই ভালরূপে বুঝিয়া, যথার্থভাবে পরস্পরের বিচার করিতে সক্ষম ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারিব।

দেহান্তে অনন্ত আনন্দলাভ সকল ধর্ম্মেরই মূল লক্ষ্য—উহাকে নির্ব্বাণই বল, মোক্ষই বল বা স্বর্গ নামই দাও, লক্ষ্য সকলেরই এক। ভারতীয় ধারণা এই— বহু জন্মান্তে ইহা লাভ হয়, এবং পাশ্চাত্য ধারণা অনুসারে এই দেহ অবসানেই সেই পরম সুখ লাভ হয়। কিন্তু এই পরম সুখই যে ধার্ম্মিকের চরম গতি, এ বিষয়ে কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোন ধর্ম্মেই মতভেদ নাই।

সকল দেশের অবতার, আচার্য্য, সাধুমহাপুরুষ—সকলেই সময়ে সময়ে মানবের উন্নতি ও উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—মানুষের কিসে উন্নতি হয়।"

অতঃপর ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর মিত্র

মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিলে দ্বারবঙ্গাধিপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই—

"আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি—আমাদের ধর্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি পরস্পর হইতে কতদূর পৃথক্ ইহা বিচারের জন্য নহে, বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যেক ধর্মের ভিতরে যে সকল অনন্ত সত্য বিরাজ করিতেছে, সেইগুলির সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে কতদূর মিল আছে, ইহা বিচারের জন্য। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপ ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে রাজা অজাতশত্রুর সভাপতিত্বে রাজগৃহে, খ্রীঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে বৈশালীতে ও খ্রীঃ পূঃ ২৫৫ অব্দে মহারাজা অশোকের সভাপতিত্বে পাটলিপুত্রে এবং ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কনিষ্কের সভাপতিত্বে জলন্ধরে বৌদ্ধগণ কর্তৃক ধর্ম্মসঙ্ঘ আহুত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ধর্ম্মসঙ্ঘ আহ্বান করিতেন। জৈনগণও ধর্ম্মসঙ্ঘ করিতেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় যে সঙ্ঘের অধিবেশন হয়, তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণের মধ্যে সম্ভবতঃ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদের সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ন্যায়ানুগত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মসঙ্ঘের সূচনা করেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালেও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একস্থানে সমবেত হইয়া বিচারের কথা শুনা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে চিকাগো ও ভিনিসে ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানেও এইরূপ মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এমন কি বর্ত্তমান ভারতেও সময়ে সময়ে ধর্ম্মের নামে স্থানে স্থানে অনেক লোক সম্মিলিত হইয়া থাকেন—এই সকল মেলার মধ্যে কুম্ভমেলাই প্রধান। এই সকল মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসমাগম হয়, তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া, তাঁহাদের পবিত্র সহবাসে সাধারণ লোকে উন্নত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মই মানবের বিশেষত্ব। অতি অসভ্য জাতির মধ্যেও আমরা কোন না কোন আকারে ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

Religion শব্দের অর্থ—পুনর্ব্বন্ধন—মানুষে মানুষে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অবশেষে ঈশ্বরের সহিত প্রেমবন্ধনে সম্মিলিত হওয়া। আমরা যেন এই ধর্ম্মসঙ্ঘের অবসানে সকলেই বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইতে পারি। ঈশ্বর আমাদের নেতা ও অধ্যক্ষস্বরূপ। আমরা তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদলের বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত হইলেও একত্র মিলিত হইয়া জগতের সমুদয় অনিষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

যে যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাকে ভজনা করি। হে পার্থ, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করিতেছে।

কোন পারস্য কবি বলিয়াছেন—

"মুসলমান তোমার দাসানুদাস, ব্রাহ্মণ তোমার জেলখানার কয়েদী, তুমি কাবা ও মসজিদে রহিয়াছ, আবার অগ্নি-উপাসকের এবং হিন্দুর মন্দিরে বিরাজ করিতেছ।"

জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহ ও তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ভগবান্ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল ধর্ম্মের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন এবং অধিকারানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালীসহায়ে তিনি যে সকলেরই পরম পিতা, উহা উপলব্ধির পথে লইয়া যাইতেছেন।

এখনও হয়ত সময় না আসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মানবজাতি বিভিন্ন উপায়ে সেই এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—তাহার মূল কথা এই —ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব।

আমরা সকলে এই সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য এবং ঐ অবস্থা আনয়নের সহায়তার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি।

আমরা বিভিন্ন পার্থিব মন্দিরে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী ও পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতে পারি, কিন্তু এই সকল আমাদের বিভিন্নতা—সময়ে সময়ে প্রবল বিভিন্নতা—সত্ত্বেও ভিতরে—প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনে সকলেরই একভাব—তথায় অবিচ্ছিন্ন শান্তি। বাহিরের ধর্ম্মে জগতে চিরকাল বিরোধ রহিয়াছে, কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই সাধুত্ব একই জিনিষ। এই সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতি যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন নিশ্চিত উহাদের উদ্দেশ্য ছিল—আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সহায়তা করা। কিন্তু এখন আর ভিতরের ভাবের দিকে লক্ষ্য নাই, এখন কেবল ছোবড়া লইয়া টানাটানি। আধ্যাত্মিক জীবনের যে সকল লক্ষণ—যথা প্রেম, পবিত্রতা, সত্য, আনন্দ, শান্তি ও অন্যান্য উচ্চ মানবোচিত গুণ—এইগুলিতে কাহারও ত কোন বিরোধ দেখা যায় না। এখানে আমাদের সকলেরই মিল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি এই ধর্ম্মসঙ্ঘে যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মের প্রস্তাব

পাঠ হইবার কথা, সংক্ষেপে তাহাদের সার সত্যগুলির সম্বন্ধে আলোচনান্তে সমাগত বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—

"এই ধর্ম্মসঙ্ঘের দ্বারা আমি অনেক কল্যাণের আশা করি। কোন ধর্ম্মের সত্যাসত্যের চরম পরীক্ষা এই—উহা তাহার উপাসকদিগকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব-সম্পন্ন সাধুচরিত্রে পরিণত করিতেছে কি না। যে ধর্ম্ম ইহাতে সক্ষম নহে, তাহাতে মানবজাতির কোন উপকার নাই। সমুদয় বিভিন্ন ধর্ম্মের সেই এক উদ্দেশ্য—আর আমরা অন্যরূপ ইচ্ছা করিলেও সকলই সেই এক ঈশ্বর, এক বিধান, এক ভাবের দিকে এবং সমগ্র জগৎ যে সুদূর ঈশ্বরাভিপ্রেত লক্ষ্যে অগ্রসর, তদ্দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পরিণামে এক ধর্ম্ম হইবে—উহার প্রধান ভাব হইবে—ঈশ্বরপ্রেম ও মানবজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব। এই ধর্ম্মসঙ্ঘ যেন জগতের ইতিহাসে সেই গৌরবের দিন আনিবার সহায়তা করিতে পারে।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে তাঁহার আহ্বানে কলিকাতাবাসী মিঃ আইজ্যাক, কোহেন ও ডেভিড যাহুদী ধর্ম্মসম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে কোলাবার জেব।নজী জামশেঠজী মোদী প্রেরিত জরতুষ্ট্রধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধের কোন কোন অংশ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ভিক্ষু পূর্ণানন্দ ও ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যথাক্রমে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোম্বাইবাসী শীতলপ্রসাদ প্রেরিত দিগম্বরী জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দী প্রবন্ধ পণ্ডিত ছেদিলাল কর্ত্তৃক ও বারাণসীবাসী মুন্নিমহারাজ প্রেরিত শ্বেতাম্বরী জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দী প্রবন্ধ পণ্ডিত হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক পঠিত হয়। পরে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইংরাজী ভাষায় নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলে প্রথম দিবসের অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে সঙ্গীতান্তে রেভারেণ্ড এচ, এণ্ডার্সন প্রথমে প্রার্থনা করেন এবং সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া উহাতে ভক্তিভাবে যোগদান করেন। পরে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর এই ধর্ম্মসঙ্ঘের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। ধর্ম্মের অভাবেই আমরা নানাবিধ দুর্দ্দশা ও দুঃখদুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াছি। সকলে নিজ নিজ ধর্ম্ম অকপট ভাবে পালন করিলেই আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি হইবে। নিজ নিজ ধর্ম্মের অপালনেই আমাদের সকলের দুঃখকষ্ট। যদি আমাদের খ্রীষ্টিয় শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম ঠিক ঠিক

প্রতিপালন করেন এবং আমরাও যদি ঋষিদিগের অনুশাসন প্রকৃতভাবে প্রতিপালন করি, তবে কি আমাদের মধ্যে এই সকল জাতীয় বিদ্বেষ থাকিতে পারে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ধর্ম্মসঙ্ঘ জন্মলাভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই ভারতে প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গের অভ্যুত্থান হইয়া আমাদের সমুদয় দুঃখ দূর হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতার রেভারেণ্ড এচ, এণ্ড্যার্সন প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্ম, জন এচ, ফ্রান্সিস রোমান কাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্যামুয়েল এ চিসহলম্ কর্ত্তৃকও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পঠিত হয়।

মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলবি মির্জা আবুল ফজল ইংরাজী ভাষায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৌলবি খোদাবক্স প্রেরিত ইংরাজী প্রবন্ধ মৌলবি মুস্তাফা খাঁ কর্ত্তৃক পঠিত হয়। কোয়াডিয়ান হইতে সমাগত মৌলবি মহম্মদ আলি নব-প্রতিষ্ঠিত উদারমতাবলম্বী আমেদিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মত ইংরাজী ভাষায় বিবৃত করেন। কলিকাতার মৌলবি খণ্ডকর আমিনুদ্দিন আমেদ বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পরে শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে কলিকাতা বড়বাজারের বড় সঙ্গতের নাথসিংহ হিন্দী প্রবন্ধ পাঠ করিলে লাহোর দেবসমাজের সম্পাদক কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় দেবধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হইয়া দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন শেষ হয়।

তৃতীয় দিবসের অধিবেশনের প্রথমে একটী বাঙ্গালা ও একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি ইহার প্রতি সহানুভূতিসূচক অনেক পত্র ও তার পাইয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুগণের মধ্যে উদারতা ও ভ্রাতৃভাব বিস্তৃত হইতেছে। পুরী গোবর্দ্ধন মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য এই ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন। আরো অনেক ব্যক্তি ও ধর্ম্মসম্প্রদায় অনেক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। মিত্র মহাশয়, সময়াভাবে সেইগুলি সঙ্ঘে পাঠ হইতে পারিবে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া, তন্মধ্যে কোন কোনটী হইতে অংশবিশেষ পাঠ ও সকলগুলির নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, সঙ্ঘের বিবরণী-পুস্তকে সেই সমুদয় মুদ্রিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মান্দ্রাজের জি, কে, শাস্ত্রী অনুভবাদ্বৈত বেদান্ত, রাজমহেন্দ্রীর নলস্বামী পিলে শৈবসিদ্ধান্ত এবং আমেদাবাদের লালুভাই পারেখ বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি রাজা গোপালাচার্য্য প্রেরিত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-

সম্বন্ধীয় ইংরাজী প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রেরিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা প্রবন্ধ শ্রীকুমুদবন্ধু সেন কর্তৃক পঠিত হয়। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ প্রেরিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রেরিত প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইতে না পারায় মিত্র মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। বাবা প্রেমানন্দ ভারতী প্রতিমাপূজা সমর্থন করিয়া কিছু বলিলে বাঁচি হইতে বালকৃষ্ণ সহায় কর্তৃক প্রেরিত আর্য্যসমাজের মত বিষয়ক প্রবন্ধ কলিকাতার শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতান্তে অপঠিত অবস্থায়ই সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রদান করেন। তৎপরে বেলুড় মঠের স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক প্রেরিত সনাতনধর্ম্ম বিষয়ক সুদীর্ঘ ইংরাজী প্রবন্ধ স্বামী নির্ম্মলানন্দ কর্তৃক পঠিত হইলে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র থিয়জফি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সময়াভাবে শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক সৌর উপাসনা ও পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন শাক্তধর্ম্ম বিষয়ক বাঙ্গালা প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ পাঠ করেন।

উপসংহারে বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক সঙ্ঘের সভাপতি দ্বারবঙ্গাধিপ, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, অনুশীলন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রভৃতি যাঁহাদের যত্ন ও উদ্যোগে এই সঙ্ঘের অধিবেশন সম্ভব হইল, সকলকেই যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুতে উদার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য যে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সভ্যগণই এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোগী।

মিত্র মহাশয় সকলকে যথারীতি ধন্যবাদদানান্তে বলিলেন, আমরা যেন এই ধর্ম্মসঙ্ঘের ফলে অপর ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া এই স্থান ত্যাগ করি। তিনি বলিলেন, আগামী ধর্ম্মসঙ্ঘ ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজ বা বোম্বাইয়ে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইয়া, তাঁহারা যেন কলিকাতার প্রধান কমিটির সহিত পত্রব্যবহার করেন।

পরিশেষে একটী ইংরাজী কবিতা পঠিত হইয়া হিন্দী ভাষার জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া উহাতে যোগদান করিলেন। পরে সভা ভঙ্গ হইল।

আমরা স্থানাভাবে এবারে কেবল স্বামী সারদানন্দের প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম। আগামীতে শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম' প্রবন্ধ সম্পূর্ণ ও অন্যান্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

সনাতন ধর্ম্ম।

ধর্ম্মভাব মানবের হৃদয়ে প্রথমে কিরূপে আবির্ভূত হইল, তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, প্রাকৃতিক নানাবিধ দৃশ্য দর্শনে ভয় বা বিস্ময় হইতে ধর্ম্মের আরম্ভ, অপর দল আবার বলেন, প্রাচীন মানব নিদ্রাবস্থায় যখন স্বপ্ন দর্শন করিত, তখন তাহার বোধ হইত যেন সে আর একজন, সে যেন আর এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, ইহা হইতেই আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান ও তৎসঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপার দেখিয়া এবং পরলোকগত আত্মার সাক্ষাৎ দর্শনে যে এই স্থূলদেহ ব্যতীত অপর সূক্ষ্ম সত্তার অস্তিত্ব জ্ঞান হয়, ইতিহাসে ইহার অনেক সাক্ষ্য বিদ্যমান। আর মানবের ধর্ম্মভাব বিকাশে অদ্ভুত বাহ্যপ্রকৃতি এবং তদপেক্ষা অদ্ভুত তাহার অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ই যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে গেলে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে যাহা সকল গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন, সেই বেদের কথা বলিতে হয়। বেদালোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায়—সামান্য জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বহুদেবোপাসনা ও তাহা হইতে দেবদেব অর্থাৎ একেশ্বরের উপাসনা কিরূপে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে। বেদে বিভিন্ন দেবের পৃথক্ স্তুতি আছে, আবার স্থলে স্থলে প্রত্যেক দেবকেই দেবদেবরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে বিভিন্ন দেবের উপাসনা আরম্ভ হইয়া কিরূপে শেষে একেশ্বরবাদে উহা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর এই ভাব যে আর্য্যগণ ভারতে উপনিবেশের পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেহ হইতে আত্মার পৃথকত্বধারণাও ইঁহারা যে অন্যান্য জাতি হইতে অনেক পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও অন্যান্য জাতির দেহসংকারবিষয়ক প্রথা হইতে বিশেষ উপলব্ধি হয়। এইরূপে একজন অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং দেবাতিরিক্ত জীবাত্মার ধারণা আসিল।

হিন্দুরা বেদকে অনাদি অনন্ত বলেন। আপাততঃ শুনিতে এই মত অদ্ভুত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বেদ অর্থে কতকগুলি আধ্যাত্মিক নিয়মাবলি বুঝায়। জীবাত্মায় জীবাত্মায় সম্বন্ধ এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ক নিয়মাবলিই বেদ। আর অন্যান্য জ্ঞানলাভের সময় যেমন জ্ঞানলাভের উপযুক্ত মন লাভ করিয়া অবস্থান করিলে সত্যের জ্ঞান সহসা সমুদিত হয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভেরও তাহাই নিয়ম। এই কারণে ঋষিগণ আবিষ্কারক নাম গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া দ্রষ্টা নাম গ্রহণ করিলেন—তাঁহারা যেন ভগবানের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হইলেন।

একত্ব উপলব্ধিতে সমুদয় বিজ্ঞানের পর্য্যবসান। সুতরাং ঋষিরা বেদের কর্ম্মকাণ্ডপ্রকাশিত অনুষ্ঠানপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া এবং সংসারের উপস্থিত

যাবতীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া পরিশেষে যখন তৎসকলের অসারতা বুঝিলেন, তখন তাঁহারা আরো সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়, উপাস্য উপাসক উপাসনা, প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ—এই ত্রিপুটি— যাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মূলভিত্তি, তাহাকে পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া চরম সত্য অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিলেন। এই অবস্থার নাম সমাধি বা তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থা কিন্তু স্থায়ী হইল না। আবার দেহজ্ঞান আসিল—আবার মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের নৃত্য আরম্ভ হইল। কিন্তু একবার সত্যের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ঐ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিবার শক্তি জন্মিল। তখনই তাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গেল, ঈশ্বর ও অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা এমন পরমানন্দ লাভ করিলেন, যাহাকে পাইলে আর কোন লাভ, লাভ বলিয়া বোধ হয় না, যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া অতি দুঃখেও আর মন বিচলিত হয় না।

তখন তাঁহারা সমগ্র জগতের নিকট ঘোষণা করিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥

হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর। আমি সেই পরম পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি অজ্ঞানান্ধকারের অতীত ও জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যু অতিক্রম করে, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

একবার যখন এই তুরীয় ভূমি লব্ধ হইল, তখন উহার সহিত সাধারণ অবস্থার সম্বন্ধ ও তল্লাভের বিভিন্ন প্রণালী বিচার করিয়া বিবিধ দর্শনের সৃষ্টি হইল। এমন কি, ভগবান্ তথাগত আপাততঃ বেদবিরোধী হইলেও তৎপ্রচারিত নির্ব্বাণ ঐ তুরীয় অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, যখন বেদের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে নানাবিধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল, তখন সেইগুলির সাধনের জন্য সমুদয় বেদের বাক্যই যে পরস্পর বিরোধী নহে, উহাদের মধ্যে যে সমন্বয় আছে, তাহা দেখাইবার জন্য ব্যাস বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করিলেন।

যখন উপনিষদ্‌যুগে তুরীয় ভূমি আবিষ্কৃত হইল, তখন যে দ্বৈতবাদী ও কর্ম্মমার্গীদের মধ্যে কিরূপ গোল লাগিয়া গেল, ইহা আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে গোল লাগিয়াছে, তাহা দেখিয়া কতকটা

অনুমান করিতে পারি। কর্ম্মবাদী ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানবাদী ক্ষত্রিয়ে অনেকদিন ধরিয়া তর্ক বিতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল, কর্ম্মকাণ্ডের অনেক অংশ লোপ পাইল। এই বিরোধের সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মমার্গ প্রচার দ্বারা জ্ঞানকর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিলেন। আবার যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অসামঞ্জস্য হইল, তখন ভগবান্ বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া আচণ্ডালে জ্ঞানবিতরণে আবার সামঞ্জস্য সাধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইতে না হইতেই নানা কারণে তাঁহার ধর্ম্মের মধ্যে নানা দোষ প্রবেশ করিল। বড় বড় মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তথায় বুদ্ধমূর্ত্তি পূজিত হইতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রণের ফলস্বরূপ কতকগুলি কদাচার প্রবেশ করিল। তখন আবার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশসমুদয় গ্রহণ করিয়া প্রাচীন বৈদিক মার্গের সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধন করিলেন। এ কারণে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অপবাদ হইয়াছিল। আর তিনি মন্দিরগুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে বৈদিক ধর্ম্ম লোপ পায় নাই বা এই নব হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানেও বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইল না। উভয়েরই উৎকৃষ্ট অংশ অপরে গ্রহণ করিয়া নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, শঙ্কর কর্ত্তৃক বেদের অদ্বৈত ব্যাখ্যা তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার প্রভাবে প্রায় সকলেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল সত্য, কিন্তু দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতসকল লোপ হয় নাই, বরং ধীরে ধীরে উহারা বিকাশ পাইতেছিল— পরিশেষে দাক্ষিণাত্যে রামানুজের অভ্যুদয়ে ও তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে ঐ সকল ভাব বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। পরিশেষে রামানন্দ, মধ্ব ও বঙ্গদেশীয় চৈতন্যদেবের প্রভাবে ঐ সকল ভাব আরো বিস্তৃত হইল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবানুযায়ী বেদের ভাষ্য ও দর্শন প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল পরস্পর বিরোধীভাব পাশাপাশি অবস্থান করিতে লাগিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে ঋষির বংশধরগণ দিশাহারা হইয়া কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, কোন্‌টী গ্রাহ্য, কোন্‌টী ত্যজ্য বিচার করিতে গিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এদিকে বাণিজ্যপ্রাণ পাশ্চত্যজাতি ক্ষমতা হস্তে পাইয়া বিভিন্নরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে জাতীয় ভাবের উপর একেবারে ঘৃণা আসিল। নিজের উপর অবিশ্বাসে যেমন কাহারও উন্নতি হয় না, জাতীয় গৌরবে অবিশ্বাসী জাতিরও তদ্রূপ কখন উন্নতি

হয় না। জাতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রাচীনের উপর উহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। যাহা হউক,যখন এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত,তখন বঙ্গদেশের এক অপরিচিত সুদূর পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইল—তিনি নিজ পবিত্র জীবনের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিন্দুমাত্র সহায়তা না লইয়া প্রাচীন সত্যসকল উপলব্ধি করিয়া উহাদের সত্যতা প্রমাণ করিলেন। তাঁহার কার্য্য এই সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ভারতসন্তানগণের ভিতর তাহাদের অতীত গৌরবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাগরণের সূচনা করিয়া দিয়া তিনি সমগ্র ভারতকে এক জাতিতে গ্রথিত করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষগণ বিনাশ করিতে আসেন না, সম্পূর্ণ করিতে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি প্রাচীন সকল ভাবের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেখাইলেন, প্রত্যেকটীই সত্য, প্রত্যেকটীরই স্থান আছে। তাঁহার মতে মানব মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে না, সত্য হইতে সত্যান্তরে গিয়া থাকে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, কোনটীই মিথ্যা নহে, একটী অপরটীর পরিণতিমাত্র; ব্রহ্ম সগুণ নিগুর্ণ, সাকার নিরাকার উভয়ই; সিদ্ধাবস্থায় সকলেরই এক ভাব, তবে সাধনাবস্থায় নানা বিভিন্ন পথাবলম্বনে তথায় যাইতে হয়; যে যে মত অবলম্বন করুক, সে অকপটভাবে তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে; কখনও কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই, কখনও কাহাকেও বলিতে নাই, এই এই মত অবলম্বন না করিলে বা এই এই অনুষ্ঠান না করিলে তোমার কিছু হইবে না, ধর্ম্ম কল্পনার বস্তু নহে, প্রত্যক্ষ সত্য, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন, জ্ঞান ভক্তি রাজ ও কর্ম্মযোগ সহায়ে সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছান যায়; বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থাজনিত পার্থক্য কেবল কর্ম্মফলে, আর কালে সকলেই কর্ম্মপাশ কাটাইয়া সেই তুরীয় অবস্থায় উপনীত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনিই আসিয়া জুটে।" ফুল ফুটিয়াছে—এমন সর্ব্বভাবসমন্বিত জীবন ও উপদেশ আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এখনও যাঁহারা ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন না, তাঁহারা বাস্তবিকই দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না।

উপসংহারে বক্তব্য, যাঁহারা এই জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইঁহার জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আরো অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করুন—যিনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার গুরুদেবের বার্ত্তা বহন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার অদ্ভুত কৃতকার্য্যতায় আমরা সকলেই ভাবিয়াছিলাম, অলৌকিক শক্তিবলেই তাঁহার পাশ্চাত্যবিজয়কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম।

গৃহনির্ম্মাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের বিষয় সংবাদপত্র পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা এখনও অবগত নহেন, তাঁহাদের অবগতির জন্ত সংক্ষেপে উহা লিখিত হইল।

উদ্দেশ্য,—স্ত্রী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়াদি বিচার না করিয়া সকল নিঃসহায় পীড়িত মুমূর্ষু জরাগ্রস্ত এবং অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা।

উপায়—(ক) রাস্তাঘাট এবং বাড়ী বাড়ী অন্বেষণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে বাহির করিয়া আশ্রয় ঔষধ পথ্য খাদ্য বস্ত্রাদি যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহাকেই তাহা দেওয়া; (খ) যাহারা গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালে যাইতে রাজি, তাহাদের তথায় আশ্রমের খরচায় প্রেরণ, (গ) নিঃসম্বল ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হইলে জাতি ও ধর্ম্মানুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা, (ঘ) মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাঁহারা ব্যবস্থা-বিপর্য্যয়ে এককালে নিঃস্ব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, অথচ সাধারণ দানস্থলে গমন করা অপেক্ষা অনশনে বা অর্দ্ধাশনে জীবনত্যাগও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন, তাঁহাদের অন্বেষণ করিয়া গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান। এক কথায়, সেবকগণের শারীরিক পরিশ্রমে এবং ভিক্ষা ও চাঁদালব্ধ অর্থে 'দরিদ্র নারায়ণগণের' যতদূর সেবাশুশ্রূষা করা সম্ভব, এই সেবাশ্রমে সেই সমুদয় সেবাই করা হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৯০৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯২০১ জন ব্যক্তি এই সেবাশ্রমে সাহায্য পাইয়াছে।

রামাপুরা পল্লীস্থ একটী ক্ষুদ্র ভগ্নবাটীতে অনেকদিন ধরিয়া উক্ত সেবাশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্থানটী তত স্বাস্থ্যকর ও প্রশস্ত না হওয়ায় উত্তমরূপে সেবাকার্য্য চলিতেছে না। প্রায় দুই বর্ষ পূর্ব্বে সেবাশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮৯৩৪৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বারানসীর লাক্ষা নামক পল্লীতে চারি বিঘা জমি খরিদ হইয়া ১৯০৮ সালের ১০ই এপ্রেল উহার ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয় এবং ৭ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিজ্ঞানানন্দের (ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার) তত্ত্বাবধানে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সংক্রামক এবং অন্যান্য রোগগ্রস্ত ৩৫ জন রোগীকে যাহাতে স্বচ্ছন্দে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থানবিশিষ্ট গৃহসমূহ বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে যে রোগিগৃহ নির্ম্মাণকল্পে দান স্বীকৃত হইয়াছে,

সে সকল রোগিগৃহের ছাদপর্য্যন্ত গাঁথনি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল গৃহ-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে উহাতে ২৩ জন মাত্র রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইবে।

এখন অভাব—আরও ১২ জন রোগীর থাকিবার গৃহসমূহ এবং আশ্রমসেবক ও চাকরবাকরদিগের বাসোপযোগী গৃহ, রন্ধনশালা পাইখানা প্রভৃতি। ঐ সকল নির্ম্মাণকার্য্যে অন্ততঃ আরও ২০০০০্ টাকার প্রয়োজন।

ভারত চিরকাল দানের জন্য প্রসিদ্ধ। সেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্যটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের প্রাণের ইচ্ছা—যাহাতে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে। সেবকগণ সকলেই সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের নিজেদের ত কোন সম্বলই নাই। তদ্ব্যতীত তাঁহারা সমর্থপক্ষে নিজেদের আহারাদি পর্য্যন্ত সেবাশ্রম হইতে গ্রহণ না করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে ইহার স্থায়িত্ব আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা পাঠকমহোদয়দিগের প্রত্যেককে অনুরোধ করিতেছি, যাঁহাদের সুবিধা হয়, তাঁহারা স্বয়ং কাশীতে যাইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসুন। অথবা—কাশীতে সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আছেন—তাঁহাদের দ্বারা ইহার সংবাদ লউন। তারপর যদি আপনার এ কার্য্যটী যথার্থ ই লোকহিতকর বলিয়া ধারণা হয়, তবে আপনারা যথাসাধ্য এ বিষয়ে সাহায্য করুন এবং বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য করান। এইরূপে 'দরিদ্র নারায়ণ' সেবারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের সহায়তা করিয়া নিজেরা ধন্য ও দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

সাহায্যাদি—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রামাপুরা, বেনারস সিটি ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ভগবৎসন্নিধানে নিয়ত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
ব্রহ্মানন্দ
(প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন।)

সংবাদ।

গত ২৯শে ফাল্গুন ইংরাজী ১৩ই মার্চ্চ শনিবার দিবসে পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গিয়াছে।

গত ২৯শে চৈত্র ইংরাজী ১১ই এপ্রেল রবিবার ইটালি রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক তথায় অতি সমারোহের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।
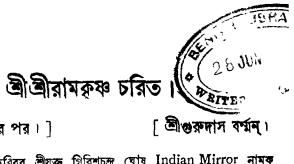
বহুদিন পূর্ব্বে কবিবব শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ Indian Mirror নামক ইংরাজি খববেব কাগজে পড়িয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। গিরিশ ভাবিলেন যে, ব্রাহ্মরা যেমন হবি, মা প্রভৃতি বলা আবম্ভ কবিয়াছেন, সেইরূপ একজন পরমহংসও খাড়া করিয়াছেন। হিন্দুরা যাঁহাকে পবমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। ইহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলেন, তাঁহাদের বসুপাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গেলেন, কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়াই শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহাব প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলেন। কবিবর দীননাথেব বাড়ী যখন উপস্থিত হইলেন, তখন পবমহংস কি উপদেশ কবিতেছেন ও কেশব প্রভৃতি তাহা আনন্দে শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিযা পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যা হয়েছে?" গিবিশ ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে, সাম্নে সেজ জ্বলছে, তবু বুঝতে পারছেন না যে, সন্ধ্যা হযেছে কি না। আর কি দেখব?"—ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর গলিস্থ বলবাম বসুব ভবনে রামকৃষ্ণদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলবাম তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পাড়াব অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতিবেশী কবিবরকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঘোষজ মহাশয় দর্শন করিতে গেলেন। দেখিলেন—বামকৃষ্ণদেব আসিয়াছেন; বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামের বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম। পরমহংসের আচরণে কবি চূড়ামণির একটু চমক হইল। তিনি জানিতেন, যাহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়, তাহারা কাহাবও সহিত কথা কয় না, কাহাকেও নমস্কার করে না, তবে কেহ যদি অতিশয় সাধ্য সাধনা করে, পদসেবা করিতে দেয়। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার কবিতেছেন। এক ব্যক্তি, গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বের ইয়ার, পরমহংসকে

লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।" কথাটা ঘোষজ মহাশয়ের ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখবে?" কবিবরের ইচ্ছা ছিল আরও কিছু দেখেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় জিদ্ করিয়া কবিবরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (তখন উহা ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে) "চৈতন্য-লীলার" অভিনয় হইতেছে, গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছেন, বসতে দেও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনছি।"

গিরিশ কহিলেন, "তাঁর টিকিট লাগবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগবে।" এই কথা বলিয়া তিনি রামকৃষ্ণদেবের অভ্যার্থনার্থে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; ঘোষজ মহাশয় না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন। ঘোষজ মহাশয় নমস্কার করিলেন, পুনরায় তিনিও নমস্কার করিলেন; ঘোষজ আবার নমস্কার করিলেন, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। ঘোষজ ভাবিলেন, "এইরূপই ত দেখছি চল্‌বে।" সুতরাং ঘোষজ মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটী বক্সে বসাইলেন ও একজন আড়ানী পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই তাঁহার তৃতীয় দর্শন।

চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ঘোষজ মহাশয়ের নিজের অবস্থার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার পঠদ্দশায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজি শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যা ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে, এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত

যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ঘোষজ মহাশয় ইংরাজি দুপাতা পড়িয়াছেন—কালা-পাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে, প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না। মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক বিতর্ক চলে। আদি সমাজেও কখন কখন যাওয়া আসা করেন, একটী ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যান। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান্ যদি থাক, আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেও।" ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মনে দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলেন, জল, বায়ু, আলো ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা অজচ্ছল রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান্ বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথা ঠিক। ভাবিলেন, ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা। এরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল।

পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঘোষজকে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বিপন্মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? ঘোষজ মহাশয় দেখিয়াছেন, অসাধ্য রোগ হইলে লোকে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। ভাবিলেন, "আমারও ত কঠিন বিপদ্—একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ভাব্‌লে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করে দেখা যাক্।" শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলেন, চেষ্টা সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ্ হইতে ত মুক্ত হইলেন, কিন্তু পরকালের উপায় কি; আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব—কোন্ পথ অবলম্বন করিব? ভাবিলেন—"তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি।" ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে—গুরু ব্যতীত উপায় নাই।

ঘোষজ ভাবিলেন, "কেন, উপায় নাই? এইত ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে—গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করব? শুনতে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করতে হয়, কিন্তু আমার ন্যায় মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি?" তাঁহার মন অতি অশান্তি-পূর্ণ হইল। তিনি মানুষকে গুরু করিতে পারিবেন না।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিবেন? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইবেন? ভাবিলেন, "যাক্, আমার গুরু হবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করে আমার গুরু হোন্। শুনেছিলাম—নরবেশে ধরে কখন কখন মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই, নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের ত কৈ দেখা পাই না, তবে আর কি করব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করব, তার পর যা হয় হবে।"

এই সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়; তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্, একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"আমি প্রত্যহ ভগবান্‌কে ভোগ দিই—তিনি গ্রহণ করেন, কখন কখন রুটিতে দাঁতের দাগ্ থাকে, কিন্তু এভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হলে হয় না।" কবিবরের মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ ঘটনার তিন দিন পরে তিনি কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটী রকে বসিয়া আছেন; দেখিলেন—চৌরাস্তার পূর্ব্ব দিক্ হইতে নারায়ণ আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতে-ছেন। ঘোষজ মহাশয় তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র পরমহংসদেব নমস্কার করি-লেন। সেদিন কবিবর নমস্কার করায় পুনর্ব্বার আর নমস্কার করিলেন না। তাঁহার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতে-ছেন, কবিবরের বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থল রামকৃষ্ণদেবের দিকে কে টানিতেছে। পরমহংসদেব কিছুদূর গিয়াছেন,

ঘোষজ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল—তিনিও তাঁহার সঙ্গে যান। এমন সময় পরম-হংসদেবের নিকট হইতে তাঁহাকে একজন ডাকিতে আসিলেন, বলিলেন, "পরম হংসদেব ডাক্‌ছেন।" গিরিশচন্দ্র চলিলেন, পরমহংসদেব বলরাম বসুর বাড়ীতে উঠিলেন, তিনিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। বলরাম বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বসুজ মহাশয়ের সহিত দুই একটী কথা বলিবার পর, পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া "বাবু আমি ভাল আছি, বাবু আমি ভাল আছি," বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "না, না, ঢং নয়, ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। ঘোষজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরু কি?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "গুরু কি জান, যেন ঘটক*।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে।"

ঘোষজ—"মন্ত্র কি?"—জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—"ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানন্দ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান কর্‌তেন। ঘাটের সিঁড়ীতে কবীর নামে এক জোলা শুয়েছিল। রামানন্দ নাম্‌তে নাম্‌তে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' উচ্চারণ কর্‌লেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হ'ল। আর সেই নাম জপ করে কবীরের সিদ্ধিলাভ হ'ল।"

পরে থিয়েটারের কথা পড়িল। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখিও।"

ঘোষজ উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখ্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "কিছু নিও।"

ঘোষজ—"ভাল, আট আনা দেবেন।"

পরমহংসদেব বলিলেন, "সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।"

ঘোষজ উত্তর করিলেন, "না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেই খানে বস্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "না একটী টাকা নিও।"

ঘোষজ "যে আজ্ঞে" বলায়, একথা শেষ হইল।

---

* পরমহংসদেব এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বসুজ মহাশয় তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। ঠাকুর একটী সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। ঘোষজ মহাশয়েরও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে—লজ্জায় পারিলেন না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বসুজ মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হরিপদ কবিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন ?" গিরিশ কহিলেন, "বেশ ভক্ত।" তথন ঘোষজর মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্য হতাশ ভাব আর নাই। ভাবিলেন, "গুরু কর্‌তে হয়, মূর্খে বলে। এইত পরমহংস বলিলেন, আমার গুরু হয়ে গেছে, তবে আর কার কথা শুনি ?"

যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাহা একরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু এখন বুঝিতেছেন যে, তাঁহার মনে প্রবল দম্ভ থাকায় তিনি গুরু করিতে চাহেন নাই। ভাবিতেন, এত কেন ? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড় হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ্ জোটান মাত্র। পরমহংস-দেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি ঘোষজকে নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও তাঁহাকে প্রথম নমস্কার করিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, তাহা ঘোষজর ধারণা জন্মিল, এবং তাঁহার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা ঘোষজর মনে দিন দিন উঠে। বলরাম বসুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ঘোষজ মহাশয় থিয়েটারের সাজ ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব এসেছেন"। তিনি বলিলেন, "ভাল, বক্সে নিয়ে গিয়ে বসান।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করে নিয়ে আস্‌বেন না ?"

ঘোষজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নাম্‌তে পার্‌বেন না ?" কিন্তু গেলেন।

তিনি পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় পরমহংসদেব গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া, ঘোষজ বলেন, তাঁহার পাষাণ হৃদয়ও গলিল, আপনাকে ধিক্কার দিলেন, সে ধিক্কার আজিও তাঁহার মনে জাগিতেছে। ভাবিলেন, "পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাইনি।" তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলেন, তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কেন যে করিলেন, তাহা তিনি

আজিও বুঝিতে পারেন না। তাঁহার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়। তিনি একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া পরমহংসদেবকে দিলেন। তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু আবার ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব ?"

ড্রেস্ সার্কেলের দর্শকের কনসার্টের সময় বসিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারের দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন, অনেকগুলি ভক্তও তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, ঘোষজও অপর এক চৌকিতে বসিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। কবিবরের পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রের সহিত আলাপ ছিল। ঘোষজ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "বসুন না।" কিন্তু তিনি অসম্মত। ঘোষজ কারণ বুঝিতে পারিলেন না। ঘোষজ মহাশয় বলেন, "আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বসতে নাই, ইহা আমি জান্‌তাম না।" পরমহংসদেব ঘোষজর সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কবিবরের বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন তাঁহার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব ভাব নিমগ্ন হইলেন। একটী বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু পূর্ব্বে তিনি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলেন। এই বালকের সহিত ঐরূপ ক্রীড়া দেখিয়া সেই নিন্দার কথা তাঁহার মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি নাট্যাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মনে বাঁক আছে।"

গিরিশ ভাবিলেন, অনেক প্রকার বাঁক ত আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁক যায় কিসে ?"

পরমহংসদেব বলিলেন, "বিশ্বাস কর।"

আবার কিছুদিন গত হইল ; গিরিশ বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছেন, একটু চিরকুট পাইলেন যে, মধুরায়ের গলিতে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংস আসিবেন। পড়িবামাত্র তাঁহাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। তিনি যাইতে ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইবেন ? কিন্তু ঐ অজানিত সূত্রের টানে বাধা রহিল না ;

চলিলেন। অনাথ বাবুর বাজারের নিকট যাইয়া ভাবিলেন, "যাইব না।" ভাবিলে কি হয়, তাঁহাকে টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হন, আর থামেন। রামচন্দ্রের গলির মোড়ে গিয়া থামিলেন। পরে রামচন্দ্রের বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে রামচন্দ্র বসিয়া আছেন; ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ ঘোষজকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এখানে এসেছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "পরমহংসদেবকে দর্শন করতে।" রামচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রের বাড়ী। তিনি তথায় ঘোষজকে লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সব কথা ভাল লাগিল না। তিনি তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রামচন্দ্রের উঠানে রামচন্দ্র খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে—"নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে।" তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামচন্দ্রের আঙ্গিনা টল্‌মল্ করিতেছে। তাঁহার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনিও গ্রহণ করেন, কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। তাঁহার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও তিনি নৃত্য করিতে করিতে ঠিক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার আর চরণস্পর্শে বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামচন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, তিনিও উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কবিবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবে ত?" পরমহংসদেব কহিলেন, "যাবে।" কবিবর আবার ঐ কথা বলিলেন, পরমহংসদেব ঐ উত্তর দিলেন। ঘোষজ মহাশয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের পরম ভক্ত মনোমোহন মিত্র কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "যাও না, উনি বল্‌লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কর্‌ছ?" এরূপ কথার উ না দিয়া গিরিশ ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষান্ত হন নাই। মনোমোহন

মিত্রের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু ভাবিলেন, "ইনি সত্যই বলেছেন, যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নেই, তিনি শতবার বল্‌লেও ত তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়।" কবিবর রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলেন। দেবেন্দ্র কিয়দ্দূর তাঁহার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন; অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঘোষজ যাইয়া রামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি স্তবটীও আবৃত্তি করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বল্‌ছিলুম, মাইরী; একে জিজ্ঞেস কর।" পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঘোষজ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি উপদেশ শুনব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি, তাতে কিছু হয় না; আপনি যদি আমার কিছু করে দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃস্পুত্র রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "কিরে, কি শ্লোকটা বল্‌ত?" রামলাল দাদা শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন; শ্লোকের ভাব—পর্ব্বত গহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। ঘোষজ মহাশয়ের তখন মনে হইতেছে, "আমি নির্ম্মল।" তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তাঁহার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, তাঁহার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল? এ কাহার আশ্রয় পাইলেন, যে আশ্রয়ে তাঁহার সকল ভয় দূর হইয়াছে?

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "আমায় কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ, আমি এইখানেই থাকি।" তিনি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছেন, রামকৃষ্ণদেব উত্তরের বারাণ্ডা অবধি তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আবার কি আমায় যা করি তাই করতে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন, "তা কর না।" তাঁহার কথায় ঘোষজর মনে হইল, যেন যাহা করেন তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার হৃদয়ে আসিল; গুরুই

সর্ব্বস্ব তাঁহার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—তাঁহার জন্ম সফল।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

আমেরিকা, ১৮৯৪

প্রিয় ধর্ম্মপাল,

আমি তোমার কলিকাতার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠাইলাম। আমি তোমার কলিকাতার বক্তৃতার কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্য ফল হইয়াছিল, তাহা সব শুনিয়াছি। * * *

এখানকার জনৈক কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত মিশনরি আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটী ছাপিয়ে একটা হুজুক কর্‌বার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জানো, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভাবিয়া থাকে। আবার সেই মিশনরিটীই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, তার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে অবিমিশ্র ঘৃণাই পেলেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। একজন ধর্ম্মের প্রচারক—তাঁর এইরূপ সব কপট ব্যবহার। দুঃখের বিষয়—সব দেশে, সব ধর্ম্মেই এইরূপ ভাব বেজায়।

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল। আমার তত শীত বোধ হয় নি। মনে করেছিলুম—ভয়ানক শীত ভোগ কর্‌তে হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় কেটে গেছে। 'স্বাধীন ধর্ম্মসভা'র (Free Religious Society) সভাপতি কর্ণেল নেগিন্‌সনকে তোমার অবশ্য স্মরণ আছে—তিনি খুব যত্নের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন অক্সফোর্ডের (ইংলণ্ড) ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি প্লাইমাউথে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি খুব সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। তিনি তোমার সম্বন্ধে আর তোমার কাগজের সম্বন্ধে খোঁজ কর্‌লেন।

আশা করি, তোমার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

তোমার যখন অবকাশ থাক্‌বে, তখন দয়া করে আমার সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্‌বে। তোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে তোমার ক্ষণিকের জন্য সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। ইণ্ডিয়ান মিররের মহামনা সম্পাদক মহাশয় আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন—তজ্জন্য তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পরম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়্‌ব—জানি না। তোমাদের থিওজফিক্যাল সোসাইটির মিঃ জজ ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই খুব ভদ্র ও সরল আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জজ খুব কঠোর পরিশ্রমী—তিনি থিওজফি প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চানরা তাঁদের পছন্দ করে না। সে ত তাদেরই ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টিয়ানগণ বাকি লোকদের কোন রকম ধর্ম্ম দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম্ম নেই, থিওজফিষ্টরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম্ম দিতে কৃতকার্য্য হন, তাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, তাত বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু খাঁটি গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশ হতে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের যে রূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা ভারতের খ্রীষ্টধর্ম্ম হতে এত তফাৎ যে বল্‌বার নয়। ধর্ম্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, এ দেশে এপিস্কোপ্যাল ও প্রেস্‌বিটেরিয়ান চার্চ্চের ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার আবার তাঁদের নিজের ধর্ম্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাঁদের কাছে ধর্ম্ম একটা ব্যবসামাত্র, তাঁরাই ধর্ম্মের ভিতর সংসারের ঝগড়া বিবাদ স্বার্থপরতা এনে—ব্যবসার খাতিরে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকটভাবাপন্ন হোতে বাধ্য হন।

তোমার প্রতি চির ভ্রাতৃপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

[শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।]

মহৎব্যক্তির আদেশ পালন অতি কর্ত্তব্য—নচেৎ আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাসের উপযুক্ত নই, পূর্ণ ব্রহ্ম মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতাম না। বৈষ্ণবগণের চরণে শতকোটী নমস্কারপূর্ব্বক মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছে, "জপাৎ সিদ্ধিঃ"। কিন্তু কলির দুর্দ্দম শাসনে ক্রমে দুর্ব্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও কঠিন। মহাপ্রভু দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়াল প্রভু এই নিমিত্ত অতি গুহ্যতর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন,—নামই সর্ব্বস্ব, নামই ব্রহ্ম; নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান করো, ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হও। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধির বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কিন্তু কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু। পতিতপাবন গৌরাঙ্গ বলিলেন, জীবে দয়া রাখো, কোটী কোটী কঠোর তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে, নাম ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবে, মানব জন্ম সার্থক হইবে।

মানব জন্ম সার্থক হইবে—এ কথা শুনা যায়, কিন্তু মানব জন্মের সার্থকতা কি? শুনিতে পাই, মানবজন্মের সার্থকতা মুক্তিলাভ, কিন্তু যাহা মুক্তি বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। জলবিম্ব জলে মিশাইয়া যাইবে—অস্তিত্ব থাকিবে না, মোহজড়িত হৃদয় এ কথা শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হয়! এই তো মৃত্যু! আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, এ কি কথা? শত শত বার জন্মগ্রহণ করি, শত তাপে তাপিত হই, তথাপি অস্তিত্ব থাকুক! অস্তিত্ব লোপ যদি মানব জীবনের সার্থকতা হয়, তবে এ সার্থকতা আমার প্রয়োজন নাই। তেজীয়ান্ মহাপুরুষেরা এ সার্থকতার প্রয়াসী, কিন্তু মৎ-সদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ জীবের পক্ষে এই সার্থকতা লাভ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক বোধ হয়।

তেজীয়ানের উপায় আছে, আমাদের উপায় কি? গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইলেন। পতিত তাপিত মায়ামোহবিজড়িত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে শ্রীচরণে স্থান

* বিগত ২৯শে চৈত্র ভারতীয় ধর্ম্ম-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। তিনি স্বয়ং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেন। জীব দেখিত, বিস্মিত হইয়া ভাবিত,—স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? ইনি বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তবে মন্ত্রতন্ত্র ছাড়িয়া হরিবোল দিয়া নৃত্য করেন কেন? "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া শতধারা ইঁহার বক্ষ বহিয়া যায় কেন? দেখিতে লাগিল, ভাবিতে লাগিল, ধীরে ধীরে ভাবের ধারা হৃদয়ে বহিল। সেই পবিত্র ধারা মোহপ্রস্তর বেষ্টিত ছিল, গৌরাঙ্গদেবের গভীর হরি-ধ্বনিতে সেই প্রস্তর প্রাচীর ভাঙ্গিল। ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া জীব বৃন্দাবনের ভাব-সাগরে উপস্থিত হইল, ভাবরাজ্যে দেখিল—হৃদয় আকৃষ্টকারী কৃষ্ণকায় বালক যশোদা গোয়ালিনীর কোলে স্তনপান করিতেছে, দেখিল—অলঙ্কারভূষিত চূড়াবান্ধা জানু পাতিয়া গোয়ালিনীর নিকট নবনী প্রার্থী, দেখিল—নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় লইয়াছে; দেখিল—পাঁচনী হস্তে গোপবালকের সহিত গোচারণ করি-তেছে; দেখিল—কিশোর কৃষ্ণকায় কাঞ্চনকান্তি কিশোরীর সহিত প্রেমের আদান-প্রদান করিতেছে,—গোপীগণ মুগ্ধচিত্তে সেই আদানপ্রদান উপভোগ করিতেছে; দেখিল—মায়িক সংসারের ন্যায় সকলই, কিন্তু মায়িক জড়তা নাই, সমস্ত প্রেমে গঠিত। প্রেমগঠিত যশোদা, প্রেমগঠিত নন্দ, প্রেমগঠিত গোপবালক, প্রেমের পুতলী কিশোরী, প্রেমের গোপীগণ প্রেমাধার কিশোর লইয়া প্রেমলীলায় মুগ্ধ আছে।

জীব বুঝিতে পারে না, এ কি সাধন! ভাবে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত, কিন্তু কই এ ত সাধন নয়! সাধনের কঠোরতা কোথায়? সকলই মাধুর্য্যপূর্ণ, ইহা আবার সাধন কি? পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছে—ভাবে, এ কি মধুময় ভাব-সাগর! কই—কোথায় ত এরূপ ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ নাই! ভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতেছে, নাস্তিক, আস্তিক উভয়েই মুগ্ধ। নাস্তিক ও আস্তিক উভয়েই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে,—এ কি অপূর্ব্ব "কবিত্ব রসের" প্রস্রবণ! "ভূমণ্ডলের অন্য কোন দেশে কোন উপাখ্যানে এরূপ বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ ও বিচিত্র রসতরঙ্গিণী একত্রে প্রবাহিত হইতে ত দেখা যায় না। এ রসে যাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত না হয়, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণ অপেক্ষা কঠিন পদার্থে বিনির্ম্মিত, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এ কি অনন্ত ভাবপ্রবাহ! অষ্টাদশ পুরাণে বর্ণিত হইয়া শেষ হয় না। বরং আরও উথলিয়া উঠিতে থাকে। কথকতা, কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না, রসতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িতে থাকে! কানু ছাড়া মধুর গীতই হয় না! এ মাধুর্য্যপ্রবাহ কে সৃষ্টি করিল? যদি এ বিমল আনন্দ অবিচ্ছিন্নরূপে হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, যদি এ বিমল আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইলে মানব-

জীবনের সার্থকতা বটে, এ সার্থকতা লাভে অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ও প্রয়াসী। যদি ইহার নাম মুক্তি হয়, ইহাতে ত ভয়েব ছায়ামাত্র নাই, কেবল আনন্দ!

গৌরাঙ্গ বলেন,—"হরি বলো, এই বসেব অধিকাবী হও। রসেব উপবিভাগে ভাসিয়া তোমাব হৃদয় আনন্দে পবিপূর্ণ। এসো আমাব সহিত এ বসসাগরে ডুব দিবার চেষ্টা করো। একবার নিজ অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবো, দেখো—বিষদংষ্ট্র কামক্রোধাদি বিপুচয মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অবনতশিবে ম্রিয়মাণ, রসতরঙ্গে পাপপুণ্য দূবে নিক্ষিপ্ত হইযাছে। আমাব সহিত অনন্ত রসসাগবে ডুব দেবাব চেষ্টা করো।" দেখিতেছ না, স্বয়ং ঈশ্বর এই রসের প্রার্থী, যে রস স্বর্ণকান্তি কিশোরী বৃন্দাবনে উপভোগ কবিয়াছিলেন, সেই বসাস্বাদনলুব্ধ হইয়া স্বয়ং ঈশ্বব ধবণীতলে অবতীর্ণ হইয়া ধরায বিলুণ্ঠিত। বুঝিতে পারিতেছ না, নাই পাবো, অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছ, তোমার আব মৃত্যু নাই। বসাস্বাদনে তৃপ্তির সহিত আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অনন্তকালে এ বসেব অন্ত নাই, অনন্ত বস অনন্তকাল আস্বাদ কবো!

আহা তুমি কেন দীনভাবে দূবে দণ্ডায়মান? চণ্ডাল? তুমি মহাপাতকী? তাতে দোষ কি, এসো এ কিশোবীর রসাস্বাদনে তোমাব মানা নাই। আহা, তুমি ব্যভিচাবিণী, তাই কি তুমি কুণ্ঠিতা? এ বৈকুণ্ঠেব বসপানে কুণ্ঠিতা হইও না, রসমযী কিশোরী এ রসদাত্রী, তোমাব নিমিত্ত তিনি কাতরা, তোমায তিনি তাঁব সঙ্গিনী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তোমায় সঙ্গে না লইয়া তিনি গোলোকে যাইবেন না, অকুণ্ঠহৃদয়ে বৈকুণ্ঠের বস-সাগরে ঝম্প প্রদান করো! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌবাঙ্গদেব করতালি দিয়া নৃত্য কবিতে কবিতে উচ্চ হবিধ্বনি করিযা জীবকে ডাকিতেছেন, "এসো এসো, চিরানন্দ উপভোগ কবো। এ আনন্দ-রস আস্বাদনে কাহারও বাধা নাই। এক বাধা, সন্দেহ। যদি কোটী জন্ম মহাপাপ করিয়া থাকো, তথাপি তোমার শঙ্কা নাই; দেখিতেছ না, আমি তোমায় কোল দিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া বহিয়াছি। যদি কুটিল তর্কযুক্তি তোমায় আসিতে বাধা দেয়, তুমি বৃন্দাবন ভাবের আশ্রয় গ্রহণ কবো, সেই ভাবতরঙ্গে জটিল তর্কযুক্তি ভাসিয়া যাইবে।"

গৌরাঙ্গ পাপীতাপীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। নিত্যানন্দ সংসারী সাজিয়া সংসারীর সহিত মিশিয়া জীবের ভববন্ধন ছেদনার্থে জীবেব দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছেন। মোহান্তগণ জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া গ্রন্থ রচনা, গীত রচনা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত গৌরাঙ্গের সাঙ্গো-

পাঙ্গের অবতীর্ণ হইবার সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও প্রকৃত বৈষ্ণব জীবের দুঃখ মোচনার্থ দীনবেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন।

আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাহা জানি, তাহা যথাসাধ্য বর্ণনা করিলাম। গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের উচ্চ মাহাত্ম্য এই যে, জগতে এমন কেহই হীন নাই, যে হরিনামের অধিকারী নয়; এমন কেহ অবকাশশূন্য নয়, যে একবার হরি নাম করিতে না পারে; এমন কেহ সংসার-জালে জড়িত নয়, মধুর গৌরাঙ্গলীলা শ্রবণে যাহার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ না হয়; বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক, এমন কঠিন কঠোর হৃদয় কাহারও নয়, যে হৃদয় লীলারসামৃতে দ্রবীভূত হয় না। এবং একবার সেই কঠোর হৃদয় কোমল হইলে বিশ্বাস-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভক্তি-কমল প্রস্ফুটিত করে।

সামান্য জীবের ত এই অমরত্বলাভ হয়। এ ধর্ম্ম কি সমান্য জীবেরই জন্য? উচ্চহৃদয় উচ্চাশয় ব্যক্তিদিগের জন্য কি এ ধর্ম্ম নয়? হাঁ, তাঁহাদেরও জন্য গৌরাঙ্গের এই প্রেমধর্ম্ম, মানব হৃদয় যতদূর উচ্চ হইতে পারে ততদূর উচ্চ হইয়াও এ রসের কেবল বিন্দুমাত্র আস্বাদনে সক্ষম। যে রস আস্বাদনের পিপাসায় স্বয়ং ভগবান্ নবদেহধারী, যে ভাবে ভগবান ঘন ঘন ভাববিভোর, চৈতন্যশূন্য, আত্মহারা, তোমার হৃদয়ে কত স্থান, তুমি কত ভাবগ্রাহী যে, এ ভাবের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে তোমার তৃপ্তিসাধন হইবে না? তবে এ ভাব কি? কে বলিবে?

"না পিয়ে না বঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায়!"

যে বিন্দুমাত্র পান করিয়াছে সে আত্মহারা, তার দেহভাব নাই, জিহ্বা নাই, উচ্চারণ-শক্তি নাই, বাক্যহারা হইয়াছে,—কিরূপে বলিবে! সে রসে আপ্লুত, রসময় হইয়া গিয়াছে; তার ত আর নরত্ব নাই যে, নরকে সমাচার প্রদান করিবে! তবে চৈতন্যচরিতামৃতে পড়িয়াছি, তাই বলিতেছি, কিশোরীর আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধারূপে ভগবান্ লীলা করিয়াছেন। ইহার তত্ত্ব কি, তা ত জানি না।

ভাবুক ভাবে বিভোর হইয়া ভাবচক্ষে দেখুন—বৃন্দাবনের যশোদাদুলালের মৃত্তিকা ভক্ষণ, নবনী হরণ, মদনমুগ্ধকারী রাসলীলা—নবদ্বীপের শচীনন্দন লীলায় তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করুন। বেদান্ত যাঁর তৃপ্তিকর, গৌরাঙ্গ প্রকটিত "অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ" দার্শনিক যুক্তি দ্বারা আন্দোলন করিয়া আনন্দ উপভোগ করুন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি যাঁহার যে রসে তৃপ্তি, গৌরাঙ্গ লীলায় তাহার পরিপুষ্ট বিকাশ দেখুন। গৌরাঙ্গলীলার উপমাস্থল, গৌরাঙ্গলীলা। গৃহী সন্ন্যাসী, পাপী পুণ্যবান্, সকলের নিমিত্ত গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম, গৌরাঙ্গদেবের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা একটী স্থূলকায় পুস্তকেও হয় না। এ প্রবন্ধেও নিষ্প্রয়োজন। তবে সর্ব্ব প্রধান যে চারি সম্প্রদায় এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, যথা—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য, এই চারি সম্প্রদায়ই বিষ্ণুভক্ত, কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় বা ইহাদের শাখা প্রশাখা কোন সম্প্রদায়ই আচণ্ডালে আলিঙ্গনদানে প্রস্তুত নন। মায়াবাদ খণ্ডন, ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনা এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু কেবল গৌরভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই বলেন, এসো দীন হীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ, এসো এসো দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম দিবার জন্য ডাকিতেছেন। শুনিতেছ না, নিতাই মধুরস্বরে গাহিতেছেন,—

"ধর' নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়॥"

পতিত শোনো,—বৈষ্ণবেরা উচ্চনাদে বলিতেছেন,

"যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়,
তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে।"

তবে আর ভয় কি? ভবসাগর ত গোষ্পদ। বিশ্বাস করো, বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা নয়। বৈষ্ণব—বৈষ্ণব কি? বৈষ্ণব কি বর্ণনা করিতে হইলে যেমন রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, বৈষ্ণব কি, বর্ণনা করিতে হইলে আবার তাঁহার দেহ ধারণের প্রয়োজন। বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবই জানেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই, কালনার ভগবানদাস বাবাজী মদনমোহন দর্শনে আসিয়াছিলেন। একজন বেশ্যা তাঁহাকে প্রণাম করে, তাহাতে বাবাজী গদ্‌গদ্ ভাবে সেই বেশ্যাকে প্রণাম করিলেন। একব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজী, এ বেশ্যাকে প্রণাম করিলেন কেন?" বাবাজী উত্তর করিলেন, "এ রমণী পরম ভাগ্যবতী, আমি ত বৈষ্ণবের দাসানুদাসের যোগ্য নই, কিন্তু আমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছে। যে বৈষ্ণবকে প্রণাম করে, সে আমার প্রণম্য।" এ বৈষ্ণব-তত্ত্ব আমি কি বুঝিব!

শুনিয়াছি, কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হয়, কায়মনে আমি অক্ষম, তবে বাক্যে বলি—জয় বৈষ্ণবের জয়। জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব—গৌর-নিতাই কে—বলিয়া দেন। জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব দ্বারে দ্বারে বলেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলেন, "ভাই, হরি বল'!"

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস ।

হেরাক্লাইটাস্ (Heraclitus)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।]   [শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক, বি, এ ।

আইওনিয় দার্শনিকেরা (Ionic Philosophers) জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্ত্তন-পরম্পরার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। পরিবর্ত্তনের সত্যতা সম্বন্ধে যে কোনও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, এরূপ ক্ষীণ সন্দেহও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন ব্যাপারটী অতি জটিল বিষয় এবং এই জটিলতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে তাহার যথোচিত মীমাংসাও হইতে পারে না। কাজেই আমরা পূর্ব্বে যাহার আভাস মাত্র দিয়াছিলাম, এখন তাহা সবিস্তারে আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

পরিবর্ত্তন-ব্যাপার এরূপ সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ নিত্য ঘটনা যে, ইহার মধ্যে যে কোনওরূপ জটিলতা আছে, তাহার সুদূর আশঙ্কাও সহসা কাহারও মনে জাগাইয়া তোলা সহজ নহে। তাই যখন প্রশ্ন করা যায় যে, পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি কি, তখন সে প্রশ্নের সার্থকতা সহসা হৃদ্গত হয় না। আচ্ছা, পরিবর্ত্তন বলিতে কি বুঝায়? পরিবর্ত্তন কাহার? উত্তর এই যে, কোনও বস্তুর বা ব্যক্তিরই পরিবর্ত্তন হয় এবং পরিবর্ত্তনের অর্থ এই যে, ঐ বস্তু বা ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে। যদি কোনও কিছু তখন একরকম ছিল দেখিয়া থাকি এবং এখন আর এক প্রকার হইয়াছে বুঝিতে পারি,—তাহা হইলে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে জানিতে হইবে। যেমন চারা গাছ পরিণত বৃক্ষে, পূর্ণিমার চন্দ্র কলাক্ষয়-নিবন্ধন অষ্টমীর অর্দ্ধ চন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে পরিবর্ত্তন-ব্যাপারটীর তত্ত্ব আলোচনা করিলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বোধ হয় যে, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-পরম্পরাই যে পরিবর্ত্তন তাহা নহে, অপিচ যদি এক অখণ্ড বস্তু সেই বিভিন্ন অবস্থা-গুলিকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া তাহাদিগকে একত্ব দান করে, অথচ আপনি আপনার নিত্য সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহা হইলেই পরিবর্ত্তন-ব্যাপারের যথার্থ অর্থাবগতি হয়। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু যদি কালান্তরে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঠিক পরিবর্ত্তন বলা যায় না। কেন না, তখন বৃক্ষকে একরূপ দেখিয়াছি বলিয়া এবং এখন চন্দ্রকে বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণ

ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া, এই পৃথক্ বস্তু দুটির অবস্থার কালগত পার্থক্যকে পরিবর্ত্তন নাম দেওয়া যাইতে পারে না। তবে ইতিমধ্যে আমাব ভিতরে এই এক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, তখন বৃক্ষ আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল, এখন চন্দ্র আমার জ্ঞানগোচর হইতেছে, অর্থাৎ একই আমাতে দুই মুহূর্ত্তে দুই বিভিন্নপ্রকাব জ্ঞান বিবাজ করিবাছে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, পবিবর্ত্তনের মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্য এই দুটি বিরুদ্ধ ভাব এক যোগে কার্য্য করিতেছে। পবিবর্ত্তন-ব্যাপারটীব এমনি অপূর্ব্ব প্রকৃতি যে, ইহাতে একতা ও ভিন্নতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। আমবা পরিবর্ত্তন শব্দেব এরূপ ব্যাখ্যা করিলাম বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তন বলিলেই সকলেই সব সময়ে যে এত খানি বুঝে, তাহা নহে। কেবল মাত্র শব্দার্থেব প্রতি লক্ষ্য করিলে, পরিবর্ত্তন বলিতে কেবল বিভিন্ন অবস্থা ধাবণকেই বুঝায়। কিন্তু পরিবর্ত্তন শব্দটীর প্রতি লক্ষ্য না কবিয়া যদি উহাব আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচাব কবা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, নিত্যেব সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত হইলেই তবে সূক্ষ্ম দার্শনিক হিসাবে পবিবর্ত্তন-ব্যাপাবটী অর্থবান্ বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ পবিবর্ত্তন-ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন ও একতা ভাবে দেখিলে তাহা অর্থ-হীন বলিয়া মনে হইলেও যখন তাহাকে এক অপরিণামী পদার্থেব অবস্থান্তবপ্রাপ্তি এইরূপ ভাবে দেখা যায়, কেবল তখনই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

কিন্তু তাহা হইলে পবিবর্ত্তনেব ভাব কি স্ববিবোধিতাদোষদুষ্ট নহে? ইলিয়াটিকগণ (Eleactics) বলিলেন যে, নিত্য সত্তা এক অপবিবর্ত্তনীয় কাবণ, একত্ব ও বহুত্ব, ঐক্য ও পার্থক্য এক পদার্থে অবস্থান করিতে পাবে না। তাই তাঁহারা বলিলেন, পার্থক্য ও বহুত্ব মিথ্যা, সত্য কেবল এক। হেব্যা-ক্লাইটাস বলিলেন, ভেদ ও পার্থক্য, বহুত্ব ও নানাত্ব মিথ্যা নহে, উহাবাই বরঞ্চ সত্য; একত্ব, নিত্যত্বই মিথ্যা। 'পরিবর্ত্তন'ই জগতের সত্য ঘটনা। অপরিণামী, নিত্য সত্তা অস্তিত্বহীন। যদি কিছু নিত্য থাকে, তাহা 'পবিবর্ত্তন'। অবশ্য পরিবর্ত্তন বলিতে তিনি কেবল শব্দার্থেব প্রতিই লক্ষ্য বাখিতেন, পবিবর্ত্তন শব্দটী আবও কতখানি অর্থ জড়াইয়া আনে, তাহা তিনি পরিষ্কাব ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই তিনি পবিবর্ত্তন-ব্যাপারের মধ্যে মূলতঃ যে দুটি বিরোধী ভাব জড়িত, তাহার মধ্যে অন্যতব ঐক্য ও অভিন্নতা ভাবের অপলাপ করিয়া পবিবর্ত্তনের মধ্যে যে আপাত বিবোধ তাহা নিবৃত্ত কবেন। আমবাও হেব্যাক্লাইটাস দর্শন বা অন্যান্য দর্শন বুঝাইবার কালে 'পরিবর্ত্তনে'ব শব্দার্থের প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখিব।

জীবনী।

হেরাক্লাইটাসের আবির্ভাব কাল প্রায় ৫৩৬—৪৭০ খ্রীঃ পূঃ। ইনি এসিয়া মাইনরস্থ গ্রীক্ উপনিবেশে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীকৃগণের জীবনে রাষ্ট্রনীতি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই সময়ে এসিয়া মাইনরের গ্রীক্ নগরগুলির যেরূপ রাজনৈতিক অবস্থা, সেই অবস্থাচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে পড়িয়া তত্রত্য চিন্তাশীল লোক মাত্রেরই মনে পরিবর্ত্তনের ভাব অতিশয় দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইত। তখন প্রাচ্য পারসীক রাজের অতুল প্রতাপ, এরূপ প্রতাপশালী প্রতিবেশী রাজার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার জন্যই ত একে গ্রীকৃগণকে সদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত। তাহার পর আবার গ্রীক্দের নিজেদের মধ্যেও সদাসর্ব্বদা অন্তর্বিবাদের কালাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। হোমারের সময় যে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী ছিল, এ সময়ে তাহার পরিবর্ত্তে অভিজাতবর্গ-চালিত শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু অভিজাতবর্গে ও জনসাধারণে কোনও কালেই সদ্ভাব নাই, সেকালেও ছিল না। অতএব শাসন-কার্য্য সকল সময়ে ন্যায়ানুগত হইত না। ইহাতে সাধারণ প্রজার অসন্তোষের সৃষ্টি হইল এবং সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ প্রজাশক্তির সাহায্যে প্রথমে ক্ষমতার অধিকারী হইয়া, পরে অত্যাচারী হইয়া উঠিতে লাগিল। সাধারণ প্রজাপুঞ্জ যখন এক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে বিতাড়িত করিবার উদ্যোগ করিত, তখন তাহাদের শক্তি অবলম্বন করিয়া অপর এক অত্যাচারী নিজেকে পরিপুষ্ট করিয়া শেষে স্বয়ংই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিত। এরূপে চক্ষের সমক্ষে ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিলে চিন্তাশীল লোকের মনে সহজেই এই ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায় যে, জগতের কোন বিষয়েই স্থায়িত্ব নাই—এখানে কেবল পরিবর্ত্তন। হেরাক্লাইটাস্ আবার স্বয়ং এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি রাজনৈতিক জীবনের অস্থিরতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ছেলেখেলা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া নগর ছাড়িয়া বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং বনবাসীর ন্যায় সহজ-লভ্য অশন-ভূষণে আপনার অভাব মোচন করিয়া গভীর তত্ত্ব-চিন্তায় মনঃসংযোগ করিলেন। তাঁহার চিন্তার ফল তিনি এরূপ সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান যে, উত্তর কালে তাহা সক্রেটিসের (Socrates) নিকটও দুরধিগম্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহাকে Obscure Philosopher

বা "জটিল দার্শনিক" বলা হইত। জনসাধারণের প্রতি তাঁহার এক মর্ম্মান্তিক ঘৃণা ও বিরাগ ছিল। তাহাদের নিজেদের কিছু জ্ঞান বুদ্ধি নাই, ভাল মন্দ বিচারের শক্তি তাহাদের নাই, অথচ তাহারা পরবুদ্ধি-চালিত হইয়া হেরাক্লাই-টাসের বন্ধু হারমোডোরাসের (Hermodorous) ন্যায় বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোককে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করিল। এইরূপে নানা ঘটনায় সম্পদ্ বিপদের ক্ষণস্থায়িত্ব ও জনসাধারণের নির্বুদ্ধিতা এই দুই ভাব তাঁহার হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। এবং তাঁহার দর্শনে আমরা এই দুই ভাবেরই বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাধারণ লোকের প্রতি অবজ্ঞা-বশতই যেন তিনি সাধারণ-জ্ঞানের আপাত-বিরোধী মত সকল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ও সাধারণ-বুদ্ধির অগম্য ভাষা ও যুক্তির সাহায্যে ঐ সকল মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

দর্শন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক পদার্থই দুইভাবে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, অথবা প্রত্যেক পদার্থেই দুই বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। এই দোয়াতটী কালও যেমন ছিল, আজও মূলতঃ কতকটা সেই রকমই আছে এবং সেই জন্যই ইহাকে একই দোয়াত বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও হইয়া গিয়াছে, কারণ, কাল উহা নূতন ছিল, আজ পুরা-তন হইয়াছে, কাল ওখানে ছিল, আজ এখানে আছে ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া দোয়াতটী সর্ব্বাংশেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে এই দোয়াত ও কল্যকার দোয়াত যে একই, তাহা কিছুতেই আমাদের বোধগম্য হইত না। সর্ব্বাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলে আর এক দোষ হয় যে, তাহাতে পরিবর্ত্তন কথাটীরও কোন সার্থকতা থাকিত না—এ কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কল্যকার দোয়াত ও অদ্যকার দোয়াতের মধ্যে যদি কোনও ঐক্য না থাকিত, যদি কল্যকার দোয়াত সর্ব্বাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া অদ্যকার দোয়াতরূপে দেখা দিত, তাহা হইলে কল্যকার দোয়াত পরিবর্ত্তিত হইয়া অদ্যকার দোয়াত হই-য়াছে এরূপ না বুঝিয়া, ঐ দুই দিনের দোয়াত যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এইরূপই বুঝিতাম। সুতরাং দেখা গেল যে, প্রত্যেক পদার্থেই দুইটী অংশ আছে, একটী স্থির, অপরটী চঞ্চল, একটী নিত্য, অপরটী পরিবর্ত্তনশীল। এই দুইটী স্বভাবতঃ বিরোধী ভাব যে প্রকৃতিবশেই সকল পদার্থে বিদ্যমান, হেরাক্লাইটাস্ তাহা অত বুঝিয়া দেখেন নাই। তাই তিনি বলিলেন, স্থির, নিত্য বলিয়া কোন পদার্থই জগতে নাই, উহা

অলীক। পরিবর্ত্তনই নিত্য, সত্য ঘটনা। স্থির ও স্থিতি, কথার কথা মাত্র, চাঞ্চল্য ও গতিরই জগতে একাধিপত্য। গতির দ্রুততাই মূঢ়বুদ্ধিকে স্থিতির অনুকরণে মুগ্ধ করে। মূঢ়েরাই মনে করে যে, তাহারা একই নদীতে প্রত্যহ অবগাহন করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তে নদীতে স্রোতোবেগে নূতন জল বহিয়া আনিতেছে ও নূতন নদী সৃষ্টি করিতেছে। একই নদীতে দুইবার নামা অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীনকালে মানব-মন রূপকপ্রিয় ছিল, তাই হেরাক্লাইটাস্ এই পরিবর্ত্তনকে রূপক-ভাবে * অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করেন। কারণ, ভূত সকলের মধ্যে অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনের ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। অগ্নিশিখা যেমন আপনার মধ্যে অতিমাত্র চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল হইয়াও স্থিরতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে বিরাজ করে, এমন আর কিছু নহে। প্রকৃত গতির সহিত স্থিতির ভাণ অগ্নিশিখাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

এইরূপে তিনি পরিবর্ত্তনের সত্তা খুব দৃঢ়ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন—একই নদীতে দুইবার নামা অসম্ভব। তাঁহার মতাবলম্বী কোনও ব্যক্তি আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, গুরু অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিল যে, একই নদীতে একবারও নামা যায় না! আমরা জলে নামিব, এইরূপ মনস্থ করিতে না করিতে জল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্তে অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব হইতেছে এবং সৎ অসতে অন্তর্হিত হইতেছে। কাজেই অসৎ যখন সৎ সৃষ্টি করিতে এবং সৎ যখন অসৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তখন সদসতে কোনও প্রভেদ নাই। যদি সৎ ও অসৎ পরস্পর ভিন্ন হইত, তাহা হইলে এক হইতে অপরের উদ্ভব সম্ভব হইত না।

যাহা হউক, হেরাক্লাইটাস্-দর্শন হইতে নিত্য সত্তার একেবারে পরিহার আমরা ন্যায়বিরুদ্ধ ও স্ববিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করি। যদি কোনও পদার্থের বিষয়ে কিছু অভিমত প্রকাশ করিতে না করিতেই তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাক্ থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু হেরাক্লাইটাসের মত সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের সহিত

* অনেকের মতে উহা রূপক নহে। তাঁহারা বলেন, বাস্তবিকই হেরাক্লাইটাস্ অগ্নিকেই জগতের মূলতত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহারা তাঁহাকে আইওনীয় ভূতবাদীদের শ্রেণীভুক্ত করেন।

ইহার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও জগতে কিছুই স্থির নহে, সবই গতিশীল। পদার্থ মাত্রেই পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র এবং পরমাণুগণ আবার সর্ব্বদাই গতিশীল। তাহারা পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে গমন করে এবং নূতন পরমাণু সকল তাহাদের স্থান অধিকার করে। কতকগুলি কম্পনশীল পরমাণু প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব ভাবে সমষ্টিবদ্ধ হইয়া নব নব পদার্থ সৃজন করিতেছে। আবার জড় জগতে যেরূপ অস্থিরতা, অন্তর্জগতেও সেইরূপ চাঞ্চল্যই একাধিপত্য করিতেছে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে মানব-মনে শত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের দ্রুততা অনুসারে মানবমনের কর্ম্মশীলতার হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ হয়। মানব-মনে যদি একেবারেই কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটিত,—তাহা হইলে চৈতন্য বিলুপ্ত হইত। এই ভাবে বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, হেব্যাক্লাইটাস্-দর্শন যতই স্ববিরোধিতাপূর্ণ হউক, তদীয় দর্শনের দ্বারা আধুনিক চিন্তাবিকাশের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

হেব্যাক্লাইটাস্ বলেন যে, প্রত্যেক পদার্থই যে কেবল মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নহে, পরন্তু উহা আপনার বিরুদ্ধস্বভাব কোন বস্তুবিশেষে সর্ব্বদাই পরিণত হইতেছে। প্রত্যেক পদার্থই বিরোধ হইতে উৎপন্ন। বিরোধই জগদ্ব্যাপারের জনক ও নিয়ামক। প্রাণিজগৎ স্ত্রী ও পুরুষের বিরোধী শক্তির সংযোগে উৎপন্ন। কড়ি ও কোমল সুর মিশিয়া সঙ্গীতের মাধুর্য্য সৃষ্টি করে, রোগই নীরোগ অবস্থার সুখ স্বচ্ছন্দ সম্যক্‌রূপে অনুভব করায়, পাপের উপর জয়ী না হইলে পুণ্যার্জ্জন হয় না, বিপদ্ উপস্থিত না হইলে হৃদয়ে সাহস জাগে না ইত্যাদি। প্রত্যেক পদার্থই আপন হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন। একই সমুদ্র-বারি মৎস্যের পক্ষে স্বাদু ও হিতকর এবং মানবের নিকট বিস্বাদযুক্ত ও অহিতকর। দস্যুতে আমাদের দেহে অস্ত্রাঘাত করিলে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, কিন্তু চিকিৎসক অস্ত্রাঘাত করিলে পুরস্কৃতই হইয়া থাকে। সবই আপেক্ষিক, অমঙ্গল নাশ হইলে তাহাকে মঙ্গল বলে, মঙ্গল নষ্ট হইলে তাহাকে অমঙ্গল বলে। জগতে বিরোধের রাজত্ব; কিন্তু একটী ধনুকের দুই প্রান্তকে পরস্পর হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা যেরূপ বিপরীত দিকে নমিত হইয়া ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিরোধের আতিশয্যে এক অভিনব মিলন ও সামঞ্জস্য সংসাধিত হয়। যেমন সেই এক আদি সত্তা অগ্নি হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ যথাকালে উহা আবার সেই অগ্নিতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এইরূপে সৃষ্টি ও লয় চক্রবৎ পর্য্যায়ক্রমে অনাদি কাল ধরিয়া ঘটিয়া আসিতেছে। উহার বিরাম নাই।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যে কি ঐক্য ও সামঞ্জস্য আদৌ নাই? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনের ভাণ আমাদিগকে কি করিয়া প্রতারণা করে? যাহা আদৌ নাই, তাহার ভাণ অসম্ভব। হেব্যাক্লাইটাস্ যে নিত্য কোন ঐক্য একেবারে অস্বীকার করেন, তাহা নহে। এখানেও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত একযোগে স্বীকার করেন যে, জাগতিক পদার্থনিচয় যদিও পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তন-ব্যাপারটী নিয়মাধীন অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। জগতে আর যাহা কিছু সব অস্থির ও অনিত্য হইলেও, এই পরিবর্ত্তনের নিয়ম কিন্তু স্থির ও ধ্রুব। এই মত কত দূর সঙ্গত, সে আলোচনা হইতে আমরা আপাততঃ বিরত রহিলাম।

আর একটী কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া আমরা হেব্যাক্লাইটাস-দর্শন শেষ করিব। সত্য যদি এক, নিত্য ও সনাতন হয় ও ইন্দ্রিয়জজ্ঞান মাত্রেই যদি ভেদ, পার্থক্য, বিরোধ ও পরিবর্ত্তনের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সত্য বস্তুর জ্ঞান কোন দিনই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র প্রণালী, তাহা নহে। বোধশক্তির দ্বারাও আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, এবং সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই পরিবর্ত্তনময় সংসারে একমাত্র দৈব নিয়ম শৃঙ্খলই ধ্রুব ও শাশ্বত এবং তাহা বোধমাত্র গ্রাহ্য।

ক্রমশঃ।

ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ।

[ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘে বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল প্রবন্ধ বা প্রবন্ধাংশ পঠিত হয়, তন্মধ্যে ২০টী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইল। প্রত্যেক প্রবন্ধের মূল কথাগুলি যতদূর সম্ভব লেখকের ভাবানুযায়ী দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সঙ্ঘের কার্য্যবিবরণীতে বিস্তৃত ভাবে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও তন্মধ্যে প্রকাশিত হইবার কথা। কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম' প্রবন্ধটী অন্যত্র অবিকল উদ্ধৃত হইল।]

জুডাইস্ম্ বা য়াহুদী ধর্ম্ম।

(আইজ্যাক।)

সান্ত অনন্তকে সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারে না, সেই জন্যই আমাদের পরস্পর মতভেদ হয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব জ্ঞান না হইলে জগতে শান্তি নাই।

এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা আব্রাহাম বা মুশার নামানুসারে ইহার নামকরণ হয় নাই অথবা প্রথম যাহারা এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিত, তাঁহাদের নামানুসারে ইহা ইস্রায়েল বা হিব্রু ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয় নাই। গ্রীক ও রোমান লেখকগণ কর্ত্তৃক যখন ইহা জগতে পরিচিত হয়, তখন এতদ্ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেশে যে বাস করিত, তাহার নাম জুডিয়া থাকাতে এই ধর্ম্মের নাম জুডাইস্ম হয়।

এই ধর্ম্ম অলৌকিক ঘটনা বা রহস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনানুমোদিত। অপরে যাহাকে প্রাচীন বিধান (Old Testament) বলেন, কিন্তু য়াহুদীরা যাহাকে 'পবিত্র শাস্ত্র' বলেন, তাহাই ইহার মূল শাস্ত্র। ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভাষা হিব্রুতে লিখিত। উহা ব্যতীত তালমুদ, মিশ্‌না, গেমারা ও জোহারও ইহার আনুষঙ্গিক শাস্ত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

এক পূর্ণ চৈতন্যময় নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসই ইহার মূল তত্ত্ব, আর ইহার মতে য়াহুদীগণই ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত বিধানের রক্ষক। মানবাত্মা স্বাধীন। এই ধর্ম্ম—প্রেম, আনন্দ ও আশার ধর্ম্ম। প্রতিবাসীকে ও বিদেশীকে আত্মতুল্য ভালবাসা ইহার নীতি। অপরে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তোমার ক্ষতি বোধ হয়, তুমি অপরের প্রতি এমন ব্যবহার করিও না, আর অপরের যেরূপ ব্যবহারে তোমার কল্যাণ হয় বিবেচনা কর, অপরের প্রতি তুমিও তদ্রূপ আচরণ কর। ঈশ্বরের আদেশস্বরূপ সপ্তাহের মধ্যে একদিন বিশ্রামবার প্রতিপালন ও উহা ঈশ্বরোপাসনায় যাপন, পিতামাতাকে সম্মান, হত্যা ব্যভিচার চৌর্য্য ও লোভ পরিত্যাগ এবং মিথ্যাসাক্ষ্য না দেওয়া—ইহার পারিবারিক ও সামাজিক নীতি।

পরম পুরুষ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া উহার নিয়মন করিতেছেন, মানবাত্মা তাঁহার অংশ, সুতরাং ঐশ্বরিকভাবাপন্ন ও অমর। মানুষের কর্ত্তব্য—সৎকর্ম্ম ও জ্ঞানের অন্বেষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরীণ ঈশ্বরভাবকে প্রস্ফুটিত করা। সুতরাং এই ধর্ম্মের সর্ব্বদা চেষ্টা এই—এক পরম পিতার অধীনে জগতে সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃ-ভাব প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বর আব্রাহামকে বলিয়াছিলেন--পূর্ণ হও। প্রফেট জোনা জানিয়াছিলেন, যিনি ইস্রায়েলাইটদের ঈশ্বর, তিনিই জগতের অধীশ্বর। প্রফেট মালাকি বলিয়াছেন, "পরম পিতা কি আমাদের সকলের পিতা নহেন, এক ঈশ্বর কি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেন নাই?" সক্রেটীস যে বলিয়াছেন, আপনাকে জান, তাহা সলোমানের জ্ঞান অন্বেষণ কর, এই বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের ও অপর ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সহানুভূতি শিক্ষা দেয়। য়াহুদীধর্ম্ম—

পারসী, কংফুছ ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রাচীন কালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মের সমুদয় উৎকৃষ্ট অংশ ইহা হইতে গৃহীত। য়াহুদীরা সমগ্র জগতে ছড়াইয়া সমগ্র জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে অনেক রত্ন দিয়াছে। যে কোন গ্রন্থ মানুষকে উন্নত করে, তাহাই পবিত্র গ্রন্থ। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকলই পবিত্র। প্রফেট অর্থে যে সকল ব্যক্তি পবিত্রতাবলে খুব উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

মতে বিশ্বাস দ্বারা মুক্তি হয় না, সদ্ভাবে জীবন যাপনের দ্বারা মুক্তি হয়। প্রার্থনার উদ্দেশ্য—পূর্ণ ও পবিত্র হওয়া। ভগবানের রাজ্যে যাইবার বিভিন্ন পথ রহিয়াছে। একটী ধর্ম্ম সত্য, অপর গুলি মিথ্যা, তাহা নহে।

(কোহেন।)

অন্যান্য কথা বলিয়া ইনি ভগবানের দশ আজ্ঞার মধ্যে দ্বিতীয় আজ্ঞার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিলেন, ভগবানের আদেশ—এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, মিথ্যা ঈশ্বর উপাসনা ও পৌত্তলিকতা হইতে বিরত হইতে হইবে। বিশ্রামবার পালন সম্বন্ধীয় ভগবদাজ্ঞার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিলেন, শুধু বিশ্রামবার নয়, অন্যান্য পর্ব্ব যথা পাসোভার প্রভৃতিও প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যায্য সুদগ্রহণ য়াহুদী ধর্ম্ম নিষিদ্ধ। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত আশা এই—ভবিষ্যতে সকলেই এক সত্য ঈশ্বরের উপাসক হইবে। সৎকর্ম্মের শুভফল, অসৎকর্ম্মের অশুভফল। মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী কেহ নাই। য়াহুদী ধর্ম্মই কেবল শিক্ষা দেয়, যে মতাবলম্বী লোক হউক, ভাল লোক হইলে সে স্বর্গে স্থান পাইবে। মুশার ন্যায় শ্রেষ্ঠ প্রফেট হন নাই, হইবেনও না। শেষে ঈশ্বর একজন মেসায়া প্রেরণ করিবেন, তখন ইস্রায়েলাইটগণ আর বিভক্ত থাকিবে না, একত্রিত হইয়া শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিবে এবং জগতের সকল জাতি মিলিত হইয়া এক সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। শেষ বিচার-দিনে ভগবান্ মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর হইতে তুলিয়া সকলের বিচার করিয়া তাহাদের ফলাফল বিধান করিবেন।

(ডেভিড।)

ইস্রায়েলাইট শব্দের অর্থ—যিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, যিনি অনন্ত জীবন পাইয়াছেন। য়াহুদীগণ আত্মার দেহ ধারণের পূর্ব্বেও অস্তিত্ব ছিল, বিশ্বাস করেন। এই ধর্ম্ম পশুগণের উপরেও দয়াবান্ হইতে উপদেশ দেয়। মুক্তি অর্থে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া ও আধ্যাত্মিক-

ভাবসম্পন্ন হওয়া। য়াহুদীগণ সেই চরমদিনের আশায় রহিয়াছেন, যখন সকলেই ঐশ্বরিকজ্ঞানসম্পন্ন হইবে, যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া গিয়া শান্তি স্থাপিত হইবে, ব্যাঘ্র মেষ একত্রে ক্রীড়া করিবে।

জরতুষ্ট্র বা পারসী ধর্ম্ম।

(জোবানজী জামশেঠজী মোদী, কোলাবা।)

হিন্দু ও পারসীদের পূর্ব্বপুরুষ এক। আর্য্যগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদের এই দুই শাখা পরস্পর পৃথক্ হইয়া পৃথক্ দেশে বাস করিলেন। মূলধর্ম্মে যে একেশ্বরবাদ ও দ্বৈতবাদ ছিল, পারসিকগণই সেই ভাব রক্ষা করিয়াছেন। জরতুষ্ট্রের পূর্ব্বেও অনেক আচার্য্য হইয়াছিলেন, তবে তিনিই বিশেষভাবে বহুদেববাদ ও পৌত্তলিক উপাসনা হইতে ইঁহাদের ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। ইহার মতে ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাঁহার নাম অহুর, মজ্‌দ্, অথবা অহুর মজ্‌দ্। অহুর শব্দের অর্থে সমুদয় সত্তার প্রভু, মজ্‌দ্ অর্থে সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার অধীনে স্পেণ্টামৈন্যুষ ও অংগ্রমৈন্যুষ নামক দুই শক্তি যথাক্রমে সৎ ও অসতের নিয়মন করিতেছেন। যখন মানবে প্রথমোক্ত শক্তির প্রাবল্য হয়, তখন সে সৎ চিন্তা, সৎবাক্য ও সৎকার্য্যে রত হয়, ও দ্বিতীয়োক্ত শক্তির প্রাবল্যে তদ্বিপরীত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। মানুষের কর্ত্তব্য—শেষোক্ত ভাবসমূহ হইতে বিরত হইয়া প্রথমোক্ত সদ্ভাবসমূহের আশ্রয়। এই ধর্ম্মাবলম্বিগণ অগ্নিকে অহুর মজ্‌দের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচনা করেন, কারণ, ঈশ্বর স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ। নানাপ্রকার ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা শোধিত হইবার পর মন্দিরে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবও এইরূপ পুনঃপুনঃ শোধিত হইলে তবে ঈশ্বরোপাসনার যোগ্য হয়। এই অগ্নিকে ভগবানের স্মৃতি-উদ্দীপক চিহ্নরূপে ব্যবহার করাতে পারসিকগণ পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। ইঁহাদের অনন্যসাধারণ মৃতদেহ-সৎকার-প্রথার (ইঁহাদের মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হয় না, অথবা পুড়াইয়া ফেলা হয় না, উহাকে এমন এক স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে শকুনি প্রভৃতি উহা খাইয়া ফেলিতে পারে) উদ্দেশ্য এই—সমাধি দেওয়া হয় না, পাছে পৃথিবী কলুষিত হয়, অগ্নিদগ্ধ হয় না, কারণ, অগ্নিকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করা হইয়া থাকে। আরো সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং দেহ হইতে যে জীবাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্ এই ধারণা জাগ্রৎ রাখিবার জন্য এই প্রথা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার শাস্ত্র আবেস্তা কোন প্রকার উপবাস, বা কৃচ্ছ্রব্রত করিতে বা অবিবাহিত জীবনযাপনে উপদেশ দেয় না। উহা বলে, ঈশ্বর

যাহা সৃজন করিয়াছেন, মানবের সঙ্গতভাবে ভোগের জন্য—কেবল ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম (আদি সমাজ)।

(শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।)

বেদের ঋষিগণ প্রাকৃতিক নানা পদার্থ দর্শনে ভয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বায়ু বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিতেন। প্রথমে এই পূজা সরল ও অনাড়ম্বর ছিল, ক্রমে অনুষ্ঠানবহুল ও কৃত্রিম হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহারা বুঝিলেন, এই সকল দেবতা এক ও অনন্ত শক্তিরই বিকাশ। সুতরাং তাঁহারা উপনিষদের যুগে বহুদেবোপাসনা ও কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরের উপাসনায় রত হইলেন। কিন্তু তখন এই জ্ঞানলাভ করিবার অধিকারী খুব কম ছিল। সেইজন্য তাঁহারা এই সামঞ্জস্য করিলেন যে, অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরা জ্ঞানালোচনায় রত থাকিবেন, গৃহীরা যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনা করিবেন। এখন চারিদিকে জ্ঞানালোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ঐ প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্মকে আর সন্ন্যাসীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে উদ্যত। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, গৃহীর ধর্ম্ম। গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, পিতামাতার সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী-পুত্রকে পালন করিতে হইবে, স্বজন বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে, এই সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।'

খ্রীষ্টধর্ম্ম (প্রোটেষ্টাণ্ট)।

(এণ্ডার্স ন।)

খ্রীষ্টধর্ম্ম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ঈশ্বর-প্রকাশিত। ইহা সগুণ, পবিত্র, স্বপ্রকাশ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, মানবের উদ্ধারসাধনই ইহার সার কথা। মানুষ স্ব ইচ্ছায় পাপ করিয়া থাকে, উহা তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নহে অথবা তাহার অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে। মানবের পাপসত্ত্বেও সে ঈশ্বরতনয়। কিন্তু মানব নিজের ঐশ্বরিক ভাব উপলব্ধি করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টের ধর্ম্ম মানবকে তাহার ঐশ্বরিকভাবে পুনরায় আনিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের বিধান। খ্রীষ্ট মানবগণের পাপভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। মৃত্যু প্রশান্ত নিদ্রামাত্র এবং পুনরুত্থান শীঘ্রই হইবে—তখন লোকে ঈশ্বর ও তাঁহার অনন্ত মহিমা সাক্ষাৎ দর্শন করিবে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম তরবারি বা বলের দ্বারা অথবা রাজার সাহায্যে বিস্তৃত হয় নাই। উহা কোন দেশের রাজকীয় শাসনপ্রণালীব বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হয় নাই, আর স্পষ্ট নীতি-বিগর্হিত বা পৌত্তলিক না হইলে কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধেও দাঁড়ায় নাই। প্রলোভন দ্বারা উহা স্বমতাবলম্বী বিস্তাবেব চেষ্টা করে নাই। আর খৃষ্টধর্ম্মের ইহা খুব গৌরবের কথা যে, খৃষ্টীয় রাজ্যে যে কোন সংস্কার বা লোকহিতকব কার্য্যের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তাহা ইহার শিক্ষা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। ইহা দেশকালপাত্রভেদে, মানসিক উন্নতির তাবতম্যভেদে আপনাকে উদার ও বিভিন্নরূপ করিয়া লোকের উন্নতির গতি পবিচালিত করিয়াছে। আর সর্ব্বত্র সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা ঘোষণা কবিয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্ম—ধর্ম্মেব মূলতত্ত্বগুলির সমষ্টি ও চূড়ান্ত সীমা। খৃষ্টের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার ন্যায় বিনয়, ক্ষমা, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণবাশির বিকাশ আর কাহারও দেখিতে পাওযা যায না। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বমানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণের সহিত তাঁহাব অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়াছেন। বাস্তবিকই তাহার বাক্যাবলী ও কার্য্যাবলী দেখিয়া তাঁহাকে আর সাধারণ প্রফেট বা ঈশ্বরভাবাবিষ্ট মানব বলা চলে না—সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে হয।

যীশুব ঈশ্বর সম্বন্ধীয ধারণা য়াহুদীদেরই মত—কেবল তিনি 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব' এই নূতন ভাবটী উহাতে যোগ দিলেন। ঈশ্বব সকলেব পিতা, সকলেই তাঁহার সন্তান; সুতরাং উভয়ে অনেক বিষয়ে স্বাভাবিক সাদৃশ্য থাকিলেও যে পিতাব সহিত কিছু পরিমাণে ঐক্যলাভ কবিতে পারিয়াছে, সেই যথার্থ তাঁহাব পুত্র নামেব যোগ্য।

যীশু নিজে মানবদেহে ঈশ্ববরূপে অবতীর্ণ হইয়া, জগতেব জন্য নিজের প্রাণ দিয়া এবং পুনরুত্থান করিয়া মানবগণকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই—মানব এই দান গ্রহণ করিবে কি না? অতএব খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মোট কথাটা এই—যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম।

(ফ্রান্সিস।)

অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, কেবল বিশ্বাসেই মুক্তি হয়, রোমান ক্যাথলিক-গণ বলেন, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান ও পাপস্বীকার মুক্তির জন্য প্রয়োজন। সেণ্ট জেম্স

বলিয়াছেন, যদিও অনেককেই কৃত্রিম অনুষ্ঠান পরায়ণ দেখা যায়, কিন্তু আপেল বৃক্ষ হইলেই যেমন তাহাতে আঁপেল ফল হইবেই, তদ্রূপ অনুষ্ঠান, বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ। পাপ স্বীকার সম্বন্ধে অপর খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় সকল বলেন যে, মানুষের নিকট পাপ স্বীকার ভগবানের চক্ষে ঘৃণিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্যাথলিকগণ মানুষের নিকট পাপ স্বীকার করেন না। পাপ স্বীকারের প্রথমেই এই বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, "আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সমক্ষে, চিরকুমারী ভগবতী মেরির সমক্ষে, শ্রেষ্ঠ দেবদূত ভগবান্ মাইকেলের সমক্ষে, ভগবান্ বাপ্তাইজক জনের সমক্ষে, প্রেরিত মহাত্মা পিটর ও পলের সমক্ষে এবং সকল সাধুগণের সমক্ষে স্বীকার করিতেছি—আমি কায়মনোবাক্যে ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছি—আমারই দোষে, আমারই দোষে, আমারই ঘোরতর দোষে।" ভগবান্ যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার মনোনীত প্রেরিতগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যে পাপ ক্ষমা করিবে, তাহার ক্ষমা হইবে, তোমরা যাহা রাখিয়া দিবে, তাহা থাকিবে।' এ কথায় কি তিনি এই 'পাপস্বীকার' প্রথারই ইঙ্গিত করেন নাই ?

খ্রীষ্টধর্ম্ম—পেণ্টকাষ্টাল লিগ।

(চিস্‌হল্‌ম্।)

আমরা বাইবেল গ্রন্থ অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি। ভগবান্ একে তিন, তিনে এক—জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও পবিত্রাত্মা ঈশ্বর। আমরা ঈশ্বরের শত্রু সয়তান নামক পুরুষে বিশ্বাস করি, তাহার কার্য্য—মানুষের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি ও তাহার দেহে রোগ উৎপাদন ও পরিশেষে আধ্যাত্মিক বিনাশ সাধন। প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত মানবের মিল ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য অবধান না করিয়া সয়তানের কথা শুনিয়া পাপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়াতে তিনি তাহাকে নিজ সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করিলেন, কারণ, পাপের প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণা। তথাপি তাঁহার মানবের প্রতি এমন ভালবাসা যে, জনকেশ্বর তাহার উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রক্তপাত বিনা মানবের পাপ ধৌত হইবে না, সেই জন্য ভগবান্ পশুবলিদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু উহাও পর্য্যাপ্ত না হওয়াতে তনয়েশ্বর স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক মানবশরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া সমগ্র মানবের প্রতিনিধি হইয়া আপনাকে ক্রুশে বলি দিলেন ও পরে পুনরায় স্বর্গারোহণ করিলেন। এইরূপে তনয়েশ্বর জনকেশ্বরের উদ্ভাবিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিলেন। এখন যাহারা যীশুর এই মানবোদ্ধার-কার্য্যে বিশ্বাসী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্রাত্মা ঈশ্বর সর্ব্বদা নিযুক্ত

রহিয়াছেন। যখন মানব যীশুর এই মানবোদ্ধার-কার্য্যে বিশ্বাসী হইবে, তখনই তাহার ভিতর পবিত্রাত্মার আবির্ভাব হইবে ও তাহার নব জীবন লাভ হইবে। ক্রমে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করিলে মানব একেবারে মুক্ত হইবে। এই অবস্থা আদি মানবের পতনের পূর্ব্বাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। তখন মানুষ খ্রীষ্টের অঙ্গীভূত হওয়াতে তাহা হইতে স্বভাবতঃ সৎকার্য্য সকল হইতে থাকে। যীশুখ্রীষ্ট—কেবল স্বয়ং ক্রুশে দেহত্যাগ করেন নাই, সকল মানবের সহিত তাঁহার একত্ব থাকাতে তাহাদের সহিত দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত পুনরুত্থানও করিয়াছেন। পবিত্রাত্মার শক্তিতে যে ইহা বিশ্বাস করে ও বুঝিতে পারে, সেই তাঁহার সহিত একত্বের ভাগী হয়। এইরূপ অবস্থায় মানবের পক্ষে পাপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন সে দেখিতে পায়, তাহার দ্বারা পাপকার্য্য সম্ভব নয় বটে, কিন্তু 'মূল পাপ'—পাপেচ্ছা, পাপপ্রবৃত্তি রূপে তাহার ভিতরে তখনও রহিয়াছে। কিন্তু যীশু নিজ রক্তপাতে আমাদের এ মূল পাপও মোচন করিয়াছেন, এই দৃঢ়-বিশ্বাস-বলে আমরা স্বর্গগত, ভাগবতীতনুপ্রাপ্ত, এখনও সর্ব্বদা পবিত্রাত্মা প্রেরণে জীবের কল্যাণে নিযুক্ত যীশুর অঙ্গীভূত হইয়া যাইব। তখনই হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিস্বরূপ ঈশ্বর দর্শন হইবে। আমরাও তাঁহার যন্ত্র স্বরূপ হইয়া নিজ জীবন দ্বারা অপরের নিকট তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে থাকিব। পরে তিনি দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পারিষদবর্গ সহিত সহস্র বর্ষ ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে রাজত্ব করিবেন। তখন সয়তান কারারুদ্ধ থাকিবে। পরে শেষ বিচার-দিনে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসিগণকে অনন্ত যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিবেন ও তাঁহার অঙ্গগণকে অনন্ত শান্তি প্রদান করিবেন।

ইস্‌লাম।

(আবুল ফজ্‌ল।)

ইস্‌লাম শব্দটী আরবী শালামা শব্দ হইতে আসিয়াছে—উহার অর্থ শান্ত হওয়া, বিশ্রাম লাভ, সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য সাধন, সম্পূর্ণ শান্তিলাভ, নিজ শক্তিবলে সম্ভাবলাভের চেষ্টা। ইহা কোন নূতন ধর্ম্ম নহে, প্রাচীন সমুদয় ধর্ম্মকে তাহাদের প্রাচীন পবিত্রতর আকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা। উহা আব্রাহাম, মুশা, ঈশা প্রভৃতি সমুদয় প্রফেটকেই স্বীকার করে, ঈশ্বরের একত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে, দয়া, পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেয় এবং ব্যভিচার, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত হত্যা প্রভৃতি নিষেধ করে। ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী

শা ওয়ালি উল্লা, আবদুল আজিজ ও অন্যান্য প্রাচীন আচার্য্যগণ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেবকেও ঈশ্বর-প্রেরিত প্রফেট বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মৌলানা হাসান নিজামিও আজ কাল এই ভাবের উপর খুব জোর দিতেছেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরধর্ম্মবিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহার মতে ভগবান ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী নাই। উহা সকল মানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দেয়। সৎকার্য্যই বিশ্বাসের প্রকৃত পরিচয়। উহা মানবাত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। উহার মতে স্ত্রীলোককে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিবাহ শুধু লৌকিক চুক্তি মাত্র নহে, পরন্তু ঈশ্বরীয় বিধান। ইসলাম স্ত্রীস্বাধীনতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে। বহুবিবাহ, উপপত্নী রক্ষা প্রথা, পতি বা পত্নী ত্যাগ প্রথা, ও অবরোধ প্রথা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। উহা দাস-ব্যবসায়েরও বিরোধী। ইস্‌লাম যুদ্ধের উপদেশ দেয় বটে, কিন্তু ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অপর সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা ইস্‌লামের উপদেশ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরবিরোধী হইয়া এতদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণকে উৎপীড়ন করে, তাহাদেরই সহিত যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অপর ব্যক্তিকে জোর করিয়া নিজ ধর্ম্মাবলম্বী করিতে ইস্‌লাম উপদেশ দেয় না। শেষে বক্তব্য, মহম্মদ যে সকল বিধান দিয়াছেন, তাহা সেই সময়ের জন্য। সুতরাং উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি কেবল সাময়িক ও কোন্‌গুলি সনাতন, তাহা বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

(খোদাবক্স।)

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরবে পৌত্তলিক উপাসনা প্রচলিত ছিল। পরে য়াহুদী ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে হানিফ উপাধিধারী কতকগুলি ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়, তাঁহাদিগকে মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে। ইস্‌লামধর্ম্ম—য়াহুদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম হইতে, এমন কি, আরব জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম হইতেও গৃহীত হইয়াছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের এই কয়েকটী মূল উপদেশ। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস—তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন ঈশ্বর বা দেবতায় বিশ্বাস নিষেধ। মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত প্রফেট। দিনের মধ্যে পাঁচবার ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। জাকাত অর্থাৎ দরিদ্রগণের জন্য ট্যাক্সস্বরূপ কিছু কিছু দিতে হইবে। রমজানের সময় একমাস দিনে উপবাস করিতে হইবে এবং জীবনে অন্ততঃ একবারও মক্কায় যাইতে হইবে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের ইহাই এক মহা গৌরব যে, এই ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই তাহার জাতি বা পদ-গৌরবের দরুণ আর ছোট বড় ভেদ নাই—সকলেই সমান। ইস্‌লাম ধর্ম্মের

শিক্ষা আধুনিক সভ্যতার বিরোধী নহে, উহা সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির পোষকতা করে এবং বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া আপনাকে লইতে পারে। আজকাল আর সেই মহম্মদের প্রচারিত উদারভাব নাই। এখন গোঁড়ামী তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে মহম্মদ ও তাঁহার শিক্ষার উপর ভক্তি না হইয়া যাইতে পারে না।

ইস্‌লাম (আমেদিয়া সম্প্রদায়)।

(মহম্মদ আলি, পঞ্জাব।)

এই নূতন ইস্‌লাম সম্প্রদায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা গুলাম আমেদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মতে ভগবান্ সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির মধ্যেই তাঁহার প্রফেট প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশা, মুসা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই ভগবানের প্রফেট আর ইনি স্বয়ং আপনাকে শেষ প্রফেট বলিয়া দাবী করেন। হিন্দুগণ যে অবতারের আশা করেন, খ্রীষ্টিয়ানগণ যে যীশুর পুনরাবির্ভাবের আশা পোষণ করেন, মুসলমানগণ যে প্রফেটের পুনরাবির্ভাবের আশা রাখেন, তাহা ইঁহাতেই পূর্ণ হইয়াছে। আমেদ শব্দের অর্থ শান্তি। ইঁহাদের মূলমন্ত্র—সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে বিরোধ দূর হইয়া শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরাণই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন এবং মুসলমানগণের নানাবিধ বিশ্বাস ও কিম্বদন্তীর বিরুদ্ধে ইঁহারা কোরাণের প্রামাণ্য উপস্থাপিত করেন। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার উপাসনা, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্বপ্রকার অসদ্ভাব ও অসৎকার্য্য বর্জ্জন—ইঁহাদের প্রধান শিক্ষা। ইঁহাদের মতে যীশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিহত হন নাই। তিনি পলাইয়া আসিয়া কাশ্মীরে বাস করেন ও তথায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা নানাবিধ প্রমাণ উপস্থাপিত করেন।

দেবধর্ম্ম।

(গুরুমুখ সিং বি,এ, সেক্রেটারি, দেবসমাজ।)

অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মের মধ্যে কিছু কিছু সত্য থাকিলেও সে সমুদয়ই মানবের কল্পনাপ্রসূত, দেবধর্ম্ম বা সৎধর্ম্মই একমাত্র বিজ্ঞানমূলক ধর্ম্ম। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব দেবগুরু ভগবান্ শ্রীসত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। অন্যান্য ধর্ম্ম বা মতের ন্যায় ইহ বা পরকালে সুখলাভ বা মুক্তি ইহার লক্ষ্য নহে, ইহার

লক্ষ্য—আত্মার অস্তিত্বলোপ নিবারণ। জড় ও শক্তি নিত্য, ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। সকল মানবেরেই মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকিবে, তাহা নহে। যাঁহারা চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যভাবে সদ্ভাবে উচ্চ জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন, অপরের আত্মা ক্রমশঃ নীচ গতি লাভ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া নিজের শরীর মনকে এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির সহ-বাসই উন্নতির মুখ্য উপায়। দেবগুরুই একমাত্র এইরূপ উন্নত পুরুষ। এই সম্প্রদায়ে প্রথম প্রবেশার্থিদিগকে কতকগুলি নীতি পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়। চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ গ্রহণ, তামাক প্রভৃতি কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবা, ব্যভিচার বা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত হিংসা ত্যাগ করিতে হয়। ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ ব্রত লইতে হয়। সমুদয় জগতের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ সাধনা করিবার জন্য এক এক করিয়া ষোলটী যজ্ঞ সাধন করিতে হয়; যথা—পিতা-পুত্র-যজ্ঞ, স্বামি-ভৃত্য-যজ্ঞ প্রভৃতি। উচ্চ জীবন লাভ করিবার জন্য সকল অসদ্বিষয়ের প্রতি তীব্র ঘৃণারূপ বিরাগ শক্তি, এবং সকল সৎবিষয়ে প্রবল অনুরাগরূপ অনুরাগ শক্তির সাধনা করিতে হয়। দেবধর্ম্মের মতানুযায়ী উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, পাঠাদির দ্বারা উচ্চ জীবন লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত জাতকর্ম্ম, বিবাহাদি সংস্কারের কুসংস্কার বর্জ্জিত অনুষ্ঠান পদ্ধতিও আছে। এই দেবধর্ম্ম ও উহার আচার্য্যের পবিত্র স্পর্শে আসিয়া অনেক অসাধু ব্যক্তি সাধু ও অনেক অসাধু পরিবার আদর্শ পরিবার হইয়াছে। ইহা সমাজ সংস্কারের অতিশয় পক্ষপাতী, এবং বাল্য বিবাহ নিবারণ, অবরোধ প্রথার সঙ্কোচ, বিধবা বিবাহে উৎসাহ দান প্রভৃতি বিষয়ে খুব উদ্যোগী। স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই শিক্ষা বিধানের জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হয় এবং তদুদ্দেশ্যেই বালিকা বিদ্যালয় এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অনুভবাদ্বৈত বেদান্ত।

(জি, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, মান্দ্রাজ।)

অনুভবাদ্বৈত বেদান্ত মতের প্রচারকর্ত্তা ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত অপ্যয়াচার্য্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির টিনেভেলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণের ১৫ দিন পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার রচিত প্রায় ১৫০ খানি অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে। ইনি সন্ন্যাস হইতে গৃহস্থাশ্রমের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। বেদান্তের দক্ষিণামূর্ত্তি বৃত্তি নামক প্রাচীন বৃত্তির

উপর ইহা স্থাপিত। ঐ গ্রন্থের নাম তত্ত্বরসায়ন। এতদ্ব্যতীত রামগীতা, অধিকরণ কঞ্চুক ও অনুভূতি মীমাংসাও ইহার প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইঁহাদের মতে ১০৮ খানি উপনিষদের প্রামাণ্যই তুল্য, উহাদের মধ্যে ছোট বড় নাই। সকল দর্শন, সকল বাদই (যথা—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এবং আরম্ভ, পরিণাম ও মায়াবাদ) সত্য। উহারা সাধনার বিভিন্ন অবস্থামাত্র। শঙ্করমতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দুই ভাব স্বীকার করেন, ইঁহারা এই নির্গুণকে আবার নির্গুণ ও নির্গুণাতীত এই দুইভাগে বিভাগ করেন। সচ্চিদানন্দই নির্গুণ ব্রহ্ম—যাহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা উপলব্ধি হয়। যাহা বিশুদ্ধ মনেরও অগোচর, যাহাকে নেতি নেতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে ইঁহারা নির্গুণাতীত বলেন। ইঁহারা আপনাদিগকে সাংখ্যযোগী বলেন। সাংখ্য অর্থে ইঁহারা জ্ঞান ও যোগ অর্থে কর্ম্মকে লক্ষ্য করেন। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান সমুদয় মিলিত হইলেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানানুভূতি হয়। সাংখ্যশাস্ত্র ২৪ তত্ত্ব স্বীকার করেন, যোগ শাস্ত্র তদতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করেন। ইঁহারা তাহার উপর আরও দুই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহারা অদ্বৈতবাদীদিগকে কেবল সাংখ্য ও যোগীদিগকে কেবল যোগী বলেন। অনুভবাদ্বৈত বেদান্ত মতে দ্বৈতবাদিগণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বরূপ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ উচ্চ বিদ্যালয় এবং অদ্বৈতবাদ কলেজ স্বরূপ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না পড়িয়া একেবারে কলেজে প্রবেশ করা যায় না। মোট কথা ইঁহারা সমুদয় বাদকেই সত্য বলিয়া উহাদের সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসী।

অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়, হিন্দুধর্ম্ম কিন্তু তাঁহার মাতৃত্ব ও নারীর ভগিনীত্ব শিক্ষা দেয়। সকল মানবের মধ্যেই পরমাত্মার অংশস্বরূপ প্রত্যগাত্মা রহিয়াছেন, তাহাকেই যীশু ঈশ্বরতনয় বলিয়াছেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ নিশ্চিত তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একমাত্র তাঁহাকেই ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই খ্রীষ্টত্ব লাভ করিবে।

জৈনধর্ম্ম (শ্বেতাম্বর)।

(মুন্নি মহারাজ, বেনারস।)

জীবের প্রকৃত স্বভাব সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা উহার স্বরূপ আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যখন এই কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তখন আত্মা পরমাত্মার উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তে যাইয়া স্বসংবেদ্য সুখের অনুভব করেন। এই লোকান্ত

বা অলোক-প্রদেশে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। কর্ম্ম এবং সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই। যদি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হন, তবে তাঁহাতে রাগদ্বেষ থাকিবে, ঈশ্বরে কিন্তু রাগদ্বেষ সম্ভব নয়; আর এরূপ রাগদ্বেষযুক্ত ঈশ্বরের ধ্যানে মুক্তিও হইতে পারে না। এই জন্য উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী নামক কালচক্রে আবির্ভূত তীর্থঙ্কর নামক মহাপুরুষগণই ঈশ্বর; এবং তাঁহাদের ধ্যান ও মূর্ত্তিপূজা বিহিত ও মুক্তির সহায়ক। ধর্ম্ম দুই প্রকার—সাধুধর্ম্ম ও গৃহস্থধর্ম্ম। সাধুধর্ম্ম যথা—ক্ষান্তি, মার্দ্দব, আর্জ্জব, মুক্তি (লোভাভাব), তপ (ইচ্ছারোধ), সংযম (ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ), সত্য, শৌচ, অকিঞ্চন (সকল বিষয়ের পরিত্যাগ) ও ব্রহ্মচর্য্য। এই সাধুধর্ম্ম পালনের জন্য অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ পঞ্চ মহাব্রত বা মূলগুণ আশ্রয় করিতে হয়। ঐ মূলগুণ উত্তমরূপে সিদ্ধির জন্য আবার ঈর্য্যাসমিতি (সম্মুখে সাড়ে তিন দেখিয়া চলা), ভাষাসমিতি (বিবেচনা পূর্ব্বক বাক্য উচ্চারণ, যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয়), এষণাসমিতি (বিয়াল্লিশ প্রকাব দোষরহিত আহার), আদাননিক্ষেপসমিতি (সংযমধর্ম্ম-পালনোপযোগী দ্রব্য সমুদায় দেখিয়া ও মার্জ্জন করিয়া গ্রহণ ও স্থাপন) ও পারিষ্ঠাপনিকাসমিতি (জীবহিংসা না হয়, এমন স্থলে শৌচ-কার্য্য করা)—এই পাঁচটী সমিতি অর্থাৎ সম্যক্ চেষ্টা এবং মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কায়গুপ্তি (শরীরবাক্যমনের রক্ষা অর্থাৎ অশুভ হইতে নিবৃত্তি)—এই তিনটী গুপ্তির আচরণ করিতে হয়। গৃহস্থের ধর্ম্ম দ্বাদশ-প্রকার। তন্মধ্যে পাঁচটী অনু-ব্রত ও উহাদের সহায়ক তিন গুণব্রত ও চারি শিক্ষাব্রত। ১। প্রাণাতিপাত-বিরমণব্রত। (স্থূলভাবে জীবহিংসা হইতে বিরতি)। ২। মৃষাবাদবিরমণব্রত। ৩। অদত্তাদানবিরমণব্রত। ৪। মৈথুনবিরমণব্রত। ৫। পরিগ্রহবিরমণব্রত। এই গুলি আর কিছুই নহে, সাধুর অনুষ্ঠেয় অহিংসাদি পঞ্চব্রতেরই আংশিক অনুষ্ঠান, যথা, গৃহস্থগণ চতুর্থ ব্রতাচরণকালে কেবল স্বদারে রত থাকিবেন। গুণব্রত ৩টী এই :—১। দিগ্‌ব্রত (আপন স্বার্থের জন্য দশদিকের মধ্যে কতদুর যাইব, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া উহার উল্লঙ্ঘন না করা)। ২। ভোগোপভোগনিয়ম (আহার-বস্ত্রাদির নিয়ম। ৩। অনর্থদণ্ডনিষেধ (বৃথাকার্য্য পরিত্যাগ)। চারিটী শিক্ষা-ব্রত এই :—১। সামায়িক (রাগদ্বেষরহিত সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া ৪৮ মিনিট পর্য্যন্ত একান্তে বসিয়া আত্মচিন্তা)। ২। দেশাবকাশিক (পূর্ব্বোক্ত দেশসম্বন্ধে নিয়ম আরো সংক্ষেপ করা) ৩। পৌষধ (একদিন বা অহোরাত্র সাধুর ন্যায় বৃত্তিধারণ)। ৪। অতিথি সংবিভাগ (মুনিগণকে পূর্ব্বে না দিয়া ভোজন না করা)। যাহাদের সাধন মোক্ষোপযোগী সাধন হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন, তাহারা

দেবগতি প্রাপ্ত হয়। অপরে কর্ম্মের তারতম্যে মনুষ্য বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত অথবা নরকগত হয়। চব্বিশ তীর্থঙ্করের নাম এই :—১। শ্রীঋষভদেব ২। অজিতনাথ ৩। সংভবনাথ ৪। অভিনন্দন স্বামী ৫। সুমতিনাথ ৬। পদ্মপ্রভ ৭। সুপার্শ্বনাথ ৮। চন্দ্রপ্রভ ৯। সুবিধিনাথ ১০। শীতলনাথ ১১। শ্রেয়াংসনাথ ১২। বাসুপূজ্য স্বামী ১৩। বিমলনাথ ১৪। অনন্তনাথ ১৫। ধর্ম্মনাথ ১৬। শান্তিনাথ ১৭। কুন্থুনাথ ১৮। অরনাথ ১৯। মল্লিনাথ ২০। মুনিসুব্রত স্বামী ২১। নমিনাথ ২২। নেমিনাথ ২৩। পার্শ্বনাথ ২৪। মহাবীর স্বামী। ইঁহারা বলেন,—জৈনধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও, তামলী, কমঠ, পুরণ প্রভৃতি তাপসগণ তপস্যাপ্রভাবে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু জৈননামমাত্রধারী হইয়া তপস্যা না করিলে সিদ্ধি হয় না। অহিংসাই এই ধর্ম্মের মূল বটে, এই ধর্ম্ম অনাদি অনন্ত; কিন্তু ইঁহারা বলেন, জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজা ভরত ১০০০ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন,কিন্তু তিনি এই জন্মেই সিদ্ধ হন। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ২২০০ বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দিগম্বরদিগের সহিত শ্বেতাম্বরদিগের প্রধান প্রধান বিষয়ে ঐক্য আছে, কেবল ক্রিয়াকর্ম্মের কতকগুলি পার্থক্য আছে। শ্বেতাম্বরীরা তীর্থঙ্করদিগকে বস্ত্রধারী বলেন, দিগম্বরেরা তাঁহাদিগকে বস্ত্ররহিতরূপে বর্ণনা করেন।

শৈব অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

(নলস্বামী পিলে, রাজমহেন্দ্রী।)

শৈবধর্ম্ম (শাক্ত, গাণপত্য ও সুব্রহ্মণ্য [কার্ত্তিক] উপাসক উহার অন্তর্ভূত) অধিকাংশ হিন্দুর ধর্ম্ম এবং উহা বেদ ও আগমের (তন্ত্র) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মতে শিবই বেদ ও আগমের প্রণেতা। ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, কেন উপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, সর্ব্বত্রই শিব বা রুদ্র ব্রহ্ম বা এক ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ইহার একখানি প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং ইহাতে যে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য বা যোগ বা সাধারণতঃ যাহাকে দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদ বলে, তাহা নহে। শ্রীনীলকণ্ঠাচার্য্য যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য ও প্রামাণ্য। বর্ত্তমান শৈবধর্ম্মের দর্শন ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যে ২৮ খানি তন্ত্র দ্বারা পরিচালিত; এবং তিরু মুলার, মিকান্দান, অরুণ নান্দি শিবাচার্য্য, মারাই জ্ঞান শাম্বান্ধার ও উমাপতি শিবাচার্য্য এই সকল

তামিলাচার্য্য প্রচারিত। ইহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রাচীন বৈদিক প্রথানুযায়ী। শিবলিঙ্গোপাসনা অথর্ব্ববেদসংহিতার যূপস্তম্ভোপাসনা হইতে গৃহীত। অন্যান্য প্রকার মূর্ত্তি উপাসনার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কম আপত্তিজনক। ইহার কোনরূপ কুৎসিত অর্থ নাই। শিব—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি নহে, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। তিনি নিগুর্ণ, তাঁহার কোন অবতার নাই; তবে তিনি ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া গুরুরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রেমস্বরূপ ও সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ—জগদতীত অথচ জগন্ময়। তাঁহার শক্তিই জগন্মাতা। উহা মায়া হইতে শ্রেষ্ঠ। মায়াও তাঁহার শক্তি, তবে উহা হইতে নিকৃষ্ট এবং উহাই অন্যান্য শাস্ত্রে প্রকৃতি, প্রধান প্রভৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট, উহা ৩৬ তত্ত্বময়। উহা আবার অবিদ্যা হইতে পৃথক্, অবিদ্যা বা অজ্ঞান এতৎশাস্ত্রে 'আণব মল' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যখন জীব এই 'আণব মল' দ্বারা আবৃত থাকে, তখন তাহাতে ক্রিয়া, ইচ্ছা ও চৈতন্য থাকে না, তাহাই উহার রাত্রিস্বরূপ, কেবলাবস্থা। যখন ঈশ্বর প্রেমবশে তাহাকে সংসারে প্রেরণ করিয়া ভোগের দ্বারা তাহার ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎ করিবার জন্য মায়া হইতে দেহ ও জগৎ সৃষ্ট করিয়া প্রদান করেন, তাহাই তাহার সকল অবস্থা। কিন্তু যখন জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া সমুদয় অন্ধকার দূর হয়, যখন তাহার চৈতন্য বিধানের জন্য মায়ারূপ উজ্জ্বল দীপেরও আর প্রয়োজন থাকে না, যখন সেই পরমজ্যোতিতে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার সমুদয় চলিয়া যায়, তখন তাহার শুদ্ধ বা নির্ব্বাণ অবস্থা। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও, সোঽহং ও শিবোঽহম্ ভাবনা দ্বারা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইবার যোগ্য। জীব যেন দর্পণ-স্বরূপ—যখন জড় উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন উহা সম্পূর্ণরূপে জড়ের সহিত একীভূত হয়, যখন আবার উহা ব্রহ্ম চিন্তা করে, তখন ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হয়। যদিও এই মত অন্যান্য অদ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাপি শৈব সিদ্ধান্তীরা আপনাদিগকে অদ্বৈতী বলিয়াই পরিচিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈত অর্থে দুইএর অভাব; উহার অর্থ এই—ঈশ্বর, আত্মা ও জড় পরস্পর পৃথক্ নহে, কিন্তু উহা দ্বারা উহাদের সম্পূর্ণ একত্ব বুঝায় না। উহা এই তিনটী তত্ত্বের কোনটীকেই অস্বীকার করে না, অথবা উহাদিগকে কার্য্যকারণ স্বরূপে বর্ণনা করিয়া একটী আর একটীতে পরিণত হয়, তাহাও বলে না। মন ও দেহ পরস্পর পৃথক্ হইলেও যেমন উহারা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, স্বর ও ব্যঞ্জন পরস্পর পৃথক্ হইলেও যদ্রূপ অভিন্ন, ঈশ্বরের সহিত জীব-জগতেরও তদ্রূপ

সম্বন্ধ। তিনি জগতের সহিত একও নহেন, পৃথক্‌ও নহেন, এই সম্বন্ধকে অনন্য বা অদ্বৈত বলে। এই মতে চারি প্রকার সাধনমার্গ আছে—চর্য্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান অথবা দাসমার্গ, সৎপুত্রমার্গ ও সন্মার্গ। এই সাধনমার্গ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি মার্গ হইতে পৃথক্‌। তিরমল্লুবরের তামিল গ্রন্থই ইঁহাদের খুব প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই ধর্ম্ম অহিংসা প্রভৃতি উচ্চ নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

বল্লভাচার্য্য-মত।

(লালুভাই পারেখ, আমেদাবাদ।)

বল্লভাচার্য্য ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার চম্পাবণ্য নামক স্থানে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া—তিনি অদ্বৈতবাদাদি সকল মতের অসারতা বুঝিতে পারেন। ১১ বৎসর বয়সে বারাণসী ধামে ব্রহ্মবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। পরে বেঙ্কটেশা পর্ব্বতে লক্ষণ বালাজী নামক স্থানে কিছু দিন থাকিয়া ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব ধর্ম্মসভা করিয়া সকল মতের পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বল্লভ ১৪ বৎসর বয়সের সময় এই সভায় যাইয়া সকলকে পরাস্ত করিয়া রাজাকে শিষ্য করেন ও আচার্য্যজী মহাপ্রভুজী উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিয়া অন্যান্য সকল বাদিগণকে পরাস্ত করিয়া গোকুলে পুষ্টিভক্তিমার্গ বা নির্গুণ ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আবার প্রায় ১৮ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতে এই মার্গ শিক্ষা দেন। ২৮ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। তিনি অন্যান্য সময়ে গয়া বা বারাণসীর নিকট গ্রামে বাস করিতেন। ৫২ বৎসর বয়সে বারাণসী হনুমানঘাটে অলৌকিক রূপে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার মত বঙ্গদেশীয় গৌরাঙ্গ-প্রচারিত মতের সদৃশ।

বল্লভাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম সাকার, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি নির্দ্দোষ, সর্ব্বগুণাধার; তিনি স্বাধীন, তাঁহার দেহ জড়দেহ নয়, তাঁহার হস্ত পদ মুখ উদরাদি আনন্দ মাত্র, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও ত্রিবিধ-ভেদ-বর্জ্জিত। তিনি অনন্তমূর্ত্তি, তিনি অচল অথচ চল, সমুদয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়, তর্কের অগোচর। তিনি সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্‌, ত্রিগুণাতীত। 'এই সমুদয়ই আত্মা, তিনিই সৃষ্টি করেন, তিনিই সৃষ্ট হন, তিনিই রক্ষা করেন, তিনিই রক্ষিত হন, তিনিই নাশ করেন, তিনিই নষ্ট হন। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম।' ইহাই ব্রহ্মবাদ। বল্লভাচার্য্য ব্রহ্মকে কৃষ্ণ নাম দেন—কৃষ্‌ অর্থে শক্তি, ন অর্থে আনন্দ। এই উভয়ের সম্মিলনই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম।

যখন ব্রহ্ম অনেক হইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে লক্ষ লক্ষ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পরমাণু বহির্গত হইতে থাকে। সৎ পরমাণুগুলি জড়, চিৎগুলি জীব ও আনন্দগুলি অন্তর্য্যামী হয়। ব্রহ্ম যখন সত্য, তখন তাঁহা হইতে বহির্গত জগৎ সত্য, উহা মিথ্যা বা ভ্রান্তিমাত্র নহে। জীব অণুস্বরূপ। ব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব নামক দুই শক্তি আছে। আবির্ভাব-শক্তিতে জগৎ আবির্ভূত হয় ও তিরোভাব-শক্তিতে সমুদয় লয় হইয়া গিয়া তিনিই থাকেন।

বল্লভাচার্য্যের মতে ভগবানের মাহাত্ম্য জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাতে সুদৃঢ় ও অতিশয় স্নেহই ভক্তি। ইহা ব্যতীত মুক্তি হয় না। বিষ্ণু স্বামী যে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহা তামস, মধ্বাচার্য্যের রাজস, রামানুজাচার্য্যের সাত্ত্বিক, বল্লভাচার্য্য-প্রচারিত ভক্তি নির্গুণ ভক্তি।

পুষ্টিমার্গ নাম শুনিয়া অনেকে মনে করেন, তিনি স্থূল শরীরের পুষ্টিবিধান উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। উহার অর্থ ভগবৎ-কৃপা। জ্ঞান বা সাধারণ ভক্তি-মার্গে নিজ শক্তি-বলে সাধন করিতে হয়। কিন্তু পুষ্টিমার্গে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হইতে হয়। মানুষ যাহা কিছু আপনার বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাই ভগবানে—গুরু বা অন্য মানবকে নহে—নিবেদন করিতে হইবে—ইহাকে আত্ম-নিবেদন বলে। কলিযুগে ভক্তিই এক মাত্র পথ। ভক্তি উপার্জ্জন করিতে সেবাই প্রয়োজন। এই সেবা ত্রিবিধা—তনুজা, চিত্তজা ও মানসী। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ দ্বারা ভক্তি জন্মায়। তৎপ্রণীত ৮৪ গ্রন্থের মধ্যে তত্ত্বদীপ বা নিবন্ধ, অনুভাষ্য (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য), পূর্ব্বমীমাংসা ভাষ্য, সুবোধিনী, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী প্রভৃতি প্রধান। বল্লভাচার্য্যের প্রেমধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইবার যোগ্য।

আর্য্য-সমাজ।

(বালকৃষ্ণ সহায়, রাঁচি।)

এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রায় ৭৪ বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল, মূল শঙ্কর। ১৪ বৎসর বয়সের সময় একবার শিবরাত্রির উপবাস করিয়া তিনি একাকী রাত্রি জাগরণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মনে উদয় হইল, আমার সম্মুখস্থ এই মূর্ত্তিই কি জগৎ-কর্ত্তা মহাদেব? এই চিন্তা তাঁহার মনকে এরূপ তীব্র ভাবে অধিকার করিল যে,তিনি পিতার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তরে তৃপ্ত হইলেন না। কিছু কাল গত হইলে, ভগিনী ও খুল্লতাত-বিয়োগে তাঁহার মনে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চার ও মুক্তিলাভের প্রবল

পিপাসা হয় এবং পণ্ডিতবর্গকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ধ্যানকেই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার কিছু পরে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং নানা পণ্ডিত, সন্ন্যাসী ও যোগীর নিকট শিক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের পিপাসা কিছুতে মিটিল না। শেষে মথুরায় স্বামী বিরজানন্দ সরস্বতীর নিকট চারি বর্ষ বেদ ও সমুদয় আর্য্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উদ্দিষ্ট বস্তু পাইলেন। অধ্যয়নান্তে যখন গুরুদক্ষিণা দিবেন, তখন গুরু, তিনি যে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার প্রচারই গুরুদক্ষিণারূপে প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বয়ং সাধনা করিতে ও লোক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যার্থিগণকে সন্ধ্যা করিতে ও কেবল বেদ পাঠ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনেক অনুবর্ত্তী হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতের সাম্রাজ্ঞীত্ব পদ গ্রহণকালে যে দিল্লীর দরবার হয়, সেই উপলক্ষে তথায় গিয়া তখনকার ৭ জন বিভিন্ন-ধর্ম্ম-সংস্কারককে লইয়া এক সভা করেন, কিন্তু পরস্পরের প্রধান প্রধান মতের মিল না হওয়াতে কিছু ফল হইল না।

দয়ানন্দ সরস্বতী কিছু নূতন ধর্ম্ম শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার প্রণীত সত্যার্থপ্রকাশ ও ঋগ্বেদ-ভাষ্য-ভূমিকা পড়িলেই ইহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি বেদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকে প্রকৃত ব্যাখ্যার নিয়ম না জানিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকে। তাঁহার মতে বেদের শব্দগুলির যৌগিক (ধাতুপ্রত্যয়গত) অর্থ করিতে হইবে, সাধারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বেদের যথার্থ অর্থ জানা যায় না। আরও, ঋষিরা যোগের দ্বারা বেদের অর্থ বুঝিতেন ও চর্চ্চা করিতেন। যোগশক্তিশূন্য ভাষ্যকারেরা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝেন নাই।

এই মতে—ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান, আনন্দময়, নিরাকার, অখণ্ড, অবিনাশী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অভয়-স্বরূপ ; বেদ সমুদয় সত্যের খনি ; মানবের ব্যক্তিগত সাধারণ জ্ঞান বা বিবেক (Conscience) সত্যাসত্যের বিচারক-স্থানীয় হইতে পারে না ; কারণ, উহা অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া থাকে। বেদ স্বতঃসিদ্ধ সত্য ; সুতরাং উহাই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যেক আর্য্যেরই উহা পঠন পাঠন আবশ্যক। পুরাণে কিছু কিছু ভাল জিনিষ থাকিলেও, উহাদের অসামঞ্জস্য প্রভৃতি নানা হেতুতে উহা পরিত্যজ্য। আর্য্যগণকে সর্ব্বদা সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। অজ্ঞান দূর করিবার জন্য জ্ঞানের বিস্তার করিতে হইবে।

আর্য্যধর্ম্ম ঈশ্বর, জীব ও জগৎ তিনই অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করেন। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন। জীবের কর্ত্তব্য—ঈশ্বরের উপাসনা। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন মিথ্যা বস্তুর উপাসনা উচিত নয়। তাঁহার সহিত জীবের সেব্য-সেবক, উপাস্য-উপাসক, পিতাপুত্র সম্বন্ধ। ভগবান্ ও জীবের মধ্যবর্ত্তী কেহ নাই। ভগবানের বিশেষ কেহ প্রতিনিধি বা কোনরূপ প্রতিমা নাই। বিশেষ বিশেষ তীর্থে যাইলে বা স্নান করিলে মুক্তি হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভ, চিত্তশুদ্ধি, সৎকর্ম্ম, জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সঙ্গ, যোগাভ্যাস, কায়মনোবাক্যে সত্যপালন, সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণ,—এক কথায়, ঈশ্বরেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই ঈশ্বরোপাসনা ও উহাই তীর্থ। উপাসনার তিন সোপান। স্তুতি, প্রার্থনা ও ধ্যান। ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। তাঁহাতে এই এই মঙ্গল গুণ আছে, এইরূপ চিন্তা সগুণ, ও তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ গুণ সকলের অভাব চিন্তা নির্গুণ ধ্যান। ইহার সহায়তার জন্য পাঁচ মহাযজ্ঞ করিতে হয়। বর্ণাশ্রম গুণগত, জাতিগত নহে। স্বর্গ নরক স্থূলভাবে কিছু নাই। আনন্দ ও দুঃখের পরাকাষ্ঠাই স্বর্গ ও নরক। কর্ম্মানুসারে মানব বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। বেদে শ্রাদ্ধের উল্লেখ নাই, উহার আবশ্যকতাও নাই। কারণ, পিতৃগণ হয় মুক্ত, নতুবা কোন দেহ লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। স্ত্রীগণও বেদপাঠের অধিকারী। শূদ্রও উপযুক্ত হইলে বেদপাঠ করিতে পারে। ইঁহারা অল্পবয়স্কা বিধবার বিবাহ সমর্থন করেন।

১৮৭৫ সালে বোম্বাইএ প্রথম আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এখন উহার ৭০০ শাখা হইয়াছে, প্রায় লক্ষ লোক এই সমাজের সভ্য। পঞ্জাবে ও পশ্চিমে উহার প্রভাব খুব বেশী। লাহোরে এঙ্গ্‌লো বেদিক কলেজ, এবং নানাস্থানে গুরুকুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্য্যসমাজ প্রাচীন মতানুযায়ী শিক্ষা দিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম বা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অনেক ব্যক্তিকে ইঁহারা শুদ্ধি-প্রথা দ্বারা আর্য্য করিয়াছেন। এমন কি, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান বংশজাত কতকগুলি ব্যক্তিও এই সমাজে গৃহীত হইয়া আর্য্য হইয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০০০ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইয়াছে। উহা নানাস্থানে অনাথালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং পঞ্জাবে রাঠোর ও মেঘা এবং মান্দ্রাজে শানার নামক নীচজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়াছে। উহা মাংসভোজনের বিরোধী। ইহাদের মতে বেদে হিংসার উল্লেখ নাই। দয়ানন্দ সরস্বতী নিজেকে অভ্রান্ত বলিয়া দাবী করেন নাই।

থিওজফি।

(যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা।)

ইহা কোন নূতন ধর্ম্ম নহে এবং ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও নাই। থিওজফিক্যাল সোসাইটির ৩টী উদ্দেশ্য :—

১ম, জাতি, ধর্ম্মমত, লিঙ্গ বা বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যজাতির মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাবের একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

২য়, ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনায় আলোচনার উৎসাহ প্রদান।

৩য়, অব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের এবং মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির অনুসন্ধান।

ইহাদের মধ্যে ১মটী সকল সভ্যকেই স্বীকার করিতে হয়। অপর দুইটী পরম্পরাক্রমে উহার সহায়ক হইলেও, বিশেষ বিশেষ অধিকারী ব্যক্তি সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদের আলোচনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন, কোন সভ্য না করিলেও কোন হানি নাই। ইহা কাহাকেও তাহার নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলে না, বরং সেই ধর্ম্মের যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে ও তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে উৎসাহ দেয়। সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। যে সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ নিজেরা নির্ব্বাণ-সুখ করতলগত হইলেও,উহাকে পরিত্যাগ করিয়া জগতের কল্যাণার্থ সদা নিযুক্ত, এবং যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জগতের সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহারাই হেলেনা পেট্রোভ্‌না ব্লাভাট্‌স্কিকে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করেন। সুতরাং তাঁহারাই এই সোসাইটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইহার ৬৩১টী বিভিন্ন শাখা এবং সভ্যসংখ্যা প্রায় ১৫০০০ হইয়াছে। যাঁহারা নিজেদের মুক্তিকামনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মাগণের প্রবর্ত্তিত কার্য্যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের দর্শনের অধিকারী। থিওজফি বলিয়া সাধারণতঃ যে মত ও শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। তবে ইহা কেবল চিন্তা ও আলোচনার জন্য কোন অবশ্য-বিশ্বাস্য মতবাদরূপে নহে।

১। এক অনন্ত অজ্ঞেয় প্রকৃত সত্তা আছে।

২। তাঁহা হইতে ব্যক্ত ঈশ্বর একস্বরূপ হইতে দ্বিবিধভাবে ও পরে তাহা হইতে ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত।

৩। ঐ ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত ঈশ্বর হইতে অনেক চৈতন্যবান্ সত্তা উৎপন্ন হইয়া জগৎশৃঙ্খলা পরিচালন করিতেছেন।

৪। মানুষ সেই ব্যক্ত ঈশ্বরের প্রতিবিম্বস্বরূপ অতএব ত্রিবিধস্বরূপ, তাহার প্রকৃত স্বরূপ জগদাত্মার সহিত অভিন্ন।

৫। বাসনাবশে জীবের বারবার জন্মপরিগ্রহ হইয়া ক্রমে উন্নতি হয় এবং পরে জ্ঞানলাভ ও স্বার্থত্যাগ দ্বারা উহা হইতে মুক্তি হয়। জীব অব্যক্তরূপে ব্রহ্মভাবাপন্ন, মুক্তাবস্থায় তাহার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত হয়।

সৌর জগতে ভূতের সপ্তভূমি বা সপ্তবিধ প্রকাশ আছে। যথা—(১) ভৌতিক (২) ভাবময় (৩) মানসিক (৪) বুদ্ধিসম্বন্ধীয় (৫) আত্মিক। অবশিষ্ট দুই ভূমি ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশক্ষেত্র।

থিওজফির গ্রন্থাদিতে ভৌতিক ভূমির অতীত ভাবময় ও মানসিক ভূমির সম্বন্ধে অনেক বিবরণ (ভূতপ্রেতাদির সমাচার) দেখিতে পাওয়া যায়। ওগুলি থিওজফি বা ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য বিষয় নহে, উহা অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা তাহাই, যাহাকে জানিলে সকল জানা যায়। এই পরাবিদ্যা লাভের উপায় কি? সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্যে পর্য্যন্ত ত্যাগের অভ্যাস, কায়মনোবাক্যে একত্বের দিকে গতি, নীচ প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য, আপনাকে সব শেষে রাখিয়া পরের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—এই সকল সাধন অধ্যবসায়ের সহিত করিতে করিতে ক্রমে উহা লাভ হয়। সত্য, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা দেহের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় সেই আত্মার দর্শন হয়। কার্য্য বড় কঠিন, তথাপি নিরাশ হইবার কারণ নাই। মহাত্মারা সেই প্রাচীন ক্ষুরধার পথে সাহায্য করিতে এখনও প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা এখনও যথার্থ অনুরাগী শিষ্যগণকে সেই প্রাচীন সাধনা ও গুহ্যবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহারা প্রেমভক্তি এবং জগৎসেবার উপযোগী জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষারূপ সমিধ্ হস্তে তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করে, তাঁহারা এখনও তাহাদিগকে সেই সূক্ষ্ম বর্ত্মে পরিচালনা করিয়া থাকেন।

শাক্তধর্ম্ম।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন।)

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে যদিও নির্ব্বাণমুক্তিলাভের সম্ভাবনা, তথাপি নিরাকার নির্গুণের ধারণা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তজ্জন্য তিনি নিজ ভক্তগণের ধ্যান-সিদ্ধির জন্য সৃষ্টির আদিতে সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, মহেশ ও ভগবতীরূপে

প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রথম চারিটীর উপাসনায় যথাক্রমে সার্ষ্টি, সামীপ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়া জন্মজন্মান্তরে সাধক শক্তির উপাসনায় রত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারেন। এই শক্তি ব্যতীত সকল দেবতাই নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যদিও শক্তি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তথাপি স্ত্রীদেবতারূপে ও মাতৃরূপে তাঁহার উপাসনার তাৎপর্য্য এই যে, যে মূর্ত্তিতে সমধিক করুণা থাকা সম্ভব, তাঁহারই প্রতি হৃদয় স্বতঃ ধাবিত হয়। মায়ের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি কাহার না হয়? অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল স্থানেও শিশু সন্তান মায়ের ক্রোড়ে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। মাও ভয়ানক বিপদসঙ্কুল স্থানেও শত শত বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া সন্তানের রক্ষায় যত্নবতী। মা নামও কি মধুর! এই নামে সাধকের প্রাণ ভরিয়া যায়। তাই এই মাতৃভাবে সাধনা।

রূপধারণ করিলেও তাঁহার নিরাকার স্বরূপের কোন ব্যাঘাত হয় না; কারণ, যখন তাঁহা হইতে এত বড় জীব ও জগৎ সৃষ্ট হইয়াও তাঁহার নিরাকার স্বরূপের *কোন ক্ষতি হয় নাই, তখন তাঁহা হইতে অভীষ্ট ফলদায়িনী কোন মূর্ত্তির উৎপত্তি* হইলেই বা তাঁহার স্বরূপের ব্যাঘাত হইবে কেন? সৃষ্টির প্রথমেই মহত্তত্ত্বের বা তমোগুণের আবির্ভাব হয়। ইনিই শাক্তগণের মহাকালভৈরব এবং শক্তি তাহাতে অনুপ্রবিষ্টা হওয়াতে আদ্যা কালিকা বিপরীত ক্রীড়ায় রত হইয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম। (দক্ষিণাম্নায়)।

(পুন্নানন্দ ভিক্ষু)।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনি কপিলাবস্তু নগরের রাজা শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্র। রোগগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, শব ও সন্ন্যাসী দর্শনে ইনি সংসারের দুঃখপূর্ণতা ও সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রথমে রুদ্রক ও আড়ার কালাম নামক দুই জন যোগীর নিকট শিক্ষা করেন। ইঁহারা যতদূর শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা শিখিয়াও যখন অভীপ্সিত বস্তু পাইলেন না, তখন ইনি গয়াক্ষেত্রে বোধিদ্রুমমূলে নিজ শক্তিবলে দুঃখ মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণার্থ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। অনেক দিন কঠোর তপস্যার পর বুঝিতে পারেন, বিলাসিতা ও কঠোরতা উভয়ই পরিত্যজ্য। সুতরাং তখন মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া চতুরার্য্য সত্য প্রাপ্ত হইলেন ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করিলেন। পরে নানাস্থানে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম ও উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই

বিস্তৃতি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধগণের ত্রিপিটকশাস্ত্র হইয়াছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, যে বিষয় অযৌক্তিক, তাহা পরম্পরাগত স্থাবর বা সঙ্ঘ বা বুদ্ধবাক্য হইলেও গ্রহণ করা উচিত নয়।

চতুরার্য্য সত্য এই,—

(১) দুঃখ। জরাব্যাধি, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ, প্রভৃতি দুঃখ আছেই। তদ্ব্যতীত যাহাকে সুখ বলা হয়, বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও দুঃখ বলিয়াই প্রতীতি হইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ দুঃখময়, ইহার বিচার করিতে হইবে।

(২) দুঃখসমুদায় অর্থাৎ দুঃখ উৎপত্তির কারণ বিচার। উহা বিচার করিলে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়-বাসনাই যে সমুদয় দুঃখের মূল, তাহা বুঝা যাইবে। দুঃখময় সংসারের উৎপত্তি বিচার করিয়া বুদ্ধদেব অবিদ্যাদি কারণ-পরম্পরাকে সংসারের উৎপত্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) দুঃখনিরোধ। নির্ব্বাণকে দুঃখনিরোধ বলে। উহা অজাত, অভূত, অসংস্কৃত, ধ্রুব, শুভ, সুখ ও শিবস্বরূপ। যে যে কারণ-পরম্পরাক্রমে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সেই কারণ-পরম্পরার পর্য্যায়ক্রমে নিরোধে দুঃখের নিরোধরূপ নির্ব্বাণ লাভ হয়। উহা দুই প্রকার—সোপাধিশেষ ও অনুপাধিশেষ। ১ম প্রকারের নির্ব্বাণ দেহ থাকিতে থাকিতেই লাভ হয়। তখন মন চাঞ্চল্য-রহিত, সুস্থির, প্রশান্ত, শোকহীন, ভয়হীন ও দ্বন্দ্বরহিত হয়। মৃত্যুর পর অর্হৎগণ যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তাহাকে অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ বলে। তাঁহারা মৃত্যুর সময় তৃষ্ণাহীনতাবশতঃ সুস্থির চিত্তে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পর আর দেহধারণের হেতু না থাকাতে তাঁহাদের জন্ম হয় না। সুতরাং তাঁহারা অজর, অমর, অনাদি, অনন্ত হন।

(৪) দুঃখনিরোধের উপায়।—আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, ত্রিবিধ কায়িক পাপ, যথা—প্রাণিহিংসা, চৌর্য্য ও কাম হইতে বিরতি, সম্যক্ আজীব (জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়), সম্যক্ ব্যায়াম (দৃঢ় উৎসাহ), সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

এই গুলিকে ৩ স্কন্ধে বিভাগ করা হয়; যথা, শীলস্কন্ধ (সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব), সমাধিস্কন্ধ (সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি) ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ (সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সঙ্কল্প)। শীলের দ্বারা সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া সমাধিরত হইতে হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি প্রজ্ঞালাভ করিয়া সর্ব্বসংস্কারের অনিত্যত্বাদি হৃদয়ঙ্গম করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নীতির ন্যায় উদার নীতি আর নাই।

শঙ্কর-প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পরদিন প্রাতেই ব্যাঙ্গালোরে আসিলাম; আসিয়া দেখি, শৃঙ্গেরীর পত্র আসিয়াছে। সেখানে প্লেগ কিছু কমিয়াছে—এই মাত্র সেই পত্রের মর্ম্ম; সুতরাং একদিন বিশ্রাম করিয়া শৃঙ্গেরী যাত্রা করিলাম।

ব্যাঙ্গালোর হইতে শৃঙ্গেরী যাইতে হইলে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সাউথ্ ইণ্ডিয়ান রেলপথ অবলম্বন করিতে হয়। এই রেলপথ হুবলি, ধারওয়ার প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া পুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রায় রাত্রি ৮ টার সময় গাড়িতে উঠিলাম এবং প্রায় রাত্রি ২।৩ টার সময় বিরুর নামক ষ্টেশনে নামিয়া, "বিরুর সিমোসা" নামক একটী ক্ষুদ্র শাখা-রেলপথের গাড়িতে উঠিলাম এবং একটু পরেই টেরিকেরে নামক ষ্টেশনে নামিলাম। শৃঙ্গেরী যাইতে হইলে এই স্থান হইতে যাওয়াই সুবিধা, যেহেতু ডাক এই স্থান হইতেই যায়, এবং তজ্জন্য যাত্রিগণ ডাক গাড়ির সুবিধা পাইয়া থাকে। বিরুর হইতেও যাওয়া চলে, কিন্তু সেখানে ডাক গাড়ির সুবিধা পাওয়া যায় না। শেষরাত্রিতে টেরিকেরে ষ্টেশনে নামিতে হইয়াছিল, সুতরাং বিশ্রামাগারে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকাল হইবামাত্র ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্লেগের সংবাদটী প্রথমেই লইলাম। তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে হৃদয়ে যার পর নাই ভীতির সঞ্চার হইল, কিন্তু কি করিব, শৃঙ্গেরী যাইবার বাসনা তদপেক্ষা বলবতী। যাহা হউক, নানাবিধ চিন্তায় উদ্বেলিত চিত্তে ডাক গাড়ির অন্বেষণে পোষ্ট আফিসে আসিলাম, এবং ২৲ টাকা দিয়া ৩৭৷ মাইল দূরবর্ত্তী কোপ্পা নামক স্থানের একখানি টিকিট কিনিলাম। শৃঙ্গেরী পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রয় করিবার পোষ্টমাষ্টারের ক্ষমতা নাই। ইহা কোপ্পার পোষ্টমাষ্টারের ক্ষমতাধীন। কারণ টেরিকেরে হইতে কোপ্পা পর্য্যন্ত এবং কোপ্পা হইতে শৃঙ্গেরী পর্য্যন্ত বিভিন্ন কণ্ট্রাক্টর ডাক লইয়া যায়। এই কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য প্রতি বৎসর নিলামে নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, অগত্যা কোপ্পা পর্য্যন্ত টিকিট লইয়া ঝট্কাতে উঠিলাম। এই ঝট্কা টাপা বাঁধা গরুর গাড়ির মত, এক ঘোড়ায় টানে। বসিবার স্থানে বিচালি বিছাইয়া সতরঞ্চি দিয়া ঢাকা। গাড়োয়ানের ঠিক পশ্চাতে মেল ব্যাগ, এবং তাহার পশ্চাতে তিন জন লোক বসিবার মত স্থান থাকে। রৌদ্র উঠিলে গাড়ি ছাড়িল। টেরিকেরের প্রধান পথ দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন

কীর্ত্তির ধ্বংসের দুটী একটী অবশেষ দেখিতে দেখিতে ক্রমে যেন পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোপ্পা পর্য্যন্ত পথে বাস্তবিক কোন পাহাড় পড়ে নাই, পাহাড়ের পার্শ্বদেশস্থ সমতল বন্ধ ভূমির উপর দিয়া পথটী চলিয়া গিয়াছে। বেলা ৩টার সময় কোপ্পায় পঁহুছিলাম। পঁহুছিয়াই পোষ্টমাষ্টারের নিকট গিয়া ১৲ টাকা দিয়া শৃঙ্গেরী যাইবার ডাক গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করিলাম এবং অন্বেষণ করিয়া একটী ব্রাহ্মণের হোটেলে অন্ন আহার করিলাম। এখানে, ব্রাহ্মণ হোটেলের বড় দুর্দ্দশা। তাহাতে আমি ব্রাহ্মণ নহি জানিয়া, আমাকে পিঁয়াজের তরকারি দিয়াছিল। আমি নগদ পয়সা দিয়া একটু দুগ্ধের সাহায্যে কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে আমাদের গাড়ি প্রস্তুত হইল, আমিও যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গেরীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এইবার যথার্থই পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। নিবিড় অরণ্যাবৃত পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া ১০।১২ হাত প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও হঠাৎ পর্ব্বত-মধ্যবর্ত্তী সমতল অরণ্য প্রদেশের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; কোপ্পা হইতে শৃঙ্গেরী পর্য্যন্ত ১৫।১৬ মাইল পথ আসিতে প্রায় রাত্রি ৮টা হইয়া পড়িল।

শৃঙ্গেরী, একটী পর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টিত সমতলভূমিপ্রদেশ। এই সমতল ভূমির মধ্যে আসিতে হইলে প্রায় ২।৩ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিতে হয়। শৃঙ্গেরীর প্রায় দুই মাইল দূরে আসিয়া শুনিলাম, শৃঙ্গেরীর ডাক্তার বাবু প্লেগের ভয়ে সহর ছাড়িয়া সেখানে একটী বাঙ্গালায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। আমিও প্লেগ-ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিলাম, ডাক্তারটীর বাটীতে যদি রাত্রিতে থাকিতে পাই, তাহা হইলে পরদিন প্রাতে শৃঙ্গেরী যাইব। এই ভাবিয়া ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; অগত্যা শৃঙ্গেরীই চলিলাম। ক্রমে গাড়োয়ান একটা পর্ব্বতোপরি একটী প্রান্তর-বিশেষের মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং সেখানে আমায় নামিতে বলিল। আমি মঠ পর্য্যন্ত যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। অব-শেষে একটী ঘেস্থুড়ের মস্তকে আমার বিছানা-পত্র দিয়া।• আনা পুরস্কার স্বীকার করিয়া মঠাভিমুখে চলিলাম। এই পথটী অন্ধকারে এমনই ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল যে, ভাবিলাম, বুঝি কৃতান্ত সদনেই যাইতেছি। যাহা হউক, সেই অনির্ব্বচনীয় মনোভাবের সহিত সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন দেখিলাম, পথপ্রদর্শক আমাকে কোন হত্যাস্থানে লইয়া যায় নাই, সহরেই

লইয়া যাইতেছে। কিন্তু এস্থানটীও আরও ভীষণ হইয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। প্লেগের ভয়ে সহর একেবারে জনশূন্য; আমি পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই যে, সহর এতদূর জনশূন্য হইয়াছে। যতই যাই, একেবারে নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকারময় প্রদেশে আসিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিয়া দেখি—রাস্তার ধারে একটী দোকানের মত ছোট পাকা ঘরে দুই জন পুলিশ কর্ম্মচারী একটী হরিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া একটী টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সঙ্গের লোকটী তাহাদের কথার উত্তর দিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিল। বুঝিলাম—সহরবাসী সকলেই প্রস্থান করিয়াছে, কেবল পুলিস কর্ম্মচারী কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্লেগের ভয়ে পলায় নাই। আরও প্রায় ১৫ মিনিট চলিয়া একটী বৃহৎ ফটক দেখিতে পাইলাম। ফটকটী প্রায় ৩ তলা, সমান উচ্চ। ফটকের উপরে নহবৎখানা এবং বাম পার্শ্বে বহির্দ্দেশে পথের উপরে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ চালা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিবা একটী বৃহৎ প্রাঙ্গণ। ইহার চারি পার্শ্বেই একতলা বারাণ্ডা-বিশিষ্ট গৃহশ্রেণী। দক্ষিণ দিকের গৃহশ্রেণীর মধ্যস্থলে আবার একটী ফটক। ইহার ভিতর দিয়া আর একটী প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। এই ফটকের উভয় পার্শ্বে বারাণ্ডায় কয়েক জন প্রহরী রহিয়াছে। আমার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া প্রহরী তাহার পার্শ্বেই রাত্রি যাপন করিবার অনুমতি দিল। মুটেটীকে বিদায় করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিয়া শয়নের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলাম এবং প্রহরীকে প্লেগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম—সম্মুখের গৃহ সমুদায়ে অনেক প্রহরী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। গৃহের দিকে চাই, আর ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি হয়। মধ্যে মধ্যে ইন্দুরের কিচি কিচি শব্দ ভয়ের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিল। যাহা হউক, ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া রাত্রি যাপন করিবার মানস করিলাম। শৃঙ্গেরী মঠ একটী জমীদারী, ইহার এজেন্টই মোহান্তের প্রধান কর্ম্মচারী। ইঁহার সহিত দেখা করিবার প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু প্রহরিগণ সে রাত্রে দেখা অসম্ভব বলিয়া আমায় ক্ষান্ত করিল। ক্রমে প্রহরী আমার বৃত্তান্ত কতক কতক জানিল এবং আমায় কলিকাতার বাবু জানিয়া একটু সম্মান করিতে লাগিল। এখন রাত্রি প্রায় দশটা। বেলা ৩টার সময় আধপেটা দুধ ভাত খাইয়া ঝটকার ঝাঁকানিতে বহু পূর্ব্ব হইতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্লেগের প্রভাব দেখিয়া খাবার কথা হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রহরীটী ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়া

আমাকে শারদা মাতার প্রসাদ কিছু খাইতে আহ্বান করিল ; আমিও কোন কিছু বিচার না করিযা, শৃঙ্গেরীর অধিষ্ঠাত্রী শারদা মাতাব প্রসাদ জ্ঞান করিয়া, তদ্দারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। যাহা যাহা দিয়াছিল, তন্মধ্যে খিচুড়ি ও হালুয়ার কথা এখনও স্মরণ আছে।

আমার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, রাত্রেই ১২ খানি প্লেট পরাইয়া রাখিলাম এবং সকালে সর্ব্বাগ্রে শৌচাদি সমাপন করিয়া এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। প্রথমেই মঠ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া রাত্রের কষ্ট, প্লেগের ভয় অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। দেখিলাম, শারদা দেবীর সেই প্রাচীন মন্দিরের তিন পার্শ্বে শৃঙ্গেরী-স্বামিগণের সমাধির উপর শিবলিঙ্গ-সমূহ, বিবিধ সুন্দর মন্দির মধ্যে বিরাজমান। তন্মধ্যে বিদ্যাশঙ্করের মন্দিরটী সর্ব্ববিষয়ে চিত্তাকর্ষক। ইহার কারুকার্য্য এত সুন্দর যে, ইহাকে একপ্রকার আদর্শস্থানীয় বলা চলে। দেখিলাম, প্রাঙ্গণের প্রায় মধ্যস্থলে শারদা দেবীর পার্শ্বে শ্রীজনার্দ্দনের একটী মন্দির রহিয়াছে। এ মন্দিরটীও সুন্দর। এই মন্দির-গুলিকে ডানদিকে রাখিয়া একটু উত্তর মুখে যাইয়া মঠ-প্রাঙ্গণের উত্তর-দিকের প্রাচীরের গাত্রে প্রাঙ্গণাভিমুখী গৃহশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। এই গৃহশ্রেণীর প্রায় মধ্যস্থলে আবার একটী ফটক রহিয়াছে। দ্বারবান আমাকে ইহার মধ্য দিয়া তুঙ্গানদী-গর্ভে যাইবার সিঁড়ির উপর লইয়া আসিল। এই স্থান হইতে নদী-গর্ভ বড় কম নীচে নহে ; প্রায় দুই তিন তলা সমান নীচে নামিয়া একটু পশ্চিম দিকে যাইয়া, একটী সুপারি গাছ ও বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত, একটী লোক যাইতে পারে এমন প্রশস্ত, সাঁকোর উপর দিয়া নদীর পর পারে লইয়া আসিল। সাঁকো হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নুড়ি পাথর বিছান শুষ্ক নদী-গর্ভের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। দৃশ্যটী দেখিবার জন্য দুই একবার পথিমধ্যে ফিরিয়া ফিরিয়া দাঁড়া-ইতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিকে উদীয়মান সূর্য্য দূরে নিবিড় বনাবৃত নানাবিধ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব্বতের উপর উঠিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে ; দক্ষিণ-দিকে নদীর পরপারের প্রস্তরময় মঠপ্রাচীর যেন এক শৈলপাদদেশস্থ দুর্ভেদ্য দুর্গের চিত্র চিত্তপটে অঙ্কিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে ; পশ্চিম দিকে দূরস্থিত পর্ব্বতমালা তখনও উষার অন্ধকারের ছায়া পরিত্যাগ করে নাই, তজ্জন্য নিজ পার্ব্বত্য শোভা বিস্তার না করিয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; উত্তরদিকে অতি দূরে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী একটী ত্রিভুজের দুইটী

ভুজের ন্যায় ক্রমাগত উত্তরাভিমুখী হইয়া উত্তর ভারতকে পথপ্রদান করিবার জন্য যেন মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে, ত্রিভুজ-মধ্যস্থ বিস্তীর্ণ শিলাময় ভূখণ্ড নানাবিধ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ হইয়া উত্তর দিগাগত নির্ম্মল তুঙ্গাবারিধারা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পশ্চিমোত্তর দিকের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপে চারিদিক্ চাহিয়া মনে হইল, বিধাতা বুঝি এই স্থানটীকে নিভৃত করিবার জন্য চারিদিকে দুর্গম পর্ব্বতমালাদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি প্রাকৃতিক শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম—আমার পথপ্রদর্শক প্রহরী আমাকে ফেলিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে ; কাজেই মনের ভাব মনে রাখিয়া সম্মুখের সরু পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। একটু পরেই একটী বাগানে প্রবেশ করিলাম। যতই যাইতে লাগিলাম, বাগানটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ততই চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। আঁব, কাঁটাল, লিচু, গোলাপজাম, পিয়ারা, ন্যাশপাতি, চন্দন, সুপারি, নেবু প্রভৃতির নাতিবৃহৎ বৃক্ষগুলি এমনভাবে ফুলগাছের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাগানের তিন স্তর জমিতে সজ্জিত রহিয়াছে যে, ইহাই দেখিবার জন্য দর্শকের চিত্ত উৎসুক হয়। আরও দুই চারি পা যাইয়া একটী একতলা কাছারিবাটীর সম্মুখে আসিলাম। এখানে এজেণ্টের কাছারি হয়। তখনও প্রাতঃকাল, কাজেই কাছারী খোলা হয় নাই। সুতরাং আরও দুই চারি শত পা অগ্রসর হওয়া গেল। দেখিলাম, একটী অতি সুন্দর দ্বিতল বৈঠকখানা বাটীর মত একটী ক্ষুদ্র বাটী প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এই বাটীর উত্তরদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণবিশেষ স্থানে এক শ্রেণী একতলা ঘর এবং মধ্য প্রদেশে একটী ফটক। ফটকাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখি যে, এটী উক্ত বৈঠকখানা বাটীর রন্ধনশালা। যাহা হউক, প্রহরী আমাকে ঐ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এজেণ্টের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিল ; কারণ, তখন তিনি হয় শয্যাত্যাগ করেন নাই, অথবা স্নানশৌচাদি ক্রিয়াতে ব্যাপৃত ছিলেন। যাহা হউক, প্রায় ১৫ মিনিট পরে তিনি রন্ধনশালার ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন ও আমাকে দেখিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে তাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় অভিবাদন করিলাম, তিনিও তদুত্তরে সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে আমার কথা সব শুনিয়া আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল এবং অগ্রে আমার থাকিবার ব্যবস্থার জন্য ভৃত্যবর্গকে আদেশ দিলেন। কথায় কথায় এজেণ্ট নিজ কাছারিতে আসিলেন এবং আমাকে বসিবার জন্য চৌকি

দিলেন। আমি অন্যান্য কথার পর স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাই লাম, উত্তরে তিনি আমাকে ৯টার সময় পুনরায় আসিতে বলিলেন এবং ইতি-মধ্যে আমাকে তাঁহাদের অতিথিশালায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি পূর্ব্ব-পথে ফিরিয়া আবার মঠের ভিতরে আসিলাম, এবং জিনিসপত্র অতিথিশালায় লইয়া যাইবার জন্য সঙ্গের ভৃত্যটীকে বলিলাম। ভৃত্যটী অনুগত ভাবে আমার কথামত আমার সমুদায় জিনিসপত্র লইয়া প্রধান ফটকের ভিতর দিয়া মঠের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পশ্চিমমুখে চলিল, এবং অনতিদূরে একটী সুন্দর দ্বিতল বাটীতে আমাকে লইয়া আসিল। বাটীটি দেখিয়া ভাবিলাম, আমার জন্য এখানে ভালই বন্দোবস্ত হইবে, কোন কষ্ট হইবে না। অতঃপর উপরের একটী উৎকৃষ্ট ঘরে ইস্প্রিংএর লোহার খাটের উপর আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, আমার আহারের ব্যবস্থার জন্য একটী পাচক ব্রাহ্মণের জন্য পুনরায় মঠে আসিল। আমিও ইত্যবকাশে পুনরায় এজেন্টের নিকট আসিলাম, এবং কথায় কথায় স্বামীজির বাসভবনে আসিলাম।

ক্রমশঃ।

বেদ ও বেদ্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।]

বিশ্বের ইতিহাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা সৃষ্টি, নির্নিমিত্ত, স্বতঃসৃষ্টি ও ক্রমবিকাশভেদে সাধারণতঃ চতুর্বিধ মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত চতুর্বিধবাদের মধ্যে, যথাক্রমে প্রথম তিনটি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা চতুর্থ মতটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ক্রমবিকাশবাদ।

ক্রমবিকাশবাদের অন্য এক নাম অভিব্যক্তিবাদ। উহা স্বতঃসৃষ্টিবাদের শুদ্ধী-কৃত রূপান্তর মাত্র। স্বতঃসৃষ্টিবাদে যে সমূহ মারাত্মক দোষ বিদ্যমান ছিল,

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন, ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তিবাদে তৎসমুদায়ের পরিহার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান-বিজ্ঞান-সাহায্যে পরিমার্জ্জিত হইয়া স্বতঃ-সৃষ্টিবাদ এমনই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে, অভিব্যক্তিবাদকে এখন একটি সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আবার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তনিচয়ের অবিসংবাদী বলিয়া শিক্ষিত-সমাজে উহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভেও সক্ষম হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মাত্রেই প্রত্যক্ষমূলক। সকলেই বিদিত আছেন যে, প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাসহায়েই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ নির্ণীত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ-ভূত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তনিচয়ের সহিত স্বতঃসৃষ্টিবাদের যে সকল সমাধানের ঐক্য আছে বা হইতে পারে, তত্তৎ লইয়াই অভিব্যক্তিবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। এই জন্যই অনেকে অভিব্যক্তিবাদকে, প্রত্যক্ষমূলক দর্শনসমূহের অন্তর্ভূত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বিশ্বসংসার সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তৎসমুদায়ই কি স্থূল প্রত্যক্ষসিদ্ধ?

লক্ষণ বিচার দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুরই আবার তটস্থ ও স্বরূপ ভেদে, দ্বিবিধ লক্ষণ নির্ণয় করা হয়। তটস্থ লক্ষণ (Phenomenal indications) দ্বারা এক বস্তুর সহিত পরিপার্শ্বস্থ বস্তুর সম্বন্ধ—things as they appear—প্রকটিত হইয়া থাকে, এবং স্বরূপ লক্ষণ (Transcendental indications) দ্বারা তাহার তাত্ত্বিক স্বরূপের—things as they are in themselves—জ্ঞানলাভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, তীর হইতে তরঙ্গায়িত জলধিবক্ষাবলোকনকারী ব্যক্তি যেমন কেবল নিয়তোন্মজ্জননিমজ্জনশীল তরঙ্গমালার কল্লোলাদি মাত্রই দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন, ঐ জলের শৈত্য-লবণত্বাদি গুণের অনুভবে সমর্থ হন না। কিন্তু যিনি বাহ্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তীর হইতে নামিয়া নির্ভীকচিত্তে জলধিগর্ভে অবতরণ করেন, তিনিই যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত ঐ জলের শীতলত্বাদির অনুভূতিতে আনন্দমগ্ন হয়েন, সেইরূপ দৃগ্‌ভূমির পার্থক্য-নিবন্ধন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—(স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয়)—ভেদে বিশ্বজ্ঞানের দ্বৈবিধ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের এই দ্বৈবিধ্য হেতুই বিবেক জ্ঞান সাধনোপায় সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে দুইটি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

প্রত্যক্ষবাদিগণ বলেন, ভূত, ভৌতিক পদার্থ, পরমাণু শক্তি প্রভৃতি বলিতে

আমরা যাহা বুঝি, তাহা আমাদের মানস বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরিজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মিল, হিউম, ফিক্স্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উত্তর করেন, পদার্থে প্রকৃত স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই না, তবে নিত্য-বেদনাজনন-সামর্থ্যকেই (Permanent possibilities of sensations কেই) আমরা পদার্থরূপে স্বীকার করিয়া থাকি। সন্দিগ্ধবাদী Spencer বলিয়াছেন—"Thus we are brought to the conclusion that what we are conscious of as properties of matter even down to its weight and resistance are subjective affections produced by objective agencies that are unknown and unknowable"—(Psychology, vol 1. p. 20)—অনন্তর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জড়ের ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা বহিঃস্থিত অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত-পদার্থ-সমুৎপাদিত আমাদের মানস বিকার মাত্র,—এমন কি, জড়ের গুরুত্বাদি ধর্ম্মও তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিশ্চয়বাদী কম্‌টে (Positivist Comte) বলিয়াছেন, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানলাভ মানবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বাহ্যার্থের পরোক্ষমূলক স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব বোধে মিল, হিউম, কম্‌তে প্রভৃতি পণ্ডিত প্রবরেরা তদ্‌জ্ঞানার্জ্জনকে উপেক্ষা করিয়া 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'—প্রত্যক্ষ-লব্ধ জ্ঞানদ্বারা বিশ্ব-কার্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কালাবচ্ছিন্ন সংবেদনাত্মক বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হইতে জ্ঞান-সামান্যে আরোহণক্রমে, অখণ্ডদণ্ডায়মান চিরবিদ্যমান দ্রষ্টার চিত্তে বিশ্বসংসারের ছায়া কিরূপ পতিত হইবে, ইতিহাস ও জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা তন্নিরূপণের চেষ্টাই করিয়া থাকেন। কিন্তু এবম্বিধভাবে বিশ্বচিত্র অঙ্কিত করা এবং বিশ্বের সহিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের সন্নিকর্ষজনিত সংবেদনপুঞ্জ (Clusters of possible sensations)কেই জগৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করা—উভয়ই সমান কথা। সমান কথা হইলেও সংশয়াত্মা হিউম (Hume) ও মিল (J. S. Mill) এবং নিশ্চয়াত্মা কম্‌তে (Comte, the positivist) তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু তটস্থ-লক্ষণ-সাহায্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে বিশ্বচিত্রের রেখাপাত করিবার জন্য সন্দিগ্ধবাদী পণ্ডিত স্পেন্‌সার (H. Spencer) সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবরের "সংশ্লেষণাত্মক দর্শন" (synthetic philosophy) শিক্ষিত-সমাজে এইজন্যই বিশেষ আদরণীয়। এই দর্শনে বিশ্বকার্য্য কিরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—যথাসময়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এক্ষণে আমরা উক্ত প্রসিদ্ধ দর্শন শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয়মাত্র দানেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

সংশ্লেষণাত্মক দর্শন or The Synthetic Philosophy.

পণ্ডিত স্পেন্সারের "সংশ্লেষণাত্মক দর্শন" (Synthetic Philosophy)—'মূলতত্ত্ব' (First Principles) প্রভৃতি চারিটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভক্ত ও সমাপ্ত। তন্মধ্যে—

১। **'মূলতত্ত্ব'** (First Principles) নামক প্রথম গ্রন্থে ভূত, কর্ম্ম ও শক্তি সাতত্যের (Matter, motion and persistence of Force) ইন্দ্রিয়গম্য আকৃতিপ্রকৃতি জড়বিজ্ঞান-সাহায্যে অবধারিত হইয়াছে এবং দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত পদার্থসমূহের নৈহারিক অবস্থা হইতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে রবি-সোমাদি-গ্রহ-বিভূষিত বিশ্বজগৎ কিরূপে আবির্ভূত ও তিরোভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

২। **'জীবতত্ত্ব'** (Prin of Biology) নামক দ্বিতীয় গ্রন্থে দিগন্ত-ব্যাপী অপ্রাণ নীহারসমুদ্র হইতে সমুৎপন্ন পিণ্ডীভূত গ্রহসমূহের ক্রমশীতলতা-নিবন্ধন কাঠিন্যপ্রাপ্তির সহিত তাহাদিগের মধ্যে কিরূপে জৈবসৃষ্টির আদ্যাবস্থারূপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোলাকার প্রাণপঙ্কের (Protoplasm) আবির্ভাব হয় এবং তৎ-প্রাণপঙ্কের অবিরাম সংবিভাগ সংযোগক্রমে অবনীতলে অতি নিম্নতম জীব হইতে বিবিধ জাত্যন্তরক্রমে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর উচ্চতম জীববৃন্দের উৎপত্তি কিরূপে হইয়া থাকে, তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩। **'মনস্তত্ত্ব'** (Prin: of Psycholgy) নামক তৃতীয় গ্রন্থে মননের মূলীভূত সন্তোষ, অসন্তোষ, সুখদুঃখাদির অনুভূতির সহিত নিম্নতম জীবের মন হইতে কিরূপে বিবিধ-বৃত্তি-সমন্বিত মানব-মনের ক্রমবিকাশ হয় এবং তাহা পুনরায় ইচ্ছা, ভাব, ভাবনা, প্রযত্ন, সঙ্কল্পাদি বৃত্তির ক্রমস্ফুরণের সহিত কিরূপে উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

৪। **'সমাজতত্ত্ব'** (Prin· of Sociology) নামক শেষ গ্রন্থে পণ্ডিত স্পেন্সার দেখাইয়াছেন—মানসিক ক্রমপূর্ণতার সহিত যোগ্যতম হইয়া জীবন-সংগ্রামে আপন আপন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার অবিরাম চেষ্টার ফলে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অতীব অসভ্য জনমণ্ডলী হইতে দেশকালপাত্রভেদে কিরূপে বিবিধ ধর্ম্ম, রীতিনীতিপূর্ণ বিবিধ-শাসনপদ্ধতি-বিশিষ্ট বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত "মূলতত্ত্ব" প্রভৃতি চতুর্বিবধ গ্রন্থে 'সংশ্লেষণাত্মক দর্শন' সুপ্রকটিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ উক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়ে প্রকটিত দর্শনের 'সংশ্লেষণাত্মক' নাম হইবার

কারণ এই যে, সংশ্লেষণ (Synthesis)ই এতদ্দর্শনের আত্মা বা মূল ভিত্তি। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সংশ্লেষণই জ্ঞানের প্রভব। বিশেষের সংশ্লেষণে—বিশেষ হইতে সামান্যের আবিষ্করণে সামান্য জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। বিশ্বের ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তাশীল স্পেন্সার প্রধানতঃ এই সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার কল্পিত দর্শনকে সংশ্লেষণাত্মক নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অস্মদাদির ন্যায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি-সম্পন্ন অথণ্ড দণ্ডায়মান আত্মতত্ত্বদর্শীর হৃদয়পটে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতিভঙ্গের ছায়া কিরূপ নিপতিত হইবে, পণ্ডিত স্পেন্সার দেশকালাবচ্ছিন্ন জ্ঞানবিশেষের সংশ্লেষণে অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানসামান্যে আরোহণ-ক্রমে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ কাহাকে বলে?

বিশ্বের ক্রমবিকাশবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া স্পেন্সার যথাযথ ভাবে না হউক, অনেকতঃ বৈজ্ঞানিকদিগের নৈহারিক সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সাম্যাবস্থায় বৈষম্য প্রাপ্তিকে অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থাপ্রাপ্তিকে সূক্ষ্মের স্থূলভাব প্রাপ্তিকে, অপরিচ্ছিন্ন অবিশেষ হইতে দেশকালাদিপরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষের উৎপত্তিকে স্পেন্সার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ বলিয়াছেন। অণুপরমাণুবিরচিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থ আমরা এই সংসারে দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই, প্রত্যক্ষপর ক্রমবিকাশ-বাদীর মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে স্বগতাদি ভেদ-বিরহিত এক অবিশেষ সাম্যাবস্থায় বিরাজমান ছিল। তখন রবি শশী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহাদি অথবা অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাদি নক্ষত্র কিছুই ছিল না। সমস্তই তখন অন্তর্ব্বাহ্য-শূন্য ভাব-বিকার-রহিত সমন্তাৎ ব্যাপ্ত বাষ্প বা নীহার-ভাবাপন্ন ছিল। যে সমূহ ভূতাদি হইতে বিবিধ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি-বিভূষিত পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার উদ্ভূত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই উক্ত অন্তর্ব্বাহ্যভেদ-পরিশূন্য অনন্ত-বিস্তৃতি-গত অবিশেষভূত এক সলিল বা বাষ্পময় পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাববিকার ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কোন কারণ বশতঃ স্বগতাদি-ভেদ-রহিত সমন্তাৎ ব্যাপ্ত বাষ্পময় পদার্থের বিকার আরম্ভ হয়। অবিরাম এই বিকারক্রম হইতেই বিবিধ-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-বিমণ্ডিত পরিদৃশ্যমান এই সৌর জগতের আবির্ভাব হইয়াছে।

সাম্যাবস্থায় স্থিত সলিল-নীহার বা বাষ্পময় অণুপরমাণু-সমূহই বিশ্বকার্য্যের উপাদানকারণ। কিয়ৎকাল পরে সমন্তাৎ ব্যাপ্ত অবিশেষভূত বাষ্পময় অণুপরমাণু-সমূহের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে—অণুপরমাণু সকলের গতি বা কর্ম্মারম্ভ হয়। সাম্যাবস্থায় স্থিত অণুপরমাণু সকলের সহসা গতি বা কর্ম্মোৎপত্তির কারণ কি?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, দ্রব্য স্বয়ংই কর্ম্ম বা গতির উৎপত্তির কারণ, ইহা নিজ আত্মভূত শক্তির সাহায্যে কর্ম্ম করিয়া থাকে। শক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে ইঁহারা বলেন, কারণের কর্ম্ম-নিষ্পাদন-ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলিয়া থাকি। দ্রব্য ক্রিয়া নিবর্ত্তকত্ব (activity) ও কারণত্ব (causality) এই দ্বিবিধরূপে আমাদের বুদ্ধিগম্য হইয়া থাকে। জড়কণা মাত্রেই, আকর্ষণবিপ্রকর্ষণভেদে দ্বিবিধ ধর্ম্ম-বা-শক্তিসম্পন্ন। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ ধর্ম্ম-নিবন্ধনই অণুপরমাণু সকলের গতি বা কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগগ্রহণাত্মক। গতি আপেক্ষিক অবস্থানেরই বিচ্যুতি। এক বস্তু ত্যাগ করিয়া দ্রব্যান্তর গ্রহণকেই কর্ম্ম বলে। এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনেরই নাম গতি (motion)। গতির মাত্রাকে 'বেগ' (velocity) বলে। গতি যদি বাধিত না হয়, তবে স্বভাবতই সরল রেখানুপাতে ঘটিয়া থাকে; বিরুদ্ধ শক্তিকর্ত্তৃক বাধিত হইলেই ইহা ক্রমশই দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া বক্রভাব ধারণ করে। মল্লদ্বয়ের ন্যায় যদি দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে অনুক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহারা চক্রগতিতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানপাঠে আরও জানা যায় যে, শীতলতাপ্রাপ্তির সহিত বস্তু মাত্রেই সংকুচিত হইয়া থাকে। যদি কোন সচল বস্তু ক্রমশই শীতল হইতে থাকে, তবে তাহার সংবেগ গতির মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বিশ্বের বিকাশ কালে বিশ্বতোব্যাপ্ত পরমাণু সকলের কর্ম্মারম্ভ হইয়া থাকে। পরমাণু মাত্রেই দ্বিবিধ ধর্ম্মাত্মক বলিয়া তৎসকলের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব হয়। আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরমাণু সকল কেন্দ্রাভিমুখে চালিত হয় এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তির আধিক্যে কেন্দ্র হইতে দূরে অপসৃত হইয়া থাকে। আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, ইহারা দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধশক্তি; সুতরাং উভয়ই নিরন্তর প্রতিহত হইলে গাণিতিক নিয়মানুসারে সমগ্র নীহার সংঘাত যে অবিরাম চক্রগতিতে ঘুরিতে থাকিবে, তাহা বিজ্ঞানসিদ্ধ, অপিচ অত্যুষ্ণ নীহার-সংঘাতের উত্তরোত্তর শীতলতা প্রাপ্তির সহিত ইহার চক্রগতির সংবেগ যে ক্রমশই বৃদ্ধি হইবে, তাহাও বিজ্ঞানানুমোদিত। বিজ্ঞান আরও বলিয়াছেন, ক্রমসংকোচশালী ঘূর্ণায়মান বস্তুর সংবেগের বৃদ্ধি হইলে তদুপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জবিশেষের বিপ্রকর্ষণীশক্তির বল-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং ক্রমসংকোচশীল দ্রুত ঘূর্ণমান নীহার সংঘাতের চক্রগতির বেগ বৃদ্ধির সহিত তদুপাদানভুক্ত পরমাণুপুঞ্জবিশেষের বিপ্রকর্ষণীশক্তির বলবৃদ্ধি হেতু, আকর্ষণীশক্তিকে অভিভূত করিয়া তাহার অংশ-বিশেষ যে বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে নিপতিত হইবে, তাহা বেশ সহজেই অনুমান করা

যাইতে পারে। এইজন্যই বৃহস্পতি শুক্রাদিগ্রহসমূহ অথবা অশ্বিনী রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্র-নিচয় সকলই, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে সমন্তাৎ ব্যাপ্ত দ্রুতবিঘূর্ণিত মূলনীহার-সংঘাতের বিচ্ছিন্ন অংশ ব্যতীত অপব কিছুই নহে। মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নিয়ম-সাহায্যে, পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, মূল সংঘাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পতিত হইলেও, গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি নীহারপিণ্ডসকল কেহই কাহারও সংস্পর্শে আইসে না—সকলেই মূল পিণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আপনাপন অক্ষরেখায় চক্রগতিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপেই সৌর-জগতের ক্রমবিকাশ হইযাছে। আমাদের আবাস-মন্দিব মাতৃস্বরূপিণী মেদিনীও অপবাপর গ্রহাদিব মূল সঙ্ঘাত হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া, মাধাকর্ষণ শক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া, অদ্যাপিও তাহাকে বেষ্টন করিয়া আপন অক্ষরেখায় ভ্রমণশীলা। বৈজ্ঞানিকেবা বলিয়া থাকেন, কালে এই সকল গতিবিধিব যে শান্তি আছে, তাহা স্থির। স্পেন্সার বলিয়াছেন, সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, এই সকল গতি-বিধিব পবিসমাপ্তি হইবে। জ্যোতির্বিদেবাও এবিষয়ে নানা কল্পনাব অবতাবণা করিয়াছেন।

স্পেন্সাব বলেন, নীহারপিণ্ডসকল অত্যুষ্ণ মূল সংঘাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—দূরে পতিত হইলেও, তাহারা যে একেবারে জমাট্ বাঁধিযা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। জমাট্বন্ধন ক্রম-পবিণাম-প্রসূত। ভূমণ্ডলও ঠিক তন্নিয়মাধীন। স্পেন্সাব বলেন, আমাদের আবাসমন্দির মেদিনী, মূলীভূত পদার্থ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া একেবাবে যে বর্ত্তমান কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কল্পনা কবা যায় না। বিবিধ নদনদীগিরি-বিভূষিতা শস্যশ্যামলা আমাদের জননী মেদিনীর বর্ত্তমান রূপশ্রী বহুকালব্যাপী ক্রমপবিণাম-প্রসূত। পণ্ডিত বলিযাছেন, দর্শন ও পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অত্যুষ্ণ সলিলময অবস্থাই মেদিনীব আদ্যরূপ, অর্থাৎ আদিপর্ব্বে আমাদের মা-জননী মেদিনী সর্ব্বত্র সলিলময়ী নারায়ণী ছিলেন। পবে তাঁহার রূপভেদ ঘটে—যুগধর্ম্মানুসাবে তাঁহার বিবিধ রূপের আবির্ভাব হয। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জীবমাত্রের ভোগমোক্ষদায়িনী আমাদের জননীর বর্ত্তমান যে চিত্তবিমোহিনী বিপুল রূপশ্রী, তাহা সেই বহুকালব্যাপী, যুগধর্ম্মানুসারে বিবিধ রূপান্তরপ্রাপ্তিব সমষ্টিভূত ফলমাত্র।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

Epistles of Swami Vivekananda, Second edition, Revised and Enlarged, with additional extracts অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা।

এই সংস্করণে স্বামী বিবেকানন্দের ১২ খানি ইংরাজী পত্র, ১ খানি সংস্কৃত পত্রের দেবনাগর অক্ষরে মূল ও ইংরাজী অনুবাদ এবং ৪ খানি বাঙ্গালা পত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণ হইতে এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে একখানি নূতন পত্র সংযোজিত, অন্যান্য পত্রগুলিতে পূর্ব্বসংস্করণের পরিত্যক্ত অনেক অংশ পুনঃসংযোজিত, সংস্কৃত পত্রখানির এবং অন্যান্য সমুদয় পত্রের মধ্যে উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশসমূহের দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত এবং স্বামীজির ইংরাজী হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে পুস্তকের আকার কিঞ্চিৎ বাড়িলেও মূল্য পূর্ব্ববৎই আছে।

স্বামীজির পত্রাবলির পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র। উদ্বোধন-পাঠকগণ উহার পরিচয় অনেক দিন হইতে পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী পড়িতে জানেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বামীজির মূল ইংরাজী পত্রগুলি পড়া উচিত। স্বামীজির বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, ধর্ম্মবিষয়িণী অন্তর্দৃষ্টি, প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা এই পত্রাবলির ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। তদ্ব্যতীত, কিরূপে তিনি আমেরিকা যাইলেন, কিরূপে ঘোর দুঃখকষ্ট বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের জয়-ঘোষণা করিলেন, তাহা পাঠক এই পুস্তিকায় স্বামীজির নিজ লেখনী হইতে বিবৃত দেখিতে পাইবেন। আমরা প্রত্যেক ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

Swami Abhedananda's Lectures and Addresses in India. অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০।

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় প্রায় দশ বৎসর প্রচারকার্য্যের পর বিগত ১৬ই জুন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বোয় পদার্পণ করিয়া তথা হইতে ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানেই তত্তন্নগরবাসিগণ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। এই সকল অভ্যর্থনা ও ভ্রমণের বিবরণ এবং সমগ্র বক্তৃতার সংগ্রহ-পুস্তক এই প্রথম একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমাদের সকলেরই তাঁহার কথা নিশ্চিত মনে দৃঢ়ভাবে জাগরূক আছে। এই গ্রন্থপাঠে ভারতবাসী ধর্ম্মের কিরূপ আদর করিয়া থাকে এবং দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মকেই যে তাহার মূল ভিত্তি করা উচিত, ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে।

পরলোক-রহস্য। শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সহজ ভাষায় আধুনিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার নূতন প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতেও তাহার পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম। পরলোকতত্ত্ব অতি জটিল। ও সম্বন্ধে নানাজনে নানাবিধ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের তৎসম্বন্ধে যথার্থ কি অভিপ্রায়, এবং তাহা কতদূরই বা যুক্তিসহ, কিরূপ প্রমাণ-সমূহ দ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব কতকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতে পারে,এই সকল বিষয় যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

একটী বিষয়ে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। এই পুস্তকের সংস্কৃত উদ্ধৃতাংশগুলির অনুবাদে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বোধ হয় ততটা মনোযোগ দেন নাই। যদিও আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া ভাবানুবাদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে মূলেরঅর্থের বিষম গোল হইয়াছে। ৮১ পৃষ্ঠায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের কিয়দংশ ও উহার ভাবানুবাদ পড়িলে আমাদের মন্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। আশা করি, বেদান্তবাগীশ মহাশয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সময় ঐ ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিবেন।

এই একটু আধটু দোষ সত্ত্বেও পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমরা আদ্যোপান্ত আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়াছি। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিচার-

প্রণালী অতি সুন্দর। উহা দ্বারা পাঠকের মনে একটা জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া দেয় এবং প্রণিধানের ইচ্ছা স্বতঃই হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়।

আমরা আশা করি, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বেদান্তের স্থূল মর্ম্ম সকল যাহাতে বাঙ্গালী সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবেন এবং বেদান্ত-সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়গুলির এক একটী বলিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বঙ্গদেশে বেদান্তচর্চ্চার সহায়তা করিবেন।

Modern India by Swami Vivekananda. (Himalayan Series). মূল্য ।• আনা। প্রবুদ্ধ ভারত আফিস, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত।

ইহা উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের "বর্ত্তমান ভারত" নামক প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ। বাঙ্গালা ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের ইহা পাঠে অত্যন্ত উপকার দর্শিবে।

শ্রীশ্রীরাসলীলা, ব্রহ্মতত্ত্ব, A Pilgrimage to Sri Vrindaban. বাঁকিপুর-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র অধুনা স্বামী ব্রহ্মানন্দ নাম ধারণ করিয়া উক্ত গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল্য যথাক্রমে ১৲, ॥• এবং ॥• আনা।

কনখল রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সপ্তম বার্ষিক রিপোর্ট (জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর ১৯০৮) আমাদের হস্তে আসিয়াছে। উহা পাঠে জানা যায় যে, তথাকার কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ বৎসরে সেবাশ্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০০২টী রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭৯১৪ জন ঔষধ লইয়া গিয়াছে এবং ৮৮ জনকে আশ্রমে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি দ্বারা সেবা করা হইয়াছে। যাহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৯২৭ জন সাধু এবং ৬৯৮৭ জন গরিব গৃহস্থ। প্লেগ, কুষ্ঠ, ওলাউঠা ও বসন্ত ইত্যাদি রোগও চিকিৎসিত হইয়াছে। উক্ত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ আয়, ২১১২॥৯½ পাই এবং মোট খরচ, ১১৫৮॥৵৩½ পাই ; হস্তে বাকি—৯৫৩৸৵৬ পাই।

যাঁহারা এই আশ্রমে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা স্বামী কল্যাণানন্দ রাম-কৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, জিলা সাহারাণপুর ঠিকানায় সাহায্যাদি পাঠাইবেন।

বহুবাজার রামকৃষ্ণ-সমিতি-অনাথভাণ্ডারের চতুর্থ বার্ষিক (১৯০৮) রিপোর্টে প্রকাশ যে, এ পর্য্যন্ত ১৮টী অনাথ এই আশ্রমে স্থান পাইয়াছে এবং ভাণ্ডার হইতে ৩৮ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ঐ বৎসরে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আয়, ৪৯৮৬৸০ ; খরচ, ১৮০৭৷৷৫ ; হস্তে মজুত ৩১৭৯৶১৫।

চাতরা ভক্তাশ্রমের পঞ্চম বাৎসরিক (১৩১৪) কার্য্যবিবরণী পাওয়া গিয়াছে। অতি মহৎ কার্য্য হইতেছে, সন্দেহ নাই। যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল।

বৈদ্যনাথ রাজকুমারী-কুষ্ঠাশ্রমের ১৯০৮ সনের রিপোর্টে দেখা গেল যে, ২৯টী রোগী ঐ বৎসর আশ্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কুষ্ঠব্যাধি আরাম করা কি সুকঠিন এবং দুরূহ কার্য্য তাহা সহজেই অনুমেয়। আশ্রমটী উক্ত কার্য্যে এতদূর ফল দেখাইতে পারিয়াছে, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। এই সদনুষ্ঠানে সাহায্য করা যে সর্ব্বসাধারণেরই কর্ত্তব্য, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

সংবাদ।

স্বামী অভেদানন্দ গ্রীষ্মাবকাশে আমেরিকা হইতে আসিয়া লণ্ডন বেদান্ত-সমিতিতে গত ৯ই মার্চ্চ হইতে প্রতি মঙ্গলবার বৈকাল ৫৷৷০ ঘটিকায় ভগবদ্গীতা, প্রতি বৃহস্পতিবার ৫৷৷০টায় রাজযোগ এবং প্রতি শুক্রবার দ্বিপ্রহরে মনের একাগ্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

ভারতের-জগতের কি পবিত্র দিন,
যে দিন নদিয়া ধামে তাপস নবীন,
জীবের মলিন দশা করি নিরীক্ষণ,
পরিলেন বহির্ব্বাস, কুঙ্কুম চন্দন
কোথায় রহিল পড়ি, উচ্চে শচীমাতা
বিদীর্ণ বক্ষের তাঁর তপ্ত ব্যাকুলতা,
প্রকাশিল আর্ত্তনাদে; বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
কপালে কঙ্কণ মারি পড়িল মূর্চ্ছিয়া
ধূলি-ধূসরিত-দেহা। প্রতি ঘরে ঘরে
উঠিল করুণ স্বর, না চাহিয়া ফিরে,
আনন্দে চলিল গোরা সহ সঙ্গিগণ,
সুধাময় হরিনামে ধরণী গগন
করি মরি বিপ্লাবিত। সুগৌরাঙ্গ কায়,
প্রতিভা ও মহিমার সৌন্দর্য্য-রেখায়
উদ্ভাসিত মুখ-ইন্দু, কান্ত-দরশন,
নিন্দি নব নীলোৎপল যুগল লোচন
ঈষৎ প্রেমেতে আর্দ্র,; ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
বিশ্ব প্রেমে মাতোয়ারা, আপনারে ভুলি,
গায় গোরা হরিনাম, বলে "আয় আয়
ওরে ক্লান্ত ওরে শ্রান্ত দুঃখ দীনতায়
ফেলিস্ না দীর্ঘশ্বাস, বল্ একবার
সুধাময় হরিনাম, যম-যন্ত্রণার
একমাত্র মহৌষধি।"

সংখ্যাতীত প্রাণ,
শুনিয়া সে সুগম্ভীর করুণ আহ্বান,
ছুটীয়াছে দলে দলে। জাতিভেদ নাই
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে মিলি একত্রে সবাই

ভাসিয়াছে এক স্রোতে, সবে মাতোয়ারা,
প্রেমের বন্যায় যেন পরিপ্লুত ধরা।
গায় পাখী হরিনাম, বৃক্ষ বলে হরি,
আবালবনিতাবৃদ্ধ লুটাইয়া মরি,
হরি ব'লে কেঁদে সারা, হরিবোল ধ্বনি
উঠিয়াছে জলেস্থলে, জাহ্নবী আপনি
মৃতসঞ্জীবনী সুধা করিয়া বহন,
প্লাবিয়া দুকূল করে নাম-সংকীর্ত্তন।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি, শিখরে শিখরে
স্তম্ভিত ভূধরব্রজ প্রতিধ্বনি করে
সেই সুধাময় নাম, প্রান্তরে কাননে,
নগরে নগরে গ্রামে প্রাসাদে অঙ্গনে
শুধু মাত্র হরিনাম, কিছু নাই আর,
বিশ্ব যেন ত্রস্তে জিহ্বা করিয়া বিস্তার
পিয়িছে সে সুধারাশি, জননীর কোলে
চমকি কাঁদিছে শিশু হরি হরি ব'লে।

যবে মনে আসে,
হে গৌরাঙ্গ, তব রাঙ্গা চরণ পরশে,
পবিত্র এ বঙ্গভূমি, ধন্য হয় হিয়া,
যেন আমি অতীতের আঁধার ভেদিয়া,
পড়ি ওই পদমূলে, দিব্য চক্ষে দেখি,
আমার মতন কত অধম পাতকী,
ধূলি-ধূসরিত-দেহ, তুমি তা সবায়
সুমধুর স্বরে ডাকি বল "আয় আয়
যত পাপী, যত তাপী, আমি দিব কোল;
বল্ তোরা প্রাণ ভরি হরি হরি বোল।"
কি প্রাণ মাতান কথা, কি হৃদি উদার,
কি গভীর বহে বক্ষে প্রেম-পারাবার,

অনন্ত অতলস্পর্শ ; সেই সিন্ধুনীরে,
একবার যে নেমেছে, সে কি চাহে ফিরে
উঠিবারে কূলে আর ?

চক্ষে আসে জল,
সে পূত বৈষ্ণবধর্ম্ম পাষণ্ড সকল.
করিয়াছে কি ঘৃণিত ; ওই দেখ আজি,
তুলসীর মালা গলে লম্পট বাবাজী,
রসকলি পরা নাকে সেবা-দাসী সাথে,
সর্ব্ব অঙ্গে ছাপ মারা, দীর্ঘ শিখা মাথে
বারুণী-সেবনে রত। পতিতা রমণী
কোথা না আশ্রয় পেয়ে কুল-কলঙ্কিনী
অবশেষে লয় ভেক, হায়, ধর্ম্ম-ভাণে
কত না কুক্রিয়া-রাশি অতি সংগোপনে
হইতেছে সম্পাদিত।

এ সময় তুমি
হে সখে, হে প্রিয়তম, হৃদয়ের স্বামি,
এস ওগো একবার, পুন পাপ-ভারে
প্রপীড়িতা বসুন্ধরা ; তেমনি সুস্বরে,
মাতাও জগৎ পুন বলি হরি হরি ;
বিশুষ্ক তরুতে পত্র উঠুক মঞ্জরি
নবরসে ডগমগি ; মোর ক্ষুদ্রপ্রাণ
তব কৃপাসিন্ধু মাঝে হোক ভাসমান
অপূর্ব্ব হিল্লোলে কান্ত ; দাও হৃদে বল
পাই যেন শেষে রক্ত চরণ-কমল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শান্তি-সুধা।

['ব' লিখিত।]

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নির্লিপ্ত সংসারী।

শিষ্য——প্রতিদিন সংসারের চিন্তা মনে জাগে যার,
কেমনে হইবে প্রভো, সাধন ভজন তার?

রামকৃষ্ণ——তোমাকে সংসার মাঝে পাঠালেন যিনি,
নিশ্চয় তোমার খাদ্য রেখেছেন তিনি।
সন্তান হইবে ব'লে বিভু দয়াময়
জননীর স্তনে দেন দুধ সুধাময়।

শিষ্য——কিন্তু প্রভো, মোহময় যদিও সংসার,
যে ছাড়িতে নাহি পারে উপায় কি তা'র?

রামকৃষ্ণ——সংসার-সাগরে ভাস ক্ষতি নাই তায়,
মোহজল মনতরী যেন না ডুবায়।

হাতে তেল মেখে কেউ ভাঙ্গিলে কাঁটাল,
নাহি লাগে হাতে তার আঠার জঞ্জাল।

পরশমণিরে ছুঁয়ে সোণা যদি হয়,
লোহা আর না হইবে যেথানেই রয়।

কাঁচা মাটি সদা মিশে কাঁচা মাটি সনে,
পোড়ামাটি তার সনে মিশিবে কেমনে?

দুধে আর জলে হয় সতত মিলন,
জলেতে মাখন কিন্তু মিশে না কখন।

কাঁচা মন ভুলে যায় সংসার-মায়ায়,
পাকা মন কভু তাতে মিশে নাহি যায়।

ডোবাতে নামিলে হাতী উছলিয়া পড়ে জল,
সাগরে নামিলে হাতী বহে তাহা অচঞ্চল।
সাগর সমান হয় নির্লিপ্ত যে জন,
গেড়ে ডোবা সম দেখ সকামীর মন।

জলে স্থলে নানাস্থানে কচ্ছপ বেড়ায়,
মনটি তাহার কিন্তু ডিমেতে—আডায়।
সংসারের সব কায করিও সাধন,
কিন্তু ঈশ্বরেতে সদা থাকে যেন মন।

ভালবাস ক্ষতি নাই নিজ পরিজনে,
কেহই তোমার নয় রাখিও স্মরণে।
বড় মানুষের বাড়ী দাসী কায করে,
নিজের বাড়ীতে তার মন আছে প'ড়ে।
কর্ত্তার ছেলেকে বলে 'গোপাল আমার,'
মনে স্থির জানে কিন্তু ছেলে নয় তার

বেঙাচি যাবত লেজ খ'সে নাহি যায়,
তাবত না পাবে কভু উঠিতে ডাঙ্গায়।
অবিদ্যা হইলে দুর সেইমত নরে
সংসার ছাড়িয়া পারে যাইতে ঈশ্বরে।

দুই মণ বোঝা মাথে তবু দেখে বর,
সেই মত সংসারীরা ভজিছে ঈশ্বর।
অলস ডাকে তায় তুষ্ট বিভু সে কারণ
বীর যেই সেই পাবে করিতে এমন।
বাউল বাজায় বাদ্য মুখে করে গান,
কর সংসারের কায রেখে তাঁয় প্রাণ।

ছুতরের পত্নী যথা ধান সিদ্ধ করে
বাঁ হাতে উননে পুনঃ কাঠ দেয় ভ'রে
স্বামী-সনে সংসারের কথা বলে মুখে,
ভগবানে মন রেখে কায কর সুখে।

যেমন পাঁকাল মাছ সদা থাকে পাঁকে,
এক ফোঁটা পাঁক তার গায় নাহি থাকে ;
তেমতি সংসারে থাকি কোন কোন নর
নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে ভজিছে ঈশ্বর।

পানকৌড়ী অবিরত জলে ডুব মারে,
জল নাহি থাকে গায় যেই পাখা ঝাড়ে ;
ঈশ্বর-প্রেমিক তথা জ্ঞান-পাখা নাড়ি
সংসারের মায়া-লেখা সদা ফেলে ঝাড়ি।

নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কায করে,
কিন্তু উপপতি-চিন্তা সতত অন্তরে ;
সেরূপ সকল কায করিও সাধন,
ঈশ্বরেতে অনুক্ষণ থাকে যেন মন।

মৌমাছি কুসুমে বসি করে মধুপান,
সাধক সংসারে বসে, হরিরসে প্রাণ।

রন্ধনাদি সংসারের যত কায করে
কিন্তু স্বামী-পদে মন সদা আছে প'ড়ে ;
এরূপ স্বাধ্বীর মত থাকিয়া সংসারে,
কর কায, কিন্তু সদা চিন্তিও তাঁহারে।

কলসী উপরে রাখি কলসী অপর,
শিরে তুলি জল নিয়ে মেয়ে যায় ঘর।
পথি মাঝে সখি সনে গান গল্প করে,
হাত নেড়ে চলে যায় জল নাহি পড়ে।
এই মত সংসারেতে যত কায কর,
হরিপাদপদ্মে কিন্তু চিত্ত সদা ধর।

সংসারের চিন্তারাশি তারে নাহি ধরে,
একান্ত নির্ভর যেবা বিভুপ্রতি করে।

বহু ঘুড়ি উড়ে, তা'র দু'একটা কেটে যায়,
অনেকে সাধন করে, কেহ কেহ মুক্তি পায়।

লক্ষ লক্ষ লোক মাঝে
একটী জনক হয ;
নির্লিপ্ত জনক সম
ক'জন সংসারে রয় ?
এরূপ নির্লিপ্ত ভাবে
যেবা থাকে এ সংসাবে
মায়া মোহ শোক তাপ
তারে নাহি ছুঁতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

চিকাগো,
২৩ শে জুন, ১৮৯৪।

রায় বাহাদুর নরসিংহাচার্য্য—

প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমাকে বরাবর যে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমি আপনার নিকট একটী বিশেষ অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। মিসেস্ পটার পামার যুক্তরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা মহিলা। তিনি মহামেলার স্ত্রীসভা-পতি ছিলেন। তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থাব যাহাতে উন্নত হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী এবং একটী খুব বড় স্ত্রীলোকদেব সভার অধ্যক্ষ। তিনি লেডি ডফরিণের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহাব ধন ও পদমর্য্যাদাগুণে ইউরোপের রাজগণের নিকট হইতে অনেক অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। তিনি এদেশে আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি চীন, জাপান, শ্যাম ও ভারতে সফরে বাহির হইতেছেন। অবশ্য ভারতের শাসনকর্ত্তারা এবং বড় বড় লোকেরা তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আমাদের সমাজ দেখিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক। আমি অনেক সময় তাঁহাকে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য

আপনার মহতী চেষ্টার কথা এবং মহীশূরে আপনার আশ্চর্য্য কলেজের কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় আসিলে ইঁহারা যেরূপ যত্ন ও আতিথ্য-সৎকার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ এই-রূপ ব্যক্তিদিগকে একটু আতিথেয়তা দেখান কর্ত্তব্য। আমি আশা করি, আপ-নারা তাঁকে সাদর অভ্যথনা করিবেন ও আমাদের স্ত্রীলোকদের যথার্থ অবস্থা একটু দেখাইতে সাহায্য করিবেন। তিনি মিশনরি বা গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান নহেন— আপনি সে ভয় করিবেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধী মতামতের বিবাদে প্রবিষ্ট না হইয়া তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাই করিতে চান। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে এইরূপে সহায়তা করিলে এদেশে আমাকেও অনেকটা সাহায্য করা হইবে।

ভবদীয় চিরস্নেহাস্পদ

বিবেকানন্দ।

(২)

২৩ শে অক্টোবর, '৯৪।

ভিহিমিয়া চাঁদ, লিমডি—

আমি এদেশে বেশ ভাল আছি। এতদিনে আমি ইহাদের নিজেদের আচার্য্যগণের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহারা সকলেই আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করে। সম্ভবতঃ আমি আগামী শীতে ভারতে ফিরিব। আপনি বোম্বাইএর মিঃ গান্ধিকে জানেন কি? তিনি এখনও চিকাগোতেই আছেন। কিন্তু ভারতে যেমন আমার অভ্যাস ছিল, এখানেও সেইরূপ আমি সমস্ত দেশের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। প্রভেদ এইটুকু যে, এখানে উপদেশ দিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত আমার কথা শুনিয়াছে। এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রভু সর্ব্বত্রই আমার যোগাড় করিয়া দিতেছেন।

বিবেকানন্দ।

ধর্ম্মবিরোধ-ভঞ্জনের কয়েকটী উপায়।

[স্বামী শুদ্ধানন্দ।]

ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী ধর্ম্ম—সমাজে রাজত্ব করিতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বহু ব্যক্তি আপনাকে এক এক বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। আরো বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মের নানাবিধ শাখা রহিয়াছে—বিশেষতঃ, হিন্দুধর্ম্মের এত বিভিন্ন শাখা ও উহাদের মত ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সকল এত পৃথক্ পৃথক্ যে, হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া একটী সাধারণ সামগ্রী আছে কি না, তদ্বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত আধুনিক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম, দেবধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, থিওজফি প্রভৃতি নূতন নূতন ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-সমাজের অভ্যুদয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসংখ্যা এত বেশী বাড়িয়াছে যে, ধর্ম্মপিপাসু নবীন সাধকের গোলকধাঁধা লাগিয়া যায়। তাহার মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উদয় হয়, কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিব—কোন্ ধর্ম্ম আমাকে যথার্থ সত্যপথে লইয়া যাইবে—কোন ধর্ম্মে আমি প্রকৃত শান্তি লাভ করিব। অধিকাংশ ধর্ম্মই আপনাপন শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে ও অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ নিজ দলভুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর। এ যেন একটা বিরাট্ বাজার—সকলেই আপনাপন পসরা লইয়া খদ্দেরকে বল্‌ছেন—আমার মাল সব চেয়ে ভাল—এই জিনিষ কেন—ওখানে যাস্ নি—ওর জিনিষ ভাল নয়—ও তোকে ঠকাবে আর বেশী দাম নেবে। অনেকে আবার নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেই ক্ষান্ত না হইয়া অপরের নানাপ্রকার নিন্দাবাদ ও দোষোদ্ঘোষণ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এখন উপায় কি? ক্ষুদ্র মানব এই আপাতবিশৃঙ্খলতার ভিতর সামঞ্জস্যের সূত্র কি করিয়া পাইবে?

মধ্যে মধ্যে আবার ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টাও দেখা যায়। অনেক ধর্ম্মই দাবী করেন, আমার ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম—অন্যান্যগুলি মিথ্যা। সুতরাং এই ধর্ম্ম সকলে অবলম্বন করিলেই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে—বিভিন্ন ধর্ম্মে আর বিবাদ থাকিবে না—কারণ, বিভিন্নতাই উঠিয়া যাইবে। কেহ কেহ একটু উদারতর

* এই প্রবন্ধ বিগত ২রা মে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনের সময় আলবার্ট হলে পঠিত হয়।

হইয়া বলেন, অন্যান্য ধর্ম্মও ভগবানের বিধান বটে, তবে অতি প্রাচীন কালে অসভ্যাবস্থায় মানব যতটুকু ধর্ম্মের ধারণা করিতে পারিয়াছিল, ততটুকুই তিনি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মই ভগবানের সাক্ষাৎ আদিষ্ট ও পূর্ণ ধর্ম্ম। এখন উহাই সকলকে অবলম্বন করিতে হইবে। আর এক দল লোক, সকল ধর্ম্মের ভিতরেই মতবাদ ও তদনুষ্ঠানের বিস্তর পার্থক্য দেখিয়া তৎসমুদয় বাদ দিয়া, প্রধান প্রধান যে কয়েকটী বিষয় সকল ধর্ম্মই প্রচারে নিযুক্ত তাহা লইয়া, উদার ও অসাম্প্রদায়িক এক নূতনতর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ আবার নীতিকেই সকল ধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্ব ও সার জ্ঞানে উহাকে ভিত্তি করিয়া অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তৎ-সহায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর মিল আনিবার আশা করিতেছেন।

আমি এই প্রবন্ধে ধর্ম্মবিরোধ-ভঞ্জনের উপায় সম্বন্ধে কিছু আভাস মাত্র দিবার চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস—সেইগুলি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে বিভিন্ন ধর্ম্মে মিল হইতে পারে। কেহ কেহ বিভিন্ন ধর্ম্মের মিলের চেষ্টা করেন—কারণ, তাঁহাদের কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, ধর্ম্ম জিনিষটাকেই তাঁহারা বিশ্বাস করেন না—কাযেকাযেই তাঁহারা যতটা পারেন, বাদ সাদ দিয়া ধর্ম্মটাকে নেড়া করিয়া একটা অসাম্প্রদায়িক ভাব আনিবার চেষ্টা করেন—কেহ কেহ আবার বিভিন্ন ধর্ম্মের মিল হইলে তাহাতে রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির সহায়তা হইতে পারে বলিয়া উহার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের ভাব এই—যদি আমরা পরস্পরের ধর্ম্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা একটা শক্তিশালী জাতি হইবার আশা করিতে পারি। আমার বিশ্বাস—ঐগুলি ধর্ম্মবিরোধ-ভঞ্জনের অবান্তর ফল হইলেও মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম লাভ করিয়া ধার্ম্মিক হওয়া। মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রকৃত ধর্ম্মকে জানিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা লাভ করা। ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আর এক মহৎ ফল—একটী মাত্র ধর্ম্ম প্রবল হইয়া অপর ধর্ম্মসমূহের উচ্ছেদ সাধন করিবে না। অথবা বিশেষ বিশেষ মতবাদ ও অনুষ্ঠান-বিবর্জ্জিত একটা একঘেয়ে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমার বিশ্বাস—যথার্থ ধর্ম্মসমন্বয়ে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই বর্ত্তমান থাকিবে—তাহাদের বিভিন্ন আপাত-বিরোধী মত ও অনুষ্ঠানসমূহও বিদ্যমান থাকিবে—কেবল তাহারা প্রত্যেকেই আপনাকে এক সনাতন ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ জ্ঞানে অপরকে স্বমতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া বা তাহাকে নিন্দাবাদ বা গালাগালি না দিয়া তাহার যথাসাধ্য সহায়তা করিবে এবং তাহার নিকট যথাসাধ্য সহায়তা লইয়া নিজ ভাবের পুষ্টি সাধন

করিবে। সম্প্রদায় থাকিবে—বরং আরো বাড়িবে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা উঠিয়া যাইবে। পরস্পর ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসম্বাদ উঠিয়া যাইবে।

হয়ত আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার মতে কি সকল ধর্মই সমান সত্য? কোন ধর্মে ঈশ্বর মানে না, কোন ধর্মে আগাগোড়া ঈশ্বর ছাড়া অন্য কথা নাই। কোন ধর্ম যাহাকে মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া মানে, অপর ধর্ম তাঁহাকেই হয়ত শয়তানের অবতার বা অসুরসম্মোহনার্থ আগত বলিয়া মানেন। ঈশ্বর-বাদীদের মধ্যে আবার মতভেদ—কেহ বলেন ঈশ্বর নিরাকার, কেহ আবার তাঁহাকে সাকার বলেন। নিরাকার-বাদীদের মধ্যে আবার সগুণনির্গুণভেদে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। সাকার-বাদীদের মত-বিরোধের ত কথাই নাই। কেহ বলিতেছেন, ভগবতী আদ্যাশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আবার কেহ শিব, কেহ বা বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানিতেছেন। পরলোক-তত্ত্বেও মতভেদ। কেহ পুনর্জ্জন্মবাদেরই সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন—কেহ বলেন—দেহান্তে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক; কাহারও কাহারও মতে বা অনন্ত উন্নতি—Ever approaching, but never nearing (সর্ব্বদা সমীপে অগ্রসর, অথচ কখনই সন্নিহিত নহে)। অনুষ্ঠান-প্রণালীর ত কথাই নাই। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানাবিধ দার্শনিক বিভিন্নবাদ ধর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া ভেদকে বিশেষ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় করিবে? সর্ব্ববাদি-সম্মত সামঞ্জস্য পাইবে কোথায়?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, অবশ্য প্রকৃত ধর্ম্ম এক বই দুই হইতে পারে না, কিন্তু সেই এক ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন আপাত-বিরোধী রূপ ধারণ করে, সুতরাং আপাততঃ বিরোধ দেখিলেও সমুদয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আশঙ্কা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত সূর্য্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, সে সূর্য্যকে বিভিন্নাকার দর্শন করিবে। কিন্তু তা বলিয়া কি তাহার বিভিন্ন দর্শন ভ্রান্ত বলিতে হইবে?—আপেক্ষিক হিসাবে তাহার সকল দর্শনই সত্য—সকলগুলিই সেই অদ্বিতীয় সূর্য্যের বিভিন্ন দর্শন। সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইলেই তাহার নিরপেক্ষ দর্শন হইবে।

যাহা হউক আমি একথা বলি না যে, আমি যেভাবে বিরোধভঞ্জনের চেষ্টার কথা বলিব, তাহাতে সকলের সমান সন্তোষ হইবে। কিন্তু কালের লক্ষণ দেখিয়া এটা আশা করা খুব বেশী মনে করি না যে, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যথার্থ ধার্ম্মিক শিক্ষিত ও উদারহৃদয় ব্যক্তিগণ এই গুলির সত্যতা ও উপযোগিতা স্বীকার করি-

বেন। আর যদি তাহাই হয়, তাঁহারা মনে করিলে ও চেষ্টা করিলে আপনাপন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদারভাব আনয়নের চেষ্টা ক্রমশঃ করিতে পারেন। আর এইরূপ চেষ্টা চলিতে থাকিলে কোন না কোন কালে ইহা সফল হইবার সম্ভাবনা।

এখন ধর্ম্মবিরোধ-ভঞ্জনের উপায়গুলি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ধর্ম্ম জিনিষটা কি, ইহা আমাদিগকে বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম—কতকগুলি মতবাদ বা বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানমাত্র নহে, অথবা শুদ্ধ নীতি বা ethicsও নহে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—যথা—বৈদিক ঋষিগণ বা বিভিন্ন অবতারগণ, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধ, খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক খৃষ্ট, মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ প্রভৃতি সকলেরই জীবনালোচনায় দেখা যায়, ইঁহারা সকলেই এক একটী বিশেষ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। উহাকে কেহবা ধর্ম্মসাক্ষাৎকার, কেহবা সমাধি, কেহ অলৌকিক দর্শন, কেহবা inspiration নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহারা সকলেই ইহাও বলিয়া গিয়াছেন বা আভাস দিয়াছেন যে, ইহা তাঁহাদের কিছু বিশেষত্ব নহে—সকল মানবই ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। এই অতীন্দ্রিয় অবস্থাগত হওয়াই—আমার বিশ্বাস—ধর্ম্ম। অন্যান্য সমুদয়ই উহার আনুষঙ্গিক। আমরা এখন যে অবস্থায় রহিয়াছি, ধর্ম্মলাভ করিলে তাহা হইতে বিভিন্ন অবস্থাগত হইব—নবজীবন লাভ করিব—এখনকার মত আর থাকিব না। তবে কি নীতিবাদীরা যাহা বলেন, কেবল চরিত্রগঠন কর, ইহা তাহাই? শুধু তাহাই নহে, ইহা নীতির বা ethicsএর চরম অবস্থা—কিন্তু তাহা হইতেও অধিক। কারণ, ঐ অবস্থা হইতেই সমুদয় নীতি ও ধর্ম্ম প্রসূত হয়। পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকেই ধর্ম্মমেঘ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ অবস্থা লাভের পক্ষে যাহা যাহা সাহায্যকারী, গৌণভাবে তাহাকেই ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন অধিকারিবিশেষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস ঐ অবস্থালাভের সহায়ক হইতে পারে, তেমনি আবার অধিকারি-বিশেষে উহার নাস্তিত্ববিশ্বাসও সহায়ক। এই কারণেই মত অনুষ্ঠান বিশ্বাসাদি বিভিন্ন। নানা অবস্থা ভেদে নানা ব্যক্তির নানা রুচি এবং নানা ব্যক্তিতে বিভিন্ন শক্তি প্রকাশ—এই কারণেই নানাপ্রকার বিভিন্ন ও আপাতবিরোধী উপদেশ বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। আরো নূতন নূতন কত ঐরূপ হইবে।

এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। শুধু তাহাই

নহে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম্মমত উপস্থিত হয়। তাহার যতই দেহমনের বিকাশ হয়, ততই তাহাকে নূতন নূতন ভাব আশ্রয় করিতে হয়। পুরাতন ভাব আর চলে না। এই বহুত্বের ভিতর একত্ব ও একত্বের ভিতর বহুত্ব দর্শন যিনি করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করিয়াছেন।

এখন কথা এই, এই ধর্ম্মবিরোধভঞ্জনের উপায় কি? প্রথম উপায়—ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা। যখনই আমরা ধর্ম্মসাধনে অবহেলা করিয়া কেবল প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হই, তখনই বিরোধের সূত্রপাত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য এখন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। খ্রীষ্টিয়ান এখন গিয়া কিছুদিন তাঁহার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া সেই Father in Heavenএর (স্বর্গস্থ পিতার) নিকট prayer (প্রার্থনা) করিতে থাকুন—খ্রীষ্ট যেমন মরুভূমিতে অনেক দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া সাধনবলে শয়তানের প্রলোভন জয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া তবে প্রচারকার্য্যে রত হইয়াছিলেন—খ্রীষ্টিয়ান তাহাই করিতে থাকুন। একেবারে না পারেন, কিছু কিছু করিয়া ঐরূপ ঈশ্বরসাধনা অভ্যাস করুন, প্রার্থনার সময় বাড়াইতে থাকুন। বৌদ্ধ আবার বোধিদ্রুম-তলে বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলুন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ং সমুচ্চলিষ্যতে।

—এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্ অস্থি মাংস নষ্ট হউক। যাহা বহু কল্পেও লাভ হয় না, সেই বোধিজ্ঞান লাভ না করিয়া এই আসন হইতে শরীর বিচলিত হইবে না।

মুসলমান তাঁহার সম্মানিত প্যাগম্বর মহম্মদের ন্যায় হীরাপর্ব্বতের গহ্বরে যাইয়া ঈশ্বরবিরহে ক্রন্দন ও মুখঘর্ষণ করুন।

হিন্দু তাঁহাদের ঋষিগণের ন্যায় যোগধ্যাননিরত হউন—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রারম্ভেই আছে—

ঋষিদের মনে সন্দেহ হইল—এই জগৎ-কারণ কি? তখন তাঁহারা ধ্যানযোগ-মগ্ন হইলেন—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্—তাঁহারা ধ্যানযোগমগ্ন হইয়া দেখিলেন; অথবা কঠোপনিষদের সেই নির্ভীক বালক নচিকেতার ন্যায় সর্ব্বরহস্যময়

মৃত্যুর অধিপতির সম্মুখীন হইয়া সত্যের জন্য সমুদয় প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়স্বরে বলুন—

নান্যৎ তস্মাৎ নচিকেতা বৃণীতে—

নচিকেতা এই পরম তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছু চায় না। যমরাজকে বলুন—যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ—যাহা দেখিতেছেন, তাহা বলুন। শোনা কথা নহে—যাহা দেখিতেছেন। শোনা কথায় বিশ্বাস কি? যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বলুন। তার পর তপস্যায় রত হউন—স তপোঽতপ্যত—তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে গেলেন না—তর্ক করিতে গেলেন না—অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিন্দা করিতে গেলেন না—তপস্যা করিতে গেলেন—ক্রমে এক একটী অজ্ঞানের আবরণ খসিয়া যাইতে লাগিল—শেষে আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন—তখন উচ্চৈস্বরে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*   *   *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

*   *   *

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

—হে অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর, হে দিব্যধামনিবাসিগণ,তোমরাও শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—তিনি জ্যোতির্ম্ময়, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়, মুক্তির আর অন্য পথ নাই। সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারকাও নহে, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এই সামান্য অগ্নির কথা কি? প্রকাশশীল তাঁহারই পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার প্রকাশেই সমুদয় প্রকাশিত।

তাই বলি ভাই, সাধন কর। যে যাহা জান, তাহাই কর—কিন্তু কিছু কর—কিছু কর। যথেষ্ট বক্তৃতা হইয়াছে, যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছে, যথেষ্ট তর্ক হইয়াছে। আর সময় নাই। ঐ দেখ শমন তোমার শিয়রে—তুমি কখন মরিবে—তাহার ঠিক নাই—আর মৃত্যু যেমন নিশ্চিত, তাহার মত নিশ্চিতও আর কিছু নাই। ইহাও ধ্রুব সত্য যে, আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহা লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছি, সবই অনিত্য। অতএব মৃত্যুর পারে গিয়া অমৃতকে জানিবার চেষ্টা কর—অনিত্যকে দূরে ফেলিয়া নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান কর। এখনই অন্বেষণ কর। যতদিন না শরীর পাত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বেই জানিবার চেষ্টা কর—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি—

এখন জানিতে পারিলেই মঙ্গল।

এখনই—এই মুহূর্ত্তেই সত্যসাক্ষাৎকারের চেষ্টা কর। প্রস্ফুটিত পদ্ম সম্মুখে—আমরা চারিদিকে মধুকরবৎ গুঞ্জন করিয়া ঘুরিতেছি—কমলের মধুপানে কেন আগ্রহ হইল না? কেন ঘুরিয়া মরিলাম? সার সত্য বস্তু ছাড়িয়া কেন অসারে লইয়া গৌণ বিষয় লইয়াই জীবন কাটাইলাম?

কত তীর্থে স্নান করিলাম, কত মন্দিরে প্রণাম করিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম, কত ফুল, বিল্বপত্র, কত নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলাম—কই, সত্য কই? কই—সে অমৃত কোথায়?—কোথায় সেই সুখস্বরূপ—প্রেমস্বরূপ? জীবনের সার্থকতা তো হইল না!

তাই বলি ভাই, সত্যের জন্য উন্মাদ হও। প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য প্রাণ পণ কর। অর্জ্জুনও বলিয়াছিলেন—

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে চাই।

আমি দেখিতে চাই—শুধু শুনিয়া, শুধু বিশ্বাসে তৃপ্তি হইতেছে না। দেখিব—দেখিয়া মজিব—আত্মহারা হইব।

ধর্ম্মবিরোধভঞ্জনের এই প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। হয়ত এতক্ষণে অনেকে ভাবিতেছেন, এ ত বেশ কথা বলিলে। এ কি সোজা কথা? যাহা কেবল বড় বড় পীর, প্যাগম্বর, প্রফেট বা অবতারদের হইয়াছে শুনা যায়, তুমি কি আমাদের সকলকেই তাহাই করিতে ব্যবস্থা দাও? তুমি নিজে কতটা করিলে? সত্য কথা—আপনাদের সমস্ত কথাই মানিলাম। কিন্তু বলুন দেখি, পারুন না পারুন, এইটাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে কি না? যদি তাই বোধ হইয়া থাকে,

একেবারে না পারুন, চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিন না। তাহাতে দোষ কি? একেবারে পারিব না বলিয়া যতটা পারি, করিতে বাধা কি? যখন প্রত্যক্ষ না হইলে ধর্ম্মই হইল না, তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? আর ইহাকেই এত শক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার কথাটাকেই এত সহজ ঠাও-রাইয়াছেন কেন বলুন দেখি? এই প্রচারকার্য্য অনেক সময়েই অভিমানপ্রসূত, আর তজ্জন্যই ইহাতে বিশেষ উপকার না হইয়া অনেক সময়ে অপকারই হইয়া থাকে। কেবল উন্নতমনা প্রত্যক্ষানুভূতিবিশিষ্ট মহাপুরুষগণের দ্বারাই ঠিক ঠিক প্রচারকার্য্য হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আরো কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপায় আছে। সেগুলি অবলম্বন করিলে সম্পূর্ণ না হউক, এই বিরোধভঞ্জনের আংশিক সাহায্যও হইতে পারে। তাই ২য় উপায় এই যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম্ম, ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান শুধু বিশ্বাস বা আপ্তবাক্যে স্বীকার না করিয়া লইয়া বিচার ও যুক্তিপূর্ব্বক তাহাদের তত্ত্বানু-সন্ধান করিতে হইবে।

এই যুক্তি বা বিচারের বিরুদ্ধে সচরাচর আপত্তি শুনা যায় যে, ধর্ম্ম বিশ্বাস-মূলক বা আপ্তবাক্যমূলক। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুক্তিতে উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা বাতুলতা বই কিছুই নহে—মানব-যুক্তি আজ যাহা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, কাল আবার তাহাকেই ভ্রান্ত বলিয়া অবধারিত করে। সুতরাং যুক্তির উপর প্রত্যয় কি? একথা এক হিসাবে সত্য যে, যাহা অতীন্দ্রিয় বস্তু, তাহার সম্বন্ধে তর্ক চলে না—তাহা তর্কাতীত। কিন্তু এইটী বুঝিতে হইবে, তাহা তর্কাতীত বটে, কিন্তু তর্কের বিরোধী নহে। শঙ্কর বেদের অবিরোধী তর্কের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং ধর্ম্মবিচারের সময় বিচার-বিরোধীকেও বিচারের ও তর্কের আশ্রয় লইতে দেখা যায়। তার পর কথা এই—ধর্ম্মের নামে যে সকল মত অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত, সেগুলি ত সব অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নহে, সুতরাং ওগুলি আমরা যুক্তিপূর্ব্বক বিচার করিব না কেন? অথবা সেগুলি বুঝিতেই বা না পারিব কেন? আমাদের ভিতরে যতটুকু তর্কযুক্তি বা বিচারশক্তি আছে, তাহার অতীত তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই যে তর্কযুক্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। আমার বুদ্ধির দ্বারা আমি যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আমার আর কতটুকু ধারণার শক্তি হইবে? আমার যুক্তিবুদ্ধির অতীত তত্ত্ব লইয়া আমার জীবনের কতদূর কার্য্যসাধনই বা হইবে? এখন যাহা বুঝিতে পারিতেছি, পরে যখন আবার মনের উন্নতিসহকারে তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া

বুঝিব ও নূতন কিছুকে সত্য বলিয়া ধারণা হইবে, তখন তাহাই অবলম্বন করিব, কিন্তু এখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি, তাহাই সত্য বলিয়া আমাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাস বা অনুষ্ঠান যুক্তিতর্ক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমি একথা বলিতেছি, যাহা কিছু আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তাহাই এখনই ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। উহাকে ছাড়িবার পূর্ব্বে বিধিমত পরীক্ষা না করিয়া ত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাহা হউক, এইরূপ বিচারের দ্বারা আমরা স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনেকটা বুঝিতে পারিব, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তৃতীয় উপায়—প্রত্যেক ধর্ম্মের শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় কথাসকল তত্তৎধর্ম্মাবলম্বীর ভিতর বিশেষভাবে বিস্তার করা। দেখিতেছি, আমরা নিজের নিজের ধর্ম্ম অনেক সময় অনেকেই জানি না। আমাদের কথাই বলিতেছি, বেদের কথা ত অনেক দূরে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে বেদের চর্চ্চা ত লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। পুরাণ তন্ত্রাদিরই বা প্রচার কোথায়? উহাদের পঠন পাঠনও ত বিলুপ্তপ্রায়। আমরা এদিক্ ওদিক হইতে দু চারটা কথা শুনিয়া তাহাতেই মস্ত পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক হইয়া অপরের সঙ্গে ঘোরতর তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। আমরা এইরূপ তর্ক করিতে করিতে যথার্থ ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট এবং লোকসমাজে ক্রমাগত হাস্যাস্পদ হইতেছি, তথাপি আমাদের চৈতন্য নাই। তাই বলি, অধিকারী ব্যক্তিরা শাস্ত্রের বিশুদ্ধ সংস্করণ ও তাহাদের মূলানুযায়ী ও সরল অনুবাদ প্রচারে বদ্ধপরিকর হউন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিতে চাই, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখের সঞ্চার হয়। যাহা হউক, অনুবাদকগণ যাঁহারা পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহাদের কার্য্যে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণ এই অনুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হউন। আর যাহারা তাহাও বুঝিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য সরল ভাষায় তাহাদের উপযোগী করিয়া অথচ শাস্ত্রের মর্ম্ম বিকৃত না করিয়া, প্রবন্ধাদি প্রচারিত হউক এবং নবশিক্ষিত প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানী কথকদলের অভ্যুদয় হইয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতর এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিস্তারিত হউক। যতই শাস্ত্রীয় চর্চ্চার প্রসার হইবে, যতই লোকে শাস্ত্রের কথা জানিবে ও বুঝিবে, ততই তাহারা শাস্ত্রের সারতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইবে, আশা করা যায়। এই বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। অনেক করিবার আছে। বাহুল্য ভয়ে আভাসমাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

৪র্থ,—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চেষ্টা হওয়া উচিত—অন্যান্য ধর্ম্মের

প্রকৃত মর্ম্ম তাহাদের দৃষ্টিতে, তাহাদের ভাবে জানা ও শিক্ষা করা। সমালোচকের মত নহে, দোষদর্শীর মত নহে—যীশুখ্রীষ্টকে যীশু খ্রীষ্ট না বলিয়া ঋষি খ্রীষ্ট বলিয়া আমাদের আপনার লোক ভাবিয়া তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে—বুদ্ধদেব অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, শুধু এই কথা বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান না লাভ করিয়া বৌদ্ধদের পালিগ্রন্থে ত্রিপিটকে কি বলে, তাহার চর্চ্চা করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, পালিভাষায় এত অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, তাহার শিক্ষাও সর্ব্বসাধারণে বিস্তার করিলে আমাদের একটী গুরুতর অভাব দূর হইতে পারে। এই একটী ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে—কতকগুলি অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি সারা জীবন এই বিষয়ে নিয়োগ করিয়া সাধারণের কল্যাণসাধন করিতে ও স্বয়ং যশস্বী হইতে পারেন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকেও ঐরূপে অপরাপর ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ চর্চ্চার প্রবল তরঙ্গ উঠুক দেখি—দেখি ধর্ম্মবিরোধ কতটা সমাজে স্থান পায়।

ধর্ম্মবিরোধনিবারণের কয়েকটী উপায়ের আভাসমাত্র দিলাম। এক্ষণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের মূলীভূত কয়েকটী তত্ত্বের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) প্রকৃত ধর্ম্মের সার কথা বিনাশ নহে, গঠন। প্রকৃত ধর্ম্ম অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাইবার দাবী করে না, সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে লইয়া যাইতে চায়।

(২) উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর নির্ভর করিবে না, অথচ উহাতে অনন্ত ব্যক্তির স্থান থাকিবে। অনুষ্ঠানাদি দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইবে।

(৩) কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ মার্গ সমুদয়েরই উহাতে স্থান থাকিবে।

(৪) উহা আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ও উদার অথচ সমুদ্রবৎ গভীর হইবে। উহা প্রবল নিষ্ঠা অথচ প্রবল উদারতার পোষকতা করিবে।

প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, প্রকৃত ধর্ম্মের ভিতর গঠনকারী ভাগ (Constructive element), হাঁ এর দিক্ (Positive side) অধিক থাকা উচিত। তোমার অপরের সম্বন্ধে কি ধারণা, তাহা শুনিবার আমার সময় বড় কম। তুমি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু নূতন জিনিষ দিতে পার? ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মের প্রথম পরীক্ষা। বাস্তবিকই প্রফেটগণ পূর্ব্ববিধানসমূহ বিনাশ করিতে আসেন না, পরিপূর্ণ করিতেই আসেন (does not come to destroy, but to fulfil)। ইচ্ছা হয়—অন্যান্য সত্যকে নিম্নতর সত্য বলিতে পার, কিন্তু একেবারে অসত্য

বলা নিরর্থক—কারণ, ঐরূপ প্রচারে লোকের মধ্যে কেবল দ্বেষাদ্বেষী কলহ-দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি হয়। এক 'পৌত্তলিকতা' এই শব্দটীর ভিতরে যে কি ঘৃণা ও দ্বেষের বীজ নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। যাঁহারা সচরাচর আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী (Monotheist) বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা ঐ বাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষরূপ বিষের সৃজন করিয়া অনেক সময় ধর্ম্ম-সমন্বয়কে সুদূর স্বপ্নরাজ্যরূপে প্রতীয়মান করান। ইঁহাদের কর্ত্তব্য—আগে নিজেদের মত. নিজের বিশ্বাস, কতদূর বিচার-সহ ও কতদূর প্রত্যক্ষ অনুভব-সঙ্গত, তাহার আলোচনা করা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভিতর যেমন ক্রমবিকাশবাদ (Evolution theory) স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্মজগতেও তদ্রূপ যেদিন ক্রম-বিকাশ অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে, তখনই অপরের উপর সহানুভূতি আসিবে, তখনই বুঝা যাইবে, তথাকথিত পৌত্তলিকতা হইতে কেহই প্রকৃতপক্ষে একেবারে নির্ম্মুক্ত নহেন, আর উহা প্রকৃতপক্ষে কোন অন্যায় বা পাপকার্য্য নহে, নিম্নাধিকারীর অনন্ত জ্ঞানলাভের একটী সোপানমাত্র। তখন আরও বুঝা যাইবে, আমরা যে একেশ্বরবাদের গৌরব ও বড়াই করিয়া থাকি. তদপেক্ষা আরো উচ্চতর অবস্থায় আমাদিগকে আরোহণ করিতে হইবে—দার্শনিক মত বিচার করিলেও আমরা দেখিব, বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ বা আরম্ভবাদ প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বিরোধী নহে, অথবা একটীকে অসত্য প্রতিপন্ন করিয়াই অপর বাদ স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নহে। একই সত্য—বিভিন্ন অবস্থাপন্ন সাধক বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে দেখিলে যেরূপ প্রতীয়মান হয় উহারাও তদ্রূপ। এইরূপ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদাদি মত সম্বন্ধেও। এইগুলিতে তবু দৃষ্টির পার্থক্য আছে, অনেক সময়ে আবার বিরোধ কেবল নামের বিভিন্নতার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে অনেক সময় দেখা যায়, একজন যে অপরের বিরোধী হন, ও উহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন,কেবল নাম ও শব্দগত বিভিন্নতাই উহার কারণ। নূতন ভাব কিছুই প্রতিষ্ঠিত হইল না, পুরাতন ভাবগুলিই নূতন নামে পরিচিত হইতে লাগিল। তার পর আবার অনেকে সংস্কারক নাম ধারণ করিয়া সংহারক হইয়া বসেন। কোন বিষয়ের উপর যখন আক্রমণ করা হয়, তখন উদ্দেশ্য—ভাববিশেষের যে বিকৃতভাবে পরিণতি হইয়াছে. তাহাকে তাহার মৌলিক বিশুদ্ধতায় লইয়া যাওয়া। কিন্তু অসহিষ্ণুতাবশতঃ আমরা উহার ভিতরে কিছু ভাল জিনিষ আছে কি না, তাহার চিন্তা করিবার সময় পাই না, যতক্ষণ না উহাকে আমূল উচ্ছেদ করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের সুনিদ্রা হয় না। কিন্তু ইহাতে

কি ফল হয়? ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ সাধিত না হইয়া দ্বেষাদ্বেষী কলহদ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি হয়। তাই বলি, কাহারও বিশ্বাসে বা ভাবে আঘাত করিও না; যদি তোমার কিছু দিবার থাকে, দিয়া যাও। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা আপনিই পলায়ন করিবে। কোন মতে বা ভাবে প্রকৃতপক্ষে দোষ আছে বোধ হইলেও, উহা দোষ বলিয়া উল্লেখ না করাই ভাল। তুমি যেটী ভাল বুঝিয়াছ, সেইটীই সাম্‌নে আনিয়া ধর। মানবাত্মা নিজের অভ্রান্ত শক্তিবলে যেটী ভাল, সেইটীই গ্রহণ করিবে। মাতালকে তুমি মাতাল বলিলে তাহার বিশেষ কল্যাণ হওয়া দূরে থাক্, তাহার তোমার প্রতি একটা বিদ্বেষ-বুদ্ধিই জাগ্রৎ হইবে, কিন্তু যদি তাহাকে একটা উচ্চ জিনিষের নেশায় মাতাল করিতে পার, তাহার নীচ প্রবৃত্তি আপনিই ছুটিয়া যাইবে। তাই বলি, যে ধর্ম্মে যত এ ছাড় ও ছাড়—এটা ভুল, সেটা ভুল—এসব বুলি ছাড়িয়া কেবল সত্যপ্রচার, সেই ধর্ম্মেরই জয় হয়, তাহাই স্থায়ী হয়। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা অপেক্ষাকৃত সহজ—তাহার স্থলে একটা গড়া বড় শক্ত কায। কেহ কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহার দোষ দেখান খুব সহজ, কিন্তু সে যদি নিজে আবার একটা গড়িতে যায়, তখন দেখে—আমি অপরকে যে দোষে দোষী করিতেছিলাম, আমারও ত তাহাই আসিয়া পড়িতেছে। অতএব আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা হওয়া উচিত—কিসে একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি।

(২) ব্যক্তিবিশেষ ধর্ম্মের প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ, ধর্ম্ম সনাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সনাতন ভূমির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকেই ধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে যান, তাঁহাদের ধর্ম্ম নিতান্ত বালির বাঁধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিত অপ্রমাণ হইয়া গেলে তাঁহাদের ধর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গে অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। তথাকথিত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহের তাই বড়ই বিপদ্। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের ক্রমাগত মুষলাঘাত হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মকে বাঁচান বড়ই কঠিন। কিন্তু ধর্ম্ম ত বাস্তবিক তদ্রূপ বস্তু নহে। ক্ষুধাতৃষ্ণাকামক্রোধাদি বৃত্তি যেমন সার্ব্বজনীন—ধর্ম্মভাব বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারও তদ্রূপ সার্ব্বজনীন—সকলের পক্ষে স্বাভাবিক। যাঁহাদের ভিতর কেবল বিশেষভাবে উহার বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারাই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকরূপে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার নিজ অন্তরাত্মাই ধর্ম্মের এবং কৃষ্ণ-খ্রীষ্ট-বুদ্ধাদির কৃষ্ণত্ব-খ্রীষ্টত্ব-বুদ্ধত্বের মুখ্য প্রমাণ। ধর্ম্মের এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি স্বীকার করিলে ব্যক্তিকে যে অস্বীকার করা হইল,

তাহা নহে, ববং ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কালে অনন্ত ব্যক্তি, অনন্ত প্রফেট, অনন্ত অবতারেব উহাতে স্থান রহিল।

নিশ্চলদাস বলিয়াছেন,—

যো ব্রহ্মবিৎ ওই ব্রহ্ম তাকু বাণী বেদ
সংস্কৃত ঔর ভাষামে করত ভ্রম কি ছেদ।

—যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার বাক্যই বেদ; সংস্কৃত অথবা লৌকিক ভাষা—যাহাতেই তাঁহার উপদেশ কথিত হউক না, তাহাতেই ভ্রম দূর করিয়া দেয়।

আমরা যদি এইটুকু মাত্র স্বীকার কবি যে, যেমন আমাদের প্রফেট বা অবতাবের দ্বারা সত্য প্রকাশিত হইল, অন্যান্য প্রফেট বা অবতাবের দ্বারাও তদ্রূপ দেশকালভেদে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আবাব হইবে, তবেই সব বিবাদ মিটিয়া যায়। তার উপর, আর এক কথা—সেই প্রফেট বা অবতাবই যে কেবল সত্য দর্শন কবিয়াছেন, তাহা নহে; তুমি আমি চেষ্টা করিলে আমবা সকলেই সেই অবস্থা পাইতে পারি ও সত্য-সাক্ষাৎকার আমাদের সকলেরই হইতে পাবে। প্রকৃত ধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী কেহ নাই—সত্যের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তবে যত দিন না সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতেছে, ততদিন মুখে যাহাই বলা হউক না, বাধ্য হইয়াই তোমার মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সাহায্যকাবী গুরু, প্রফেট বা অবতাব স্বীকার কবিতেই হয়। উহা হইতে পলাইবাব পথ নাই।

সকল মহাপুরুষই এক সত্য দর্শন ও প্রচার কবিলেও, অনুষ্ঠান ও মতাদির পার্থক্য হয, কেবল তদানীন্তন লোকের ধাবণা-শক্তিব তারতম্যে। সকল অনুষ্ঠান ও মতই পরিবর্ত্তনশীল এবং ধর্ম্মেতিহাস নিবপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাব ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৩) মোটামুটি মানবকে ৪ প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ধরা যাইতে পারে—অবশ্য কোন কোন প্রবৃত্তির আধিক্য হিসাবেই আমরা এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি কল্পনা করিতেছি। ১ম—কর্ম্মপ্রবণ, ২য়—ভাবুক, ৩য়—শক্তিপ্রিয়, ৪র্থ—বিচারপবায়ণ। এই চতুর্ব্বিধ প্রবৃত্তির তারতম্য-ভেদে ধর্ম্মও বিভিন্নাকাব ধারণ কবে। কর্ম্মী অহরহ কর্ম্ম করিতে চায, সে দার্শনিক বিচার বা ভাবুকতাকে স্বপ্নবাজ্য বলিয়া উপহাস করে। যাহা কিছু হাতে হেতড়ে করিতে পারে, তাহাতেই তাহাব প্রীতি, তাহাতেই তাহাব সন্তোষ। সে মানবজাতির সেবা কবিতে চায়, তাহাদেব দুঃখ মোচন কবিতে চায়, ধবাতে দুঃখ-দৈন্য দেখিতে পাবে না, উহাকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে সে বদ্ধপবিকর। ভাবুক এক মনোহব

মূর্ত্তি বা সুন্দর গুণবিশিষ্ট পুরুষ বা আদর্শ বা ভাবকে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত; সে দিবা-রাত্র ভাবে বিভোর হইতে হাসিতে কাঁদিতে নাচিতে গাহিতে চায়। তাহার প্রাণ দিবানিশি ভাবসাগরে সন্তরণ করিতে চায়—সে তর্কযুক্তির বড় ধার ধারে না—ভালবাসিয়াই তৃপ্ত। জয়—অর্থাৎ শক্তিপ্রিয় ব্যক্তি প্রকৃতিকে জয় করিতে চায়। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়াই সে তৃপ্ত নহে—এক ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ চলিতে পারিলেই বা তারের দ্বারা দূরদূরান্তরের সংবাদ মুহূর্ত্তেকে আনিতে পারিলেই সে তৃপ্ত নহে—সে চায়—অন্তঃপ্রকৃতিকে পর্য্যন্ত জয় করিতে—যাহাতে মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করিতে পারে, উহাকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে, ইহাই তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। দার্শনিক বলেন, আমি সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিব—প্রত্যেক তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রকৃত সত্যকে দেখিব—বিচার—বিচার—ইহাই তাঁহার মূল কায।

প্রকৃত ধর্ম্মে এই সকল বিভিন্ন ভাবগুলিরই বিকাশের অবকাশ থাকা চাই। যাঁহারা কেবল একটী ভাবের বিকাশেরই অবকাশ দেন, অপরগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা কখন সকল মানবকে ধর্ম্মপথে সহায়তা করিতে পারেন না। যে ধর্ম্মে কেবল চক্ষের জল ফেলিতে বলে, তাহাতে কি বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির তৃপ্তি হইতে পারে? আবার যে ধর্ম্মে কেবল বিচার, তাহা লইয়া প্রেমরসের রসিক ভাবুক কি করিবে? তাই বলি, যে ধর্ম্ম আপনাকে সার্ব্বভৌমিক বলিয়া ঘোষণা করিতে চায়, তাহাতে সকল প্রকার প্রকৃতির, সকল প্রকার রুচির তৃপ্তি প্রয়োজন। উহা কেবল পণ্ডিত বা কেবল মূর্খের ধর্ম্ম হইলে চলিবে না, দেশকালপাত্র-নির্ব্বি-শেষে আবালবৃদ্ধবনিতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ সকলেরই তাহাতে স্থান থাকা চাই।

(৪) উহা আকাশের ন্যায় প্রশস্ত, অথচ সমুদ্রবৎ গভীর হওয়ার প্রয়ো-জন। উদারতার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এক্ষণে গভীরতার কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। অনেকে ধর্ম্মে অভ্যুদয়তা দেখাইতে গিয়া ধর্ম্মভাবের গভীরতা হারাইয়া ফেলেন। যাহাকে আমরা গোঁড়ামী বলিয়া উপেক্ষা করি, সেই ভাবটী বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার ভিতর একটী গূঢ় শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। প্রথমাবস্থায় গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতায় এই আকার দেখা যায় যে, উহা অন্যান্য ভাবসমুদয়ের খণ্ডনেই আপনার অধিকাংশ শক্তি নিয়োজিত করে, নিজ ভাব প্রতিষ্ঠায় তাদৃশ যত্ন করে না। কিন্তু যখন গোঁড়ারা একটু উন্নত হয়, তখন দেখিতে পায়, আমরা যে অপরাপর মতের বা বাদের নিন্দা-

বাদ করিতেছিলাম, তাহার উদ্দেশ্য কেবল নিজ ভাব প্রতিষ্ঠা, সুতরাং তখন তীব্র নিন্দাবাদের স্থলে উপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। অপরের নিন্দন বন্দন কিছুই করিব না, নিজ ভাব লইয়া থাকিব—ইহাই নিষ্ঠার প্রারম্ভ। যেমন চারাগাছকে কিছুদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, নতুবা গরু বাছুর উহা খাইয়া ফেলিতে পারে, তদ্রূপ ধর্ম্মসাধকের নিজ ভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য এই নিষ্ঠার অতীব প্রয়োজন। এমন কি, যখন জ্ঞানের প্রসার হইয়া সে দেখিতে পায়, অপরের ভাবও সত্য, তখনও তাহাকে অনেক দিন ধরিয়া নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া থাকিতে হয়। তখন তিনি হনুমানের মত বলেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

—আমি জানি, পরমাত্মা-স্বরূপে লক্ষ্মীপতি নারায়ণে ও সীতাপতি রামচন্দ্রে কোন প্রভেদ নাই, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।

অথবা ভর্তৃহরির মত বলেন,—

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদ-প্রতিপত্তিরস্তি মে তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥

—মহেশ্বর বা জগতের অধীশ্বর, জনার্দ্দন বা জগতের অন্তরাত্মা, ইহাতে আমার বিভিন্নবস্তুজ্ঞান নাই, তথাপি তরুণেন্দুশেখর মহাদেবেই আমার স্বাভাবিক ভক্তি।

কিম্বা তুলসীদাসের মত বলেন,—

সবসে রসিয়ে সবসে বসিয়ে সবকা লিজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥

—সকলের সহিত বস, সকলের সহিত আনন্দ কর, সকলের নাম লও, সকলকেই হাঁজী হাঁজী বলিবে, কিন্তু আপন ভাবে থাকিবে।

তাই বলি, ধর্ম্মসমন্বয় অর্থে—নিজ নিজ ভাব ছাড়িয়া দিয়া, নিজ নিজ অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়া কেবল সার ভাগটী ধরিয়া থাকা নহে। ধানের মধ্যে চালটুকু সার বটে, কিন্তু যেমন চাল পুতিলে গাছ হয় না, ধান পুতিতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের মধ্যে তথাকথিত অসার বা গৌণ অংশকেও ছাড়িলে চলবে না। যাঁহারা সকল অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়া বা সকল মত ছাড়িয়া দিয়া একটা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম খাড়া করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ কয়েকটী নূতন অনুষ্ঠান বা নূতন মতেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন মাত্র, কারণ, মানুষ যত দিন জড়-দেহে আবদ্ধ, যত দিন না সে দেহভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছে, তত দিন

তাহার ভাব কতকগুলি মত, ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবেই হইবে। তবে অবশ্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, যেন আমরা উহাদের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যাই, যেন উহারা কেবল একটা লোকদেখান ব্যাপারে পরিণত না হয়, যেন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভাব জাগিয়া উঠে আর চেষ্টা থাকে, যেন ক্রমে অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভাব লইয়া থাকিতে পারি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—It is good to be born in a church, but bad to die there—চার্চ্চে জন্মান ভাল, মরা ভাল নয়—অর্থাৎ সাধনের প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট মত অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়া থাকা ভাল, কিন্তু ঐ ভাবেই চিরকাল থাকিলে চলিবে না, উন্নতিসহকারে ক্রমে উহাদের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাই আমাদের কর্ত্তব্য—নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে ও বিচারের সহিত প্রতি-পালন করিয়া ক্রমে অসাম্প্রদায়িক ভাবের দিকে অগ্রসর হওয়া। প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ না হইলে অসাম্প্রদায়িক ভাব আসিতে পারে না, তবে এটুকু চেষ্টা করা প্রয়োজন, যেন অপরের ভাবগুলির আলোচনা-স্থলে তাহাদের ভাবে তাহাদের বিষয়, তাহা-দের মত ও অনুষ্ঠানাদি বুঝিতে চেষ্টা করি; শুধু তাহাই নহে, নিজ ভাব বিস্মৃত না হইয়া, নিজ ভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরের সদ্ভাবকে জ্ঞানপূর্ব্বক ভিতরে গ্রহণ করিতে পারি। হিন্দু হিন্দুভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টা-নের ভাব গ্রহণ করুন ও সাধনা করুন—তদ্রূপ অপরেও ঐরূপ ভাবে অপরের ভাব গ্রহণ করুন। হিন্দুকে মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান হইতে হইবে না, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমানকেও হিন্দু হইতে হইবে না, তবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাব শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ ভাবে অগ্রসর হইবে। যদি আমরা এইরূপ ভাবে অগ্রসর হইতে পারি, তবেই এক দিন ধর্ম্মবিরোধভঞ্জনের ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার আশা করিতে পারিব।

বিগত গুডফ্রাইডের সময় টাউন হলে যে ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা আপাততঃ খুব সামান্য হইলেও এবং প্রথমাধিবেশনে নানাপ্রকার অনিবার্য্য ত্রুটি থাকিলেও, উহা একটী সময়ের শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। উহার প্রসার আরো বাড়াইতে হইবে এবং যাহাতে উহার মূল উদ্দেশ্য—ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মবিরোধ-ভঞ্জন প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার জন্য নানা ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তি ও অধিকার মত চেষ্টা করিতে হইবে। এই সবে মাত্র সমন্বয়ের সূচনা হইয়াছে। কালে ইহা অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মহা মহীরুহে যাহাতে পরিণত হয়, তাহার জন্য আমাদের সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের এখন আর পরস্পর বিরোধের সময় নাই। এখন আমাদের বিবাদ পরস্পরে নহে—আমরা এখন আমাদের সাধারণ শত্রু অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিব। আমরা ধর্ম্মবাদিগণ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া সমস্বরে বলিব—জয় বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণের জয়; জয় রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদের জয়; জয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সকল সাধুর, সকল পবিত্রাত্মা নরনারীর জয়।

ধর্ম্মবিরোধের সমন্বয় কি করিয়া হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের কথা ও তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী ভাবে যে দুই একটী কথা আমার মনে উদয় হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বিবৃত করিলাম। বক্তৃতা আমার উদ্দেশ্য নহে—তাহার শক্তিও নাই। যদি কাহারও প্রাণে এ বিষয়ের জন্য চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রস্তুত আছি। অথবা যাঁহার এ বিষয়ে কোন প্রকার বক্তব্য বা আলোচ্য আছে, তিনিও তদ্বিষয়ে বলিতে ও আলোচনা করিতে পারেন, এবং আমিও যথাসাধ্য আমার বক্তব্য আরো বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য, এই বিবেকানন্দ-সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য—এই ধর্ম্মবিরোধ-ভঞ্জনের চেষ্টা। তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহা করিতেছেন এবং এ বিষয়ে অপরের অভিপ্রায় ও মতানুযায়ী সাধ্যমত কার্য্য করিতেও প্রস্তুত আছেন। তবে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সমবেত শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং আশা করি, আপনারা সমিতির সহিত যোগদান করিয়া আপনাদের সাধ্যমত ইহার মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবেন।

[বক্তার প্রবন্ধপাঠান্তে সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেন ও কেহ কেহ কিছু কিছু প্রশ্নাদিও করেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটা উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধ মতবাদের প্রয়োজন, সমুদয় ধর্ম্ম বিচার করিয়া তন্মধ্যে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম যদি উপলব্ধিরই জিনিষ, তাহা হইলে স্বধর্ম্মপালনই অত্যাবশ্যক কেন? উত্তরে বক্তা বলেন, বিশুদ্ধ মতবাদ প্রয়োজন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম যখন উপলব্ধিরই জিনিষ, তখন অবিশুদ্ধ-মতাবলম্বী ব্যক্তিরাও ধর্ম্মের সেই চরমাদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে। ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধু ও সিদ্ধ পুরুষ-সমূহের অভ্যুদয় হইয়াছে। যেমন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইলে সদর ফটক দিয়া প্রবেশ করা যায়, আবার পাইখানার দরজা দিয়াও যাওয়া যায়, তদ্রূপ অবিশুদ্ধ-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণও সেই চরমাদর্শে যাইতে পারে। যখন ধর্ম্ম উপলব্ধিরই জিনিষ এবং সকল ধর্ম্মেই যখন সত্যলাভ হইতে পারে, তখন কাহারও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বনের প্রয়োজন নাই; তবে যদি কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মা-

বলঘনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সহজে করিতে পারে বিবেচনা করে, বক্তার মতে তাহাতেও কোন বাধা নাই। তবে যাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা না হয়, তজ্জন্য সাধারণতঃ এক ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনয়নের চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে।]

এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ।

[ব্রহ্মচারী উপেন্দ্রনাথ।]

কোনও সময়ে এক গ্রামের প্রান্তভাগে এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। গ্রামস্থ লোকের নিকট তিনি সাধারণ লোক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ঐ গ্রামে প্রত্যহ ভাগবত পাঠ হইত। উক্ত গ্রামবাসী ভিন্ন চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য গ্রামের অনেক লোকও আসিয়া ঐ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিত। ঐ মহাপুরুষও তন্মধ্যে এক পার্শ্বে বসিয়া প্রত্যহ পাঠ শ্রবণ করিতেন।

এক দিবস উক্ত পাঠ শেষ হইলে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া পাঠক মহাশয়কে বলিতে লাগিল, "মহাশয় আমি ৪ মাইল দূরবর্ত্তী একরামপুর-নিবাসী একজন বণিক্। পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এ গ্রামে আসিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছি, তাহা একাকী বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছি না। এক-জন লোক যদি উপযুক্ত মজুরী দিয়া প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।" পাঠক মহাশয় বণিকের আবেদন শ্রবণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, মজুরের যোগ্য কোনও লোকই উপস্থিত নাই; কেবল এক পার্শ্বে একটী লোক বসিয়া আছে, যাহার মলিন ছিন্ন বস্ত্র দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছে। পাঠক অগত্যা তাহাকেই বলিলেন, "দেখহে, উপযুক্ত মজুরি লইয়া যদি এই লোকটীর মোট পৌছাইয়া দিয়া এস, তবে ইঁহার বিশেষ উপকার হয়।" বলা বাহুল্য, ঐ ব্যক্তিই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মহাপুরুষ। পাঠক মহা-শয়ের আদেশ শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ মনে মনে বিচার করিলেন—এই পাঠক মহাশয়ের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ ইঁহাকে অর্থ, বস্ত্র, শস্য, গাভী, স্বর্ণ ইত্যাদি কত প্রকার দ্রব্য দান করিয়া থাকে, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত ইঁহার ঐরূপ কিছুই সেবা করিতে পারি নাই; এখন ইঁহার এই সামান্য আদেশ প্রতিপালন

করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ইঁহার সেবা করা হয়। মনে মনে এই প্রকার বিচার করিয়া মহাপুরুষ পাঠক মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন—"বণিকের নিকট হইতে মজুরির পয়সা বা কোনও প্রকার প্রতিদান আমি গ্রহণ করিব না।" ইহা শুনিয়া বণিক্ বলিল, "তাহা কি হয়? না হয় দুই আনার স্থলে আমি চারি আনা মজুরি দিব।" মহাপুরুষ তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিলেন, "চল, পয়সা দিতে হবে না, আমি তোমার মোট পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।" বণিক্ বলিল, "পরিশ্রম করিয়া পারিশ্রমিক লইতে ক্ষতি কি?" মহাপুরুষ নিরুত্তরে বণিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ভাগবত পাঠক মহাশয় লোকটির ঐরূপ উদার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং শ্রোতাদিগকে বলিলেন, "লোকটির বেশ নিঃস্বার্থ ভাব।"

এদিকে বণিক চারি আনা মজুরি দিতে হইবে ভাবিয়া লোকটীর মস্তকে বেশী করিয়া মোট চাপাইয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। আমাদের পরিচিত মহাপুরুষও নীরবে মোট বহন করিয়া চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মহাপুরুষ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এই বণিক্ সমস্ত জীবন প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে; কখনও সাধুসঙ্গ, দান ব্রত, তপস্যা, গরীব দুঃখীর সেবা অথবা অন্য কোনপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই। অতএব ভবিষ্যতে ইহার মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা, কারণ, কৃত কর্ম্ম আপন শুভাশুভ ফল প্রসব করিবেই করিবে; ইহার প্রবল কাঞ্চন-লিপ্সা ইহাকে চিরকাল পার্থিব বিষয়েই নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং বিষয় ভোগে বাস্তবিক শান্তি-সুখ কে কবে পাইয়াছে? মহাপুরুষ এই প্রকার মনে মনে বিচার করিয়া বণিকের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং কিসে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই একান্তমনে চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন—"দেখ, শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গের ফলে সহস্র ঘণ্টা কাল স্বর্গ বাস লাভ হয়, এবং কোন ব্যক্তির শুভকর্ম্ম অল্প থাকিলে, ধর্ম্মরাজ তাহাকে মৃত্যুর পর, ঐ শুভকর্ম্মের ফলই অগ্রে ভোগ করান। অতএব তুমি যত পার সাধুসঙ্গ কোরো। সাধুজনের সঙ্গ করা স্বর্গবাসাপেক্ষা বড় বলিয়া জেনো। আমার এই কথাটি বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া রেখো।" এইরূপে তিনি বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিষয়াসক্ত বণিক্ মহাপুরুষের ঐরূপ কথায় কিন্তু কিছুমাত্র ভিজিল না। ভাবিল—লোকটা বুঝি পাগল—পাগলামি করছে; কিন্তু পাগলের কথায় সম্মতি না দিলে সে যদি এইখানে মোটটি নামাইয়া দিয়া আর বহন করিতে অসম্মত হয়, তাহ

হইলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে। সেজন্ত অগত্যা সম্মতির ভান দেখাইয়া বলিল—তাহাই হইবে। মহাপুরুষ বণিকের মোট তাহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন কিন্তু বণিক্ পয়সা দিতে চাহিলে কিছুতেই তাহা গ্রহণ না করিয়া দিবা অবসানে পুনরায় নিজ গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। বণিক্ও যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, সেইভাবেই দিন কাটাইতে লাগিল। সাধুর সে কথা মনেও আনিল না।

কালের প্রভাবে নামরূপবিশিষ্ট সকল বস্তু ও ব্যক্তিই পরিবর্ত্তন-স্রোতে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কত রাজা, রাজধানী, প্রাসাদ, দেবালয়, সাধু, অসাধু এইরূপে লয় পাইয়াছে, তাহার পরিচয় কে দিতে পারে? অতএব কাল-প্রবাহে একদিন উক্ত মহাপুরুষের শরীরত্যাগ এবং ঐ বণিকের মৃত্যু হওয়াও কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে ঘটনাচক্রে একদিনেই দুজনের মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর পর যমরাজের নিকট বণিকের সমস্ত জীবনের সদসৎ কার্য্যের পর্য্যা-লোচনা হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তাহার অতীত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি-লেন, সমস্ত জীবনে সে সৎকার্য্য কিছুই করে নাই, কেবল একদিন এক ঘণ্টামাত্র সাধু-সঙ্গ করিয়াছে; উহার ফলে সহস্র ঘণ্টা কালমাত্র স্বর্গভোগ করিবে। ধর্ম্মরাজ বণিক্‌কে বলিলেন, "তোমার অত্যল্পমাত্র শুভকর্ম্ম, তাহার ফল অগ্রেই ভোগ করিয়া লও, অগ্রেই সহস্র ঘণ্টা স্বর্গে কাটাইয়া এস।" ধর্ম্মরাজের কথার ভাবেই বণিক্ বুঝিল, তাহার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। তখন তীব্র অনুতাপ আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল এবং সেই পাগলার কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। সে ব্যাকুলহৃদয়ে ভাবিল, হায় সেই পাগলার সঙ্গ এক ঘণ্টা করিয়াছিলাম বলিয়াই আমার অদৃষ্টে এই স্বর্গসুখভোগটুকু হইতেছে; যদি দিন থাকিতে তাহার কথা শুনিয়া সাধু-সঙ্গ করিতাম, যদি একদিনও সাধু-সঙ্গ করিতাম, তাহা হইলে তাহার ফলে হয়ত সকল দুঃখের হাত হইতে এড়াইতাম। এখনও কি উহা করা চলে না? যদি চলে, তাহা হইলে সহস্র ঘণ্টা স্বর্গভোগের বিনিময়ে আমি আর এক ঘণ্টা যথার্থ সাধুর সঙ্গে কাটাই। বণিক্ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সহস্র ঘণ্টা স্বর্গভোগের পরিবর্ত্তে এক-ঘণ্টা সাধু-সঙ্গে বাস প্রার্থনা করিল। ধর্ম্মরাজ বণিকের কাতরতা দেখিয়া অগত্যা তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন এবং আপন অনুচরকে আদেশ করিলেন, "যাও, ইহাকে একঘণ্টা সাধু-সঙ্গ করাইয়া লইয়া আইস।"

অনুচর আদেশ পাইবামাত্র বণিক্‌কে পুণ্যময় লোকে সাধুদিগের সন্নিধানে উপস্থিত করিয়া বলিল, "ইহাই সাধু মহাত্মাদিগের আবাস, যাও, একঘণ্টা কাল

তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আইস; দেখিও, যেন এক ঘন্টার বেশী না হয়।" বণিক্ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পূর্ব্বপরিচিত মোট বহনকারী সেই পাগলা বা মহাপুরুষ উপবেশন করিয়া আছেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শে আরও কয়েকটী উজ্জ্বল-শরীরী মহাত্মা বসিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে বেদান্ত-চর্চ্চা ও হরিকথা-প্রসঙ্গও হইতেছে। বণিক্ মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল এবং ঐ প্রসঙ্গ তদ্গতচিত্তে শুনিতে লাগিল।

শুনিতে শুনিতে বণিকের অল্পে অল্পে বিবেকজ্ঞানের উদয় হইয়া বিশেষ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা জন্মিল। ঐ ইচ্ছা-প্রভাবে তাহার সকল অনিত্য (অসৎ) পদার্থে বৈরাগ্য জন্মিয়া অল্পকাল-মধ্যেই সে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ ষট্‌সম্পত্তির অধিকারী হইল এবং অবশেষে মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠধন মুমুক্ষুতাও লাভ করিল। এইরূপে অজ্ঞান অমানিশার অবসান হইয়া জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে তাহার মন নবীনালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অতঃপর সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন বণিক্

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥" (১)

যে জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন এবং নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহাকে সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করিলেন।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (১)

এইরূপে সেই পরাবর ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া বণিকের হৃদয়ে অবিদ্যা-জনিত বিষয়বাসনার লোপ হইল, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইল এবং সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হইল। আপন চিন্ময়-স্বরূপের উপলব্ধি করিয়া তখন সে বুঝিতে সমর্থ হইল—"পাশবদ্ধ জীব—পাশমুক্ত শিব"।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" (১)

যেমন প্রবহমান নদীসমূহ নিজ নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষসকলেও নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে অভেদ প্রাপ্ত হন।

(১) মুণ্ডকোপনিষৎ।

তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। (মুণ্ডকোপনিষৎ)

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হয়েন।

সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া কোন্ দিক্ দিয়া কেমনে কত সময় যাইতেছে, বণিকের তাহার কিছুমাত্র হুঁস রহিল না। সে যমদূত, নরকভোগ, তাহাকে এক ঘণ্টার ভিতর ফিরিতে হইবে ইত্যাদি সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তমনে কাল কাটা-ইতে লাগিল। যমদূত এদিকে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বণিক্ আসিতেছে না দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং ধর্ম্মরাজের নিকট আসিয়া সমস্ত জানাইল। ধর্ম্মরাজ সকল কথা শুনিয়া ত্রস্তভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কুপিত হইয়া বণিক্‌কে ধরিবার জন্য ঐ মহাপুরুষ-মণ্ডলীমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের শান্তি ভঙ্গ কর নাই ত ?" দূত বলিল, "না"। যমরাজ তচ্ছ্রবণে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বড় ভাল করিয়াছ।" অতঃপর তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গকে নিকটে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, "যে স্থানে সাধুসঙ্গ, হরিকথা, বেদান্তচর্চ্চা ও পরব্রহ্মের চিন্তা হইবে, যথার্থ অনুতপ্ত লোক শান্তির আশায় তথায় আশ্রয় লইলে, তোমরা তাহাকে কখনও আক্রমণ করিতে যাইবে না।"

বণিক্ মহাপুরুষকে দিয়া অধিক মোট বহন করাইয়াছিল; মহাপুরুষের কিন্তু সে বিষয় আদৌ লক্ষ্য হয় নাই। মহাপুরুষ তাহার অবশ্যম্ভাবী দুঃখে নিজ স্বভাবগুণে অহেতু দয়ার্দ্র হইয়া ভাবিয়াছিলেন, আহা, কিরূপে ইহার এরূপ উপকার করা যায়, যাহাতে ইহার আর কখনও দুঃখকষ্ট হইবে না, যাহাতে ইহার জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের এককালে নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভে পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। মহাপুরুষের ঐ ইচ্ছাপ্রভাবেই যে বণিকের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল, এ কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সে জন্যই সর্ব্বশাস্ত্র বারবার বলিতেছেন— "হে নর, তুমি ধনী হও, দরিদ্র হও, ব্রাহ্মণ হও, চণ্ডাল হও, শিক্ষিত হও, অশিক্ষিত হও, অধিকারী হও, অনধিকারী হও, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।' হে জীবগণ, অজ্ঞান মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হও, জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-গণের নিকট গমন করিয়া পরম পুরুষ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও। যে পর্য্যন্ত স্ব-স্বরূপ জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইও না। দাবা-নলে সমস্ত বন দগ্ধ হইলেও, বনমধ্যস্থিত সরোবরের তটবর্ত্তী দূর্ব্বাঘাস সকল জলাশয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া যেমন দাবদাহন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার হে নর, তোমরাও সাধুসঙ্গের অনুষ্ঠানে শোক-দুঃখ-জন্ম-জরা-মৃত্যু-রূপ সংসার দাবদাহন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পরম পুরুষ পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও—

পরমানন্দ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় জানিও, পরশমণির সংস্পর্শে তোমরাও সোণা হইবে।"

ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ।

(এবারে আমরা ভারতীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশনে পঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ম (নববিধান), রামানুজীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করিলাম।)

ব্রাহ্মধর্ম্ম (নববিধান)।

(অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।)

অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতই ধর্ম্মসঙ্ঘের অধিবেশনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, কারণ, বিধাতার ইচ্ছায় ভারতে সকল ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ধর্ম্ম অর্থে এদেশে কেবলমাত্র দার্শনিক ভাব বা মতবাদ বুঝায় না, কিন্তু ধর্ম্মের উচ্চাদর্শে গঠিত জীবনই বুঝায়। সুতরাং এখানে এমন সুযোগ থাকা প্রয়োজন, যাহাতে হিন্দু-মুসলমানাদি বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পরের ভাব গ্রহণ করুন বা না করুন, অন্ততঃ পরস্পরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

নববিধান প্রাচীন-কালাগত নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটী সম্প্রদায়-বিশেষ নহে, কারণ, উহা আপনাকে সমন্বয়ের ধর্ম্ম বলিয়া দাবী করে। উহা অন্যান্য ধর্ম্মকে ভগবানের বিধান বলিয়া স্বীকার করে আর নিজেকেও যথাকালে তাহাদেরই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করে। কেশবচন্দ্র সেন আপনাকে ইহার একজন সামান্য প্রচারক ব্যতীত অপর কোন উচ্চ পদবীর দাবী করেন নাই।

নববিধানের নিম্নলিখিত কয়েকটী উদ্দেশ্য আছে,—

(১) জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের সমন্বয় সাধন।

(২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সমুদয় ধর্ম্মসঙ্ঘকে (Church) এক অবিভক্ত ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসঙ্ঘে পরিণত করা।

(৩) সমুদয় ধর্ম্মবিধানের মধ্যে একত্ব অনুসন্ধান।

(৪) প্রাচীন ও আধুনিক সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণের ভিতর যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা।

(৫) সকল শাস্ত্রের সত্যগুলিকে এক অনন্ত ও অলিখিত শাস্ত্রে পরিণত করা।

(৬) জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা।

(৭) বড় বড় মনীষিগণের মহান্ চিন্তারাশি এক্ষণে যে রূপক ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দ্বারা সমাবৃত আছে, তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করণ।

(৮) বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনার আলোচনা দ্বারা ধর্ম্মবিজ্ঞান গঠন।

নববিধান—প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে। উহা সমুদয় ধর্ম্মাচার্য্য ও সাধুগণের ভিতর সমন্বয় আছে বলিয়া স্বীকার করে; উহা সকল শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য দর্শন করে এবং সকল ধর্ম্মবিধানকেই ভগবানের এক উদ্দেশ্যেরই ক্রমবিকাশ বলিয়া মান্য করে, যাহাতে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব, তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মিলন ও শান্তি স্থাপিত হয়, উহা তাহারই পক্ষপাতী। উহা যুক্তি ও বিশ্বাস, যোগ ও ভক্তি, সন্ন্যাস ও সামাজিক কর্ত্তব্য—এই সকলেরই সমন্বয় সাধন করে—উহা কালে সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়কেই এক রাজ্যে ও এক পরিবারে পরিণত করিতে চায়। উহা বিশ্বাস করে যে, সাধারণভাবে সকলেই ও বিশেষভাবে কোন কোন ব্যক্তি ভগবানের আদেশ পাইয়া থাকে। উহা বিশ্বাস করে যে, বিধাতা যেমন সাধারণভাবে সমুদয় জগৎসংসার পরিচালিত করিতেছেন, তদ্রূপ বিশেষভাবে ব্যক্তি বা জাতিবিশেষকেও পরিচালিত করেন। উহা বিভিন্ন শাস্ত্রকে ততদূর পর্য্যন্ত স্বীকার ও মান্য করে, যতটুকু প্রত্যাদিষ্ট মনীষিগণের জ্ঞান-ভক্তি-সাধুতার বর্ণনা এবং জাতিবিশেষের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ বিধানের পরিচয়। ঐ সকল শাস্ত্রের ভাব ঈশ্বর-লব্ধ, কিন্তু ভাষা মানব-রচিত। উহা জগতের ধর্ম্মাচার্য্য ও সাধুগণকে ততদূর পর্য্যন্ত স্বীকার ও মান্য করে, যতদূর তাঁহারা ঈশ্বরীয় স্বভাবের বিভিন্ন ভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং জগতের শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সংক্ষেপে নববিধানের তিনটী লক্ষণ বলা যাইতে পারে; ১ম, অপরোক্ষতা, ২য়, সাংশ্লেষিকতা ও উদারতা, ৩য়, আধ্যাত্মিকতা।

১ম, অপরোক্ষতা—ইহার দুইটী দিক্ আছে। 'না'এর দিকে উহা অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত ধর্ম্মসঙ্ঘ ও অভ্রান্ত গুরু, ধর্ম্মাচার্য্য বা পরিত্রাতা স্বীকার করে না; আর 'হাঁ'এর দিকে উহা ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ ও সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ স্বীকার করিয়া থাকে।

২য়, সাংশ্লেষিকতা ও উদারতা—নববিধান সকল ধর্ম্মাচার্য্য ও সাধুগণের ভিতর সমন্বয়, সকল শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য ও সমুদয় বিধানের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা দেখিয়া থাকে।

বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনার সমালোচনা রূপ নূতন বিজ্ঞানের সহায়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশঃ পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে, আর ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের একত্র সমাগমে এমন ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা একেবারে অপর ধর্ম্মকে বাদ দিতে পারি না। অবশ্য অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ সকল আর বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার থাকিবে না। এই হিসাবেই সমগ্র সমাজে এক ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩য়, আধ্যাত্মিকতা—নববিধান বলে, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, ইহা প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যময়—জড়বস্তু চৈতন্যের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। অতএব যে পরিমাণে আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিবে, যে পরিমাণে দিব্য দৃষ্টি উন্মীলিত হইবে, সেই পরিমাণে জগৎ ও জীবনের তত্ত্ব বুঝা যাইবে। নববিধানের দুইটী বিশেষ মতের আলোচনাস্থলে এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

(ক) সাধুদের নিকট তীর্থযাত্রা ঃ—এই ব্যাপারটী বুঝিবার জন্য দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—জীবনের আদর্শসমূহ কেবল সূক্ষ্মভাব বিশেষরূপে লইলে চলিবে না, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে ঐ সকল আদর্শ যে ভাবে প্রকাশিত—তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে, আর ঐ সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে কেবল পুস্তকে যে ভাবে বর্ণিত, তাহা দেখিলে চলিবে না, তাঁহাদিগকে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

(খ) নববিধান সংসার ও ধর্ম্ম, রবিবার ও অন্য বারের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতে চায় না, সংসারের সমুদয় কর্ম্মকে উহা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করে। এই ভাবেই উহা জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, যথা, ব্যাপ্টিজ্‌ম্, আরতি, হোম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া থাকে। উহার উদ্দেশ্য নূতন নূতন অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করা নহে। সমুদয় ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা। উহার আদর্শ—সরল, স্বাভাবিক জীবন লাভ—জীবনের সমুদয় কর্ম্ম সেই অনন্ত-স্বরূপ চৈতন্যে সমর্পণ—উহা ঈশ্বরের সহিত প্রেমযোগে অনন্ত জীবন লাভ ব্যতীত অন্য কোন স্বর্গ চাহে না।

রামানুজীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

(রাজগোপালাচার্য্য, মান্দ্রাজ।)

রামানুজাচার্য্য যে দার্শনিক মতের পোষকতা করিতেন, তাহার নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। এক ব্রহ্মই আছেন, আর সকলেই তাঁহার প্রকাশ বা গুণ বা শক্তি।

চিৎ (জীবাত্মা সকল) ও অচিৎ (জড় প্রকৃতি) ইহারা তাঁহার গুণস্বরূপ—উহারা মায়াবিজৃম্ভিত বা মিথ্যা নহে, সত্য। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দময়। ব্রহ্মে কোন বিচার নাই ; কিন্তু জীবগণের জ্ঞান কখন সঙ্কোচ, কখন বা বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাহারা বিকারী। জড়প্রকৃতি আবার ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীর মতে এই পরিণাম আপাতপ্রতীয়মান মাত্র, তজ্জন্য তাঁহারা উহাকে বিবর্ত্ত নাম দেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে কিন্তু পরিণাম সত্য। ব্রহ্ম দুই ভাবে থাকেন। যখন প্রলয়াবস্থা, তখন জীব-জগৎ তাঁহাতে সুপ্তভাবে অবস্থান করে, যখন আবার তিনি সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে উহারা ব্যক্তভাব ধারণ করে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য—জীবের কর্ম্মফল ভোগ। ব্রহ্মের নিজের কিন্তু সৃষ্টিতে কোন স্বার্থ নাই, উহা তাঁহার লীলামাত্র। অদ্বৈতবাদীর ন্যায় ইঁহারাও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং উহা বুঝিবার জন্য যুক্তির প্রয়োজনীয়তাও মান্য করেন, তবে উঁহাদের সিদ্ধান্তে অনেক পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলে আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, রামানুজের মতে কিন্তু যত দিন জীবন, তত দিন কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত রামানুজীয় মতে নিত্য মুক্ত আত্মা, স্বর্গ, ব্রহ্মের বিভিন্ন অবতার প্রভৃতি স্বীকৃত আছে। রামানুজের মতে এগুলি বেদপ্রমাণে জানিতে পারা যায়, আর যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলেও উহাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। রামানুজ শঙ্করের মত ব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ দ্বিবিধ ভাব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদের যেখানে আপাততঃ সর্ব্বগুণরহিত ব্রহ্মের উপদেশ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে তথায় তাঁহার অসৎ গুণের নিষেধ করা হইয়াছে মাত্র। রামানুজের মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ বটেন, তবে শঙ্করের মতে জগৎ মায়া বা বিবর্ত্ত মাত্র, রামানুজের মতে উহা পরিণাম।

রামানুজ প্রধানতঃ প্রপত্তিমার্গের উপদেশ দিয়াছেন। প্রপত্তির অর্থ এই যে, ভগবানের প্রপন্ন বা শরণাপন্ন হও। মানব মুক্তির জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করুক, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত তাহা কোন ফলদায়ক হয় না, এই ভাবটী বুঝিতে হইবে। ভগবানের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহার শক্তি ও দয়ার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে। যদি মনের এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও এবং মধ্যে মধ্যে পতন হইলেও, মুক্তির কোন প্রতিবন্ধক হইবে না। একবার এইরূপ প্রপত্তিগ্রহণ করিতে পারিলেই হইল।

রামানুজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আলোয়ার নামধারী ভক্তসাধকগণ তামিল ভাষায় ভক্তিপূর্ণ অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই আলোয়ারগণ সকল জাতীরই ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ষট্‌কোপ-নামা জনৈক আলোযার খুব প্রসিদ্ধ। ইঁহাদেব কৃত গীতাদি এখনও দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে গীত হইয়া থাকে। আলোয়ারগণের ভাব না বুঝিলে রামানুজীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝা কঠিন।

রামানুজ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ৭৪ জনকে তাঁহার মত ও শিক্ষাপ্রচারে নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমান রামানুজী বৈষ্ণবগণ এই সকল আচার্য্যগণের কোন না কোন আচার্য্যকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক-রূপে স্বীকার করেন। আর সহজে এইরূপ এক সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায়ান্তরে যাওয়া উচিত নহে। দীক্ষাগ্রহণ বৈষ্ণবের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষা অর্থে মন্ত্রগ্রহণ, তাপ অর্থাৎ হস্তে বিষ্ণুর শঙ্খচক্রের তপ্ত ছাপ গ্রহণ, কপালে তিলকধারণ ও গুরুদত্ত নামগ্রহণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম। (হীনযান)

(ধর্ম্মপাল।)

পালি জাতকগ্রন্থে বুদ্ধদেবের ৫৫০ পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটীর বিবরণ এইরূপ। অনেক সহস্র কল্প পূর্ব্বে বুদ্ধ গৌতম সুমেধা নামক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিস্তর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী ও বেদজ্ঞ ছিলেন। সংসারের দুঃখরাশি হইতে মুক্তিলাভের বাসনায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ধ্যানতপস্যাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। সেই সময়ে বুদ্ধদীপঙ্কর লোককে নির্ব্বাণমার্গ উপদেশ করিতেছিলেন। সুমেধা যথায় তপস্যা করিতেন, তথাকার লোকদের কর্ত্তৃক তিনি একবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লোকেরা তাঁহার সম্মানার্থ রাস্তাঘাট সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল। সুমেধা লোকদিগকে রাস্তাঘাট সাজানর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন, বুদ্ধদীপঙ্করের শুভাগমন হইবে বলিয়া এই সমুদয় আয়োজন, তখন 'বুদ্ধ' এই শব্দটী শুনিয়াই তাঁহার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল, কারণ, এই নাম সচরাচর কর্ণগোচর হয় না। তখন তিনি রাস্তার কিয়দংশ স্বয়ং সাজাইবার জন্য লোকেদের নিকট অনুমতি লইয়া সাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সজ্জা শেষ হইতে না হইতে বুদ্ধদীপঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সুমেধা গিয়া স্বয়ং রাস্তায় দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, যাহাতে বুদ্ধ তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। তখন তাঁহার মনে উদয় হইল, আমি বুদ্ধদীপঙ্করের প্রসাদে এই মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে

পারি, কিন্তু আমার ন্যায় বীরের তাহা সাজে না। আমি স্বয়ং ইঁহার ন্যায় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া শোকদুঃখের পারে যাইয়া অসংখ্য জীবকে শোকদুঃখের পারে লইয়া যাইব। তিনি এইরূপ সংকল্প করিলে বুদ্ধদীপঙ্করও তাঁহাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, অনেক সহস্র কল্প পরে এই ব্রাহ্মণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ-গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং সংসারবাসী জনগণকে উদ্ধার করিবেন। তাহার পর সুমেধা দানপারমিতা, শীলপারমিতা, নিষ্কামপারমিতা, প্রজ্ঞাপারমিতা, বীর্য্যপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, সত্যপারমিতা, অধিষ্ঠান (দৃঢ়ত্ব)-পারমিতা, মৈত্রী-পারমিতা ও উপেক্ষাপারমিতা—এই দশটী পারমিতা (এই সকল বিভিন্ন গুণের চরমোৎকর্ষ) জন্মে জন্মে সাধন করিয়া পরিশেষে গৌতম বুদ্ধ হইলেন।

গৌতমরূপে জন্মিবার ঠিক পূর্ব্বজন্মে তিনি তুষিত স্বর্গে দেব শ্বেতকেতুরূপে বাস করিতেছিলেন, দেবগণের প্রার্থনায় তিনি কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের রাজ্ঞী মায়াদেবীর গর্ভে লুম্বিনী নামক রাজোদ্যানে ২৫৩২ বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। দেবগণ বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আসিয়া তাঁহার স্তবাদি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি জগতের মধ্যে প্রধান, জ্যেষ্ঠ ও প্রথম। সেই দিন ঋষি কালদেবল আসিয়া বুদ্ধকে দর্শন করেন ও বলেন, ইনি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন, কিন্তু যখন তাঁহার প্রকাশ হইবে, তখন তিনি তাঁহার লীলা দেখিতে পাইবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। পঞ্চম দিনে রাজাজ্ঞায় ১০৮ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আহূত হইয়া এই বালকের ভবিষ্যৎ বলিবার জন্য আদিষ্ট হইলে তাঁহাদের দশজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া বলেন, ইনি সংসারে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী ও সংসার ত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন। রাজা তিনি যাহাতে সন্ন্যাস অবলম্বন না করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অপরিমিত বিলাসের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রাসাদে রাখিয়া দিলেন, যাহাতে কোন প্রকার মৃত্যু, ব্যাধি বা জরা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত না হয়। ইতিমধ্যে ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার সমবয়স্কা যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সেই দিনই তাঁহার নগরভ্রমণের বাসনা হয় এবং রাজার যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও মৃত-দেহ, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও ভিক্ষু তাঁহার নয়নগোচর হওয়াতে, তিনি সংসারের অসারতা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্ন্যাসজীবনই শান্তি লাভের একমাত্র উপায় ভাবিয়া ঐ ব্রতগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রাজপ্রেরিত অনুচর তাঁহার পুত্র হইয়াছে সংবাদ প্রদান করায়, তিনি "রাহুল" (অর্থাৎ প্রতিবন্ধক) এই শব্দটী উচ্চারণ করেন। তাহাতেই পুত্রের নাম রাহুল রাখা হয়। পথিমধ্যে

গমনকালে কিসাগোতমী নাম্নী জনৈক শাক্যরমণী তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া এক গাথা গান করেন, তাহাতে "নিব্বুত" শব্দটী অনেকবার ছিল। সেই রমণী উহা সুখী অর্থে ব্যবহার করিলেও, তাঁহার ঐ শব্দ দ্বারা নির্ব্বাণের ভাব জাগ্রৎ হয়। যাহা হউক, তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পরমাসুন্দরী রমণীগণ নৃত্যগীতবাদ্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার উহা ভাল লাগিল না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, তাহারাও ঘুমাইল। যখন তিনি জাগ্রৎ হইলেন, তখন তাহাদের নিদ্রিতাবস্থা দেখিয়া এক বীভৎস ভাব তাঁহার অন্তরে উদয় হইল। তাঁহার অন্তঃকরণে তীব্র বৈরাগ্য উদয় হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই সংসারত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার পত্নী-পুত্রকে দর্শনের ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহার গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু পাছে পত্নী জাগিয়া তাঁহার মহা অভিনিষ্ক্রমণের বিঘ্ন জন্মায়, তজ্জন্য সঙ্কল্প করিলেন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত না হইয়া পুত্রমুখ দর্শন করিবেন না।

সারথি চন্নার সমভিব্যাহারে নিজ প্রিয় ঘোটক কণ্ঠকের সাহায্যে তিনি অনোমা নদী পর্য্যন্ত যাইলেন, পরে ঐ নদী পার হইয়া নিজ মণিমাণিক্য-খচিত বসনভূষণ ও ঘোটক সারথির হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তখন তরবারি-সাহায্যে নিজ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া হস্তে লইয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, যদি আমি বুদ্ধ হইতে পারি, তবে উহা মাটিতে পড়িবে না। শক্র আসিয়া হীরক-খচিত পাত্রে করিয়া ঐ পবিত্র কেশরাশি স্বর্গে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মা ঘটিকর গৈরিকবসনধারী ব্যাধরূপে তাঁহার নিকটে আসিলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের সহিত তদীয় বস্ত্রের বিনিময় করিলেন ও তৎপ্রদত্ত ভিক্ষাপাত্র লইয়া পদব্রজে বিম্বিসার রাজার রাজধানী মগধান্তর্গত রাজগহ বা রাজগৃহে যাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লোকে এই ভিক্ষুকের অলৌকিক তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নানাবিধ তর্ক করিতে লাগিল ও পরিশেষে রাজাকে সম্বাদ দিল। রাজা তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। লোকেরা গিয়া দেখিল, তিনি পাণ্ডবশৈলে যাইয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু আহারের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু উদর কোন মতেই উহা যেন গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। পরিশেষে তিনি মনকে অনেক বুঝাইয়া সেই কদন্ন আহার করিলেন। লোকেরা গিয়া রাজাকে সংবাদ দিলে রাজা স্বয়ং সেখানে আগমন করিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন ও তাঁহার অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাণলাভে আগ্র

দেখিয়া পরিশেষে প্রার্থনা করিলেন, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রথমেই যেন তাঁহার রাজ্যে পদার্পণ করেন।

পাণ্ডবশৈল হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠ আচার্য্য অলার কালাম ও উদ্দক রামপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা 'অরূপ ব্রহ্মাবস্থা' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঐ অবস্থায় বাহ্যা-নুভূতি-সমূহ এককপ প্রসুপ্তাবস্থায় থাকে এবং ৮৪০০০ কল্প পর্য্যন্ত জ্ঞান-জনিত আনন্দলাভ হয়। তিনিও ঐ অবস্থা লাভ করিয়া তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নের-ঞ্জরা-নদী-তীরবর্ত্তী উরুবেলা নামক মনোরম স্থানে ৬ বর্ষ কঠোর তপস্যা করেন। এই স্থানেই পাঁচজন ভিক্ষু তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তিনি একটী মাত্র তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন, শেষে তিনি অস্থিচর্ম্মসার হইলেন এবং একদিন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেবতারাও ভাবিলেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি বুঝিলেন, এতদূর কঠোর তপস্যা কোন ফলদায়ক নহে, সুতরাং তিনি অল্প অল্প করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে সাধনভ্রষ্ট মনে করিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শেষে জ্ঞান লাভের পূর্ব্ব রাত্রে এক স্বপ্ন দর্শনে তিনি বুঝিলেন, বেশাখী পূর্ণিমার দিনে তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন। তাই তিনি অতি প্রত্যুষে যাইয়া অজপাল বটবৃক্ষের নিম্নে বসিলেন। এখানেই সুজাতা আসিয়া তাঁহাকে পায়সান্ন প্রদান করেন। তিনি স্নানান্তে উহা ভক্ষণ করিয়া অপরাহ্নে বোধিবৃক্ষতলে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া এই দৃঢ়সংকল্প করিলেন,

> ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
> ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
> অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
> নৈবাসনাৎ কায়ং সমুচ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে বসিয়া আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্ অস্থি মাংস নষ্ট হইয়া যাক্, কিন্তু বহুকল্পে যাহা দুর্লভ, এমন বোধিজ্ঞান না পাইয়া এই আসন হইতে আমার শরীর বিচলিত হইবে না।

বোধিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই কামলোকের রাজা মার ও তাঁহার সৈন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবগণ এই যুদ্ধ দর্শন করিতে আসিলেন, কিন্তু শেষে পলায়ন করিলেন। মার বলিলেন, "সিদ্ধার্থ, এই আসন হইতে উঠ, এ আসন

তোমার নহে, আমার অধিকৃত।” বুদ্ধ বলিলেন, “মার, তুমি দশ পারমিতার সাধন কর নাই, পঞ্চ মহাদান কর নাই, অথবা বোধির জন্য বা জগতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা কর নাই, এ আসন তোমার নহে, আমার।” তখন মারের সৈন্যগণ পলায়ন করিল, দেবগণ সমাগত হইয়া তাঁহার পূজা করিল। তিনিও বিজয়গাথা গান করিলেন, ঐ গাথার তাৎপর্য্য এই :—

অনেক জন্মরূপ গৃহ আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—আমি গৃহনির্ম্মাণ-কর্ত্তার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অনেক কঠোর চেষ্টা করিয়াছি, কিছু ফল হয় নাই। এখন হে গৃহনির্ম্মাণকর্ত্তা, তোমায় জানিতে পারিলাম, তুমি আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, অজ্ঞান এই গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখন আমি নির্ব্বাণলাভের উদ্দেশে ইহাকে অতিক্রম করিয়া নিরাপদে চলিলাম।

বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ সাতদিন বোধিবৃক্ষ-তলে বসিয়া নির্ব্বাণসুখ উপভোগ করিলেন, দ্বিতীয় সপ্তাহে বোধি গৃহের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তৃতীয় সপ্তাহে ধ্যানাবলম্বন করিয়া একটী গৃহে পাদচারণা করিলেন, চতুর্থ সপ্তাহে বটবৃক্ষের নিম্নে যাপন করেন, তথায় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্ন করে, কি উপায়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচলিন্দ বৃক্ষতলে প্রেম ও পবিত্রতায় যাপিত নির্জ্জনবাসের প্রশংসা করিতে করিতে যাপন করিলেন। ষষ্ঠ সপ্তাহে তিনি রাজায়তন বৃক্ষের নিম্নে যাপন করেন ও তথায় তাঁহার সহিত তপুস্স ও ভল্লুক নামক বণিগ্‌দ্বয়ের মিলন হয়। সপ্তম সপ্তাহে অজপাল বৃক্ষের নিম্নে যাপন করেন ও ব্রহ্মার অনুরোধে ধর্ম্মপ্রচারে কৃতসংকল্প হন।

প্রথম সপ্তাহে বুদ্ধ দ্বাদশ নিদান অর্থাৎ সংসারের উৎপত্তির কারণ সাক্ষাৎকার করিলেন। সেই গুলি এই,—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ। অবিদ্যা হইতেই ক্রমপরম্পরায় পর পর গুলির উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা অর্থাৎ চতুরার্য্য সত্যের জ্ঞানাভাব হইতে সংস্কার অর্থাৎ সূক্ষ্ম বাসনার উদ্ভব, তাহা হইতে বিজ্ঞান অর্থাৎ সমুদয় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মূলকারণস্বরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি। তাহা হইতে নামরূপ। নাম অর্থে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি, ও রূপ অর্থে সূক্ষ্ম ক্ষিতি জল বায়ু ও তেজ। তাহা হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণত ভৌতিক কায়ার অন্তর্গত ইন্দ্রিয়। তাহা হইতে স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ। তাহা হইতে বেদনা অর্থাৎ সুখদুঃখাদির বোধ। তাহা হইতে তৃষ্ণা অর্থাৎ সুখস্পৃহা। তাহা হইতে উপাদান অর্থাৎ কায়িক, মানসিক ও বাচিক বিবিধ চেষ্টা। তাহা হইতে ভব

অর্থাৎ কর্ম্মমূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম। তাহা হইতে জাতি অর্থাৎ জন্ম বা দেহধারণ এবং দেহ-ধারণ করাতেই জরামরণ হইতেছে। অতএব অবিদ্যার নাশ করিতে পারিলে ক্রমপরম্পরায় জরামরণ নিবারণ হইবে।

ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বারাণসীতে যাইয়া, তাঁহার পূর্ব্বতন পঞ্চশিষ্যের নিকট মধ্যপথ, চতুর্বার্য্য সত্য ও অষ্টমার্গের উপদেশ করেন। পরে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তিনি ৬০ জন ভিক্ষুকে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে প্রেরণ করেন। এবং স্বয়ং জীবনের অবশিষ্ট কালে আচণ্ডালে ধর্ম্ম বিতরণ করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক পালি ভাষায় লিখিত। উহা তিন ভাগে বিভক্ত যথা,—বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও অভিধম্ম পিটক। ইহাদের প্রত্যেকটীতে আবার অনেকগুলি করিয়া গ্রন্থ আছে। ইহাদের টীকা ও টীকার টীকা সমেত মূল পালি ভাষায় ও পালি অক্ষরে লিখিত গ্রন্থ সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামরাজ্যের মন্দিরের পুস্তকালয়সমূহে আছে এবং বিগত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে সুবিখ্যাত পালি-পণ্ডিত রাইস ডেভিড্‌স রোমান অক্ষরে এই সকল গ্রন্থ ছাপাইতেছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরবিশ্বাস কিরূপ, এই প্রশ্নের উত্তরে এই প্রবন্ধে দিঘনিকায়ের কেবদ্ধ সুত্ত হইতে একটী বুদ্ধ-কথিত গল্প উদ্ধৃত হইয়াছে। জনৈক ভিক্ষুর একবার বাসনা হয়, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ কোথায় লয় হয়—সেই তত্ত্ব জ্ঞাত হইবেন। তিনি ইদ্ধি অর্থাৎ যোগসিদ্ধিবলে দেবগণ, ইন্দ্র ও পরিশেষে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াও ঐ তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না। শেষে তিনি ব্রহ্মার উপদেশে বুদ্ধের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের উত্তর প্রার্থনা করাতে তিনি বলিলেন, প্রশ্নটীই ঠিক হয় নাই। প্রশ্নটী এইরূপে করা উচিত,—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ কোথায় স্থিতি প্রাপ্ত হয় না? কোথায়ই বা দীর্ঘ হ্রস্ব, স্থূল সূক্ষ্ম, শুভ অশুভ নামরূপ একেবারে লয় হয়? আর এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হওয়া উচিত যে—অবিভাজ্য চৈতন্যে এবং অনন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে পৃথিবী, অপ্‌, তেজ ও মরুৎ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। জাতিভেদ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন, বুদ্ধগণ হয় ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইবেন, অন্য জাতিতে নহে। তবে বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। যেমন গঙ্গা সমুদ্রে মিলিত হইলে উহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রূপ বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিলে আর জাতিভেদ নাই। আর কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি জাতি, বংশানুসারে নহে।

বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্চ নীতি ও প্রেমের ধর্ম্ম, উহা দার্শনিক বিচারে বা ধর্ম্মমত স্থাপনে

তাদৃশ যত্ন করে না, চরিত্র ও সৎকর্ম্মের দিকেই ইহার প্রধান দৃষ্টি। এই কারণে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি উহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। অশোকের যে সকল তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। তিনি স্পষ্টতঃই সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের মত আনন্দের সহিত আলোচনার উপদেশ দিতেছেন।

কামাখ্যা ভ্রমণ।

[স্বামী সত্যকাম।]

যাত্রা।

সে আজ প্রায় আড়াই বৎসরের কথা। তখন শ্রীহট্ট জিলার নৈগাং পরগণায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় তন্নিবারণে তথায় মঠ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলাম এবং বুরো ধান হওয়ায় আমাদের তথাকার কার্য্যও প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। ঐ সময়ে একদিন সন্ধ্যাকালে কতিপয় স্থানীয় বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল যে, এইবার অন্নকষ্ট কমিল—এইবার দুঃখী গরিব দুটি খাইয়া বাঁচিবে—আর তাহা-দিগকে আমাদের নিকট সাহায্য লইতে হইবে না—বুরো ধান যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে এবং বাজারেও আসিতেছে ইত্যাদি। সকলে একবাক্যে ঐ কথাই বলিলেন এবং স্থির হইল, ঐ কার্য্য বন্ধ করিয়া ২রা বৈশাখ আমরা কলিকাতায় ফিরিব। পথিমধ্যে ৺কামাখ্যা দেবী দর্শন করিবার অভিপ্রায় পূর্ব্ব হইতেই আমা-দের ছিল। সে কথা উত্থাপন করাতে কেহ কেহ বলিলেন, "বেশ তো হইয়া যান না।" আবার কোন কোন ব্যক্তিও বলিতে ছাড়িলেন না যে, তাঁহারা বিশেষ-রূপে জ্ঞাত আছেন যে, সেখানে যাইলে মানুষ ভেড়া হইয়া যায়—দেশে ফিরিতে পারে না—তাতে আবার আমরা সাধু ও যুবাবয়স্ক! ঐ কথায় কিন্তু আমাদের সেখানে যাইবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়া গেল। মনে দেবী-দর্শনেচ্ছা ব্যতীত আর একটী ইচ্ছা বলবতী হইল—সেটী আর কিছুই নহে, কেবল আজকালকার দিনে মানুষ কি করিয়া ভেড়ারূপে পরিণত হয়, তাহাই দেখা।

নৈগাং পরগণার যে গ্রামটীতে আমাদের দুর্ভিক্ষমোচন-কেন্দ্র ছিল, তাহার

নাম কামারখাল। ক্রমে ২রা বৈশাখ আসিল। প্রাতেই আমাদের রওনা হইবার কথা ছিল; কিন্তু সবেগে বৃষ্টি হওয়াতে কার্য্যে তাহা ঘটিল না। আহারাদি করিয়া দ্বিপ্রহরে যদি বৃষ্টি থামে তো যাইব, মনে করিলাম। তাহাই হইল। বেলা আন্দাজ ২টার সময় রওনা হইলাম। যাত্রাকালে প্রতিবেশিগণ এবং আমাদের নিকট হইতে যাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অন্নকষ্টের হাত এড়াইয়াছিলেন, এমন অনেক দুঃখী লোকেরা বিদায় দিতে আসিলেন। সে সময়টা বড়ই হৃদয়বিদারক! কেহই আমাদের ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। সকলেরই ইচ্ছা যে, আমরা সেখানেই থাকিয়া যাই। গরিবেরা বলিল যে, খোদার মেহেরবাণীতে ও তাহাদের নসিবের জোরে এপ্রকার লোক এসেছিল, কিন্তু পুনরায় এ জীবনে তাহারা তাহাদের আর দেখা পাইবে কি না সন্দেহ। দুঃখিনী স্ত্রীলোকেরা অস্ফুটস্বরে কত কি বলিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পুরুষদের ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমাদের মনেও অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কি বলিয়া বিদায় চাহিব, সে ভাষাও মুখে আসিল না। ওদিকে কুলিরা দ্রব্যাদি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; বিলম্বও করিতে পারি না। কয়েকক্ষণ এ ভাবে থাকিয়া ব্যথিত হৃদয়ে সকলের মনে কষ্ট দিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা এখন আসি। যদি শ্রীভগবান্ কখনও দিন দেন তো আবার আসিব। এ কথায় কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই মনের আবেগে গা ভাসাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এ দৃশ্যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমাদেরও চক্ষে জল আসিল। পরে কুলিরা ব্যস্ত হওয়াতে আমাদের চমক ভাঙ্গিল এবং সকলকেই দুঃখ-সমুদ্রে ভাসাইয়া বিদায় লইলাম। পশ্চিম দিকে চলিলাম। একটী ছোট রকমের মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে পৌছিলাম। সকলেই আমাদের সহিত ঐ পর্য্যন্ত আসিলেন। প্রতিবেশী এবং গরিব পুরুষেরা নিকটেই দাঁড়াইলেন। স্ত্রীলোকেরা একটু দূরে একটী বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পারের নৌকা অপর পার হইতে আসিয়া ঘাটে লাগিল এবং আমাদের জিনিষপত্রাদি তাহাতে উঠান হইল। আমরাও সকলকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিলাম। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। সে শব্দ নদী পার হইবার পরও আমাদের কাণে আসিয়াছিল। যাহা হউক, আমরা নৌকায় উঠিলেই নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই দেখিতে পাইলাম যে, দুইটী কুকুর চীৎকার করিতে করিতে আমাদের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ছুটিয়া আসিয়া নদীজলে ঝম্প প্রদান করিল এবং আমাদের

নৌকাভিমুখে সন্তরণ করিয়া আসিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই দুইটী কুকুরকে অস্থিচর্ম্মসার দেখিয়া আমরা আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট খাইতে দিতাম। এক্ষণে তাহাদের ঐ অবস্থা দেখিয়া কাজেই আমরা নৌকা থামাইলাম ও তাহাদিগকে উঠাইলাম। তাহারা যেন কতই কৃতার্থ হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল।

এতক্ষণে নৌকা অপর পারে আসিয়া ঘাটে লাগিল। সকলে অবতরণ করিয়া পদব্রজে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম। কুকুর দুইটী নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রায় আড়াই মাইল আসিয়া আমরা সিংহনাদ গ্রামে পৌছিলাম। এখানে শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র দাসের বাটী। এই বন্ধুটি অন্নকষ্ট-নিবারণ-কার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে আমাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বাবধি বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, একদিন ইঁহার বাটীতে আমরা অতিথি হই। পাছে আমাদের অন্য মত হয়, এজন্য ইনি এবং ইঁহার ভাগিনেয় উভয়ে কামারখাল হইতে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের বাটী হইতে ষ্টীমার ষ্টেশন প্রায় ৩ মাইল। সেই ষ্টেশনে যাইয়া আমাদের ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। অগত্যা স্থির করিতে হইল যে, অদ্য রাত্রে ইঁহাদের বাটীতে থাকিয়া আগামী কল্য প্রাতে আহারাদি করিয়া ষ্টীমারে উঠিব।

সিংহনাদ গ্রামে আমাদের আগমনের কথা ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার হইল। ভদ্র অভদ্র, পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেই কাতারে কাতারে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা যেন কি একটা অদ্ভুত দর্শনের সামগ্রী হইয়া উঠিলাম। এ সব লোকের মধ্যে যাঁহারা আমাদের সাহায্যে বিগত দুঃসময়ে অন্নের কষ্ট অনুভব করেন নাই, তাঁহারা সকলেই খোদাকে ধন্যবাদ দিয়া আমাদের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য লোকে "সাধু হইয়া লোকের দুঃখে সহানুভূতি করা—কি আশ্চর্য্য" ইত্যাদি কত কথা বলিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কোনক্রমে সেই রাত্রি ও তৎপরদিন বেলা আন্দাজ ৯টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেওয়া গেল।

অতঃপর স্নানাহার সমাপনান্তে বেলা আন্দাজ ১১টার সময় রওনা হইলাম। সঙ্গে কার্ত্তিক বাবু ও তাঁহার ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র ষ্টীমার ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে চলিলেন। কুকুর দুইটীও ছাড়িল না—সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠ, মাঠ পার হইয়া শরবন, এইরূপে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে পদব্রজে টাঙ্গাখালি নামক স্থানে অবশেষে আসিয়া পৌছিলাম। নদীর কিনারায় একটী বাজার- এই খানে ষ্টীমার থামে। কোন ষ্টেশনাদি নাই। ষ্টীমারেই টিকিট কিনিতে হয়। কুলিরা

আমাদের মালপত্রাদি একটী দোকানে রাখিল। আমরাও সেই দোকানে আশ্রয় লইলাম। তখনও ষ্টীমার আসিতে বিলম্ব ছিল। দোকানদারটী বেশ লোক। খাতির যত্নে নানাপ্রকারে আপ্যায়িত করিলেন। ক্ষণেক বিশ্রামের পর বাজারটী দেখিবার ইচ্ছায় বাহির হইলাম। দেখিলাম—৫।৬টী ছোট বড় চালাঘর। ঐ সব ঘরে ডাল, লবণ, তৈল, কাপড় ইত্যাদির দোকান। দোকানগুলি প্রত্যহ খোলা হয়। আর ২টী ছোট ছোট চালা আছে, তাহাতে হাটবারে মাছ, তরকারি, পান, গুপারি ইত্যাদির দোকান বসে। বাজার হইতে অনতিদূরে গ্রাম। বাজারে দেখিবার বড় একটা কিছুই ছিল না। কাজেই পুনবায় সেই দোকানে আসিয়া বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কুলিরা "ঐ জাহাজ আসিতেছে" বলিয়া আমাদের ডাকিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই একখানি ছোট ষ্টীমার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

ক্রমে ষ্টীমারখানি আসিয়া ঘাটে লাগিল। তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষপত্রাদি উঠাইয়া লওয়া গেল। পরে কার্ত্তিকবাবু ও নবীনচন্দ্রের নিকট বিদায় চাহিলাম; বিদায় কে দিবে? পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল। ওদিকে ষ্টীমারের বাঁশী বাজিল। আব বিলম্ব চলে না—অগত্যা অতি কষ্টে তাঁহাদেব নিকট বিদায় লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। কুকুর দুইটী পরিত্যক্ত হওয়ায় একবার ষ্টীমাবেব দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, আবার জাহাজরূপী ভয়ানক জন্তু দেখিয়া ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে গিয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চীৎকাব করিতে লাগিল। আমবা কার্ত্তিকবাবু ও নবীনচন্দ্রকে ইসাবা কবিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে ও খাওয়াইতে বলিলাম। ষ্টীমাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, একটী চাকর ও আমি এই ৩ জন উঠিলাম। চাকরটী আগামী প্রথম ষ্টেশনের পরের ষ্টেশনে নামিবে। সেখানে তাহার ভগ্নীর বাটী—দেখা কবিতে যাইবে। ষ্টীমারে উঠিয়া টিকেট খরিদ করিয়া উপরে আসিলাম। সেখানে যাইয়াই দেখি—দ্বিজেন বাবু পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ২য় শ্রেণীতে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে অগ্রসর। দ্বিজেন বাবু একজন Extra Assistant Commissioner. তিনি শ্রীহট্ট জিলায় দুর্ভিক্ষমোচন-কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করায় আমাদের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনিও আজ শ্রীহট্ট হইতে বদলি হইয়া ঢাকা জিলায় যাইতেছেন। কাজেই ষ্টীমারে আমাদিগকে পাইয়া ভারি খুসি। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকটে ১ খানি কেদারায় বসিলাম এবং

পরস্পরের গন্তব্যস্থানের কথা, শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ-প্রাদুর্ভাবের কারণ ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

ষ্টীমার ডিব্রাই ষ্টেশনে থামিল। চাকরটী বিদায় লইতে আসিল। সে এখানেই নামিবে। জিনিষপত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম —এই ছোট জাহাজটি, মারকুলি নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া থামিবে। সেখানে আমাদিগকে ইহাপেক্ষা একখানি বড় ষ্টীমারে উঠিতে হইবে। দ্বিজেন বাবুকেও সেখানে ষ্টীমার বদল করিয়া অন্যদিকে যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ষ্টীমার মারকুলি আসিয়া পৌছিল। সেখানে একখানি ইহাপেক্ষা বড় ষ্টীমার তৈয়ার রহিয়াছে, দেখিলাম। সেটী নারায়ণগঞ্জ যাইবে। দ্বিজেন বাবু আমাদের নিকট বিদায় লইয়া উহাতে উঠিলেন। আমাদের ষ্টীমার, শুনিলাম, রাত্র ১টার সময় আসিবে। অতএব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। এদিকে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এ সময় কি করিয়া বা ষ্টীমার হইতে নামি এবং কোথায়ই বা যাই! কাজেই সারঙের নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ জাহাজ কতক্ষণ এখানে থাকিবে। সারঙ বলিল যে, রাত্রি প্রভাতে ইহা ছাড়িবে এবং যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেখানে ফিরিয়া যাইবে। তখন যতক্ষণ না আমাদের অন্য ষ্টীমার আসে, ততক্ষণ আমরা ইহাতে থাকিতে চাওয়ায় সারঙ সম্মত হইল। এইবার আমরা উপরকার ডেকে বিছানা বিছাইয়া, বৃষ্টি থামিলে বাজার হইতে কিছু খাইয়া আসিলাম। আসিবার সময় ষ্টীমার-ঘাটে টিকেট ঘর দেখিলাম। ঘরে ঢুকিয়া বাবুকে কখন আমাদের ষ্টীমার আসিবে এবং কখন টিকেট পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, রাত্রি ১টার সময় উভয়ই পাওয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্বে নহে। কাজেই ফিরিয়া আসিয়া আমাদের পূর্ব্ব-বিস্তৃত বিছানায় শয়ন করিলাম।

কামাখ্যার পথে।

কিছুকাল গত হইলে একটা বিকট শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, আমরা যে ষ্টীমারে শুইয়াছিলাম, তাহার পার্শ্বে আর একখানি বড় ষ্টীমার লাগিয়াছে এবং তাহার বাঁশীর শব্দ হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, উহা ষ্টীমার ছাড়িবার সঙ্কেত। তখন শশব্যস্তে জিনিষপত্রাদি লইয়া উহাতে উঠিলাম। উঠিবামাত্রই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। টিকিট করা আর হইল না! পথে বিদেশ বিভূঁয়ে নিজেদের এরূপ অকাতর নিদ্রার বিষয় ভাবিয়া এ সময় মনে একটু হাসিও পাইল। যাহা হউক স্থির করিলাম, বেশী ভাড়া (Excess fare) না হয়

দিব। প্রাতে কেরাণি বাবু টিকিট চেক্ করিতে আসিলেন। আমরা সমস্ত ব্যাপার বলাতে তিনি নীচে তাঁহার কামরায় একটু পরে যাইতে কহিলেন। যথাসময়ে তথায় যাইয়া দেখি যে, একজন হিন্দুস্থানী গরীব, কেরাণি বাবুর পালঙ্ক-নিম্নে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার করুণাভিক্ষা করিতেছে এবং তিনি গম্ভীরভাবে পালঙ্কোপরি বসিয়া তামাক খাইতেছেন। দৃষ্টি অন্যত্রে ছিল; আমরা যাওয়াতে আমাদের উপরে নিবদ্ধ হইল। আমাদের তৎসকাশে বসিতে বলিয়া হিন্দুস্থানীটিকে কর্কশস্বরে সরাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে কেচুগঞ্জ অবধি টিকিট পাইলাম। বেশী কিছুই লইলেন না। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ঘরের বাহির হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান সেই হিন্দুস্থানীটির নিকটে যাইলাম এবং তাহাকে তদ্রূপ করুণাভিক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারও ঠিক আমাদেরই মত অবস্থা। তবে এইটুকু প্রভেদ যে, আমরা ভদ্রলোক বলিয়া কেরাণি বাবুর "নজর" দিতে হয় নাই, আর সে অভদ্র, হীনাবস্থাপন্ন এবং মূর্খ বলিয়া তাহার কোনমতেই পরিত্রাণ নাই! তখন আর কি করি? পুনরায় তাহাকে লইয়া কেরাণি বাবুর সমীপে উপস্থিত। তাঁহার কটাক্ষেই বুঝা গেল যে, তিনি আমাদের হিন্দুস্থানী-সমভিব্যাহারে পুনরাগমনের কারণ এবং বক্তব্যের বিষয় অবধারণ করিয়াছেন। কাজেই আমাদের কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি অযাচিত হইয়া বলিলেন—"এ ব্যাটারও আপনাদের মত অবস্থা। তবে কি জানেন, আপনারা ভদ্রলোক, আপনারা কিছু কোম্পানিকে ঠকাইতে টিকিট লয়েন নাই, এমন হইতে পারে না। এ ব্যাটারা অনেকবার ফাঁকি দিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ঐ রকম ক'রে থাকে। তাই ওকে বলে দিইছি যে, জরিমানা (Excess fare) দিতে হবে।" প্রত্যুত্তরে আমরা নম্রভাবে বলিলাম—"হ'তে পারে যে, কেহ কেহ ও রকম ফাঁকি দেয়, কিন্তু এ লোকটি সে রকমের নয়, কেননা, এ টিকিটের ন্যায্য দাম দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে, কেবল এইটুকু আপত্তি করিতেছে যে, যদি ওকে জরিমানা করা হয়, তা হ'লে ওর আগে যাইবার খরচ কম পড়ে।" ঠিক এই সময় সে লোকটা কেরাণি বাবুর পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবু ভারি চটিলেন। তিনি অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন—"নিকালো হিঁয়াসে।" আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"আপনারা যান্। ও যদি জরিমানা দেয় ত ভাল, না দেয় ত ফলভোগ ক'র্‌বে। ওর জন্য আপনাদের আস্‌বার কি দরকার?" উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইল—"ওকে যদি জরিমানা দিতে হয় ত আমরা কি করিলাম যে, অব্যাহতি পাইলাম? ও গরিব ব'লে ওকে দিতে

হইবে, আর আমরা একটু আধটু সামান্ত লেখাপড়া জানি ব'লে দিতে হইবে না? যদি ওর কাছে নিতে হয়, তা হ'লে আমাদের নিকটও লউন। যদি একান্তই আমাদের ছাড়িয়া দিয়া উহার নিকট হইতে লয়েন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এ বিষয় কোম্পানিকে জানাইতে হইবে। এ প্রকার অন্যায় অবিচারের প্রশ্রয় দিতে আমরা পারি না।" বাবু অবশ্য ঐ কথায় আমাদের উপর একটু বেশী রকমের সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কি করেন? অগত্যা তাঁহাকে হিন্দুস্থানীটিকে ছাড়িয়া দিতে হইল। আমরাও ধন্যবাদ দিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপরে আসিলাম।

বেলা আন্দাজ ২টার সময় আমাদের ষ্টীমার ফেচুগঞ্জ আসিয়া পৌছিল। যেখানে ষ্টীমার লাগিল, সেখান হইতে বাজার প্রায় ১ মাইল। জিনিষপত্র সারঙের জিম্মায় ষ্টীমারেই রাখিয়া আমরা বাজারাভিমুখে চলিলাম। বরাবর নদীর ধার দিয়াই চলিলাম। স্থানটীতে বেশ একটু নূতনত্ব অনুভব করিলাম। ঘর বাটী প্রভৃতিতে একটু একটু আসামী ঢঙের আভা মারিতেছে, দেখিলাম। চালাঘরগুলিতে পূর্ব্ববঙ্গীয় ও আসামী প্যাটেণ্টের মিশ্রণ। প্রায় ১ মাইল যাইয়া আমরা বাজারে পৌছিলাম। বাজারটী বেশ বড, নানারকমের পণ্যদ্রব্যে পরিশোভিত। আমরা কিছু কিনিয়া খাইয়া ষ্টীমারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তখন বেলা আন্দাজ ৫টা। ষ্টীমারের সারঙটী বেশ লোক। আমাদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। আমরা কামাখ্যায় যাইব শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কোন্ পথে যাইবেন?" আমরা করিমগঞ্জ হইয়া রেলে যাইব শুনিয়া সে বলিল—"আপনাদিগকে এখান হইতে ঐ ছোট ষ্টীমারে করিমগঞ্জ যাইতে হইবে। জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া, আজ যাইতে পারিবে না। সেখান হইতে আর একখানি ঐ রকমের ছোট ষ্টীমার যদি আজ আসিয়া পৌছায়, তাহা হইলে তাহাই কল্য প্রভাতে যাইবে। আমাদের এ ষ্টীমার কল্য প্রাতে মার্কুলি ফিরিয়া যাইবে, অতএব আজ রাত্রে ইহাতেই অবস্থান করুন। আমি যদি মুসলমান না হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার সেবা লইতেন, কিন্তু এ অবস্থায় আমার দ্বারা আপনাদের কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে, আজ্ঞা করুন।" আমরা তাহার কথায় ধন্যবাদ দিয়া সেই রাত্রি তাহার ষ্টীমারে যাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

সন্ধ্যার সময় ২।৩ টী সাহেব মেম সেই ভাঙ্গা ছোট ষ্টীমারখানিতে চড়িয়া ষ্টীমার চালাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিতে পাইয়া, সারঙকে জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিলাম যে, সাহেবরা ষ্টীমার কোম্পানীর লোক, জাহাজ চালাইয়া দেখিতেছেন, চলিবে কি না; যদি চলে, তাহা হইলে উহাই প্রত্যূষে করিমগঞ্জ যাইবে। সন্ধ্যার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে খবর আসিল যে, ঐ ষ্টীমারই যাইতে সমর্থ—পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব প্রত্যূষে রওনা হইবে। আমরা এখনই উহাতে উঠা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া চড়িয়া বসিলাম। সারঙটী আসিয়া সাদরে বিদায় দিল। আমরাও আমাদের ছোট ষ্টীমারের উপরকার ডেকে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। অর্দ্ধেক রাত্রে হঠাৎ অত্যন্ত বেগে বৃষ্টি আসাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম—ষ্টীমার খানিতে পর্দ্দা আদৌ নাই। সবেগে বৃষ্টির ছাট্ আসিতেছে ও আমাদের বিছানাদি ভিজিয়া যাইতেছে। অথচ ষ্টীমারখানিতে এমন একটুও স্থান নাই, যেখানে বৃষ্টির ছাট্ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেবল একটী নামমাত্র ছোট কেবিন আছে, তাহার তলাতেও রীতিমত জল ঢুকিতেছে—উহার মধ্যেও এমন কোন স্থান নাই, যেখানে দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখিতে পারা যায়। কাযেই কম্বলাদি চাপা দিয়া এক রকমে বসিয়া রহিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টা সজোরে বৃষ্টিপাতের পর বৃষ্টি থামিল। আমরা আমাদের কম্বলাদি রেলিঙ্গে শুকাইতে দিয়া কোনও রকমে সে রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিলাম।

ভোর হইল। ষ্টীমারও ছাড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমরা হাত মুখ ধুইয়া বসিবামাত্র ষ্টীমার ছাড়িল। খানিকদূর যাইতে না যাইতে দেখি, নদী আর পূর্ব্বের মত বৃহৎকায়া নাই। প্রস্থের আয়তন খুব কম। কলিকাতার চিৎপুর খালের অপেক্ষা সামান্য বেশী মাত্র, কিন্তু স্রোতের বেশ জোর। একে আমরা উজান যাইতেছি, তায় ষ্টীমারখানি ছোট, কম তেজ—কাজেই প্রাণপণে চালিয়েও এগুতে পাচ্ছে না মনে হ'তে লাগ্‌ল, আবার ২।১ মাইল যেতে না যেতেই ষ্টেশন। এক একটা ষ্টেশনে ১৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাম্‌ছে, খুব মাল নিচ্ছে। মনে হইল, ষ্টীমারখানি ডুবিয়া যায় বা। এইরূপ নানা কারণে আমাদের যাত্রাটা বড়ই ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল। কিন্তু এই কষ্টেতেও আরাম দিবার একটী জিনিস ছিল—সেটি ঐ খরস্রোতা নদী, প্রেমালাপে বিভোর হইয়া পথের সকল বিঘ্ন-বাধা সরাইয়া "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়"—যেন এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখাইয়া, নিজ প্রেমাস্পদের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে; উভয় পার্শ্বে সেই শ্যামল হরিদ্বর্ণের ঘাস যেন সুনিপুণ শিল্পীতে মানাইয়া কার্পেট বুনিয়া বিছাইয়া দিয়াছে; তদুপরি স্থানে স্থানে বঙ্গের চির-পরিচিত গ্রাম্য কদলীবৃক্ষ বা বাঁশঝাড়ের সারি বাত্যান্দোলিত হইয়া সশব্দে

দণ্ডায়মান; ঈষৎ ঊর্দ্ধে সেই আগাগোড়া আসামী ঢঙের সুন্দর চেপ্টা কুটীর-গুলি যেন চিত্রশালিকার চিত্র! কোথাও বা কুটীর-মধ্য হইতে দুই একটী লোক আমাদের এই ক্ষুদ্রকায় ষ্টীমাররূপী জলজন্তুবিশেষ দেখিতে বাহির হইয়া আসিতেছে ও দেখিয়া ভ্রুকুটি সহকারে প্রত্যাগমন করিতেছে—সে চেহারা আগাগোড়া সরলতা-মাখা, শরীর হৃষ্টপুষ্ট অথচ খর্ব্বকায়, মুখশ্রী সুশ্রী অথচ নাক একটু বোঁচা, আবার সুঠাম অথচ আমাদের তুলনায় ছোট—এই দৃশ্য যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই জাহাজের ঘড ঘড় শব্দ, মাল বোঝাই নামাই, যাত্রীর উঠা নাবার গোলমাল, গত রাত্রির অনিদ্রাজনিত শরীরের অবসাদ ইত্যাদি সকলই চলিয়া যাইতে লাগিল। মন এক সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

সে ঘোর ভাঙ্গিল, যখন ষ্টীমার প্রায় করিমগঞ্জ পৌঁছিবে। তখন ষ্টীমার-মধ্যে একটা ছোট রকমের হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—সকলেই নিজ নিজ জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত। আমরাও তাড়াতাড়ি সকলের সুরে সুর মিলাইয়া বারাণ্ডা হইতে কম্বলাদি আনিয়া আপনাদের আসবাবাদি বাঁধিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় ৪টা।

ক্রমে ষ্টীমার করিমগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জল কম বলিয়া ঘাটে লাগিলেন না। কাজেই একখানি কিম্ভূতকিমাকার নৌকা ঠিক করিতে হইল। নৌকাওয়ালা সময় বুঝিয়া পাইয়া বসিলেন। হাত কয়েক মাত্র যাইবেন—।০ আনা চাহিলেন। কি করি? দায়ে ঠেকিয়াছি—রাজি হইলাম। মাল তুলিয়া ও নিজেরা উঠিয়া ষ্টীমারের হাত হইতে রেহাই পাইলাম। মনে আর আনন্দ ধরে না—এইবার রেল পাইব। কারণ, রেলষ্টেশনের মুখ দেখা আর ঘরে আসা একই কথা। এতদিন কোথায় যেন দ্বীপান্তরে ছিলাম, রেল নাই—কিছুই নাই। এক ষ্টীমার ভরসা, তাঁকে আবার মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা প্রদর্শনের মত ঘুরিয়া আসিতে হয়—নদীগুলি এমনই ঘোরফের! মনে হইতে লাগিল, যেন কতদিন পরে জেলখানা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

করিমগঞ্জ স্থানটি পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। শ্রীহট্ট সহরে যাইবার সময় এই স্থান হইয়া যাইতে হইয়াছিল। নদীর ঘাট হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথও জানা ছিল। নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র সন্নিকটে একটা বাসা ঠিক করিয়া জিনিষ-পত্রাদি তাহাতে উঠাইলাম ও নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। বাসায় আসিয়া গৌহাটী যাইবার ট্রেন কখন পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সঠিক উত্তর না পাওয়াতে স্থির করিলাম যে, এখান হইতে স্নানাহার সমাপন করিয়া ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ির

অপেক্ষা করিব। যখনই প্রথম গাড়ি পাইব, তখনই যাইব। একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতে সন্ধ্যা হইল। রাত্রি প্রায় ৮টা আন্দাজের সময় আহার মিলিল। পূর্ব্বদিবসের মত অন্তও একবেলা আহার হইল। আহারান্তে ২টী কুলি লইয়া ষ্টেশনে যাইলাম।

এ, বি, রেলওয়ের করিমগঞ্জ নামক ষ্টেশন একটী অতি ছোট পাকা ঘরকে মধ্যে একটী দেওয়াল দিয়া দুইটী ঘরে পরিণত করা মাত্র। তাহার চতুষ্পার্শ্বে তিন হাত পরিমিত জমী সিমেণ্টে বাঁধান। সেই জমীর উপরে Corrogated Ironএর চাল, পাকা ঘরের ছাদ হইতে নামিয়াছে। ইহাই হইল—করিমগঞ্জ ষ্টেশন। যাত্রীরা এইখানেই বিশ্রাম করে। অন্য কোন স্বতন্ত্র বিশ্রামাগার নাই। আমরাও এই বিশ্রামস্থানে জিনিষপত্র রাখিয়া ষ্টেশন ঘরের ভিতরে গেলাম। যাইয়া দেখি—আমাদের নোয়াখালি জিলায় অবস্থিতি কালীন চৌমূহনী নামক ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশনমাষ্টার এখানে বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছেন। ইনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত; জাতিতে মুসলমান। অনেক দিনের পর আমাদিগকে পাইয়া স্বীয় সুখদুঃখের কথা অনেক বলিলেন। পরে গাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, প্রাতঃকালের পূর্ব্বে গৌহাটী যাইবার গাড়ি পাওয়া যাইবে না। অবশ্য রাত্রে একখানি গাড়ি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বদরপুর পর্য্যন্ত যাইবে। সেখানে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে—যতক্ষণ না প্রাতঃ-কালের গাড়ি এখান হইতে যাইয়া পৌছে। অতঃপর যখন প্রাতঃকালের গাড়ি ভিন্ন আমাদের গতি নাই দেখিলাম, তখন এইখানেই সেই গাড়ির অপেক্ষায় থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। কিন্তু যখন রাত্রের গাড়ি চলিয়া গেলে পরে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং মুষলধারায় বৃষ্টিপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ সমস্তই দেখা দিল, তখন সেই তিন দিক্ খোলা Corrogated Ironএর ছাতওয়ালা বারণ্ডায় বসিয়া ভাবিলাম যে, রাত্রের গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া সদ্‌যুক্তির কার্য্য করি নাই; কেননা, বদরপুর নাকি বড় ষ্টেশন, সেখানে যাত্রীদের জন্য আরামগৃহ খুব সম্ভবতই থাকিতে পারে। সেখানে থাকিলে বোধ হয় এই কষ্টভোগ করিতে হইত না। এখানে একখানি মাত্র বেঞ্চ আছে, তাহাও আমাদের আসিবার পূর্ব্বে অন্যের অধিকৃত হইয়াছে। কাজেই মেঝেতে থাকা ভিন্ন উপায় নাই। বৃষ্টিও আগতপ্রায়। গত কল্যকার রাত্রের মত দুর্দ্দশায় বুঝিবা পড়িতে হয়। একবার উঠিলাম, ষ্টেশন গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিলাম—ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ। রাত্রি বেশী হইয়াছে—সকলে শয়ন করিয়াছেন। ফিরিয়া

আসিয়া বিছানায় বসিয়াছি মাত্র আর—বৃষ্টি বলে কোথায় আছি? এক ঝলকে বিছানাদি সমস্ত ভিজিয়া গেল। সামাল, সামাল। কোথায় কেমন ক'রেই বা সামলাই! সমস্ত বারাণ্ডাটী যাত্রী এবং রেলের Pointsman আদিতে ভর্ত্তি। নড়িবার চড়িবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। কাযেই ভিজিতে লাগিলাম। বৃষ্টিও যেখানে যত ছিল, সব যেন একেবারে আসিয়া আমাদের ঘাড়ে হুড় মুড় করিয়া পড়িল। আকাশে যেন ইন্দ্র-বিরোচনের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। দেবশক্তির নিকট মানব-শক্তি চিরকালই পরাজিত। জিনিষপত্র ত সবই ভিজিল—আমরাও নীরবে ভিজিতে লাগিলাম।

ভোর আন্দাজ ৪টার সময় বৃষ্টি থামিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশও পরিষ্কার হইয়া আসিল। ক্রমে পূর্ব্বগগনে বক্তিমচ্ছটা দেখা দিল। আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিলাম। ষ্টেসনমাষ্টার বাবু নিজ বাসস্থান হইতে আসিলেন। আফিস ঘর খোলা হইল। ক্রমে কাযকর্ম্ম আরম্ভ হইল। ষ্টেশনের সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে রত হইলেন। আমরা তখন ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ছোট ঘরটীতে গেলাম। কথাবার্ত্তায় তিনি আমাদের গত রাত্রের দুর্দ্দশা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ঢং ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা শব্দে ট্রেণের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া নিজেদের ভিজা জিনিষপত্রাদি একরকমে বাঁধিয়া লইয়া গাড়ির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। অবিলম্বেই গাড়ি হুস্ হুস্ করিয়া আসিয়া পৌঁছিল। টিকিট পূর্ব্বেই ক্রয় করা ছিল। একটা কামরায় উঠিলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমাদের কামরায় অপর কেহ ছিল না। ভিজা বিছানাপত্র-গুলো হুকে ঝুলাইয়া শুকাইতে দিলাম। আমরা যে গাড়িখানিতে উঠিয়াছিলাম, তাহার প্রতি কামরার মধ্যে রেলিঙ্গ ছিল না, এক কামরা হইতে অপর কামরায় অনায়াসে যাওয়া যায়। আমাদের পাশের কামরাগুলিতে কতকগুলি গুরখা সৈন্য এবং চাবাগানের কুলি উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ বাদে উক্ত গুরখা সৈন্যদের মধ্যে একজন যুবক আমাদের কামরায় আসিলেন ও আমাদের সাধু দেখিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনিই একটা ষ্টেশন হইতে নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া সেবেলা আমাদিগকে খাওয়াইলেন এবং তাঁহার সহিত শিলঙে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমরা ৺কামাখ্যা দেবী দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিব মনস্থ করিয়াছি জানিতে

পারিয়া বিশেষ মনক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি আমাদের সহিত লমডিং জংসং ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহাদের হাবিলদারের আদেশানুযায়ী সে রাত্রি তথায় থাকিতে হইল। তার পরদিনের গাড়িতে তাঁহারা গৌহাটী আসিবেন বলিয়া আমাদের নিকট বিদায় লইলেন। বিদায়কালে তিনি পুনরায় আমাদিগকে শিলং যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমাদের একান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

আমাদের গাড়ি করিমগঞ্জ হইতে ছাড়িয়া ক্রমে বদরপুরে আসিল। বদরপুর হইতে ছাড়িয়া ক্রমশঃ পর্ব্বতের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল। গাড়ির অগে পশ্চাতে দুইটী ইঞ্জিন। কতই যে পর্ব্বত-নালার (tunnel) ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটা পর্ব্বতনালার ভিতর যখন গাড়ী প্রবেশ করে, সে সময় একেবারে অন্ধকার—চক্ষু চাহিয়া আছি অথচ কিছুই দেখা যায় না—চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। গাড়ীর হিন্দু যাত্রীরা সকলেই সে সময়ে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। এদিকে নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, আবার যখন গাড়ী নালা হইতে বাহির হয়, তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন বাঁচা যায়। নিদ্রাবস্থায় বক্ষোপরি হস্ত স্থাপিত হইলে যেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া দুঃস্বপ্ন দর্শন হয় এবং পরক্ষণেই নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন একটা অব্যক্ত আরাম হয়—এও প্রায় তদ্রূপ। কোন কোন নালার ভিতরে জলপাতের শব্দ হইতেছে, অথচ অন্ধকারের দরুণ কিছু দেখা যাইতেছে না। বড় বড় নালার ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ট্রেণ থামিয়া যায় এবং উপর্য্যুপরি বংশীধ্বনি করিতে থাকে, যতক্ষণ না নালার মুখে দণ্ডায়মান নিশানওয়ালা প্রবেশ করিবার সঙ্কেত দেয়। নিশানওয়ালা সঙ্কেত করিলে তবে গাড়ী ভিতরে প্রবেশ করে। আবার বাহির হইবার সময়ও প্রায় তদ্রূপ।

আমাদের গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। কখন পার্ব্বত্য উপত্যকা-মধ্য দিয়া—বামে অচল অটল পর্ব্বত, হস্ত যদি একটু বড় হয় ত গাড়ীতে বসিয়াই যেন নাগাল পাওয়া যায়; দক্ষিণে হরিদ্বর্ণের ছোট ছোট ক্ষেতগুলি সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া স্বর্ণের মত দীপ্যমান, তন্নিম্নে কুল কুল করিয়া স্বচ্ছ জলপ্রবাহ অতি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়া চলিয়াছে, জলমধ্যে কত ছোট বড় পাথর, নোড়া নুড়ি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার পারে আবার সেই স্বর্ণময় ক্ষেত্রগুলি, একটির উপর আর একটি, তার উপর আর একটি, এইরূপে গ্যালারির মত বর্ত্তমান—তাহা-

দের পারে আবার পাহাড়, অভ্রভেদী পাহাড়, পাহাড়ের উপর ধূঁয়া ও আকাশ। কোথাও খোদিত পর্ব্বতগাত্রোপরি রেলরাস্তা ধরিয়া বক্রভাবে গাড়ী একটীর পর একটী পর্ব্বত অতিক্রমণ করিয়া চলিতেছে—বামে পূর্ব্ববৎ অচল অটল সুমেরু, দক্ষিণে সারি সারি চা গাছের কেয়ারি, কেয়ারি-মধ্যে কোথাও কুলিরা মৃত্তিকা খনন করিতেছে, কোথাও কুলিনীরা জলসিঞ্চন করিতেছে, কোথাও চা গাছের পাট করা হইতেছে, চা বাগানের ঊর্দ্ধে পর্ব্বতগাত্রোপরি স্থানে স্থানে শ্বেতকায় আসামী বাঙ্গলা, বাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। সময়ে সময়ে দক্ষিণ পার্শ্বে এত হেলিয়া ছুটিতেছে যে, প্রতিক্ষণে মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা এইবার গাড়ী উল্টাইয়া পড়িল—এই প্রকারে আমাদের গাড়ী হুড় হুড় করিয়া চলিল। পার্ব্বত্য পথের ঐ সব সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হিমাচলে পূর্ব্ব ভ্রমণের স্মৃতিকথা কতই মনে আসিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—সেই হিমাচলের সুদূর গাড়োয়াল জিলায়, বদরিকাশ্রমের পথে যেন পুনরায় চলিয়াছি ; তবে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বে পদব্রজে গিয়াছিলাম, আর এক্ষণে বাষ্পশকটে যাইতেছি ; আর তথায় অভ্রভেদী পর্ব্বতচূড়া চিরতুষারমণ্ডিত দেখিয়াছি, আর এখানে পর্ব্বতচূড়া অভ্রভেদীও নয়, হিমানীমণ্ডিতও নয়—ধূমমণ্ডিত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা লমডিং জংশন্ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখান হইতে একটী শাখা লাইন গৌহাটী অভিমুখে গিয়াছে। কাজেই আমাদিগকে এখানে গাড়ী বদলাইতে হইল। গৌহাটী যাইবার গাড়ী প্লাটফরমেই ছিল। তাহাতে যাইয়া উঠিলাম। শুনিলাম—গাড়ী ছাড়িতে অনেক বিলম্ব আছে। সন্ধ্যার পর আমরা কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। তাহার কিছুক্ষণ বাদে গাড়ী ছাড়িল। আমাদের এ গাড়ীখানিও পূর্ব্ব গাড়ীর মত অর্থাৎ এক কামরা হইতে অন্য কামরায় অনায়াসে যাওয়া যায়—মধ্যে ব্যবধান নাই। আমরা যে কামরায় ছিলাম, তাহার সম্মুখে একটী কামরা খালি ছিল। পরবর্ত্তী কামরায় দুই জন লোক শুইয়াছিল। আমাদের পশ্চাতে একটী মাত্র কামরা—তাহাও খালি ছিল। তার পরে গার্ডের গাড়ী। আমরা এলোমেলোভাবে আমাদের কামরায় জিনিষপত্রাদি রাখিয়া দুই জনে দুই খানি বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। তখন রাত্রি আন্দাজ দশটা। খানিক পরেই নিদ্রাভিভূত হইলাম। হঠাৎ লোকের কথাবার্ত্তায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, একজন আর একজনকে ইংরাজীতে বলিতেছে—"আমি এইখানে থাকি, সতর্ক থাকিও, সাহায্য করিও।" মনে সন্দেহ হইল। না উঠিয়া চাহিয়া দেখিলাম—একজন আমাদের পশ্চাদ্দিকের

কামরায় উঠিয়াছে ; যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে, তাহাকে দেখিতে পাইলাম না—মনে হইল, সে গাড়ীর বাহিরে হয় পাদানিতে, না হয় গার্ডের গাড়ীতে আছে ; গাড়ী কিন্তু পুবাদমে চলিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে একটু সন্দেহ হইল ; আবার পরক্ষণেই মনে হইল—না, কিছু না ; উহারা বোধ হয় নিজেদের সম্বন্ধে কি বলাবলি করিতেছে। মনকে বুঝাইয়া শান্ত করিলাম বটে, কিন্তু নিজেদের সতর্ক হইয়া থাকাও উচিত ভাবিয়া জাগিয়া রহিলাম। অপর বেঞ্চে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহাকে এখন ডাকিবার কোন আবশ্যক নাই বোধে কিছুই জানিতে দিলাম না। দেখিলাম, যে ব্যক্তি অপর কামরাটীতে ঢুকিয়াছিল, সে সেই কামরার বেঞ্চের উপর শুইল। খানিক বাদে একটী ষ্টেশন আসিলে সে ব্যক্তি বাহির হইয়া গেল। ঐ ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িলে ভিতরে আসিয়া আবার সেই স্থানে শুইল। অল্পক্ষণ শুইয়াই উঠিল ও সাবধানে আমাদের কামরার দিকে আসিয়া আমাদের ট্রঙ্কটী লইতে হাত বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি উঠিয়া বসিলাম। আমি উঠিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে বাহির হইয়া গার্ডের গাড়ীর দিকে পাদানি বাহিয়া চলিয়া গেল এবং সেই দিকে ইংরাজীতে দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এইরূপ শ্রবণগোচর হইল। বুঝিলাম—উহারা যেই হউক, আমাদেরই দ্রব্যাদি লইবার অভিপ্রায়ে ফিরিতেছিল। অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিলাম ও সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে বলিলাম। পরে উভয়ে সমস্ত রাত্র সজাগ থাকিয়া বসিয়া কাটাইলাম।

রাত্রি আন্দাজ ৩।৷৹ টার সময় গাড়ী গৌহাটী পৌঁছিল। পূর্ব্ব হইতে একটী বাবুর সহিত পরিচয়-পত্র আমাদের নিকট ছিল। তিনি Railway Mail Serviceএ কর্ম্ম করেন। ষ্টেশনে নামিয়াই তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। অনতি-বিলম্বে তাঁহাকে পাইয়া পরিচয়-পত্র দিলাম। তিনি পত্র পড়িয়া দুঃখের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার পরিবারাদি এক্ষণে সেখানে নাই। সেজন্য আমাদের আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য ভাবিত হইলেন। আমরা আহারাদির জন্য তাঁহাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না বলাতে তিনি একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তাঁহার আফিসে আমাদিগকে পাঠাইয়া সেখানে একটা ঘরে আমাদের জিনিষপত্রাদি রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা সেখানে পৌঁছিয়া আরাম করিলাম।

ভোর হইলে আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ৺কামাখ্যা দেবী দর্শনা-ভিলাষে প্রস্তুত হইলাম। আজ মায়ের দর্শন পাইব—মনে খুব আনন্দ। পথশ্রম, রাত্রিজাগরণ-জনিত অবসাদাদি কিছুই রহিল না। শরীর পুলকিত, মন আন-

ন্বিত, যেন নববলে বলীয়ান্! জগজ্জননীর দর্শনাভিলাষে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই একখানি শকট ঠিক করা ছিল। প্রাতে ৬টার সময় উহা আফিসের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া উহাতে উঠিয়া চলিলাম। গাড়ী গৌহাটী সহরের ভিতর দিয়াই চলিল। এতদিনে একটী সহর দেখিতে পাইয়া মনে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীদেবীদর্শনের জন্য সমুৎসুক মনের নিকট এ আনন্দ স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। শিশু যখন মাতার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন কি খেল্‌না সুন্দর হইলেও তাহার ভাল লাগে? মার নিকট কতক্ষণে যাইবে, সেই ভাবনাই তখন তাহার বলবতী হয়। গাড়োয়ান্‌কে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম—"আর কতদূর?" এইরূপে যাইতে যাইতে কিছুকাল পরে সত্যসত্যই গাড়ী সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ, পীঠস্থান-শ্রেষ্ঠ, পুণ্যভূমি কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদমূলে আসিয়া লাগিল। আমরাও "জয় মা আনন্দময়ী" বলিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। [ক্রমশঃ।

মদীয় আচার্য্যদেব।*

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥'

—হে অর্জ্জুন, যখনি যখনি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রসার হয়, তখনই তখনই আমি (মানবজাতির কল্যাণের জন্য) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

যখনই আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন অবস্থাচক্রের দরুণ নব নব সামাজিক শক্তিসামঞ্জস্যের প্রযোজন হয়, তখনই এক শক্তিতরঙ্গ আসিয়া থাকে, আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে বলিয়া এই উভয় রাজ্যেই এই সমন্বয়-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। একদিকে আধুনিক কালে ইউরোপই প্রধানতঃ জড়রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন— আর সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল আবার—আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম-

* স্বামী বিবেকানন্দের নিউইয়র্কে প্রদত্ত "My Master" নামক বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

য়ের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কালে দেখিতেছি, জড়ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী, বর্ত্তমান কালে দেখিতেছি, লোকে ক্রমাগত জড়ের উপর নির্ভর করিতে করিতে তাহার ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জ্জক যন্ত্রবিশেষ হইয়া যাইতে বসিয়াছে—এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই শক্তি আসিতেছে—সেই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, যাহা এই ক্রমবর্দ্ধমান জড়বাদরূপ মেঘকে অপসারিত করিয়া দিবে। শক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা অনতিবিলম্বেই মানবজাতিকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর এশিয়া হইতেই এই শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইবে। সমুদয় জগৎ শ্রমবিভাগের প্রণালীতে বিভক্ত। একজনই যে সমুদয়ের অধিকারী হইবে, একথা বলা বৃথা। কিন্তু তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! শিশু অজ্ঞানবশতঃ ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার পুতুলের মত লোভের জিনিষ আর কিছুই নাই। এইরূপই যে জাতি জড়শক্তিতে বড, সে ভাবে—উহাই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু—উন্নতি বা সভ্যতার অর্থ উহা ছাড়া আর কিছু নহে; আর যদি এমন জাতি থাকে, যাহাদের ঐ শক্তি নাই বা যাহারা ঐ শক্তি চাহে না, তাহারা জীবন ধারণের অনুপযুক্ত, তাহাদের সমগ্র জীবনটাই নিরর্থক। অন্য দিকে, অপর জাতি ভাবিতে পারে যে, কেবল জড় সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্যদেশ হইতে সেই বাণী উঠিয়া এক সময়ে সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির দুনিয়ার সব জিনিষ থাকে, অথচ যদি তাহার ধর্ম্ম না থাকে, তবে তাহাতে কি ফল? ইহাই প্রাচ্য ভাব—অপর ভাবটী পাশ্চাত্য।

এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্ত্তমান সমন্বয় এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয়ের মিশ্রণস্বরূপ হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তদ্রূপ সত্য। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু চায় বা আশা করে, তাহার নিকট যাহা থাকিলে জীবনটাকে সত্য বলিয়া মনে করে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাহার সমুদয়ই পাইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সে স্বপ্ন-মুগ্ধ—প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও তদ্রূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—সে পাঁচ মিনিটও যাহা স্থায়ী নহে, এমন পুতুলের সহিত খেলা করিতেছে, আর বয়স্ক নরনারীগণ, যে ক্ষুদ্র জড়রাশিকে শীঘ্র বা বিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাকে যে এত বড় মনে করিয়া থাকে, ও তাহা লইয়া যে এত বেশী নাড়াচাড়া করে,

তাহাতে তাহার হাস্যরসের উদ্রেক হয়। পরস্পর পরস্পরকে স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ যেমন মানবজাতির উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, প্রাচ্য আদর্শও তদ্রূপ, আর আমার বোধ হয়—উহা পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখন মানবকে সুখী করে নাই, কখন করিবেও না। যে আমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করাইতে চায়—সে বলিবে, যন্ত্রে সুখ আছে—কিন্তু তাহা নহে,—চিরকালই উহা মনেই বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি তাহার মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে, কেবল সেই সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তি জিনিষটাই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুব বড় লোক, খুব বুদ্ধিমান্ লোক বলিবার কারণ কি? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্ত্তে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে পড়িয়া তাহার উপাসনা কর না কেন? যদি সমগ্র জগতের উপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের প্রত্যেক পরমাণুকে বশীভূত করিতে পার, তাহা হইলেই বা কি হইবে? তাহাতে তুমি সুখী হইবে না, যদি না তোমার নিজের ভিতর সুখী হইবার শক্তি থাকে, আর যত দিন না তুমি আপনাকে জয় করিতেছ। ইহা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই জন্মিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি 'প্রকৃতি' শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিই বুঝিয়া থাকে। ইহা সত্য যে, নদীশৈলমালা-সাগর-সমন্বিতা অসংখ্য শক্তি ও নানা ভাবময়ী বাহ্য প্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু উহা হইতেও মহত্তর মানবের অন্তঃপ্রকৃতি রহিয়াছে—উহা সূর্য্যচন্দ্রতারকারাজি হইতে, আমাদের এই পৃথিবী হইতে, সমগ্র জড়জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর—আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, আর উহা আমাদের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জ্জগতের গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে, এই অন্তস্তত্ত্বের গবেষণায় তদ্রূপ প্রাচ্য জাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অতএব যখনই আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হব, তখনই উহা যে প্রাচ্য হইতে হইয়া থাকে, ইহা ন্যায্যই। যখন প্রাচ্যজাতি যন্ত্রনির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসিয়া উহা শিখিতে হইবে, ইহাও ন্যায্য। পাশ্চাত্যজাতির যখন আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহস্য শিখিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনী বলিতে যাইতেছি, যিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনীর কথা

বলিবার অগ্রে তোমাদের নিকট ভারতের ভিতরের রহস্য, ভারত বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলিব। যাহাদের চক্ষু জড়বস্তুর আপাতচাকচিক্যে অন্ধীভূত হইয়াছে, যাহারা সারা জীবনটাকে ভোজনপানসম্ভোগরূপ দেবতার নিকট বলি দিয়াছে, যাহারা কাঞ্চন ও ভূমিখণ্ডকেই অধিকারের চূড়ান্ত সীমা বলিয়া স্থির করিয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়-সুখকেই উচ্চতম সুখ বুঝিয়াছে, অর্থকেই যাহারা ঈশ্বরের আসন দিয়াছে, যাহাদের চরম লক্ষ্য—ইহলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দ ও তার পর মৃত্যু, যাহাদের মন দূরদর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম, যাহারা—যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিতেছে—তাহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ের কখন চিন্তা করে না, এইরূপ ব্যক্তিগণ যদি ভারতে যায়, তাহারা কি দেখে?—তাহারা দেখে—চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য, আবর্জ্জনা, কুসংস্কার, অন্ধকার—বীভৎসভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ,—তাহারা সভ্যতা বলিতে পোষাক, শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচার মাত্র বুঝে। পাশ্চাত্যজাতি তাহাদের বাহ্য অবস্থার উন্নতি করিতে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছে, ভারত কিন্তু অন্য পথে গিয়াছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল তথায়ই এমন লোকের বাস—যাহারা মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে নিজদেশের সীমা ছাড়াইয়া অপর জাতিকে জয় করিতে যায় নাই, যাহারা কখন অপরের দ্রব্যে লোভ করে নাই, যাহাদের একমাত্র দোষ এই যে, তাহাদের দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা আর তাহারা গুরুতর পরিশ্রমে ধনসঞ্চয় করিয়া অপরাপর জাতিকে ডাকিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে প্রলোভিত করিয়াছে। তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—তাহাদিগকে অপর জাতি বর্ব্বর বলিতেছে—ইহাতে তাহাদের দুঃখ নাই—ইহাতে তাহাদের পরম সন্তোষ—আর ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা এই জগতের নিকট সেই পরম পুরুষের দর্শন-বার্ত্তা প্রচার করিতে চায়, জগতের নিকট মানব-প্রকৃতির গুহ্য রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চায়, যে আবরণে মানবের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চায়; কারণ, তাহারা জানে—এ সমুদয় স্বপ্ন—তাহারা জানে যে, এই জড়ের পশ্চাতে মানবের প্রকৃত ব্রহ্মভাব বিরাজমান—যাহা কোন পাপে মলিন হয় না, কাম যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, উত্তাপ শুষ্ক করিতে পারে না, মৃত্যু বিনাশ করিতে পারে না। আর পাশ্চাত্যজাতির চক্ষে যেমন কোন জড়বস্তু যতদূর সত্য, তাহাদের নিকট মানবের এই যথার্থ স্বরূপও তদ্রূপ সত্য। যেমন তোমরা "হুর্‌রে হুর্‌রে" করিয়া কামানের মুখে লাফাইয়া পড়িতে সাহস দেখাইতে পার, যেমন তোমরা স্বদেশহিতৈ-

বিত্তার নামে দাঁড়াইয়া দেশের জন্য প্রাণ দিতে সাহসিকতা দেখাইতে পার, তাহারাও তদ্রূপ ঈশ্বরের নামে সাহসিকতা দেখাইতে পারে। তথায়ই যখন মানব জগৎকে মানব কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস করিতেছে, সে যাহা চিন্তা করিতেছে তাহা যে সত্য—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ বিষয় সম্পত্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তথায়ই যখন মানব জীবনকে অনন্তস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে, তখন নদীতীরে বসিয়া তোমরা যেমন সামান্য তৃণখণ্ডকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পার তদ্রূপ শরীরটাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে—যেন উহা কিছুই নয়। সেখানেই তাহাদের বীরত্ব—তাহারা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়; কারণ, তাহারা নিশ্চিত জানে যে—তাহাদের মৃত্যু নাই। এখানেই তাহাদের শক্তি নিহিত—এই শক্তিবলেই শত শত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারে তাহারা অক্ষত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত এবং এই জাতির ভিতর ভীষণতম দুঃখ-বিপদের দিনেও ধর্ম্মবীরের অভাব হয় নাই। পাশ্চাত্যদেশ যেমন রাজনীতি ও বিজ্ঞান-বীর প্রসব করিয়াছে, এশিয়াও তদ্রূপ ধর্ম্মবীর প্রসব করিয়াছেন। বর্ত্তমান (উনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ভারতে পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, যখন পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়িগণ তরবারিহস্তে ঋষির বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে—তাহারা বর্ব্বর, স্বপ্নমুগ্ধ জাতিমাত্র, তাহাদের ধর্ম্ম কেবল পৌরাণিক গল্পমাত্র আর ঈশ্বর, আত্মা ও অন্য যাহা কিছু পাইবার জন্য তাহারা এতদিন চেষ্টা করিতেছিল, কেবল অর্থশূন্য শব্দমাত্র আর এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই জাতি ক্রমাগত যে ত্যাগবৈরাগ্যের অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, এ সমুদয়ই বৃথা, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকগণের মধ্যে এই প্রশ্ন বিচারিত হইতে লাগিল যে, তবে কি এত দিন পর্য্যন্ত এই সমগ্র জাতীয় জীবন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, ইহার একেবারেই সার্থকতা নাই, তবে কি আবার তাহাদিগকে পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুসারে নূতনভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে, তবে কি প্রাচীন পুঁথিপাটা সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, দর্শনগ্রন্থগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে?

তরবারি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজ ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ বিজেতা পাশ্চাত্যজাতি যে বলিতেছেন, তোমাদের পুরাতন যাহা কিছু আছে, সবই কুসংস্কার, সবই পৌত্তলিকতা! পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে পরিচালিত নূতন

বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষিত বালকগণ অতি বাল্যকাল হইতেই এই সকল ভাবে অভ্যস্ত হইল, সুতরাং তাহাদের ভিতর যে সন্দেহের আবির্ভাব হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে সত্যানুসন্ধান না হইয়া দাঁড়াইল এই যে, পাশ্চাত্যেরা যাহা বলে, তাহাই সত্য। পুরোহিতকুলের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে, বেদরাশি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে—কেন না, পাশ্চাত্যেরা একথা বলিতেছে। এইরূপ সন্দেহ ও অস্থিরতার ভাব হইতেই ভারতের তথাকথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠিল।

যদি তুমি প্রকৃত সংস্কারক হইতে চাও, তবে তোমার তিনটী জিনিষ থাকা চাইই চাই। প্রথমতঃ, হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? জগতে এত দুঃখকষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে, ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া যথার্থই কি তোমার অনুভব হয়? তোমার সমগ্র অস্তিত্বটাই কি ঐ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? উহা কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে? তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? উহা কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর, শিরার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি ইহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তার পর চাই কৃতকর্ম্মতা—বল দেখি—তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি?—জাতীয় ব্যাধির কোনরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছ কি? হইতে পারে—প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে সুবর্ণখণ্ডসমূহ রহিয়াছে। এমন কোন উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোণাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটী জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে দেশের কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করিয়া কি বলিতে পার যে, কাঞ্চন, মানযশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে নাই? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কায করিয়া যাইতে পার? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার, তুমি কি চাও তাহা জান, আর তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্ত্তব্য এবং সেই

কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়া যাইতে পার? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার যে, যতদিন জীবন থাকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না হইবে, ততদিন অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া তোমার উদ্দেশ্যসাধনে লাগিয়া থাকিবে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ শিক্ষক, তবেই তুমি মানবজাতির পক্ষে মহামঙ্গলস্বরূপ। কিন্তু লোকে বড়ই ব্যস্তবাগীশ, বড়ই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য নাই, তাহার প্রকৃত দর্শনের শক্তি নাই। সে লোকের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়—সে এখনি ফল দেখিতে চায়। তাহার কারণ কি? কারণ এই,—এই ফল সে নিজেই ভোগ করিতে চায়, প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য চাহে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই অধিকার নাই।

ফলকামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার, হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—এইরূপ ব্যস্তবাগীশ বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগ করিবে বলিয়া সে যাহা হউক একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে এই সংস্কারের জন্য বিজাতীয় আগ্রহ আসিল। মনে হইল, যেন জড়বাদের তরঙ্গ ভারতকে আক্রমণ করিয়া ঋষিদিগের উপদেশ ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু এই জাতি এইরূপ সহস্র সহস্র বিপ্লব-তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সহিত তুলনায় এ তরঙ্গের বেগ অল্প ছিল। শত শত বর্ষ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া এই দেশকে বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইয়াছে, তাহাকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে, তরবারি ঝলসিয়াছে এবং "আল্লার জয়" রবে ভারতগগন বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পরে যখন বন্যা থামিল, দেখা গেল—জাতীয় আদর্শসমূহ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। উহা মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে, যতদিন উহার জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম্মভাব থাকিবে, যতদিন না ভারতের লোক ধর্ম্মকে ছাড়িয়া বিষয়-সুখে উন্মত্ত হইবে। ভিক্ষুক ও দরিদ্র হয়ত তাহারা চিরকাল থাকিবে, ময়লা ও মলিনতার মধ্যে হয়ত তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্তু তাহারা যেন

তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে, তাহারা যে ঋষিদের বংশধর, একথা যেন ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্যদেশে একটা মুটে মজুর পর্য্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু ব্যারণের বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্ পর্য্যন্ত অরণ্যবাসী, বল্কলপরিহিত, আরণ্যফলমূলভোজী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে আপনাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির বংশধর হইতেই চাই আর যতদিন পবিত্রতার উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

ভারতের চারিদিকে যখন এইরূপ নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশের কোন সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটী বালকের জন্ম হয়। পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান্ সেকেলে ধরণের লোক। প্রাচীনতন্ত্রের প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের জীবনটা নিত্য ত্যাগ ও তপস্যা-ময়। তাঁহাকে অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তার উপর আবার নিষ্ঠা-বান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন প্রকার বিষয়কর্ম্ম নিষিদ্ধ। আবার যার তার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবারও যো নাই। কল্পনা করিয়া দেখ—এরূপ জীবন কি কঠোর জীবন! তোমরা অনেকবার ব্রাহ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরোহিত্য ব্যবসার কথা শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছ, এই অদ্ভুত নরকুল কিরূপে তাহাদের প্রতিবেশিগণের উপর এরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিল? দেশের সকল জাতি অপেক্ষা তাহারা অধিক দরিদ্র আর ত্যাগই তাহাদের শক্তির রহস্য। তাহারা কখন ধনের আকাঙ্ক্ষা করে না। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র পুরোহিতকুল তাহারাই আর তজ্জন্যই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। তাহারা এরূপ দরিদ্র বটে, তথাপি দেখিবে, যদি গ্রামে কোন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণপত্নী তাহাকে গ্রাম হইতে কখন অভুক্ত চলিয়া যাইতে দিবে না। ভারতে মাতার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আর যেহেতু তিনি মাতা—সেই হেতু তাঁহার কর্ত্তব্য—সর্ব্বশেষে আহার। প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে হইবে, সকলে আহার পাইয়াছে, শেষে তাঁহার পালা। সেই হেতুই ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া থাকে। আমরা যে ব্রাহ্মণীর কথা বলিতেছি, আমরা যাঁহার জীবনী বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার মাতা এইরূপ আদর্শ হিন্দুজননী ছিলেন। ভারতে যে জাতি যত উচ্চ, তাহার বাঁধাবাঁধিও সেইরূপ অধিক। খুব নীচ জাতিরা যাহা খুসী তাহাই খাইতে পারে, কিন্তু তদ-পেক্ষা উচ্চতর জাতিসমূহে দেখিবে, আহারের নিয়মের বাঁধাবাঁধি রহিয়াছে আর

উচ্চতম জাতি, ভারতের বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি ব্রাহ্মণের জীবনে—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুব বেশী বাঁধাবাঁধি। পাশ্চাত্যদেশের আহার-ব্যবহারের তুলনায় তাহাদের জীবনটা ক্রমাগত তপস্যাময়। কিন্তু তাহাদের খুব দৃঢ়তা আছে। তাহারা কোন একটা ভাব পাইলে তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমে উহার পোষণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করে। একবার উহাদিগকে কোন একটা ভাব দাও, সহজে উহা আর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, তবে নূতন ভাব ধারণা করান তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা এই কারণে অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সঙ্কীর্ণ ভাবপরিধির মধ্যে বাস করে। কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে, তাহারা সেই সকল বিধি-নিষেধের সামান্য খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বজ্রদৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে। তাহারা বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র অবান্তর বিভাগের বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহাদের ঐকান্তিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কারণ, তাহাদের যে দৃঢ় ধারণা আছে যে ইহা সত্য, তাহা হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত যাহাতে লাগিয়া থাকে, আমরা সকলে উহাকে ঠিক বলিয়া মনে না করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের মতে উহা সত্য। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, দয়া ও দানশীলতার চূড়ান্ত সীমায় যাওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করিতে, সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে অনশনে দেহত্যাগ করে, শাস্ত্র বলেন, উহা অন্যায় নহে, বরং উহা করাই মানুষের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজের মৃত্যুর ভয় না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে দানব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা এইরূপ চূড়ান্ত দানশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী প্রাচীন মনোহর উপাখ্যানের কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। মহাভারতে লিখিত আছে, একটী অতিথিকে ভোজন করাইতে গিয়া কিরূপে একটী সমগ্র পরিবার অনশনে প্রান দিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, কারণ, এখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। মদীয় আচার্য্যদেবের পিতামাতার চরিত্র প্রায় এতদ্রূপ ছিল। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া গৃহিণী সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিল—আর

জন্ম হইতেই ইঁহাতে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্ম হইতেই তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইত, কি কারণ তিনি জগতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন, আর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রযুক্ত হইল। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন। ব্রাহ্মণসন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। ব্রাহ্মণের লেখাপড়ার কায ছাড়া অন্য কাযে অধিকার নাই। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী, যাহা এখনও দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সংসৃষ্ট শিক্ষা—আধুনিক প্রণালী হইতে অনেক পৃথক্। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রগণকে বেতন দিতে হইত না। তাঁহাদের এই ধারণা ছিল, জ্ঞান এতদূর পবিত্র বস্তু যে, কাহারও উহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মূল্য না লইয়া অবাধে জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে। আচার্য্যেরা ছাত্রগণকে বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন, আর শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে খাদ্য-বস্ত্র প্রদান করিতেন। এই সকল আচার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য বড়লোকেরা বিবাহশ্রাদ্ধাদি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে আবার তাঁহাদের ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিতে হইত। যে বালকটীর কথা আমি বলিতেছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্প দিন পরে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য—কেবল সাংসারিক উন্নতি। সুতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র আসিল, এই বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটী স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরের পৌরোহিত্য-কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমাদের মন্দির তোমরা যে অর্থে চার্চ্চ শব্দ ব্যবহার কর, তদ্রূপ নহে। উহারা সাধারণ উপাসনার স্থান নহে, কারণ, ভারতে সাধারণ উপাসনা বলিয়া কিছু নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য মন্দির করিয়া দেয়।

বিষয়-সম্পত্তি যাহার বেশী আছে, সে এইরূপ মন্দির করিয়া দেয়। সেই মন্দিরে সে কোনরূপ ভগবদবতারের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভগবানের নামে উহা পূজার জন্য উৎসর্গ করে। রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ্চে যেরূপ মাস (Mass) হইয়া থাকে, এই সকল মন্দিরেও কতকটা তদ্রূপ ভাবে পূজা হয়—শাস্ত্র হইতে

মন্ত্রশ্লোকাদি পাঠ হয়, প্রতিমার সম্মুখে আলো ঘুরান হয়, মোট কথা, যেমন আমরা একজন বড়লোকের সম্মান করি, প্রতিমার প্রতি ঠিক তদ্রূপ আচরণ করা হয়। মন্দিরে কায হয় এই পর্য্যন্ত। যে ব্যক্তি কখন মন্দিরে যায় না, তাহা অপেক্ষা যে মন্দিরে যায়, মন্দিরে যাওয়ার দরুণ সে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং যে কখন মন্দিরে যায় না, সেই অধিকতর ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ, ভারতে ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, আর সে নিজ বাটীতে নির্জ্জনে সমুদয় উপাসনাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে মন্দিরের পৌরোহিত্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার ভিতর এই ভাব আছে যে, যেমন অর্থ লইয়া বিদ্যাদান ঘৃণিত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে একথা আরো বেশী খাটে—মন্দিরের পুরোহিত বেতন লইয়া যখন কার্য্য করে, তখন সে এই সকল পবিত্র বস্তু লইয়া ব্যবসা করিতেছে বলিতে হইবে। অতএব যখন দারিদ্র্যের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া এই বালককে তাঁহার পক্ষে একমাত্র জীবিকার উপায়স্বরূপ মন্দিরের পৌরোহিত্য কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইল, তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইল কল্পনা করিয়া দেখ।

বাঙ্গালা দেশে অনেক কবি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত গীত সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং সকল পল্লীগ্রামে সেই সকল সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীত আর সেই গুলির সার ভাব এই যে—ধর্ম্মের অপরোক্ষানুভূতি—সম্ভবতঃ এই ভাবটী ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের বিশেষত্ব। ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাব নাই। মানুষকে ঈশ্বর সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম। অনেক সাধুপুরুষের ঈশ্বর-দর্শন-কাহিনী ভারতের সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ মতবাদসমূহই তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। আর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি এইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ-হের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ব্যক্তিগণের লিখিত। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই উহাদিগকে বুঝিবার উপায় নাই। কারণ, তাঁহারা নিজেরা কতকগুলি বিষয় দেখিয়া তবে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আর যাহারা নিজদিগকে ঐরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছে, তাহারাই কেবল ঐ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। তাঁহারা বলেন, ইহজীবনেই এইরূপ প্রত্যক্ষানু-